সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

ত্রয়োবিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৭৩ - আষাঢ় ১৩৭৪ · ১৮৮৮-৯ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

হিমালয় শিল্পী নন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

চিঠিপত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[কলিকাতা]

ভ্রাতঃ

তোমার পত্র এইমাত্র পাওয়া গেল। কবে আসছ? ছুটি নেই না কি? পালিয়ে আস্‌তে পার না? কোথায় জঙ্গলে মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে জমি টানাটানি করে বেড়াচ্চ? একবার সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বঙ্গভূমির দিকে দৃক্‌পাত করবে না? আমি হপ্তাখানেক দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করে কাল ফিরে এসেছি। আবার আগামীকল্য প্রাতে শিলাইদহে যাত্রা করচি। আমাদের শিলাইদহ পল্লি-ভবনে একবার তোমার অধিষ্ঠান হবে কি? কবে হতে পারবে? বেশ আরামে আছি। মনুষ্যের উপদ্রব প্রায় নেই।

ফুলজানিটা সংশোধন করলে বেশ ভাল জিনিষ হতে পারবে। কিন্তু তোমার মোকাবিলায় ব্যতীত সে কাজ হতে পারে না। তুমি যখন আসবে তখন একত্র বসে দেখা যাবে।

মৈনু ত বেলার বয়সী। বেলাও খুব মস্ত হয়েছে। তাকে দেখলে আমার মায়ের বয়সী বলে ভ্রম হতে পারে। শিলাইদহে যদি কখনো মৈনুকে নিয়ে উপস্থিত হতে পার তাহলে বেলার সঙ্গে বোধ হয় তার প্রণয় হতে পারে।

তোমাকে মোটা কাগজে ছাপা কল্পনা একখণ্ড পাঠান গেল। ইচ্ছামত বাঁধাবে বলে মলাট দেওয়া হয়নি।

শিলাইদহ যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত আছি। আজ বিদায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯০০]

ওঁ

[কলিকাতা]

ভ্রাতঃ

ভোলাকে পাঠাতে যতই দেরি করচ ততই তার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্চে— কারণ তার ক্লাস হুহুঃ শব্দে এগিয়ে যাচ্চে। এর পরে সে আর কোন মতেই তার ক্লাসের ছেলেদের নাগাল পাবে না।

আমার মতে রথী সন্তোষ এবং ভোলা তিনজনকেই এবার বোলপুরে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। তোমাদের ওখানে যখন প্লেগের একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখন আর কাজ কি। এত দিন বোলপুরে ছিলুম— এখন বোলপুর ভারি রমণীয় হয়েছে— বেশ ঠাণ্ডা— শরীরের পক্ষেও এখন ভাল। রথী এবং

সন্তোষ আপাতত কুঠি বাড়িতেই থাক্‌বে— বিদ্যালয়ে তাদের থাকবার দরকার নেই। সেখানে তাদের পড়াশুনোর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

বাবামশায়ের হঠাৎ কাল জর হওয়াতে টেলিগ্রাম পেয়েই আজ এখানে এসেছি। কাল সকলেরই ভয় হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্য এই যে আজ সকালেই তিনি ভাল বোধ করচেন এবং অন্যান্য দিনের মত ছাতে গিয়ে উপাসনাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করেছেন। ওঁর শরীরের প্রাণশক্তি দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। ইংরাজ ডাক্তাররা বলে ওঁর বয়সে এ রকম নাড়ি তারা কখনো দেখেনি।

যাই হোক্‌ তোমাদের ওখান থেকে ঘৃতের আশা তাহলে পরিত্যাগ করতে হল। কেবল দিনকয়েকের জন্যে ভাল ঘিয়ের আস্বাদ দিয়ে এ রকম প্রবঞ্চনা করবার দরকার কি ছিল! তখনি বল্লুম এক মোন দাও ল্যাণ্ড একুইজিশনের হুজুরের মত হলনা!

তোমার

[১৯০১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

[শিলাইদহ]

ভ্রাতঃ

তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুসি হইলাম। শরৎ ও বেলার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে ইহাতেও আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। বেলা আজকাল বেশ রীতিমত গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে সে নিজে রাঁধিয়া বাড়িয়া দশজনকে খাওয়াইতেও শিখিয়াছে। আমি বর্ষা বাদে একবার কিছু দিনের জন্য তাহাদের ওখানে যাইব মনে করিতেছি। সেই সময় তুমিও ওখানে যাইয়ো, আমিও তোমার ওখানে যাইতে পারি। আমার স্বাস্থ্যটা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে— এই ভাঙা শরীরটাকে আর টানিয়া টানিয়া চালাইয়া লইতে পারিনা— এক এক সময় হাল ছাড়িয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

সন্তোষ এখানে পড়িতেছে। দেখিলাম সে প্রায় সকল বিষয়েই কাঁচা— কেবল তাহার ইংরাজিটা ভাল। বোধ হয় নানা স্কুলে সঞ্চরণ করিয়া তাহার এই দশা হইয়াছে। এখানে যথাসম্ভব তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া লইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। রথীর সঙ্গে তাহার বেশ জমিয়া গেছে। তোমার ছুটি বুঝি সেই আশ্বিন মাসে? একবার আমাদের বিদ্যালয়টা দেখিয়া যাও না। চোখের বালি সমস্তটা লিখিয়া শৈলেশের হাতে দিয়া দিয়াছি। এখন আবার অন্য গল্পে হাত দিতে হইবে। কাজের আর অন্ত নাই— একটা ফুরাইলেই আর একটা ধরিতে হয়। জীর্ণ লেখকদের জন্য কেহ সমুদ্রের ধারে পর্ব্বতের উপরে একটা পিঁজরাপোল বানাইয়া দিতে পারে না?

মইনুর বিবাহ চুকিয়া গেলে মনটা নিশ্চিন্ত হয়। শৈলেশের কাছে শুনিয়াছি পাত্রটি ভাল— এখন ঈশ্বর করুন কোন বাধা না পড়ে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমার

[১৯০১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔ

[শিলাইদহ]

ভ্রাতঃ

কতদিন চিঠি লিখি নাই তার ঠিক নাই। মনে করি দেখা হইবে, দেখাও হয় না। শৈলেশ এবং প্রবোধ সুবোধের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ আলোচনা হইয়া থাকে—বলা বাহুল্য তাহার মধ্যে তোমার প্রসঙ্গের অভাব থাকেনা। তোমার সেখানকার বর্ণনা শুনিয়া একবার চট্ করিয়া দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে কিন্তু

"পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি।"

নানা বন্ধনে বিজড়িত— আজকাল আর গতিবিধির স্বাধীনতা নাই।

তোমার বঙ্গদর্শনের প্রস্তাব শৈলেশের কাছে পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। শৈলেশ আজ কাল এই সমস্ত সাহিত্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ে খুবই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে! তাহার উদ্যম যথেষ্ট আছে ব্যবসায় বুদ্ধিরও অভাব নাই, সহায়ও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে সুতরাং সফলতার আশা করা যাইতে পারে।

আমি কাল সপরিজনে এখানকার কুঠিবাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় গ্রহণ করিব। এখানে পরিবার আনিয়া পদ্মার সহিত আমার সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছিল— আর একবার ঘনিষ্ঠতা করিয়া আসিতে চাহি। এখানকার খবরাদি সমস্তই ভাল।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯০১]

ঔ

[বোলপুর]

ভ্রাতঃ

ইতিমধ্যে ওকাকুরা ও সুরেন গয়ায় গিয়েছিলেন। তুমি সুদূরে আছ শুনে তাঁহারা তোমার ঠিকানা করে উঠতে পারেন নি। ইতিমধ্যে মোহন্ত বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সে বলে গবর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সে জমি দিতে পারে না। তুমি তাকে একটু বিশেষ রকম তাগিদ দিতে পারনা? ওকাকুরা বলচে অকৃতকার্য্য হয়ে জাপানে ফিরে যেতে হলে তাকে অত্যন্ত লজ্জিত হতে হবে। নিতান্ত মৃদুভাবে না বলে মোহান্তকে একটু চেপে ধরনা!

ওকাকুরাকে গয়ার তামাক পাঠাতে তুমি প্রতিশ্রুত ছিলে সে কথা নিশ্চয় ভুলে বসে আছ। সে ২০শে সেপ্টেম্বর নাগাদ জাপানে ফিরবে তাকে তৎপূর্ব্বে ভাল তামাক একতাল পাঠিয়ে দিয়ো।

এখন তুমি বুঝি স্বজন পরিবৃত হয়ে আছ। সকলের খবর কি? মৈনু কেমন আছে? তোমার জামাই বেচারা অধীর হয়ে বেড়াচ্চে।

সন্তোষের পড়া ভালই চলচে। আশা করি এবার সে পাস হতে পারবে। তার সংস্কৃত এবং অঙ্ক কাঁচা আছে। সেইটে যদি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করে নিতে পারে তাহলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

এণ্ট্রেন্স পাস করিয়েই রথীকে আমি জাপানে mining অথবা আর কোন Practical বিষয় শিখতে পাঠাব। আমার উদ্দেশ্য এই যে, শিখে এসে সে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারবে। সন্তোষকে পাঠাওনা। বেশি খরচ নয়— মাসে ৬০৲ টাকা মাত্র। তুমি যে কোন বিষয়ে তাকে পারদর্শী করতে চাও সেখানে তারই সুবিধা আছে। বুঝতেই পারচ বাঙালিদের চাকরি প্রভৃতি সমস্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে— ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়— অতএব একটা কোন অর্থকরী শিল্পবিদ্যা না শিখতে পারলে উপায় নেই— য়ুরোপে শিখতে দেবেনা অর্থও ঢের লাগে— জাপানের উপরেই আমাদের একমাত্র ভরসা— কিন্তু সেও বোধ হয় বেশি দিন নয়— এই বেলা সময় থাকতে যাওয়াই ভাল। আমি রথীকে আগামী মার্চ্চের মাঝামাঝি অর্থাৎ পরীক্ষার পরেই পাঠাব— তুমি এ সম্বন্ধে ভাল করে চিন্তা করে দেখো। ইতি রবিবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯০২]

ওঁ

[কলিকাতা]

ভ্রাতঃ

রথী সেরে উঠেছে— আমিও ফিরে এসেছি। সেদিন বৌঠাকরুন এখানে এসেছিলেন— দুরদৃষ্টবশত আমি অন্তর্দ্ধান করেছিলেম— সেজন্যে বিমর্ষ আছি।

বেলারা মজঃফরপুরে ফিরে গেছে— সেখানে প্লেগ কমে গেছে— কর্ম্মস্থান ছেড়ে দীর্ঘকাল পালিয়ে থাকাই বা চলে কি করে?

আমাদের বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট চল্‌চে— তাই কলকাতায় আবদ্ধ হয়ে আছি— নইলে বোলপুরে পলায়ন করতেম। শরীরটা যে নেহাৎ মন্দ আছে তা নয়।

তোমার ওষুধের নাম শৈলেশকে লিখে দিয়েছি। সপ্তাহে একবার করে কিছুদিন খেয়ে দেখো। যদি বেদনা হয় তবে আপাতত যে পর্য্যন্ত ঔষধ না পৌছয় বেলেডোনা খেতে থাক এবং মাদারটিংচার বেলেডোনা দশফোঁটা নিয়ে কিঞ্চিৎ Sweet oil অথবা vaseline এর সঙ্গে মিশিয়ে বেদনার জায়গাটাতে লাগিয়ে দিয়ো।

জমির সন্ধান কোরো। ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে। সন্তোষ ও রথীকে agricultureএর জন্যই তৈরি করা স্থির করেছি— ওরা দুইজনে মিলে চাষবাস করবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা

করে জীবন কাটাবে। চাষের কাজে স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকা দরকার— নইলে কালিগ্রামে জমি যথেষ্ট আছে। তুমি এইটেতে একটু মনোযোগ দিয়ো। ইতি বৃহস্পতিবার।

তোমার

[১৯০৩] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[কলিকাতা]

ভ্রাতঃ

রেণুকা সম্বন্ধে গত ৩।৪ দিন হইতে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তৎপূর্বে তাহার বাঁচিবার আশা অল্পই ছিল। ডাক্তাররা কেবলি Strychnine প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে সজীব রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি আসিয়া সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। মন্দ উপসর্গ সমস্তই কমিয়া গেছে। মনে হইতেছে এবারকার মত এ ধাক্কাটা সামলাইয়া লওয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা করিতে সাহস হয়না।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলাম। অসমাপ্ত অবস্থাতেই ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। এই জন্য মনের মধ্যে উদ্বেগ রহিয়া গেছে। তুমি সন্তোষকে লিখিয়া দিয়ো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্র আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে। মোহিতবাবু জগদীশ ও রমণীর উপর বিদ্যালয় পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া আসিয়াছি— আশা করিতেছি তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের যথাসম্ভব উন্নতি ও শৃঙ্খলা সাধন হইতে পারিবে।

তুমি যখন পেন্সন লইয়া স্বাধীন হইবে তোমাকে আমার বিদ্যালয়ের মধ্যে টানিয়া লইব।

বঙ্গদর্শনের জন্য কিছু লেখ না কেন? বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইয়া অবধি অদৃষ্ট আমাকে বিবিধ উপায়ে একটা গহ্বর হইতে আর একটা গহ্বরের মধ্যে টানিয়া ফেলিতেছে। তবু ভরসা করিয়া নৌকাডুবি লিখিতে বসিয়াছি। শেষকালে সত্যই ডুবি না হয়— ভালয় ভালয় গল্পটাকে ঘাটে পৌছিয়া দিতে পারিলে বাঁচি (নিমতলার ঘাটে নয়)। ক্রমেই তুমি ঘোরতর ডেপুটি হইয়া উঠিতেছ। আগে তবু একটা আধটা লেখা কলম হইতে বেফাঁস বাহির হইয়া যাইত— এখন তোমার লেখনী কেবলি কি রিপোর্ট প্রসব করিতেছে?

তোমার

[মার্চ ১৯০৩] শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

আলমোড়া

ভ্রাতঃ

তোমার শোক সংবাদে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। আমি নিজে এখন মৃত্যুকে একটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করিনা। কিন্তু শোক অনিবার্য। ঈশ্বর তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিন— আর কি বলিব? ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩১০

তোমার

[জুলাই ১৯০৩] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

ভ্রাতঃ

বিজয়ার নমস্কার। ভোলা আমাদের সঙ্গে কাল শিলাইদহে এসেচে। আজ আমরা বোটে করে ওপারে নির্জ্জন চরে আশ্রয় নিতে চলেচি। ভোলার বোধ হয় ভালই লাগবে। ও ভারি লাজুক— ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানোই মুস্কিল। ওকে দেখলে ওর মাকে মনে পড়ে।

বেলা তার শাশুড়ির সঙ্গে পুরী ভ্রমণে গেছে— পিসিমাও তার সঙ্গ নিয়েচেন। এখানে আমার সঙ্গে কেবল মীরা এসেচে। মীরাকে ভোলা বিশেষ লজ্জা করেনা তাই রক্ষে— নইলে এ কয়েকদিনে ও বোধ হয় কথা কইতে ভুলে যেত। বেলারা দিন আষ্টেক দশ বাদে পুরী থেকে ফিরবে কথা আছে। ফিরলে পর তারা এখানে আসবে। ভোলার সহাধ্যায়ী বন্ধু একটি এসেচে। আরও একটি আসবে।

তোমাদের সব খবর ভাল ত? বৌঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার জানাবে। ইতি ২০শে আশ্বিন ১৩১০

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

[কলিকাতা]

ভ্রাতঃ

কলকাতায় যতকাল আছি তুমি আমার কাছে চিঠিপত্র প্রত্যাশা কোরো না। এখনো আমি লোষ্ট্রাহত মৌচাকের মাছির মত চঞ্চল হয়ে ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছি। সকাল থেকে লোকের অবসর নেই। যদিচ উপরে আড্ডা বলে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি পেয়েছি তবু যে রকমটা চল্‌চে সেও কম এথি নয়।

আগামী ৭ই অক্টোবরে রাত্রে গয়াধামে প্রয়াণ করব। বাঁকিপুর দিয়ে যেতে বেলা দ্বিপ্রহর হবে। নিবেদিতা যেই শুনলেন্ আমরা তাঁবুর জোগাড় করে দিব্য আরামে থাকবার চেষ্টায় আছি অমনি বলে উঠ্‌লেন Oh, now nice! অর্থাৎ ওঁদের জন্যও তাঁবুর জোগাড় করে দেওয়া আবশ্যক। যদি প্রবোধচন্দ্রের মধুর সম্পর্কীয় কুটুম্ব তাঁর রাজকীয় ক্লায়াণ্ট্ প্রভৃতির কাছ থেকে তাঁবুর জোগাড় করে দিতে পারেন তাহলে সকলেরই সুবিধা হতে পারবে।

এখানে সকলে ভাল আছেন—কেবল বেলার পর্শু থেকে জ্বর হয়েছে, অতএব আমাকে ওষুধের বাক্স খুলে বস্‌তে হয়েছে। তোমাদের রোগীর খবর কি? অর্থাৎ যেটিকে ব্রায়োনিয়া দেওয়া হয়েছিল। বৌঠাকরুনের সন্দেশটা পথের মধ্যে বড় মধুর লেগেছিল—হাতের গুণে···ছানার গুণে জানিনে। যেহেতু সে জিনিষটা যতীর বাক্সে রক্ষিত ছিল—ভুক্তাবশিষ্ট গোলক কয়টি সেই ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল। এদিকে পিসিমা চিরিঞ্জির দরবার করচেন জানিয়ে রাখলুম। যতী তোমাকে আর একটি প্রতিমূর্ত্তি শৈলেশের মারফৎ দিয়েছেন। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[অক্টোবর ১৯০৪]

ওঁ

কলিকাতা

ভ্রাতঃ

Howrah Kalka Through Passenger নামক যে গাড়িখানা সাড়ে চারটার সময় কলকাতা ছাড়ে ও রাত দেড়টার সময় মধুপুর পৌছয়—এবং কৌলে প্রাতঃকালে ছাড়িয়া গয়ায় পৌছয় মধ্যাহ্নে—সেই ট্রেনযোগে আমরা ছাড়চি। একটা পুরা গাড়ি রিজার্ভ করার কথা, সুতরাং কিউলে বদল করতে হবেনা। কিন্তু রথীদের পক্ষে সময়টা অসুবিধাজনক হবে না কি? যাই হোক্ এর চেয়ে সুবিধাজনক সময় তোমাদের ওখান থেকে সম্ভবপর নয়। আমরা শনিবারে ছাড়ব—অতএব সেইদিনই রথীরা আমাদের ধরতে পারে—ওদের সঙ্গে তাহলে জ্ঞানবাবুদের পাঠাবার দরকার কি? কেবল গিরিডি থেকে মধুপুর পর্য্যন্ত বই ত নয়।

সুবোধ বেচারাও বড় কষ্ট পাচ্চে? বোধ করি ওর ঠিক ওষুধটা হচ্চে Antimonium Crudum 30।

আমি বোধ হয় গয়াযাত্রায় যোগ দিতে পারব—কর্ত্তার শরীর একটু ভাল আছে। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩১১

তোমার

[অক্টোবর ১৯০৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[কলিকাতা]

ভ্রাতঃ

সুবোধচন্দ্রকে যদি আমাদের সঙ্গে আসতে দিতে তাহলে তার জ্বর হতনা— এবং জ্বর হলেও তার মনে কোনো দুঃখ থাকতনা। এখন অস্থানে জ্বর বাধিয়ে নিশ্চয়ই সে জ্বরের তাপের চেয়ে দ্বিগুণ তাপ ভোগ করচে।

আমার কথা আর বোলোনা। ইংরাজের রাজধানী আমাকে বেশিদিন পোষাবেনা। এরি মধ্যে লোক লেগেছে—মধ্যাহ্নে ১টার সময় আহার, রাত্রে দশটার সময় নিষ্কৃতি— একে ঠিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বলা চলেনা।

বুধগয়ায় আমার যাওয়া ঘটে কিনা সন্দেহস্থল। পিতার শরীর অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যাই হোক্ ছেলেদের নিয়ে তোমরা যেয়ো। সিস্টার নিবেদিতার ও জগদীশের সংসর্গে ও আলাপ আলোচনায় তাদের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করচি। নিবেদিতা ওদের জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি ওদের দুজনের ইতিহাস শিক্ষার ভার নিয়েছেন— সেইজন্যে এই উপলক্ষ্যে তিনি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে চান। বুধগয়ায় বসে তিনি ওদের ইতিহাসচর্চ্চার ভূমিকাস্থাপন করে দিতে পারবেন। যতী ও লালু যাবেন— মহারাজ লালুকে যেতে সম্মতি দিয়েছেন।

তাঁবুর বন্দোবস্ত তুমি করে রেখো। জনসংখ্যা নিম্নলিখিত মত :— জগদীশ, নিবেদিতা, জগদীশজায়া, সিস্টার ক্রিষ্টান, লালু, যতী, সম্ভবতঃ আমি, তুমি, সন্তোষ ও রথী। সর্ব্বসমেত ৯।১০।

রাজগৃহে টিকারীর রাজার বাড়ি আছে— সেখানে জগদীশ কিছুদিন থাকতে চান। টিকারী উপেন্দ্রনাথ বাবুর মক্কেল—এ সম্বন্ধে তাঁকে একটা পত্র জারি কোরো। জগদীশরা গয়ায় গেলে যাতে তাঁদের যথোচিত অভ্যর্থনা হয় তাঁদের অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য উকীল বাবুদের অনুরোধ করে পত্র লিখো।

সবশেষে সেই জমির জন্য আমার দরখাস্ত জানিয়ে ইতি করা যাক্।

তোমার

[১৯০৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্গত আটখানি পত্র ব্যতীত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আরও চারখানি পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মৈনু। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা

সন্তোষ। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার : শ্রীশচন্দ্রের পুত্র : শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্রবর্গের অন্যতম।

ভোলা। সরোজচন্দ্র মজুমদার : সন্তোষচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা

সুবোধচন্দ্র। সুবোধচন্দ্র মজুমদার : আশ্রমের অধ্যাপক

শৈলেশ। শৈলেশ মজুমদার : শ্রীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

বৌঠাকরুন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী

বেলা। কবির প্রথম সন্তান। অন্য নাম মাধুরীলতা

শরৎ। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : মাধুরীলতার স্বামী : কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র

রেণুকা। কবির তৃতীয় সন্তান মীরা। কবির চতুর্থ সন্তান

রথী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবোধ। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক

কর্তা, বাবামশায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ওকাকুরা। ওকাকুরা কাকুজো : জাপানী শিল্পী ও শিল্পশাস্ত্রী

সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির ভ্রাতুষ্পুত্র : সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন : আশ্রমের অধ্যাপক

জগদীশ। জগদীশচন্দ্র বসু জগদীশজায়া। অবলা বসু

রমণী। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা

পিসিমা। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনা দেবীর পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী।

সিস্টার নিবেদিতা। মার্গারেট নোব্‌ল : ভগিনী নিবেদিতা

যতী। যতীন্দ্রনাথ বসু : অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা : ত্রিপুরার মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি

সীমা ও অসীম মরমীদের যুক্তমত

ক্ষিতিমোহন সেন

মধ্যযুগের সাধকেরা বলিয়াছেন সর্বক্ষণ সর্বদিক হইতে সকল সীমার মধ্যে নিরন্তর আসিতেছে অসীমের ডাক। এই ডাক প্রাণে ধারণ করিয়া সাড়া দিতে পারে এমন শ্রোতা কোথায়?

কবীর কহিলেন, সাড়া যে দিবে সে আছে আমার অন্তরের মধ্যে। সেই অসীমই আমার গুরু। একদিন একটি মন্ত্র ফুঁকিয়া দিয়া তাঁহার দীক্ষা শেষ হয় না। নিরন্তর চলিয়াছে তাঁহার দীক্ষা। এই ডাকের একদিকে আকাশ ভরিয়া তিনি গুরু-অসীম আর একদিকে আবার চিত্ত শিষ্য-সীমা।

গুরু হমারা গগন মেঁ চেলা হৈ চিত মাহীঁ

কিন্তু গুরুকে আবার বিশেষ কোনো একটি ক্ষণে পাইলেই চলে না। নিরন্তর তাঁহাকে চাই। সেই নিত্য সম্পর্ক থাকে কেমন করিয়া? কবীর বলিলেন, অসীমের সেই ডাকের নিত্য সুরে হও যুক্ত তবে কখনই ঘটিবে না বিচ্ছেদ। সেই সংগীতের প্রেম ধ্বনির মধ্যে আপনাকে যদি কর লীন, তবে কখনো ঘটিবে না উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ।

শব্দ সুরভি মেঁ লীন হৈব বিচ্ছরত কবহু নাহীঁ॥

সকলে বলিলেন আমার চাই মুক্তি। হে কবীর, তুমি তো শুধু দেখাইলে তাঁহার সংগীতের মধ্য দিয়া ডাকের মধ্য দিয়া উভয়ের যোগ। ইহাতে মুক্তি মিলিবে কেমন করিয়া? কবীর বলিলেন, সীমা অসীম ভেদ যুক্ত করা যে মহাপ্রেম, ডুব দাও তাহাতে, তাহাই যথার্থ মুক্তি।

কবীর ডুবু সো প্রেম মেঁ তই দূসর কোই নাহীঁ॥

কিন্তু অসীম যে তিনি, প্রেমও তো তাঁর অসীম। আমি সীমা, যদি সেই প্রেমে ডুবিয়া যাই তবে যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিব। প্রেমের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করা যে পরম সার্থকতা তাহাও বুঝি, তবু অসীমের মধ্যে নিজেকে হারাইবার নামে বড় ভয় হয়। এই ভয় সকল সাধকেরই, সাধনার অবস্থা বিশেষেই ঘটে। কবীর তাই বলেন, যাহারা ডুবিল তাহারা তো প্রেমের অগাধ গভীরতায় ডুবিয়া হইল মুক্ত, আমি পাগল ডুবিতে পারিলাম কই, বৃথা সেই প্রেমসাগরে ভাসিয়া রহিলাম, রহিলাম তার তীরে।

জিঁন ডুব্যা তিন মুক্ত ভয়া গহরে প্রেম পৈঠি।
মৈঁ বৌরা বূড়ন ভরা রহা কিনারে বৈঠি॥

'বালিকাবধূ' (খেয়া) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভয়ের কথাই বলিয়াছেন। সেখানে আমার প্রাণ যেন অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকা, স্বামী কি ধন তাহা সে বোঝে না, মনে করে তিনিও বুঝি তার খেলার ধন।

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই-যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকাবধূ।

তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু!

কহে এরে গুরুজনে,
'ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা'—
ভীত হয়ে তাহা শোনে।…

বালিকা মনে ভাবে যে যেমন করিয়া পারি আমি পতির পূজা করিব। কিন্তু পূজার কি সে জানে? কখনো সময় যায় তার অচেতনে কখনো দুর্দিনে ঝড়ে কম্পিত হইয়া লয় তাঁহার বক্ষে আশ্রয়। স্বামী কিছুই মনে করেন না, তিনি প্রতীক্ষা করিতে জানেন।

তুমি বুঝিয়াছ মনে,
এক দিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।

কিন্তু তবু আর সব পরিজনের মনে হয় ভয়। তাহারা বালিকাকে ক্রমাগত বুঝাইতে চায়!—

মোরা মনে করি ভয়,
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।

কিন্তু যতক্ষণ অন্তরের মধ্যে সেই পরিণতি না আসে ততক্ষণ তাহাকে বুঝাইয়া কোনো লাভ নাই। ততক্ষণ মনের মধ্যে একটা ভয় থাকেই থাকে। কবীরও বলিয়াছেন, নিশিদিন খেলিয়া কাটাইয়াছি সখীদের সঙ্গে, এখন আমার লাগিতেছে বড় ভয়। আমার স্বামীর উচ্চ অট্টালিকা, আরোহণ করিতে কাঁপে আমার প্রাণ।

নিস দিন খেলত রহী সখিয়ন সঙ্গ
মোহি বড়া ভয় লাগে।
মোরে সাহবকী উঁচী-অটরিয়া
চঢ়ত মেঁ পিয়রা কাঁপে॥

নিজেরই নাই ভয়ের অন্ত, তার উপর হিতৈষী জনেরা আরো ভয় দেখাইয়া করেন মহাবিপদ। তাঁহারা বলেন, ওগো দুলহিনী (নববধূ), প্রিয়তমের ঘরে তোমাকে যাইতেই হইবে। এখন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদিলেই বা হইবে কি নানা রকম বাহানা করিলেই বা হইবে কি!

দুলহিনী তোহি পিয়কে ঘর জানা।
কাহে রো রো কাহে গারো কাহে করত বহানা॥

হিতৈষীদের এই অতি-আগ্রহকে বাউলরা বড় নিন্দা করিয়াছেন। জীবনের পরিণতি কালের মধ্য

দিয়া ধীরে ধীরে যে নিয়মে হয় আমরা কি আমাদের গরজের তাগিদে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারি? এইরূপ গরজে মানুষ নিষ্ঠুর হইয়া যে মুকুল ধীরে ধীরে দশ দিনের ধীর তাপে ফুটিত তাহাকে হিসাবমত পিণ্ডীকৃত এক দণ্ডের প্রচণ্ড অগ্নিতাপে ভাজিয়া দগ্ধ করে। মদন তাই দুঃখ করিয়াছেন—

নিঠুর-গরজী, তুই কি মানুষ মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে?
দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল তারে তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড, এর আছে কোন উপায়?
কয় যে মদন, শোন নিবেদন, দিস না বেদন সেই শ্রীগুরুর মনে
তাঁর সহজ ধারা, আপ্‌না হারা, তাঁর বাণী গুণে।

একদিন যথার্থ সময় আসে। বালিকা যুবতী হয়। তখন চারিদিকের সব-কিছুর মধ্যে তাঁহার খবর পাই। অসীম আমাদের গ্রহ-চন্দ্র-তারার ছন্দে ও গতিতে, প্রভাত সন্ধ্যা দিন রাত্রি ও ঋতুমালায় সকল ঐশ্বর্যে, চরাচরের সকল প্রাণধারায় ও সৌন্দর্যে দেখি তাঁরই ব্যাকুল মিলনের বাণী ভরা, তাঁরই প্রেম-লিপি। আজও সে চিঠি অসীম আকাশে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে প্রসারিত, কিন্তু আমার অন্তরে সে প্রেম জাগে নাই বলিয়া সেই লিপি এখন আমার কাছে থাকিয়াও নাই। যখন 'যৌবন' আসে, যথার্থ সময় জীবনে উদিত হয়, তখনই সেই বাণী অন্তরের মধ্যে দীপ্যমান হইয়া ওঠে। একদিন কবীরের কাছেও এমন চিঠি পৌঁছিয়াছিল, তাই তিনি বলিলেন, হে সখীগণ, আমিও হইয়াছি আজ বল্লভের জন্য ব্যাকুলা। যৌবন আগত, বিরহ দিতেছে সন্তাপ, এখন কি না আমি জ্ঞানের অলি-গলিতে মরিতেছি ঘুরিয়া! জ্ঞানের গলিতেই মিলিয়াছে তাঁহার খবর, আমি পাইয়াছি তাঁহার পত্র। অগম্য সন্দেশ সেই বাণীর মধ্যে, এখন আমি মরিতেও করি না ডর। কবীর কহেন, শোনো ভাই প্রিয়বন্ধু, এখন অক্ষয়-অমৃতকে পাইয়াছি বর।

সখিয়ো হমহু ভঙ্গ বল মা সী
আয়ো জোগ বিরহ সতা য়ো
অব মৈঁ জ্ঞান গলী-অধিলাতী?
জ্ঞান গলী মেঁ খবর মিলিগয়ে
হমেঁ মিলী পিয়া কী পাতী!
বা পাতী মেঁ অজব সংদেশা
অব হম মরণে কো ন ডরাতী।
কহত কবীরা সুনো ভাই প্যারে
বর পায়ে অবিনাসী॥

জ্ঞানের গলিতে মিলিয়াছে তাঁহার খবর। সীমার সংসারেই পাওয়া যায় অসীম সেই প্রিয়তমের খবর। কি চমৎকার উপমাটি দিয়াছেন কবীর। কন্যার সার্থকতা তাহার প্রেমময় স্বামীতে, তবু বাপের বাড়ি তাহার কি কম স্নেহের জিনিস? অসীম সেই প্রিয়তম না হইলে জীবন আমাদের ব্যর্থ তবু

সীমার সংসারকে নিন্দা করা নাই। জ্ঞানের গলিতে যে খবর মিলিয়াছে এইজন্য সেই গলির প্রতিই বা কত কৃতজ্ঞতা।

এই পত্র পাওয়ার কথা নবীন প্রবীণ অনেক কবির কাছেই শোনা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি ?
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি ?

মীরাও পত্র পাইয়াছেন, শ্যামের আসিয়াছে সন্দেশ। ওমা! কি পত্রই তিনি লিখিয়াছেন। অনুপম আসিয়াছে তাঁহার পত্র, বুকে তাহা রহিলাম লাগাইয়া। অঞ্চলের আড়াল দিয়া দিয়া আজও সেই পত্র রক্ষা করিতেছি, এখনো তাহা আমি দেখি নাই পড়াইয়া।

শ্যামকে সংদেশো আয়ো পতিয়া লিখায় মায়
পতিয়া অনূপ আঙ্গ ছতিয়া লগায় লীপী
অং চল কী দে দে ওট অজহুঁ ন বঁ চাঙ্গ হো॥

সেই পত্রের মধ্যে প্রিয়তমের নিশ্চয়ই একটা গভীর ব্যাকুলতার কথা লিখা আছে। কারণ কত বড় সমারোহে আসিয়াছে সেই পত্র। মেঘের বাজিতেছিল নাগাড়া, বাদলের সৈন্যদল বহন করিয়া আনিয়াছিল সেই পত্র। আকাশের নীল পতাকা উড়িতেছিল মাথার উপরে। এত বড় সমারোহের মধ্যে তাঁহার পত্র নামিয়া আসিল আমার প্রাণের মধ্যে।

ইন্দ্রকে নগাড়ে বাজে
কদল কী ফৌজ আঙ্গ
গগনকে নিসান খড়ে
উতর আয়ো প্রাণ মেঁ॥

সেই কোন যুগের মীরা আর আজিকার রবীন্দ্রনাথ। কেহ কাহাকেও না জানিয়াও প্রাণে প্রাণে কি গভীর মিল।

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ—
কারেও আমি দেখাব নাকো সেটি।
লিখন আমি নাহিকো জানি,
বুঝি না কী যে রয়েছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা।

পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বাঁশরি বাজি,
পেয়েছি সুখে পরান গাহে 'আহা'।

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি না কি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত।
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যত!
শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে,
ধন্দ লয়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি,
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে।
রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে,
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা,
ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে,
পুলকে রব হয়ে পলকহারা!
তখন নদী চলিবে বাহি
যা আছে লেখা তাহাই গাহি,
লিপির গান গাবে বনের পাতা—
আকাশ হতে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা।
বুঝি না-বুঝি ক্ষতি কিবা,
রব' অবোধসম,
পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি!
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি।

খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।
না-বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

এখন যদি মীরার গানটি আবার পড়িয়া দেখি তবে ঠিক তাহার মর্ম বুঝিতে পারিব।

ফজর মেঁ জয় আয়া ফলটী পুশাক্ষ সুমহলী তেরী
গথক ভর কুচ সুর লগায়া প্রীত জাগায়া মেরীণ
ধূপয়ে কথভা কিয়া উদাসা ক্যাপীড় দুর যথায়া
সখা গেরুয়া সুর মময়ণী ঘরনসা বৈসআয়া॥
কাগজ কালা হরফ উজাসা ক্যাভায়ী পায়া
ক্রতী রৌণক কোঁণয়ে য়লবী তুহিয়াছ ভুলায়া॥

জ্ঞানদাসও অপূর্ব সমারোহে ও সাজে সজ্জিত প্রকৃতির হাতে যে পত্র পাইয়াছিলেন তাহারও ছিল কত সমারোহ! এত সমারোহ কেন সে কথা প্রশ্ন করিতে গিয়া প্রকৃতির কাছে তিনি উত্তর পাইলেন।

বিরাট সেই উৎসব, বিশাল সেই যজ্ঞসভার নিমন্ত্রণ, তুই তাহার একমাত্র নিমন্ত্রিত। কাজেই লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত আছে তাঁর নিমন্ত্রণলিপি, এবং গর্বিত আমি সেই নিমন্ত্রণপত্র-বাহক।

ভারী জলসা আজম দাংত তুহী ইক মিহমান।
খল্ক খল্ক মেঁ খত হৈ ফেলী মগরুর হম ফরমান॥

আমি সীমা, তবু সেই প্রেমময় অসীমের বুক জুড়ায় না আমাকে ছাড়া। তাই আমার নিমন্ত্রণে তাঁর এত সমারোহ, এত ব্যাকুলতা। বিশ্বভরা সমারোহে সেই ব্যাকুলতায় অসীমতারই প্রকাশ। ইহাকে যে মায়া বলিল সে প্রেমের মর্ম ই বুঝে নাই। সে নিজেকেই সকলকে করিল প্রবঞ্চিত ও নিজেকে করিল বঞ্চিত। এই সমারোহের কথাই মীরা বলিলেন,

ইন্দ্রকে নগাড়ে বাজে বাদলকী ফৌজ আঙ্গ।
গগনকে নিসান খড়ে উতর আরো প্রাণ মেঁ॥

অসীমের প্রেমের এই ব্যাকুল আহ্বান শুনিলে সীমার সব বাঁধন আপনি যায় খসিয়া। তখন আর বৈরাগ্য প্রভৃতি নানা কৃত্রিম উপায়ে নেতি নেতি করিয়া একটি একটি করিয়া গাঁট করিতে হয় না ছিন্ন। বাউল বলিলেন—

পথ ছেড়েছে পথ ছেড়েছে
ছেড়েছে তোর হৃদয় চিরে।
অন্তরে তোর ফুল এসেছে
মুকুল তুই আর থাকবি কি রে॥

মুকুলের বাঁধন যে প্রেমের ব্যাকুল আহ্বানে খুলিয়া যায় তাহাতে কি কোনো কৃত্রিম টানাটানির কৃচ্ছ্রতা দেখা যায় ?

রজ্জব বলিলেন, প্রিয়তমা যে আছ অন্তরের মধ্যে, ঐ শোনো, অসীম প্রিয়তমের আহ্বান যাইতেছে শোনা।

অনহদ পিয়া পুকার সুন্থ
প্যারী অন্তর মাহীঁ।

কোথায় বিশ্বাকাশ জুড়িয়া সেই অসীম প্রিয়তম আর কোথায় অন্তরের মধ্যে সসীম তার প্রিয়া। তবু কী দুর্নিবার যোগ। সেই অসীমের বিরহে তাহার যে জ্বালা তাহা কি কেহ বোঝে? কবীর গাহিয়াছেন—কেন রে নলিনী তুই যাইতেছিস শুকাইয়া? তোর পাশেই তো রহিয়াছে সরোবর ভরা জল। জলেই তো তোর উৎপত্তি জলেই তো তোর বাস, জলের মধ্যেই তো নলিনী করিবি তুই বসতি। তোর তলাতেও দেখিতেছি না কোনো সন্তাপজ্বালা, উপরেও তোর দেখিতেছি না কোনো আগুন; তবে কাহার সঙ্গে লাগিয়াছে তোর প্রেম যে গেলি ঝরিয়া? কবীর বলেন, (নলিনী কহিল), যাহারা জলের সমতুল্য (অর্থাৎ যাহারা নলিনী নহে, তাহারা জলের সঙ্গ দ্বারাই পরিতৃপ্ত) তাহারা কি কখনো বুঝিবে আমার দুঃখ? কারণ বিরহের যে মৃত্যুযন্ত্রণা আমি করিতেছি অনুভব, সে মৃত্যু কখনো তাহারা উপলব্ধি করে নাই।

কাহেরী নলনীঁ তুঁ কুমিলানীঁ।
তে রেঁ হী নালি সরোবর পানীঁ॥
জল মৈঁ উতপাত জল মৈঁ বাস।
জল মৈঁ নলনীঁ তোর নিবাস॥
না তলি তপতি না পরি আগি।
তোর হেতু কহু কা সাজি লাগি॥
কহৈঁ কবীর জে উদিক সমান।
তে নহীঁ মুত্র হমারে জান॥

দুর্নিবার সেই ডাক। এই ডাক যে শুনিয়াছে তাহার আর বন্ধন মোচনের জন্য বৈরাগ্যের সহায়তা লইতে হয় না। সেই প্রেমের আহ্বানেই সে প্রেমের বৈরাগী। কবীর বলিয়াছেন, ওগো, শুনিয়াছি আমি সেই অসীমের বাণী। তাহাকে চিনিয়া আমি সর্বকুলের সীমা অতিক্রম করিয়া হইয়া গিয়াছি বৈরাগী।

সুনি অহদকী বানী লো।
অহি চীন্ত হম ভয়ে বৈরাগী
পরিহর ফুলকী কাজী লো॥

কবীর আর-এক স্থলে বলিতেছেন, ওগো, তাঁহার মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া আর যে আমি পারিতেছি না থাকিতে। বসন্ত কি এক কুসুমে হইতেছে বিকশিত, সদাই সে ভ্রমরকে করিতেছে নিমন্ত্রণ। কবীর বলেন, আজ প্রাণ আমার জীবন্তেই যেন দেহ ছাড়া হইতে চায়।

হম সে রহা ন জায়
মুরলিয়া কৈ ধমু সুন্তক।
বিনা বসংত ফুল ইব ফুলৈ
ভঁবুর সদা বোলায়।…
কহেঁ কবীর আজ প্রাণ হমারা
জীৱত হী মর জায়॥

অসীমে সীমায় মিলিয়াই চলিয়াছে এই বিশ্বলীলা। প্রেমের যদি এই লীলা তবে বিশ্ব ভরিয়া এত বেদনা এত ব্যাকুলতা কেন? মধ্যযুগের মরমীয়া বলেন তাহার হেতু এই যে তিনি অসীম ও আমি সীমা। সীমা ও অসীম ভিন্নধর্মী বলিয়াই এই লীলা সদাই সচল। কবিতার যেমন একটি সম আর একটি অসম মাত্রা হইলে হয় বিষম মাত্রা, বিষম মাত্রা হইলেই ছন্দ হয় অগ্রসর। তেমনি সীমা অসীম শিব-শক্তির মতো মিলিত হইয়াই চলিল সৃষ্টি। কিন্তু সব ব্যথা যে এইখানে। অসীমের যে কাল অনন্ত তার কোনো তাড়া নাই, কিন্তু সীমার কাল পরিমিত। তাই তাহার ব্যাকুলতার আর অন্ত নাই, কারণ তার পরিমিত সময় জীবনের অবসর যাইতেছে ব্যর্থ বহিয়া। কখন মুকুল জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখিল সূর্য মেঘাচ্ছন্ন, সে কহিল, একটি মাত্র দিনের পরমায়ু আমার, হে প্রিয়তম, তুমি আজ মেঘাবৃত, কাল তুমি হয়তো হইবে মুক্ত, কিন্তু আমার সকল সুযোগ সকল জন্ম এই একটি দিনেই যে গেল অবসান হইয়া।

কৱঁল কহ্যা তপন কো জলসৌ সীস উঠাঙ্গ।
পির অনহদ কদ মিলুঁ ঔসর বীতি জাঙ্গ॥
আজ বাদব পিতং তেরো কাল মৃতু মেরী।
এক দিবসকী অবধি অহৈ মানত নহীঁ দেরী॥

অসীম সঙ্গপিপাসী সীমা ক্ষণস্থায়ী তাই তার অতুলনীয় বেদনা। এখানে তাহা সবিস্তারে আলোচনার অবসর নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই দেখি অসীমের ডাক শুনিয়া সীমা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না।

ওগো, সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,
সে কথা যে যাই পাশরি।

সেই ডাক শুনিলে সকল বাঁধন আপনি খসিয়া যায়। কবীর গাহিলেন, হে ফকীর, তোমাতে আমাতে কি প্রেমের বন্ধনে বাঁধিলে। আপন মন্দিরে সুখশয়নে ছিলাম। সংগীতের আঘাতে আমাকে তুলিলে জাগাইয়া, হে ফকীর! একটি মাত্র বাণী আর দ্বিতীয় বাণীটি নয়, তুমি আমার সকল বন্ধন করাইলে ছিন্ন, হে ফকীর!

তাহিঁ মোহিঁ লগন লগায়ে রে ফকীর বা
সোৱস্তরহী হম অপনে মন্দির মেঁ
শব্দ মার জগায়ে রে ফকীর বা।…
এঁকৈ বচন দুকৈ বচন নাহিঁ
তুম মোসে বংদ ছুড়ায়ে রে ফকীর বা॥

সকল বন্ধন তোমার সংগীতে আপনি যায় খসিয়া। সকল ভার দূর করিয়া, হে কাঙাল, তুমি তোমার মতো লও কাঙাল করিয়া। এমন সর্বহারা তোমার ডাক

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
কি কাতর গান গাই!
হায় পলকে সকলই সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই।

হয়তো তাঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই তবু তাঁর ডাক শুনিলেই মনপ্রাণ হইতে চায় সর্বহারা। কবীর গাহিলেন, ভিখারী আমার! কি জানি কি মাগিয়া গেল আমার কাছে আমি তো তাহাকে একটু দেখিতেও পাইলাম না নয়নে। ভিখারীর কাছে আবার কিসের তোমার ভিক্ষা হে প্রিয়তম? না চাহিতেই তো সে সব দিতে রাজি। কবীর কহেন, আমি তো তাঁহারই, ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক।

মোর ফকির বা মাংগি জায়।
মৈ তো দেখ (ল) হু-ল গৌ লোঁট॥
মংগল সে ক্যা মাংগিয়ে
বিণ মাংগে জো দেয়।
কহৈঁ কবীর মৈ হৌঁ বা কী কো
হোনী হোয় সো হোয়॥

হে অসীম পরমেশ্বর, ঐশ্বর্যের তোমার কি অভাব? তবু প্রেমের এই কী অনুপম রীতি? অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি হইয়া ঘরে ঘরে তোমার চলিয়াছে এই সর্বহরা ভিক্ষা। এ আবার তোমার কি লীলা?

ধন্য ধন্য হে স্বামী, তোমার প্রেমের এই কী অনুপম রীতি সকল ভুবনপতি স্বামী, ঘরে ঘরে আস তুমি ভিখারী হইয়া

ধন ধন সাঈ প্রীত মেঁ তেরী অনুপম রীতি।
সকল ভুবনপতি সাঁইয়া ঘর ঘর আবৈ অতিতি॥

সর্বস্ব হরে হরুক তোমার ডাক, হে অসীম; তবু তোমার প্রেমের এই ডাকই যেন জনমে জনমে বাজে আমার কর্ণে। এই ডাকই তো আমার গুরু। দুর্বল ভীরু আমার মন, নিরন্তর চাই যে প্রেমময় তোমার ডাক। নহিলে কেবলি যায় ভুলিয়া। সব ছাড়িয়া যাত্রা করিতে পাই ভয়। এই ডাক যদি জীবনে বাজে তবে শাস্ত্রগুরু প্রভৃতি কোনো কিছুতে আমার নাই প্রয়োজন। তাঁহার বাঁশরী

যখন আমাকে পথে করিল বাহির, তখন মেঘের পর মেঘে রাত্রি ছিল অন্ধকার। (অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল) পথ আমাকে দেখাইবে কে? দেখিলাম সেইসব তরুণীরা আমাকে দেখিতেছেন তাঁহাদের অঙ্গন হইতে, যাঁহাদের কখনো ডাকিয়াছিল তাঁহার বাঁশরী। (আমার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া কহিল) পথ আমায় দেখাইবে কে?

(তাঁহারা আশ্বাস দিলেন) ভয় নাই কিছুই, পথও করিস না জিজ্ঞাসা। বাঁশরী শুনিতে শুনিতে, হে কবীর, হইয়া চল্ অগ্রসর। আজ বল্লভ যখন ডাকিতেছেন অন্ধকারের পার হইতে, তখন কে আছে এমন নির্লজ্জ যে যাইবে আজ তোর সঙ্গে?

বাঁসুরী জব মোহিঁ ডগরা ধরাঙ্গ।
রৈন অং তেরী রহী কারী বাদরণ সে
ডগরা মোহিঁ কৌন দিখাঙ্গ।
ঠাঢ়ী কোই দেখত অপনে অংগন সে
জিন্‌হে কভী বাঁসুরী বুলাঙ্গ।
ডগরা মোহিঁ কৌন দিখাঙ্গ॥
ডরনাহীঁ কুছ্ছো ডগরা ন পুছ্ছো
বাঁসুরী সুনত কবীরা বঢ় জাঙ্গ
আজি বালম বুলাবত আন্‌হর কী পায় সে
কৌন বেসরম আজ তোর সাথ জাঙ্গ॥

সীমা অসীমের নিবিড়তম যোগের জন্য প্রিয়তমের এই ডাক। ইহার মধ্যে কে আবার হইবে আসিয়া এক ব্যবধান? এই যোগের কি আর অন্ত আছে? সীমা অসীমের প্রেমের এই অনন্ত যোগই মুক্তি। যে মুক্তি সর্বরিক্ত শূন্যতা, প্রেমিক ভক্ত তাহা লইয়া কি করিবে? সে মুক্তি মিথ্যা তাহা ভূয়া। চিরপ্রেম-যোগে বদ্ধ সীমা অসীম। সেই যোগের পরমানন্দই মুক্তি। আর মুক্তি কোথায়? তাই বাউল গাহিলেন—

হৃদয় কমল চলছে গো ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি?
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটায় না হয় শেষ,
এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ।
আমায় ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পায় না যে তাই,
(তাই) তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই।
পার যদি যাও না ছেড়ে, তুমি ছাড়বে কি করি?

সীমা অসীমের এই প্রেমের নিবিড় যোগে কেহ কি কাহাকেও ছাড়িতে পারে? ইহাই ভক্তের প্রেমিকের মুক্তি, ইহাই তাহার কৈবল্য।

চিত্রের ভাষা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্দীপনার বিশুদ্ধতা অনুভব করা এ যুগে শিল্পের অন্যতম লক্ষণ। এই লক্ষণের সঙ্গে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিল্পের কোনো ধাতুগত মিল নেই।

আগের দিনে শিল্পের বিষয় ও উদ্দীপনার সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। অপর দিকে ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার সংযোগ সে ক্ষেত্রে বারবার লক্ষ্য করা যাবে। এই বিশেষ লক্ষণ থাকার কারণে চিত্রে মূর্তিধর্মী গুণ, মূর্তিতে চিত্রের লক্ষণ সর্বত্র বিদ্যমান।

প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। তৎসত্ত্বেও কতকগুলি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। প্রাচীন ও নবীন উভয় পরম্পরার ভাষাগত মিল অস্বীকার করা না গেলেও প্রয়োগরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দৃশ্য ও স্পর্শ উভয় সম্বন্ধে বস্তুর ধারণা শিল্পী করে থাকেন। বর্তমান কালে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কারণ বিচারবুদ্ধির প্রভাব। সম্ভবতঃ উভয়ের সম্বন্ধ ফিরে পাবার উপর ভবিষ্যৎ শিল্পরূপ আধুনিক শিল্পরূপের বিবর্তন নির্ভর করছে।

বস্তুর অনুকরণ শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। শিল্পীর প্রতিভা উপলব্ধি করা হয় রূপান্তরিত শিল্পরূপের প্রত্যক্ষ আবেদন থেকে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো উদ্দীপনাই বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম নয়। কেন সম্ভব নয় সে কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা হয়েছে।

শিল্পের আলোচনায় জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা এসে পড়ে। দর্শন মনোবিজ্ঞান— বিশেষভাবে এই দুই শাস্ত্রের জটিল তর্ক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শিল্পের তত্ত্ব আলোচনা সম্ভব নয়। অনুসন্ধান করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, বহু সার্থক শিল্পীর জীবনে এইসব সমস্যা দেখা দেয় নি বা এই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টাও তাঁরা করেন নি। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দর্শক যে সমস্যার সম্মুখীন হন সৃষ্টিরত শিল্পী সে সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। এই আলোচনায় আমরা সৃষ্টিরত শিল্পীর কর্মপ্রণালী অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। দর্শকের সম্বন্ধে তেমন লক্ষ্য দেওয়া হয় নি।

ভাষা মাত্রেই পরম্পরার পথে গড়ে ওঠে। উজ্জ্বলতম প্রতিভাও সম্পূর্ণ নূতন ভাষা প্রবর্তন করতে সক্ষম নন। অপর দিকে ভাষার গতিপ্রকৃতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিভাবান শিল্পীমাত্রেরই আছে।

প্রাচ্য শিল্পে অনুরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কারণ সে ক্ষেত্রে পরম্পরার বাঁধন দৃঢ়তর থেকেছে। বলা যেতে পারে, প্রাচ্য শিল্পীর ভাষা মনোজগতের সৃষ্টি; পাশ্চাত্য শিল্পের ভাষা বাস্তব পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাচ্য শিল্পে বিমূর্ত লক্ষণ যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পে বিমূর্তগুণের অনুসন্ধান চলেছে শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।

শিল্পের ভাষাগত আলোচনা প্রসঙ্গে উভয় দিকের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। কারণ, যে উপাদান দিয়ে আধুনিক বিমূর্তশিল্প আকার নিয়েছে সেটি পরম্পরাগত প্রাচ্যশিল্পে আনুষঙ্গিক রূপে প্রবর্তিত

হয়েছে। অপর দিকে প্রাচ্যশিল্পে বিমূর্ত লক্ষণ যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি আধুনিক বিমূর্তবাদী শিল্পীদের আজও লক্ষ্যের বাইরে।

আধুনিক শিল্পে শ্রেণীভাগ অতি জটিল। বিষয়বৈভব আজ প্রায় শিল্পীসমাজ বর্জন করেছেন। এই কারণে ঘটনা রূপায়িত করার প্রবণতাও তেমন সক্রিয় নয়। পরিমেলবাদ (association) উগ্র আধুনিক -পন্থী শিল্পীর কাছে বর্জনীয় বলে মনে হয়েছে। অপর দিকে আবেগপ্রকাশ শিল্পের লক্ষণ, এ কথা স্বীকারে আপত্তি নেই।

বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্দীপনা ও কার্যকারণ প্রভাবমুক্ত অনুভূতি শিল্পীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হলেও সে অবস্থাকে চিত্রপটে রূপায়িত করা সম্ভব কি না এটি দার্শনিকের ভাববার বিষয়। ভাষাশ্রিত শিল্পরূপ সকল সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলেই পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। এই কারণে শিল্পরূপে বিশেষভাবে মূর্তি ও চিত্রে বস্তুসাদৃশ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না।

সম্ভবতঃ এই কারণেই মূর্তি ও চিত্রকে অনুকরণধর্মী বলা হয়।[১] এই স্বীকৃতিকারণে চিত্রে ও মূর্তিতে ইমারত-নির্মাণ ও সংগীতসুলভ আবেগ প্রবর্তন ও অনুসন্ধানের চেষ্টা আধুনিক বিমূর্তবাদী শিল্পীরা করে থাকেন। এই দুই উপাদান সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পাচার্যরা উদাসীন ছিলেন না এবং এই দুই উপাদান প্রাচ্যশিল্প পরম্পরাতে বারংবার উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পের ভাষা এমন ধাতুতে গড়া যে সে ক্ষেত্রে হুবহু অনুকরণ সম্ভব নয়। কারণ, চিত্রনির্মাণের বুনিয়াদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে কতকগুলি নির্মাণধর্মী গুণ এবং পরিণতির পথে উদ্ভাসিত হয় একরকমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি। এই শক্তিকেই সংগীতের স্বরবিন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা চলে। উভয়ের কোনোটি প্রকৃতিজাত বস্তুর হুবহু অনুকরণ নয়। মূল প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রইল।

শিল্পের ভাষাগত উপাদানের পরিবর্তন না হলেও সংযোগের পথে ভাষার বিবর্তন ঘটেছে বারংবার। এই বিবর্তনের মূলে আছে দুই শক্তি— এক দিকে শিল্পীর প্রতিভা, অপর দিকে সমাজের প্রভাব। শিল্পসৃষ্টির প্রধান কারণ অহেতুক ইচ্ছা, আজকাল যার নাম দেওয়া হয়েছে play-motive। অপর দিকে আছে সমাজের প্রভাব। অহেতুক ইচ্ছা থেকে বা খেলার ছলে শিল্পী যেটি সৃষ্টি করেন সমাজ সেটি কাজে লাগায় নানা ভাবে। এবং উপযোগিতার দিক দিয়েই কখনো ধর্ম, কখনো সমাজ, কখনো বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে শিল্পের মূল্যবিচারের মানদণ্ডরূপে। এইসব বিচারে যে তথ্য পাওয়া যায় সেটি শিল্পের অন্যতম মূল্য হলেও প্রকৃত মূল্য নয়। গভীর বহুমুখী মানবীয় চেতনার অলৌকিক প্রকাশ শিল্পের ধর্ম। অহেতুক ইচ্ছা ও অলৌকিক অনুভূতি বাদ দিয়ে শিল্পের সম্যক্‌ পরিচয় কখনোই পাওয়া যাবে না।

অহেতুক ইচ্ছা ও অলৌকিক অনুভূতি লৌকিক ভাষার আধারে প্রকাশ পায়। ভাষার আধারে শিল্পসৌন্দর্যের প্রকাশ। এই কারণে শিল্পের এই আধার নিয়েই আলোচনা। ভাষার সঙ্গে ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এই কারণে ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার পথে প্রকৃতিগত উদ্দীপনা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা দরকার।

---

১ ভারতীয় শিল্পাচার্যরা চিত্র বা মূর্তিকে অনুকরণধর্মী না বলে বলেছেন সাদৃশ্যধর্মী।

দঙ্গবাদিনী । কোনারক

স্নানান্তে । বিশ্বনাথ মন্দির · খাজুরাহো

বাগানে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে, রোদ্দুর পড়ে ঝলমল করছে। রঙীন ফুল ঘরে এনে রাখবা মাত্র রঙের ঝলমলে ভাব অদৃশ্য হল। পরিবর্তে ফুটে উঠল আয়তনযুক্ত বর্ণবৈচিত্র্য ; কিন্তু রঙ অদৃশ্য হল না। ক্রমে ঘর অন্ধকার হল, ফুলদানি-সমেত রঙীন ফুল অন্ধকারে অদৃশ্য হল, কিছুই আর দেখতে পাওয়া যায় না। দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে বাধ্য ফুলদানি ফুল কিছুই নেই।

আলোয় যা দৃষ্টিগোচর ছিল, অন্ধকারে তা অদৃশ্য হলেও স্পর্শের সাহায্যে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারা গেল, স্পর্শের সাহায্যে অনুভব করতে পারা যাচ্ছে কোমলতা বা কর্কশতা।— বিভিন্ন আকার ও ও আকারের প্রতিহত শক্তি। দিনের আলোয় দেখার ধারণা থেকে কল্পনা করছি কোন্‌টি ফুল, কোন্‌টি পাতা। যেমন আলোয় কল্পনা করা গিয়েছিল কোন্‌টি নরম কোন্‌টি রুক্ষ।

আলোর সাহায্যে জগৎ বর্ণময় হয়ে ফুটে ওঠে। অন্য দিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয় বর্ণময় জগতের রূপ। পরিবর্তে আমরা পাই বর্ণহীন স্পর্শের জগৎ। অনেক পরিমাণে অপরিচিত হলেও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সত্য। পরিচিত বলতে যা-কিছু সবই আলোর জগতে বর্ণরঞ্জিত হয়ে সুন্দর-অসুন্দর ভাবযুক্ত হয়ে জীবনের গতিপ্রবাহকে সজীব রেখেছে।

আলোর অভাবে বর্ণময় জগতের সমাপ্তি। জীবন-মৃত্যুর মত আলো-অন্ধকার চলেছে সাথে সাথে। দুই সীমার মাঝে রামধনু-রঙের রূপলোক ; এই রূপলোক নিয়েই চিত্রকরের কারবার। এই জগৎ ধারণ করে আছে আলো ও অন্ধকার। উভয় দিকের অস্তিত্ব স্বীকার করা চিত্রকরের পক্ষে সম্ভব নয়। আলো-অন্ধকারে গতিনির্দেশক যে শূন্যতা (space) সেটি স্পর্শের জগতে দেখা দেয় কঠিন আকার ও আয়তন রূপে।

অর্থাৎ, আলো বর্ণ আকার আয়তন— এই চার বস্তু জগতের উপাদানযুক্ত হয়ে আছে আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তিতে। এই শক্তিকে বলা চলে বস্তুর গতিপ্রকাশ গুণ। শিল্পীর উপরোক্ত অভিজ্ঞতা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে প্রত্যক্ষ করে দৃশ্য ও স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতার অবদান, যথা— প্রতিফলিত ও প্রতিহত আলো বর্ণ ও বর্ণের সমাবেশ -সমন্বয় সংঘাত ও ক্রমবিবর্তনশীল উদ্দীপনা।

স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিল্পী অর্জন করেন কঠিন স্থির ভূমি, আয়তন, অবস্থান, বুনট ও বস্তুর প্রতিহত করার শক্তি। প্রকৃতিজাত উপাদানগুলি সকল সময়েই তুলনাত্মক। বস্তু থেকে বর্ণ, আকার থেকে আয়তন— বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া সম্ভব নয়। এবং এই যোগসূত্র ধারণ করে আছে আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি।

আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি কোনো বস্তুকে প্রকাশ করে না। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তির উপর। এই শক্তি স্পন্দিত হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুতে। এই কারণে স্পন্দন কথাটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেল। ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার পথে শিল্পী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, সেটি বহু অংশে অনুকরণ করা সম্ভব। কিন্তু আকর্ষণ-বিকর্ষণের অনুকরণ করা চলে না। সেটি রূপান্তরিত হয় শিল্পের ভাষায়। এই রূপান্তরের পথেই সমস্ত বস্তুগত উদ্দীপনা আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাবে চিত্রপটে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

চিত্রপরম্পরার ক্ষেত্রে টেন্‌সনের মোটামুটি দুই রকমের প্রয়োগ দেখা যায়। একটি দৃশ্যানুগত অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তথা 'সোর্স-টেন্‌সন্', ত্রিমাত্রিক ছবিতে এটি লক্ষ্য করা যায়। স্পর্শানুগত

অভিজ্ঞতার অবদান 'সারফেস্-টেন্‌সন্', জ্যামিতির সাহায্যে 'সারফেস্-টেন্‌সন্' আত্মপ্রকাশ করে চিত্রপটে।

জীবনমৃত্যুর টানাপোড়েনে যেমন মানুষের অস্তিত্ব তেমনি ডিজাইনের জগতে সকল অস্তিত্ব নির্ভর করছে আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তির উপর। বিন্দু থেকেই সকল আকারের উদ্ভব। ডিজাইনের ক্ষেত্রে এমন সার্থক সংজ্ঞা হয় না।

সাদা কাগজের উপরে কালির ক্ষুদ্রতম ফোঁটা দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত কাগজ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই হল টেন্‌সন্ নামক শক্তির মূল প্রকাশ। ডিজাইনের প্রতিটি ধাপে এই শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে এবং এই শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে যতই সচেতন হওয়া যায় ততই ডিজাইনের কৌলীন্য বেড়ে যায়।

চিত্রপটের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আকারের সাহায্যে তৈরি হয় একরকমের শক্তি। বর্ণপ্রয়োগে এই শক্তি আর-এক ভাবে প্রকাশিত হয়। রেখা উপস্থিত করে ভিন্ন রকমের শক্তি। সংক্ষেপে, সূক্ষ্মতম রেখা বা ক্ষুদ্রতম বিন্দুর প্রয়োগের সঙ্গেসঙ্গে সমগ্র ডিজাইন নূতন উদ্দীপনায় জেগে ওঠে।

এই বিশেষ শক্তি কখনো জলের মত প্রবাহিত হয় পটভূমির একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত, কখনো আগুনের শিখার মত তার শক্তি ঊর্ধ্ব দিকে। যে পর্যন্ত ডিজাইনে এই শক্তি সক্রিয় সেই পর্যন্ত ডিজাইন সার্থক। এই শক্তি নিস্তেজ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ডিজাইন বাস্তব অনুকরণে পর্যবসিত হয়। স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র— যে দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক, এই শক্তির প্রভাবেই শিল্পরূপ বস্তুজগৎ থেকে তার স্বাধীন সত্তা ঘোষণা করতে সক্ষম।

শক্তি যেখানে উপলব্ধির কথা বলে সেখানেই রস, যেখানে আকার পায় সেখানেই সৌন্দর্য, যেখানে গতি পায় সেখানেই ছন্দ।

টেন্‌সন অনুভব-সাপেক্ষ এবং গতিতেই টেন্‌সনের অভিব্যক্তি। এই অনুভবগম্য বিষয়টি প্রকাশ করার সর্বপ্রধান উপাদান রেখা।

ইতিপূর্বে টেন্‌সনের দুটি দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বর্ণাশ্রিত ও গতিব্যঞ্জক টেন্‌সন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির অবস্থায় দিগন্তপ্রসারিত দৃশ্য যখন দেখি, সে ক্ষেত্রে রেখার কোনো অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন রঙের স্তর ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে চলে। অপর দিকে যখন আমরা চলতে থাকি, তখন চলন্ত অবস্থায় আমার অবস্থান ও আশেপাশের বস্তুর সংযোগে যে টেন্‌সনের সৃষ্টি হয় সেটি রেখাত্মক ভাষার আশ্রয় ব্যতীত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

যদি সিদ্ধান্ত করা যায় চিত্রের নির্মিত আকার টেন্‌সনের প্রতীক, তবে বলা যায় রেখা সর্বপ্রধান অবলম্বন।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, একজন মিস্ত্রি যখন বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো জুড়ে টেবিল তৈরি করে তখন কারিগরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি, নির্মিত টেবিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, উপরে বর্ণিত উপাদানগুলির প্রয়োগ ছাড়া কোনো চিত্ররূপ লক্ষ্য-গোচর করা সম্ভব নয়। এই কারণে আকার-নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার সর্বপ্রথম।

জলপূর্ণ পাত্রে যদি একটা কাঠের টুকরো ফেলা যায়, তখন পাত্র জল এবং কাঠের টুকরো, তিনে মিলে একরকমের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। যে স্পন্দন (বা tension) জলে, কাঠে বা জলপাত্রে পূর্বে ছিল না।

কাগজের উপর রেখাপাত করা মাত্র অনুরূপ স্পন্দন জেগে ওঠে কাগজের নির্দিষ্ট আয়তনকে আশ্রয় করে, কাগজের নির্দিষ্ট আয়তনের সঙ্গে এই স্পন্দন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ক্রমে রেখার সাহায্যে আকার নির্মাণ করে শিল্পী। প্রত্যেকটি আকার প্রবর্তনের সঙ্গে স্পন্দনের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ রেখার আকার মাত্রেই স্পন্দনের প্রতীক। ক্রমে চিত্রিত আকার ও চিত্রপটের আয়তনের সংযোগে যে স্পন্দন আত্মপ্রকাশ করে সেটি চিত্রের বুনিয়াদ। প্রকৃতিজাত বস্তু থেকে নির্মাণের উপাদান শিল্পী আহরণ করতে পারেন অথবা বুদ্ধিবিচারের সাহায্যে আকারের সমাবেশ প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা নির্মিত আকার কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে প্রকৃতিজাত আকারের প্রতিধ্বনি।

আকার যেমন নির্মাণধর্মী তেমন আকার মাত্রেই স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চিত্ররচনার ক্ষেত্রে যেমন আকার নির্মাণ উপেক্ষা করা চলে না, তেমনি স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

বলা যেতে পারে, আকার স্পর্শানুগত গুণ ও স্পন্দন এই তিনের সম্বন্ধ চিত্রের প্রধান লক্ষণ ও ইমারতি গুণ নির্ভর করে এই তিনের উপাদানের উপর। চিত্রপটের ভূমির আয়তন যতই বিস্তৃত হোক্-না কেন, একটি নির্দিষ্ট আকার ভূমি মাত্রেরই আছে। এই সীমাবদ্ধ স্পর্শানুগত স্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে চিত্রের ভাষা।

কাগজের আয়তন ছোটবড় যেমনই হোক, সেই কাগজের উপর একটি আকার প্রবর্তন করার মুহূর্তেই কাগজের আয়তনের এমন-একটি বিস্তার বা সংকোচের ভাব দেখা দেয় যেটি রেখাবর্জিত কাগজে ছিল না।

শুদ্ধ আকার নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তব তালমান অপেক্ষা স্পন্দনের দ্বারা চালিত তালমানের উপযোগিতা অধিক।

উপরের আলোচনা থেকে মীমাংসা করা যেতে পারে কাগজের আয়তনে নির্মিত নক্সার সংযোগে বিশুদ্ধ আকারের সৃষ্টি এবং চিত্রিত আকারের অন্তর্নিহিত গুণ স্পন্দন।

আকার সম্পূর্ণভাবে স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্ণের সংযোগে আকার দৃশ্যানুগত উদ্দীপনার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই জন্যই এই দিক দিয়ে বর্ণের উপযোগিতা।

অবশ্য বস্তুসাদৃশ্যের দ্বারা আকারকে দৃশ্যানুগত অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছে দেওয়া চলে। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে রঙের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বুদ্ধিবিচারের পথে শুদ্ধ আকার নির্মাণ করা সম্ভব। অপর দিকে বর্ণপ্রয়োগ সম্পূর্ণ বুদ্ধিবিচারের উপর নির্ভর করে না। সে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ভাবাবেগ থাকতে বাধ্য। কারণ, দৃশ্যানুগত উদ্দীপনার সর্বপ্রধান অবলম্বন বর্ণ। আকার নির্মাণই যেখানে শিল্পীর একমাত্র লক্ষ্য, সে ক্ষেত্রে বর্ণপ্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর নানা পরম্পরায় রেখাচিত্রের কথা মনে হল। রেখাচিত্রে বর্ণের স্থান নেই, তৎসত্ত্বেও উদ্দীপনার তীব্রতা যে ক্ষেত্রে কম নয়। সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রেখাচিত্রের আলোচনা করা হয়েছে, কাজেই এ আলোচনা এখানে স্থগিত রাখা গেল।

বর্ণপ্রয়োগের সঙ্গে আকারের সম্বন্ধ তথা আকারযুক্ত বর্ণের আবেদন আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়।

সাদা কাগজের উপর যদি একপাত্র তরল রঙ ছুঁড়ে দেওয়া যায় তবে কাগজের প্রতিহত করার শক্তি রঙের তরলতাকে একটি আকারে রূপান্তরিত করে।

রেখায় গঠিত নির্দিষ্ট আকার অনুসরণ না করেও বর্ণলেপন মাত্রেই যে আকার যুক্ত, তারই দৃষ্টান্ত উপরে করা গেল। রেখায় গঠিত আকার যেমন স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, অনুরূপ সাক্ষাৎ আমরা পাই বর্ণলেপনের মুহূর্তে। কিন্তু আকার বর্ণের বিশিষ্টতা প্রকাশ করে না।

বিশুদ্ধ আকার যেমন চিত্ররচনার বুনিয়াদ, তেমনি বর্ণের বিশুদ্ধ প্রকাশ কালো-সাদার সংঘাতে। এই দুই উপাদানের দ্বারা চিত্রিত আকারের বাঁধুনির দৃঢ়তা নির্ভর করে। ইতিপূর্বে আকারগত বাঁধুনি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এইবার বর্ণের বাঁধুনি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। কালো-সাদা তথা গাঢ়-হালকা বর্ণের এই বাঁধুনির প্রথম ও সর্বপ্রধান অঙ্গ বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্র, এর পর অনুপাত ও অবস্থান।

বর্ণের সংযোগে চিত্রিত আকারে নূতন রকমের উদ্দীপনা প্রকাশ পায়। নক্সা নির্মাণের উপাদানে দৃশ্যানুগত উদ্দীপনার কারণরূপেই বর্ণের উপযোগিতা। শুদ্ধ আলো ও অন্ধকারের মাঝখানে যেমন ফুটে উঠেছে প্রকৃতির রামধনুর রঙ, তেমনি চিত্রপটে বর্ণপ্রয়োগের মুহূর্তে গাঢ় ও হালকার তুলনাত্মক প্রয়োগ অনিবার্য। এই দিক দিয়ে সাদা ও কালো রঙ আলোছায়ার প্রতীকরূপে স্বীকৃত, যদিও শুধু সাদা বা শুধু কালো প্রকৃতিতে লক্ষ্য করা যায় না। আকারের ক্ষেত্রে যেমন ছোট-বড়, তেমনি বর্ণের তুলনাত্মক গুণ ছাড়া বর্ণের উদ্দীপনা লক্ষ্যগোচর হয় না। পরিবর্তে লক্ষ্যগোচর হয় সংঘাত।

সমান আয়তনের কালো-সাদা বা লাল-নীল সংঘাত আছে কিন্তু বর্ণের উদ্দীপনা সে ক্ষেত্রে গৌণ। অপর দিকে একটির ইতরবিশেষের সাহায্যে বর্ণের স্পন্দন উজ্জ্বল করে তুলতে হলে প্রয়োজন বর্ণের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। কালো-সাদার সাহায্যে প্রকাশ পায় বর্ণের স্থিতিশীলতা, অনুপাতে পাওয়া যায় বর্ণের উত্তেজনা। অবস্থানের পথে জেগে ওঠে স্পন্দন। বর্ণের স্পন্দন শক্তিশালী হওয়ার পথে আকারের গৌরব কিছুটা হ্রাস পেতে বাধ্য। অপর দিকে আকার ও বর্ণের স্পন্দন, সংঘাত বা সমন্বয়ের পথে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্ণযুক্ত নক্সার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সম্ভব নয়। এই সংযোগ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত দৃশ্য ও স্পর্শের অটুট সম্বন্ধ চিত্রিত নক্সায় আচ্ছন্ন থেকে যায়।

আকার বর্ণ ইত্যাদি ভাষাগত উপাদানের সংযোগে নির্মাণধর্মী তীব্র উদ্দীপনা প্রবর্তন করা সম্ভব। এইসব নক্সাতে আপাতদৃষ্ট বস্তুসাদৃশ্য না থাকলেও এই শ্রেণীর রচনা সম্পূর্ণ সৃষ্টিবহির্ভূত নয়। যে নক্সা সাদৃশ্যবর্জিত বলে মনে হয় সেটি শূন্য আধারের মত এবং সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য দর্শক জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বুদ্ধি বা বিষয়গত তথ্য আরোপ করেন।

তথ্যপ্রচার অথবা শুধু উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য নক্সাপ্রবর্তন প্রস্তরযুগের শিল্প থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত রচিত হয়েছে। এই পরম্পরার পাশাপাশি সাদৃশ্যযুক্ত শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসও অব্যাহত থেকেছে। কারণ গভীর অনুভূতির প্রকাশ সাদৃশ্যযুক্ত সৃষ্টিতেই সম্ভব। মানবীয় চেতনা নির্দিষ্ট আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বহুআয়তনযুক্ত বিস্তৃত গূঢ় মানবীয় চেতনার ভাব সাদৃশ্যের আধারে প্রকাশ করে থাকেন শিল্পী। সাদৃশ্যধর্মী শিল্পরূপে বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তরলোকের সম্বন্ধে যে স্পন্দন প্রত্যক্ষ করা যায়, চিত্রিত-রূপে বা গঠিত-মূর্তিতে সেইখানেই শিল্পের সার্থকতা।

দৃশ্য ও স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতা সাদৃশ্যযুক্ত চিত্রে যুক্ত হয়ে ভাষার গতিবেগ যতটা সক্রিয় করে বিচ্ছিন্ন

ভিনাস। আভঙ্গ মূর্তি। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দ

রুবেন্স-অঙ্কিত প্রতিকৃতি

মোরগ । জাপানি

মেশিনগানার । ইউরোপীয়

ভাবে এই দুই অভিজ্ঞতা চিত্রের ভাষাকে অনুরূপ সক্রিয় করতে পারে না, এই উক্তির প্রমাণরূপে প্রাচীন পরম্পরা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে, বর্তমান থেকেই এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিউবিজম্ বা 'কনস্ট্রাক্‌টিজম্'-মূলক শিল্পরূপের পাশে বাংক্রুশি বা সেজানের রচনা তুলনা করে জিজ্ঞাসু পাঠক এই উক্তির যথার্থতা বিচার করবেন।

নির্মাণ (construction) ও অনুকরণ (imitation) শিল্পের এই দুই চরম সীমা। কোনোদিকেই যথার্থ শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। রূপ অন্তরলোক থেকেই আত্মপ্রকাশ করে এবং নির্মাণগুণ সেই রূপ ধারণ করে এবং দৃশ্যলোকের উদ্দীপনা শিল্পরূপে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। এই সংযোগের কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই বলেই যুক্তির পথে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব নয়। অপর দিকে বিশ্লেষণের পথে অনুসন্ধান করে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উদ্দীপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মাত্র।

আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের গুণ দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তে বাস্তবতা ও বিমূর্ততার চর্চা চলেছে। বলা বাহুল্য বিমূর্ততার আদর্শই সম্প্রতিকালের শিল্পের প্রধান উপাদান। বাস্তব আদর্শ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ এই আলোচনাতে অপ্রাসঙ্গিক এ কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক শিল্পে বিমূর্ত আদর্শ বাস্তবতার জমি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। এই কারণে বাস্তব শিল্পের কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপরিহার্য। দৃশ্য ও স্পর্শ উভয়ের সংযোগের পথ অনুসরণ না করে রেনেসাঁস্ যুগের শিল্পীদের সামনে যখন দৃশ্যানুগত উদ্দীপনার পথ প্রধান হয়ে উঠল সেই মুহূর্ত থেকে বাস্তবতার লক্ষণ ইউরোপীয় চিত্রপরম্পরায় আত্মপ্রকাশ করল ; প্রতিফলিত আলোছায়ার জটিল ক্রিয়ার পথে আঙ্গিকের অভিনবত্ব নিয়ে এল।

ক্রমে রেখার প্রাধান্য চিত্ররূপ থেকে প্রায় মুছে গেল। এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে ইউরোপীয় চিত্রে নির্মাণবৈশিষ্ট্য শিল্পীদের লক্ষ্যের বাইরে প্রায় চলে গিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রতিভাবলে শুদ্ধ সূক্ষ্ম আলোর জগৎ চিত্রপটে ফুটে উঠল। এইসব চিত্রে আকার সম্পূর্ণ গৌণ। দৃশ্যজাত উদ্দীপনার অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীরা যে ভাবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন অনুরূপ প্রয়াস ইউরোপীয় শিল্পে পূর্বে এত স্পষ্টভাবে দেখা দেয় নি।

ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে পল সেজান স্পষ্ট করে শিল্পীদের জানিয়ে দিলেন যে, চিত্রনির্মাণের জন্য রেখাত্মক গুণ অপরিহার্য। দৃশ্য ও স্পর্শের অভিনব সংযোগ সেজানের চিত্রে পাওয়া গেল। এই সংযোগের প্রভাবেই সেজানের চিত্র সাদৃশ্যের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সেজান সংযোগের পথে যে বিমূর্ত শিল্পরূপ সৃষ্টি করলেন সেটি বিচ্ছিন্ন হল কিউবিজমের প্রভাবে। কিউবিজিম স্পর্শানুগত উদ্দীপনার প্রকাশ। বলা যেতে পারে ইমপ্রেশনিস্টরা দেখেছিলেন, অপর দিকে কিউবিস্ট শিল্পীরা স্পর্শের সাহায্যে আকার চেনবার প্রয়াস করেছিলেন। কিউবিজমের প্রভাবেই তথাকথিত অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্ শিল্পের উদ্ভব। চিত্ররূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে এইসব শিল্পীদের অবদান অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু শুদ্ধ দৃশ্যগত উদ্দীপনা অনুসরণ করার চেষ্টা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, তেমনি শুদ্ধ স্পর্শানুগত অভিজ্ঞতার সাহায্যেও পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ নির্মাণ করা গেল না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকরদের মধ্যে যাঁরা সংযোগের পথে সাদৃশ্যযুক্ত চিত্র নির্মাণ করেছেন তাঁরা পথিকৃৎ রূপে স্মরণীয় হলেও বিমূর্ত শিল্পের ধারকদের মত জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

আজ বিমূর্ততা (abstract) কথাটি শিল্পের আলোচনায় প্রায় অচল। পরিবর্তে figurative ও non-figurative দুই শ্রেণীতে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে।

বিমূর্ত উপাদান শিল্পের প্রাণ, আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিমূর্ততা একমাত্র সাদৃশ্যযুক্ত রচনাতেই আত্মপ্রকাশ করে। অন্যথা বিচ্ছিন্ন উদ্দীপনার পথে রচিত চিত্ররূপ কোনো-না-কোনো ভাবে বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে। তরুণ শিল্পী প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের পথে নানা তথ্য আহরণ করেন। ক্রমে বিচিত্র আকার-প্রকারের মধ্য দিয়ে কতকগুলি সাধারণ গুণ সম্বন্ধে শিল্পী সচেতন হন। এবং শেষ পর্যন্ত গতিময় শক্তির বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে শিল্পী উপলব্ধি করেন। মহৎ শিল্পরূপ এই গতি-শক্তিকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া শিল্পী যখন উপলব্ধি করেন তখন তাঁর রচনাতে মৌল শক্তির পূর্ণ প্রকাশ না থাকলেও আভাস থেকে যায় (elementary quality)। উপরে বর্ণিত উপলব্ধিকে বলা চলে শিল্পীর প্রজ্ঞা।

তাবৎ বস্তুর অন্তরালে শক্তির ক্রিয়া থাকার কারণে কোনো বস্তু স্থির নয়। যুক্তির পথে অনুসন্ধান করলে অনড় অচল বলে কিছুই পাওয়া যাবে না প্রকৃতিতে। অপর দিকে স্থির ভাবে দেখতে না পারলে কোনো জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্ভব না। উদ্দীপনার মুহূর্তে বস্তুরূপ স্থির ও অতুলনীয় বলে অনুভব করেন শিল্পী। কোনো একটা জিনিস স্থির বলে যখন আমরা মনে করি তখনো সেই আপাত স্থির বস্তুর পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে। বস্তুজাত উপাদানগুলি শিল্পী কিভাবে দেখেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রকৃতিজাত উদ্দীপনা ক্রমে শিল্পীর ধারণায় রূপান্তরিত হয়। ধারণাকে সুদৃঢ় ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্যই প্রকৃতিপর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।

মানুষ প্রকৃতির বহির্ভূত নয়, এইজন্যই শিল্পী বাইরে যা দেখেন তার স্পন্দন জেগে ওঠে তাঁর অন্তরে। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে শিল্পী বহির্জগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সন্ধান পান শাশ্বত গুণময় জগতের। বাহির থেকে অন্তর, অন্তর থেকে বাহির এই গতি প্রকাশ করাতেই শিল্পের সার্থকতা, অনুকরণ অথবা বুদ্ধিবিচারের পথে এই গতির সার্থক প্রকাশ সম্ভব নয়। গতির সর্বপ্রধান অবলম্বন বলেই শিল্পরূপে বস্তুর অনুকরণ হয় না, পরিবর্তে সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে দেখা দেয়— এ কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

আকাশ বাতাস জীব ও উদ্ভিদ-পূর্ণ প্রকৃতিকে ঠিক একই ভাবে দুজন শিল্পীর পক্ষে দেখা কখনোই সম্ভব না। এমনকি একই প্রকৃতিকে একই ভাবে শিল্পী দু বার দেখেন না। এরই নাম জীবনের বৈচিত্র্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দলবদ্ধ ভাবে মানুষ যখন পশু শিকার করেছিল তখন প্রকৃতির যে ভাব তার কাছে দেখা দিয়েছিল শহরবাসী আধুনিক মানুষের পক্ষে অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ধর্মাশ্রিত যুগের এবং বৈজ্ঞানিক যুগের শিল্পী সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব নিয়ে প্রকৃতিকে দেখেন। প্রকৃতিকে একই ভাবে শিল্পী চিরদিন দেখছেন না। এমনকি মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকৃতিজাত উদ্দীপনার দিক পরিবর্তন হচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে শিল্পীর মনোজগৎ তথা শিল্পীর আবেগ-অনুভূতির কথা উল্লেখ করতে হয়। এই কারণে এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

প্রকৃতিতে উদ্দীপনা আছে, ভাব নেই। ভাব মানবীয় চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কারণে শিল্পরূপে ভাবের প্রকাশ বারংবার লক্ষ্য করা যাবে। প্রকৃতিজাত উদ্দীপনার প্রথম কারণ বস্তু রূপ বর্ণ ইত্যাদি, শিল্পী যেটি অনুভব করেন দৃশ্য ও স্পর্শের সাহায্য। অপর দিকে মানবীয় ভাব কোনো

আকারের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই কায়াহীন অবস্থাকে সাকার করে তোলার পথে ভাব পরিস্ফুট হয় চিত্রপটে। প্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করতে না পারা পর্যন্ত ভাবময় রূপ আমাদের লক্ষ্যগোচর হয় না। বলা চলে ভাবের উপযুক্ত আধার সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ভাব চিত্রপটে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না। এবং মানবীয় ভাব যদি শিল্পীর রচনাতে প্রতিফলিত না হত তবে মানবমনে অনেকখানি অপ্রকাশিত থেকে যেত। অবশ্য, ভাবের পথে অনুসরণ না করে সার্থক শিল্পরূপ সৃষ্টি করা যায় না এমন নয়। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীদের রচিত still-life বিষয়ক চিত্রে ভাব প্রধান নয়, সে ক্ষেত্রে উদ্দীপনা-প্রকাশই শিল্পীর লক্ষ্য। ভাবপ্রকাশের পথে বিষয় এবং বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত যে চিন্তার প্রভাবে শিল্পরূপের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকার কারণেই সম্ভবতঃ আধুনিক শিল্পী ও রসিকসমাজ ভাবমূলক রচনাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে রাজি নন।

উদ্দীপনামূলক শিল্পরূপে যেমন উদ্দীপনার বিষয়গুলির আভাস থেকে যায়, তেমনি ভাবপ্রকাশের কালে ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়ের প্রভাব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। অবশ্য ভাব যে ক্ষেত্রে অগভীর সে ক্ষেত্রে চিন্তামূলক উপাদান শিল্পী সংগ্রহ করেন। এই চেষ্টা শিল্পীমনের এক রকমের দুর্বলতা। এই কারণেই চিন্তামূলক তথ্য সার্থক শিল্পরূপে অপ্রয়োজনীয়।

প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি মানবীয় চেতনার গভীরতার কোনো শেষ নেই। ভাবের পথেও ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আঘাত ও উদ্দীপনার পথে মানুষ বিমূর্ত ভাবের জগতে পৌঁছতে পারে। অবশ্য এই বিমূর্ত ভাবের উপযুক্ত শিল্পরূপ-সৃষ্টি সকল সময়েই দুরূহ। বিমূর্ত ভাব ও ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত ভাবের সম্বন্ধ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টান্তটি ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া গেল।

নারীর সত্য পরিচয় কোথায় সে সম্বন্ধে গুরু প্রশ্ন করছেন শিষ্যকে "যে, তোমার মাতা সে অন্যের স্ত্রী, আর-এক জনের কন্যা! এর মধ্যে কোন্‌টি নারীর সত্য পরিচয়?"

সত্য পরিচয় অনুসন্ধান করতে গেলে শেষ পর্যন্ত মৌল শক্তিতেই উত্তীর্ণ হতে হয়। এ হল উপলব্ধির কথা, এবং এই উপলব্ধি সকল দিক দিয়েই বিমূর্ত। চিত্ররূপ-নির্মাণকালে এই বিমূর্ত উপলব্ধি বিভিন্ন আঙ্গিকগত উপাদানের সংস্পর্শে এবং ভাবের সংযোগে পরিচিত আকার নিতে বাধ্য।

ভারতীয় দেবীমূর্তি বিমূর্ত উপলব্ধির ভাবময় প্রকাশ। ক্রমে উপরে বর্ণিত বিমূর্ত গুণ যখন লৌকিক ভাবে রঞ্জিত হয় তখন দেখা দেয় কোনার্ক বা খাজুরাহোর নারীমূর্তি। এবং নারীশক্তির উদ্দীপনা যখন শিল্পীমনকে অভিভূত করে তখন দেখা দেয় টিসিয়ান বা রুবেন্স -এর রচিত নারীমূর্তি। এইসব রচনার কোনো অংশেই ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সংস্কার বা চিন্তামূলক তথ্য অযথা ভারাক্রান্ত করে নি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাবের মত বিভিন্ন প্রকাশ সম্ভব তারই পরিচয় শিল্পী উপরে বর্ণিত শিল্পরূপের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের পথে অনুভব করেন।

প্রকৃতির সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার শিল্পী অনুভব করেন কি ভাবে, সে বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্পীর জীবনে উদ্দীপনার স্থান যেমন আছে তেমনি শিল্পীজনোচিত অভিজ্ঞতা অর্জনেরও তাঁর প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতা নিহিত আছে শিল্প-পরম্পরার ক্ষেত্রে। বস্তুরূপ অনুকরণ করা যেমন শিল্পীর লক্ষ্য নয় তেমনই পরম্পরা অনুকরণ করাও শিল্পীর কাজ নয়। পরম্পরা থেকে সৃষ্টির রীতিপদ্ধতির সন্ধান শিল্পী

পেয়ে থাকেন। তুলনার ভাষায় বলা যেতে পারে, পরম্পরা শিল্পীর কাছে গবেষণা-গৃহের মত প্রয়োজনীয়। পরম্পরা মাত্রেই যে শিল্পীর কাজে আসবে না এমন কোনো কথা নেই। শিল্পীর প্রতিভা স্থির করে পরম্পরার মূল্য। শিল্পীর কাছে পরম্পরার যে অংশ মূল্যবান সেই অংশটি হয়তো কোনো দিনই জনমত মূল্যবান বলে স্বীকার করে নি। দেশ কাল ও ব্যক্তিগত প্রতিভা, এই তিনের সংযোগে পরম্পরার ইমারত গড়ে ওঠে।

প্রকৃতিজাত ভিন্ন উপাদানের সংযোগে চিত্রপটে রূপনির্মাণের কৌশল তথা শিল্পের ভাষা আয়ত্ত করার একমাত্র পথ পরম্পরার অনুশীলন। তবে পরম্পরার অনুশীলন নিজের তাগিদেই শিল্পী করে থাকেন। সামাজিক প্রয়োজন বা সাময়িক শিক্ষার নামে যখন কোনো একটি পরম্পরা শিল্পীকে অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয় তখনই দেখা দেয় পরম্পরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তবে বিদ্রোহী শিল্পীও নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পরম্পরার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই ভাবে নূতন নূতন পরম্পরার প্রবর্তন ঘটে থাকে শিল্পের ইতিহাসে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে পরম্পরার বিরুদ্ধে অভিযান খুবই প্রবল হয়েছিল। এবং বহু শিল্পী সম্পূর্ণ নিজেদের মতিমেজাজ অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা করেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এইসব বিদ্রোহী শিল্পীই প্রাগৈতিহাসিক ও আদিম শিল্পের পরম্পরা থেকে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

প্রাচ্য চিত্রকলার বহু উপাদান আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা অনায়াসে আত্মীকরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রমে পরম্পরা-বিমুখ প্রতিভাবান শিল্পীদের প্রভাবে পরম্পরাপন্থী ইউরোপীয় শিল্পীদের ভাব ভাবনা ও রচনারীতি বদলেছে। আধুনিক ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে তরুণ শিল্পী অনুভব করে নিতে পারেন পরম্পরার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি প্রকার। স্মরণ রাখা দরকার যে, যে শিল্পী শিল্পকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন না তাঁর পক্ষে পরম্পরা থেকে নূতন উপাদান উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিল্পীরা কোন্ পরম্পরা অনুসরণ করে গুহাগাত্রের চিত্র রচনা করেছিলেন? এই সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা বহু পণ্ডিতরা করেছেন। দীর্ঘকালের বিবর্তনের ফলে গুহাগাত্রে চিত্র বা অন্যান্য শিল্প রচিত হয়েছিল অথবা কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে কোনো অলৌকিক শক্তির প্রভাবে মানুষ চিত্ররচনার কৌশল আরত্ত করেছিলেন এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শিল্পপ্রেরণার কথা এসে পড়ে। শিল্পপ্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা। এই কারণে বিষয়টি শিল্পীর দিক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করা গেল।

দেশকাল-নির্বিশেষে মহৎ শিল্পী মাত্রেই প্রেরণার মূল্য স্বীকার করেছেন। সম্প্রতিকালে প্রেরণার বৈশিষ্ট্য-সত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। এই সন্দেহের প্রধান কারণ, প্রেরণাকে ঐশী শক্তির ক্রিয়া বলেই আগের দিনের শিল্পীরা মেনে নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক যুগে ঐশী শক্তিতে আস্থা থাকবার কথা নয়। অপর দিকে একান্ত ভাবে বুদ্ধিবিচারের পথে ভাবময় শিল্পরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ অবস্থায় বা অলৌকিক মুহূর্তে শিল্পী যে সৃষ্টি করে থাকেন অনুরূপ সৃষ্টি ইচ্ছা করলেই শিল্পী করতে পারেন না— এ বিষয়েও তর্কের অবকাশ নেই। গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিল্পী যখন কোনো শিল্পকর্মে রত থাকেন সেই মুহূর্তে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা বুদ্ধিবিচারের ক্রিয়া তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে যায়। ক্রমে গভীর মনোসংযোগের অবস্থা থেকে বিচ্যুত হলে শিল্পী অনুভব করেন তাঁর শিল্পজীবনের বিশেষ রকমের পরিবর্তন। এ হল শিল্পীজীবনের অতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এ বিষয়ে যুক্তিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। বলা যেতে পারে বিশেষ রকমের

শক্তিদ্বারা চালিত না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী মহৎ বা পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। এই ঐশী শক্তি শিল্পীর অন্তর থেকে জাগে কিংবা অন্য কোনো ভাবে সেই শক্তির সাক্ষাৎ তিনি পান, সে বিচার লেখকের পক্ষে সম্ভব না হলেও শিল্পসৃষ্টি অলৌকিক মুহূর্তের অবদান বলতে বাধা নেই।

এই অলৌকিক মুহূর্ত শিল্পীজীবনের অন্যতম উপলব্ধি। বুদ্ধিবিচারের প্রভাবে এই অবস্থার কার্যকারণ অনুসরণ করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয় এবং অনুরূপ প্রয়াসের বিশেষ কোনো প্রয়োজনও নেই। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ তথা উদ্দীপনা ছাড়াও আর-এক রকমের উপলব্ধি সম্বন্ধে শিল্পীর সচেতন থাকা প্রয়োজন। যে শিল্পী এই অলৌকিক মুহূর্ত কখনও অনুভব করেন নি তাঁর কাছে এটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনা ও অলৌকিক অবস্থা দুটি এতই কাছাকাছি যে, উদ্দীপনাকে প্রেরণা বলে ভুল হতে পারে। বিশুদ্ধ উদ্দীপনার মুহূর্তে একটি বস্তু অতুলনীয় হয়ে শিল্পীর কাছে প্রতিভাত হয়। প্রেরণার কালে একটি মুহূর্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে উপলব্ধি করেন শিল্পী।

প্রেরণার শক্তিতে যে শিল্পরূপ আত্মপ্রকাশ করে সেটি শিল্পীর কাছে অভাবনীয় বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ওঠে। এবং শিল্পের ইতিহাসে অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত উদ্ভাবন এই শক্তির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পী অলৌকিক মুহূর্তে চিত্রনির্মাণের আশ্চর্য কৌশল প্রত্যক্ষ করেছিলেন পরম্পরার সাহায্য ছাড়াও। মানসপ্রতিমা, উদ্দীপনা, বস্তু-আশ্রিত উপাদান, আঙ্গিক, উপকরণ, কায়িক পরিশ্রম সমস্ত একত্র মিশ্রিত হয়ে প্রকাশ পায় যে শিল্পরূপ, সে ক্ষেত্রে কোনো একটি অংশের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। এই অখণ্ডতার কারণেই সার্থক শিল্পরূপ দর্শকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগাতে সক্ষম।

নন্দলাল বসুর গৃহ। গুরুপল্লী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -অঙ্কিত

ভরতবর্ণিত নাট্যসংগীত ধ্রুবা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

প্রাচীন নাট্যে বিভিন্ন পরিবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতানুষ্ঠান হত। এই গীতের আখ্যা ছিল ধ্রুবা। ধ্রুবাগান ভরতের নাট্যশাস্ত্রের একটি প্রধান অংশ অধিকার করে আছে। এর প্রয়োগ আবশ্যিক ছিল; অথচ আশ্চর্যের বিষয় যেসব সংস্কৃত নাটক আমরা পাঠ করে থাকি তাতে ধ্রুবার কোনো উল্লেখ নেই। এর প্রধান কারণ হল এই যে ধ্রুবা ছিল নেপথ্যসংগীত— নাট্যকার এইগুলি রচনা করতেন না। প্রচলিত কয়েক শ্রেণীর বাঁধা গানই ধ্রুবাগীতি হিসাবে প্রযুক্ত হত। এর প্রধান দায়িত্ব ছিল সংগীতাচার্যের। তিনিই এইগুলি স্থানানুসারে প্রয়োগ করতেন। অতএব, নাট্যকারগণের মূল রচনাগুলিই আমাদের হস্তগত হয়েছে; আনুষঙ্গিক গানগুলি নয়। এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে সংস্কৃত নাটক গীতবিরল। অনুমান হয় নাটকের সঙ্গে যথেষ্ট ধ্রুবাগান ছিল বলেই নাটকে স্বতন্ত্রভাবে গীত যোজিত হত না। শকুন্তলা-নাটকের অন্তর্ভুক্ত হংসপদিকার গান কিন্তু নেপথ্যে আচরিত হলেও ধ্রুবা নয়, কারণ এটি একটি বিশেষ গীত যা নাটকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধ্রুবা অন্যভাবে প্রযুক্ত হত। শকুন্তলা নাটকের কথাই ধরা যাক। প্রথম অঙ্কে মৃগানুসারী দুষ্মন্ত যখন রঙ্গপীঠে প্রবেশ করছেন ঠিক সেই সময়ে নেপথ্যে একটি প্রাবেশিকী ধ্রুবার অনুষ্ঠান হওয়া বিধেয় ছিল। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের করুণ মুহূর্তে, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অপ্সরা-কর্তৃক অধিকৃত হবার মুহূর্তে, সর্বদমনকে দেখে দুষ্মন্তের স্নেহোদয়ের মুহূর্তে— খুব চমৎকারভাবেই ছোট ছোট ধ্রুবার প্রয়োগ হতে পারত। শুধু এ সব ক্ষেত্রেই নয়, নানা স্থানে নানা রসে নানাভাবেই ধ্রুবার প্রয়োগ হত। এই প্রসঙ্গে এটি বিশেষভাবে জানা উচিত যে কথোপকথনের কালে ধ্রুবাগীতি আচরিত হত না; যথোপযুক্ত অবসর কালেই ধ্রুবাগীতি অনুষ্ঠিত হত। ধ্রুবার প্রচলন ক্রমে ক্রমে কিভাবে বিলুপ্ত হল তা বলা কঠিন; তবে সম্ভবতঃ ধ্রুবার জন্য নাটকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া সম্ভব হত না এবং নাট্যসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর আর প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হত না। এতদ্ব্যতীত, ধ্রুবা সংগীতের দিক দিয়েও সুকঠিন ছিল। এই গানগুলি গাইবার মত যোগ্যতা-সম্পন্ন শিল্পীর অভাবও দেখা দিয়েছিল। যেসব গীতকে অবলম্বন করে ধ্রুবা প্রযুক্ত হত সেই গীতগুলিও অবলুপ্ত হয়েছিল এবং মার্গতালের ব্যবহারও আর ছিল না।

ধ্রুবার সংজ্ঞা

এই প্রসঙ্গে এটি বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে ধ্রুবা অর্থে সাধারণভাবে যে সম্মেলকগীতি বোঝায়, যাকে আমরা 'ধুয়া' বলে থাকি নাট্যশাস্ত্রের ধ্রুবা সে বস্তু নয়। এটি একক বা সম্মিলিত উভয়ভাবেই গাওয়া হত এবং এতে গীতের সব লক্ষণ থাকত। তবে এটিও বলা আবশ্যক যে যদিও ধ্রুবাকে একটি স্বতন্ত্র গীত হিসাবে ধরা হয়েছে তথাপি তা মূলতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গীত নয়, প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ গীতের অংশমাত্র। ধ্রুবা কেবল নাটকের ক্ষেত্রেই গীত বলে স্বীকার্য নতুবা নয়। সংগীতের আসরে ধ্রুবা গাওয়ার রীতি ছিল না, সেখানে ধ্রুবা যে মূল গানের অংশবিশেষ সেটি সম্পূর্ণ গাওয়া হত। ধ্রুবা নামটিও ভরতের দেওয়া নয়। তাঁর পূর্বে নারদপ্রমুখ শাস্ত্রকারগণ এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করে গেছেন।

ধ্রুবেতি সংজ্ঞিতানি স্যুর্ণারদপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।

৩২ অধ্যায়-১

কোন কোন গীত মূলতঃ ধ্রুবা-নামে অভিহিত হবার যোগ্য সে সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে ঋক্, গাথা, পাণিকা— এই তিনপ্রকার গীতি এবং মদ্রক, উল্লোপ্যক, অপরান্তক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর— এই সপ্তগীত 'ধ্রুবা' এই নামে অভিসংজ্ঞিত।

যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ।

সপ্তরূপপ্রমাণং হি সা ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতা॥

৩২ অধ্যায়-২

এই গীতগুলির বহু অঙ্গ ছিল। ধ্রুবায় সবকটি অঙ্গের প্রয়োগ হত না। কেবলমাত্র যে বিশেষ অঙ্গগুলি উদ্ধৃত করে নানা ছন্দে গাওয়া হত সেইগুলিকেই বলা হত ধ্রুবা।

এভ্যস্ত্বঙ্গেভ্য উদ্ধৃত্য নানাছন্দঃকৃতানি চ।

ধ্রুবাত্বং যানি গচ্ছন্তি তানি বক্ষ্যাম্যহং দ্বিজাঃ॥

৩২ অধ্যায়-৩

পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ভরত এই অঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন; যথা— মুখ, প্রতিমুখ, বৈহায়সক, স্থিত, প্রবৃত্ত, বজ্র, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত, মাষঘাত, চতুরশ্র, উপপাত, প্রবেণী, শীর্ষক, সংপিষ্টক, অন্তাহরণ এবং মহাজনিক। এই অঙ্গগুলি পাঁচপ্রকার মূল ধ্রুবায় এবং অপরাপর ধ্রুবায় প্রযুক্ত হত। এই পাঁচটি মূল ধ্রুবা হচ্ছে— প্রাবেশিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, আন্তরা এবং নৈষ্ক্রামিকী। অপর ধ্রুবাসমূহ হচ্ছে— অড্ডিতা, অপকৃষ্টা, স্থিতা, দ্রুতা, দীপ্তা, আবসানিকী, শীর্ষক, নৎকুট, খঞ্জক, উদ্ধতা অনুবন্ধ, বিলম্বিত, উত্থাপনী, পরিবর্ত এবং চতুরশ্রা।

যেহেতু ধ্রুবা কেবল একটি বৃহৎ গীতের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত এই কারণে ভরত বলেছেন ধ্রুবা একবস্তু; অর্থাৎ এর গেয়ভাগ বিভিন্ন কলিতে বিভক্ত নয়। ভরতের মতে বাক্য, বর্ণ (আরোহী অবরোহী) লয়, যতি এবং পাণি (সম, অতীত, অনাগত-গ্রহ)— গীতের এই আবশ্যিক অঙ্গগুলি একে অপরের সঙ্গে ধ্রুব সম্বন্ধযুক্ত বলেই এর নাম ধ্রুবা।

বাক্যবর্ণাহ্যলঙ্কারা লয় যত্যথ পাণয়ঃ।

ধ্রুবমন্যোন্যসম্বদ্ধা যস্মাৎ তস্মাৎ ধ্রুবা স্মৃতা॥

ধ্রুবার আঙ্গিক বিশ্লেষণ

উল্লিখিত সপ্তগীতির কোন কোন অঙ্গ কোন কোন ধ্রুবায় প্রযুক্ত হত ভরত তাও জানিয়েছেন। প্রয়োগটি এইরূপ :

ধ্রুবা	গীতাঙ্গ
প্রাবেশিকী	উপপাত, প্রবৃত্ত, বজ্র এবং শীর্ষক।
অড্ডিতা	প্রস্তার, মাষঘাত, মহাজনিক, প্রবেণ, উপপাত।
অপকৃষ্টা	মুখ, প্রতিমুখ।
স্থিতা	বৈহায়স, অন্তাহরণ।

খণ্ডক এবং নংকুট	সংহার, চতুরস্র।
আন্তরা	সন্ধি, প্রস্তার।

এই অঙ্গগুলির স্বরূপ বোঝাবার জন্যই ভরত এই সাতটি গীতির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এই গীতগুলিকে বলা হত 'প্রকরণ'। শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীতরত্নাকর-গ্রন্থে চতুর্দশ প্রকার প্রকরণের উল্লেখ করেছেন। ভরতও 'ধ্রুবাবিধান' অধ্যায়ে বলেছেন— 'ধ্রুবা প্রকরণাশ্রয়াঃ'। মার্গতালাশ্রিত এই গানগুলির পরিচয় পাঠকের গোচর করবার জন্যই ভরতকে সাধারণভাবে তৎকালীন সংগীতের বিবরণ দিতে হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রকরণে এই অঙ্গগুলির সন্নিবেশ কিরকম ছিল বোঝাবার জন্য প্রকরণগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

সপ্তগীতি বা প্রকরণ

১. মদ্রক— সাধারণভাবে এর গেয়পদে আটটি গুরু এবং আটটি লঘু অক্ষর যোজিত হত। এই গেয় অংশটিকেই 'বস্তু' বলা হত। এর পরে যেটি গাওয়া হত তার নাম 'শীর্ষক'। এই অংশটি গাওয়া হত ষট্‌পিতাপুত্রক বা পঞ্চপাণি নামক মার্গতালে। বস্তু-অংশের প্রথম দুটি গুরুতে 'উপোহন' নামক বিধি আচরিত হত। প্রত্যুপোহন-নামক আরো একটি অনুষ্ঠান ছিল। ঝণ্টুম্ ঝণ্টুম্ দিগি দিগি— প্রভৃতি শুষ্কস্বরে উপোহন এবং প্রত্যুপোহন অনুষ্ঠিত হত। উপোহন দ্বারা গীতের প্রবর্তন করা হত। মদ্রকের অঙ্গগুলি এইরূপ :

১ উপোহন ও প্রত্যুপোহন
২ বস্তু
৩ শীর্ষক

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বস্তুটি একবারই আচরণ করা হত। মদ্রকগীতি দুগুণ এবং চারগুণ করেও গাওয়া হত ; তখন তাদের বলা হত— দ্বিকল বা চতুষ্কল মদ্রক।

২. অপরান্তক— এই গীতে সাতটি পর্যন্ত বস্তু থাকত এবং বস্তু অংশটি চারটি গুরু এবং চারটি লঘু অক্ষরযুক্ত ছিল। এই বস্তুগুলি দুভাগে গাওয়া হত। প্রথম ভাগটির নাম শাখা, দ্বিতীয় ভাগটির নাম প্রতিশাখা। দ্বিকল অপরান্তকে চতুর্থ বস্তুর পর যে অংশটি গাওয়া হত তাকে বলা হত 'উপবর্তন'। সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন যে এইটি মাগধীরীতিতে গাওয়া হত। মাগধীরীতির কথা পরে বলা হচ্ছে। এই গীতের আদিতে উপোহন আচরিত হত। প্রত্যুপোহন সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা ছিল না। শাখা, প্রতিশাখার পর পঞ্চপাণিতালে শীর্ষক অনুষ্ঠিত হত। এর পরে 'তালিকা' নামে আর একটি অঙ্গ থাকত। এটি শীর্ষকের অনুরূপ। সব মিলিয়ে অপরান্তকে এই অঙ্গগুলি ছিল :

১ উপোহন ও প্রত্যুপোহন
২ বস্তু (শাখা এবং প্রতিশাখা)
৩ উপবর্তন
৪ শীর্ষক
৫ তালিকা

৩. উল্লোপ্যক— এই গীতে গুরু এবং লঘু অক্ষর মিলিয়ে তিনটি প্রকারভেদ ছিল। এর পূর্বার্ধে বিবিধ বা বিবধ নামক অনুষ্ঠান আচরিত হত। বিবধ অঙ্গটি দুটি বিদারী বা গীতখণ্ডদ্বারা গঠিত। এই অনুষ্ঠানটি মুখ-নামে পরিচিত এবং পশ্চিমার্ধে বহুবিদারী সংযোগে প্রতিমুখ অনুষ্ঠান করা হত। বিদারীর সমুচ্চয়কে বৃত্ত বলা হত এবং আরোহীবর্ণে সম্পাদিত বৃত্তকে বলা হত অবগাঢ়। অবরোহীবর্ণে সম্পাদিত বৃত্তকে বলা হত প্রবৃত্ত। এর পরে বিবধযুক্ত বৈহায়সনামক অঙ্গটি অনুষ্ঠিত হত। কোনো কোনো মতে বৈহায়স অঙ্গটিই ছিল শাখা এবং এইটিই পদান্তরনির্মিত হলে তাকে প্রতিশাখা বলে গণ্য করা হত। অতঃপর পঞ্চপাণিতালে বৃত্তদ্বারা গঠিত অন্তাহরণ বা সংহরণ অনুষ্ঠান এবং সবশেষে অন্তনামক অনুষ্ঠান আচরিত হত। অন্ত অংশে যুগ্ম, অযুগ্ম এবং মিশ্র— এই তিনটি অঙ্গ ছিল। এইগুলি আবার তিন-প্রকার— স্থিত, প্রবৃত্ত এবং মহাজনিক। মহাজনিক অঙ্গে গীতের পূর্বপদ বা বিবধ অংশের পুনরাবৃত্তি হত। সব মিলিয়ে উল্লোপ্যকে এই অঙ্গগুলি ছিল :

১ মুখ }
২ প্রতিমুখ } বিবধ বা বিবিধ
৩ বৈহায়স
৪ অন্তাহরণ
৫ অন্ত (স্থিত, প্রবৃত্ত এবং মহাজনিক)

৪. প্রকরী—এতে চারটি বা সার্ধ তিনটি বস্তু থাকত এবং উপোহন ও প্রত্যুপোহন অনুষ্ঠিত হত। অতঃপর সংহরণ অংশের অনুষ্ঠান হত। এর সংগঠন এইরূপ :

১ বস্তু (উপোহন ও প্রত্যুপোহন সহ)
২ সংহরণ

৫. ওবেণক— এই গীতের অঙ্গ বারটি। মতান্তরে সাতটিও স্বীকৃত হত। এই বারটি অঙ্গ হচ্ছে —পাদ, প্রতিপাদ, মাষঘাত, উপবর্তন, সন্ধি, চতুরশ্র, বজ্র, সংপিষ্টক, বেণী, প্রবেণী, উপপাত এবং অন্তাহরণ। সপ্তাঙ্গ ওবেণকের ক্ষেত্রে সংপিষ্টক, বেণী, প্রবেণী, উপবর্তন এবং উপপাত এই পাঁচটি অঙ্গ বাদ যেত। পাদ অঙ্গটি চতুষ্কল অপরান্তকে প্রযুক্ত বস্তুর মত গঠিত। প্রতিপাদ নামক অঙ্গটিও এইভাবে অন্যপদে গঠিত। প্রতিপাদের পরে যথাক্ষর উত্তর বা পঞ্চপাণিতালে শীর্ষকের অনুষ্ঠানও হত। তারপর দ্বিকল উত্তরতালে মাষঘাত নামক অঙ্গের অনুষ্ঠান হত। এরপর অপরান্তকের মত উপবর্তন অংশটি অনুষ্ঠিত হত। অতঃপর সন্ধি নামক অঙ্গটি যথাক্ষর উত্তরতালে আচরিত হত। সন্ধির পর চতুরশ্র অঙ্গটি ছিল উল্লোপ্যকের যুগ্মপ্রবৃত্তের মত। এটি দ্বিকল চপৎপুট এবং উদ্ঘট্ট তালে সম্পাদন করা হত। তারপর বজ্র নামক অঙ্গটি পূর্বোক্ত সন্ধির ন্যায় প্রযুক্ত হত। বজ্রের পর সম্পিষ্টক অঙ্গটি দ্বাদশাঙ্গ ওবেণকের পক্ষে দশকল এবং সপ্তাঙ্গ ওবেণকের পক্ষে দ্বাদশকল হত। অতঃপর বেণী এবং প্রবেণী— এই দুটি অঙ্গে যথাক্ষর বা দ্বিকল পঞ্চপাণিতাল প্রযুক্ত হত। এর পর উপপাত অঙ্গটি অনুষ্ঠানের পর অন্তাহরণ বা সংহরণ অনুষ্ঠিত হত। সব মিলিয়ে ভরত দ্বাদশাঙ্গ ওবেণকের সংগঠন এইরূপ দিয়েছেন :

১ পাদ ৩ মাষঘাত
২ প্রতিপাদ ৪ সন্ধি

৫ উপবর্তন
৬ চতুরশ্র
৭ বজ্র
৮ সম্পিষ্টক
৯ } দুই প্রকার প্রবেণী
১০ }
১১ উপপাত
১২ সংহরণ

শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীতরত্নাকরে দুই প্রকার প্রবেণীর পরিবর্তে বেণী ও প্রবেণী— এই দুটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন।

৬. রোবিন্দক— এর পাদভাগ ছটি মাত্রায় গঠিত হত। প্রথম পাদের মাঝামাঝি উপোহন এবং শেষে প্রত্যুপোহনের অনুষ্ঠান হত। প্রত্যেক পাদের পূর্বভাগে প্রস্তার নামক একটি গীতের অনুষ্ঠান হত এবং শেষে দ্বিকল উত্তরতালে শরীর নামক অঙ্গের আচরণ হত। শীর্ষক অনুষ্ঠানের পর এই গীতের সমাপ্তি হত। এই গীতের অঙ্গবিন্যাস এইরূপ :

১ ষাণ্মাত্রিক পাদ (উপোহন, প্রত্যুপোহন, প্রস্তার ও শরীর সহ)

২ শীর্ষক

৭. উত্তর— এর প্রথমে মাত্রা নামক অংশ এবং তার সঙ্গে মুখ এবং প্রতিমুখ অনুষ্ঠিত হত। এরপরে শাখা, প্রতিশাখা এবং অন্তে শীর্ষকের অনুষ্ঠান হত। এর পরেও একটি প্রতিশাখার অনুষ্ঠান হত। এই গীতের অঙ্গবিন্যাস এইরূপ :

১ মাত্রা

২ মুখ, প্রতিমুখ

৩ শাখা, প্রতিশাখা

৪ শীর্ষক

৫ প্রতিশাখা

এই হচ্ছে ভরতোক্ত সপ্তগীতির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ভরত বলেছেন যে এই সপ্তরূপ সামবেদ থেকে বিনিঃসৃত হয়েছে। বর্তমান গীতগুলি অপেক্ষা এই গীতগুলির কলি অনেক বেশি ছিল এবং তালের দিক থেকে বহু কঠিন নিয়ম পালন করা হত। বস্তুতঃ এই সব গানের তালই ছিল মুখ্য অঙ্গ। এই কারণে মার্গতালের প্রসঙ্গেই এই গানগুলির পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এই সপ্তগীতির যে সব অংশে সুরের প্রাধান্য ছিল সেই সব অংশ জাতিসহযোগে গান করা হত। জাতি হচ্ছে রাগসংগীতের পূর্বতনরূপ। মোটামুটি জাতি এবং রাগের লক্ষণ একই। শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীতরত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে জাতিবর্ণনা উপলক্ষে কয়েকটি ধ্রুবার উদাহরণ দিয়েছেন। ধ্রুবাবিধানে জাতির প্রয়োগ হলেও রসের দিক থেকে বিচার করে তাকে সংক্ষিপ্ত করা হত; অর্থাৎ বিভিন্ন কৌশল এবং অলঙ্কার বর্জন করা হত। বিশেষ সংক্ষিপ্ত না হলে নাটকে এর প্রয়োগ হওয়া সম্ভব ছিল না।

গান্ধর্বগীতি

ভরত এই সঙ্গে তৎকালীন আরো চার প্রকার গীতের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হচ্ছে— মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা এবং পৃথুলা। এই গানগুলি তৎকালে গান্ধর্ব অর্থাৎ গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা গাইতেন। এই

গানগুলি বর্ণ, অলঙ্কার, পদ এবং লয়সহযোগে গাওয়া হত। এইটি ছিল তখনকার গায়নরীতি। মাগধীগানে তিনটি করে পদ থাকত। অক্ষরগুলির বিশেষ যোজনার ফলে মনে হত প্রথম পাদটি বিলম্বিত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ দ্রুত এবং দ্রুততর। অর্ধমাগধীতেও এক পাদের শেষ অক্ষর অপর পাদের সঙ্গে যোজনা করে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হত: সম্ভাবিতা ছিল গুরু অক্ষর সমন্বিত এবং পৃথুলা ছিল লঘু অক্ষরকৃত গান। শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগীতরত্নাকরে এই গানগুলির উদাহরণ দিয়েছেন।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৯ অধ্যায়ে বলছেন যে এই গানগুলির সঙ্গে ধ্রুবার যোগ ছিল না, কিন্তু ৩২ অধ্যায়ে বলছেন যে যথাযথভাবে অক্ষরপ্রয়োগ করে এই গানগুলি ধ্রুবাতেও প্রয়োগ করতে হবে।

ঋক্, গাথা, পাণিকা

ভরত বলেছেন ঋক্, গাথা এবং পাণিকা—এই তিনটি গীত ধ্রুবায় জয় এবং আশীর্বাদ উপলক্ষে ব্যবহৃত হত।

ঋক্ নামক গীত অষ্টাক্ষর পাদযুক্ত অনুষ্টুপ ছন্দ থেকে দ্বাদশাক্ষর পাদযুক্ত জগতী পর্যায়ের ছন্দে গঠিত। এই গীত বৈদিক বা লৌকিক পদে গাওয়া হত। এর এক একটি কলায় এক একটি অক্ষর প্রযুক্ত হত। একে বলা হত একাক্ষরা কলা। অষ্টচত্বারিংশৎ কলা পর্যন্ত গাওয়া হত। এই কলাগুলি মন্ত্রপদ এবং স্তোভাক্ষরদ্বারা (ওঙ্কার এবং হ্-কার) পূরিত হত।

গাথা নামক গীতে এক একটি কলা চতুরাক্ষরা, অর্থাৎ একটি কলায় চারটি করে অক্ষর থাকত। গাথায় এক শ আটাশ পর্যন্ত কলার প্রয়োগ হতে পারত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অথবা স্তোভাক্ষরদ্বারা এই কলাগুলি পূরিত হত। গাথায় একক, বর্ণ, অলঙ্কার এবং পদরচিত গীতের সন্নিবেশ থাকত। এতে প্রস্তাব এবং অপরাপর সামাঙ্গ বহুলভাবে নিয়োজিত হত।

পাণিকা নামক গীতে প্রথম মাত্রা রোবিন্দকের প্রথম মাত্রার অনুরূপ ছিল। এর মুখ নামক উপোহনটিও রোবিন্দকের মত ছিল। পাণিকার বিবিধ বা বিবধ প্রভৃতি অঙ্গ সন্নিবেশ উল্লোপ্যকের মত। এর বিদারীগুলি আকারান্তরিত বা নিরন্তর আকারযুক্ত স্তুতিপদদ্বারা গঠিত হত। মুখনামক অনুষ্ঠানের পর সেইভাবেই প্রতিমুখ অনুষ্ঠিত হত; অর্থাৎ কেবল পদভেদ হত গীতভেদ নয়। প্রতিমুখের পর চারটি যথাক্ষর উত্তর তালের প্রয়োগে শরীর নামক অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হত। অতঃপর একক প্রয়োগে সম্পিষ্টক নামক অঙ্গের আচরণ করা হত। কোনো কোনো আচার্য অন্তাহরণের রীতিতে শীর্ষক রচনার নির্দেশ দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য ধ্রুবাগুলি এত ব্যাপকভাবে আচরিত হত না। এদের অংশ বা সংক্ষিপ্তরূপই প্রযুক্ত হত।

ধ্রুবায় ছন্দের প্রয়োগ

সুপ্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত গানগুলির অংশবিশেষ নিয়ে যেমন ধ্রুবা সংগঠিত হত সেইরকম বহু বিভিন্ন ছন্দ সহযোগেও ধ্রুবা গাওয়া হত। এই ছন্দগুলি সুরে তালে গীতরূপ ধারণ করত। এই রীতি থেকেই পরবর্তীকালে বহুছন্দও গানের পর্যায়ে এসে গেছে। সপ্তগীতির অংশ এবং ছন্দনির্মিত ধ্রুবা কোন কোন বিশেষ অংশে প্রযুক্ত হত সে সম্বন্ধে ভরত বিশেষ করে নির্দেশ দেন নি। পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি মূল ধ্রুবার ছন্দোবৃত্তি নিদর্শন উপলক্ষে ভরত প্রথমে ‘পদ’ কাকে বলে তার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। তিনি

বলেছেন স্বর, তাল এবং পদযুক্ত যে গান্ধর্বের কথা আমি বলেছি তার স্বর এবং তালের প্রভাবযুক্ত বস্তু অংশটিই হচ্ছে 'পদ'।

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্॥ ধ্রুবাবিধান—৩২ অধ্যায়

পূর্বে মদ্রক-গীতির বর্ণনা উপলক্ষে বলা হয়েছে যে সপ্তগীতির গেয় অংশটিই হচ্ছে বস্তু। এই বস্তু অঙ্গটিই ভালো করে গাওয়া হত বলেই তাকেই পদ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এর পরেই তিনি বলেছেন যে অক্ষরকৃত সব কিছুই পদ বলে বুঝতে হবে। এটি নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ এই হিসাবে দ্বিবিধ; আবার তালযুক্ত এবং তালব্যতীত এই ভাবে দুই প্রকার। ভরত আবার বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছেন যে ধ্রুবার ক্ষেত্রে তালযুক্ত এবং নিবদ্ধ পদই নির্ধারিত হয়েছে।

সতালঞ্চ ধ্রুবার্থেষু নিবদ্ধং তচ্চ বৈ স্মৃতম্॥

এতে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ধ্রুবা-গান কখনো আলাপের মত স্বাধীনভাবে বা আবৃত্তির ঢঙে আচরণ করা হত না; সম্পূর্ণ তাল-নিবদ্ধ গীতের নিয়মে অনুষ্ঠিত হত। যে পদ করণের বা বীণার বিচিত্র আঘাতের সঙ্গে যুক্ত এবং যা সর্বপ্রকার বাদ্যের অনুরঞ্জক তা অতাল এবং অনিবদ্ধ হলেও পদ বলে স্বীকৃত। নিবদ্ধপদে অক্ষরগুলি নিয়ত এবং অক্ষর সংখ্যা নিয়মিত হত। তাতে ছন্দ এবং যতি থাকত এবং সেই অক্ষরগুলি তাল ও লয়ে শাসিত হত। অনিবদ্ধ পদে অক্ষরগুলি অনিয়ত, যতি ইচ্ছানুরূপ এবং তাল ও লয়ের নিয়ম রক্ষিত হত না। অনিবদ্ধ অক্ষরগুলি জাতি গায়ন পদ্ধতির বহির্ভূত ছিল এবং বীণাবাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কেবলমাত্র ছন্দ এবং অক্ষর বিধানে নিবদ্ধ পদই ধ্রুবা নামে সংজ্ঞিত।

ধ্রুবায় প্রযুক্ত ছন্দের জাতি

ধ্রুবা	ছন্দোজাতি
স্থিতাপকৃষ্টা	অত্যুক্তা, প্রতিষ্ঠা, মধ্যা, গায়ত্রী। ভরত এই ছন্দোজাতিগুলিকে 'ত্র্যস্র' বলে নির্দেশ করেছেন।
প্রাসাদিকী	উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী এবং পংক্তি। ভরত এই ছন্দোজাতিগুলিকে 'যুগ্ম' বলে নির্দেশ করেছেন।
দ্রুতা	অনুষ্টুপ, বৃহতী, জগতী, বিলম্বিতাচপলা, দ্রুতাচপলা, উদ্গতা এবং ধৃতি।
উদ্ধত-প্রাবেশিকী	পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতি জগতী এবং শক্করী।

অক্ষর অনুসারে এই জাতিগুলির বৃত্ত ত্রিবিধ—গুরুপ্রায়, লঘুপ্রায় এবং গুরুলঘু। অপকৃষ্টা ধ্রুবায় গুরুপ্রায়, দ্রুতা ধ্রুবায় লঘুপ্রায় এবং অবশিষ্টা ধ্রুবাগুলিতে গুরু লঘু যোজিত হত। আক্ষেপিকী ধ্রুবার ক্ষেত্রে যুগ্ম বা অযুগ্ম উভয় ছন্দই প্রযোজ্য ছিল। তবে, অর্থানুসারে লঘু অক্ষরযুক্ত যুগ্ম এবং অল্প অক্ষরযুক্ত বিষম ছন্দ প্রযুক্ত হত।

অতঃপর ভরত জাতি অনুসারে ধ্রুবাগুলির বিভাগ প্রদর্শন করেছেন।

ধ্রুবায় প্রযুক্ত ছন্দের মূলজাতি	ছন্দ
বৃত্ত (ক্ষুদ্র পাদযুক্ত ছন্দ।)	স্ত্রী (গাথার অংশভুক্ত), অত্যুক্ত, তটি, ধৃতি, রজনী বা মধ্যা। এইগুলি দেবস্তুতি উপলক্ষে প্রযুক্ত হত।
প্রতিষ্ঠা (চতুরক্ষর)	প্রতিষ্ঠা।
সুপ্রতিষ্ঠা (পঞ্চাক্ষর)	ভ্রমরী, জয়া, বিজয়া, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভূতলতন্বী, কমলমুখী, গুরু, শিখা, ঘনপংক্তি। এইগুলি অপকৃষ্টাধ্রুবায় যোজিত হত।
গায়ত্রী (ষড়াক্ষর)	তনুমধ্য, মালিনী, মকরশীর্ষা, বিমলা, বীথি, গিরা, জলা, রম্যা, কান্তা, পংক্তি, নলিনী, নীলতোয়া।
উষ্ণিক্ (সপ্তাক্ষর)	দ্রুতগতি বা চপলা, বিমলা, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সুভদ্রা, কুসুমবতী, মুদিতা, প্রকাশিতা, দীপ্তা, বিলম্বিতা, চঞ্চলগতি। এই ছন্দগুলি স্থিতা প্রাসাদিকী ধ্রুবায় প্রযুক্ত হত।
অনুষ্টুপ (অষ্টাক্ষর)	বিমলজলা, ললিতগতি, মহী, মধুকরসদৃশা, নলিনী, নদী। এই ছন্দগুলি প্রাবেশিকী ধ্রুবায় অনুষ্ঠিত হত।
বৃহতী (নবাক্ষর)	রুচিরান্তা। এই ছন্দটি অপকৃষ্টা ধ্রুবায় উত্তম এবং অধম স্ত্রীদ্বারা অনুষ্ঠিত হত।
পংক্তি (দশাক্ষর)	প্রমিতা। এটিও অপকৃষ্টা ধ্রুবায় প্রযুক্ত হত।
ত্রিষ্টুপ (একাদশাক্ষর)	গতবিশোকা
জগতী (দ্বাদশাক্ষর)	বিশ্লোকজাতি, ললিত। বিশ্লোকজাতি-ছন্দটি অপকৃষ্টা ধ্রুবায় প্রযুক্ত হত।
অতিজগতী (ত্রয়োদশাক্ষর)	বিলম্বিতা।

সম্ভবতঃ ললিত এবং বিলম্বিতা স্থিতা প্রাবেশিকী ধ্রুবায় প্রযুক্ত হত। অপকৃষ্টা ধ্রুবায় স্থায়ী বর্ণ (এক স্বরের ক্রমিক প্রয়োগ) যোজিত হত। এর লয় ছিল ধীর বা স্থিত। এই ধ্রুবায় গীতের প্রারম্ভেই তাল গ্রহণ করা হত (সমপাণি) এবং এর আদি মধ্য এবং অন্ত সমান লয়যুক্ত হত (সমযতি)। অপকৃষ্টা ধ্রুবার অক্ষরসমূহ বৃত্ত জাতি অনুসারে নির্দিষ্ট হত। অর্থাৎ, যদি সুপ্রতিষ্ঠাজাতীয় ছন্দ ব্যবহৃত হত তাহলে অপকৃষ্টা ধ্রুবার অক্ষর সংখ্যা পাঁচ-এর বেশি হত না। অনুরূপভাবে বৃহতীজাতীয় ছন্দ প্রযুক্ত হলে তার অক্ষর সংখ্যা নয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

এর পর ভরত দ্রুতাধ্রুবার প্রসঙ্গে এসেছেন। দ্রুতাধ্রুবার মুখে বা প্রারম্ভে তোটকছন্দ এবং শেষে হ্রস্বস্বর যোজিত হত। শেষের পদগুলি যুগ্ম, অযুগ্ম বা মিশ্রও হতে পারত। এই ধ্রুবায় জগতীজাতীয়

ছন্দগীতি থেকে অতিধৃতি পর্যায়ের ছন্দজাতি পর্যন্ত প্রযুক্ত হত। এই ছন্দ প্রয়োগের তালিকা প্রদান করা হল।

দ্বিপাদা ত্র্যস্রজাতীয় দ্রুতাধ্রুবা

ছন্দোজাতি	ছন্দ
জগতী (দ্বাদশাক্ষর)	বিক্রান্তা
অতিজগতী (ত্রয়োদশাক্ষর)	বিদ্যুন্মালা[1]
শক্করী (চতুর্দশাক্ষর)	ভূতলতন্বীস্খলিতগতি, বিভ্রমা
অতিশক্করী (পঞ্চদশাক্ষর)	ভূতলতন্বী
অষ্টি (ষষ্ঠ দশাক্ষর)	সুকুমার, স্খলিতবিক্রমা
অত্যষ্টি (সপ্ত দশাক্ষর)	রুচিরমুখী, ক্ষিপ্তকা
ধৃতি (অষ্ট দশাক্ষর)	দ্রুতাচপলা
অতি ধৃতি (ঊনবিংশাক্ষর)	কনকলতা
ঊনবিংশাক্ষর আর্যা	মুখচপলা

ভরত বলেছেন যে উপরোক্ত আটটি ছন্দোজাতি অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর থেকে ঊনবিংশাক্ষর ছন্দোজাতি হচ্ছে ধ্রুবার মূল জাতি। এইগুলি থেকেই যুগ্ম, অযুগ্ম, মিশ্র এবং বিষমাক্ষরযুক্ত বিভিন্ন ছন্দ বিনিঃসৃত হয়েছিল। এই ছন্দগুলি দেবতা এবং রাজা প্রভৃতির উপমায় প্রযুক্ত হত।

চতুরস্রজাতীয় বিলম্বিতা ধ্রুবায় মালা, প্রভাবতী, মালকিতা, সুরভিমুখী—এই কটি ছন্দ প্রযুক্ত হত। এইগুলির মূল ছন্দোজাতি নির্ণয় করা যায় না।

চতুরস্রজাতীয় দ্রুতা ধ্রুবায় মনোজ্ঞগমনা, ললিতগতি, রতি, ভুজগমুখী, দ্রুতপদগা—এই ছন্দগুলি প্রযুক্ত হত। এইগুলিরও মূল ছন্দোজাতি নির্ণয় করা যায় না।

উদ্ধতা ধ্রুবার ছন্দোজাতি ও ছন্দগুলি এইরূপ :

ছন্দোজাতি	ছন্দ
বৃহতী (নবাক্ষর)	কনকলতাক্ষিপ্তা, শশিরেখা, শলভবিচলিতা, মণিগণ-নিকরকৃতা, সিংহাক্রান্তা
পংক্তি (দশাক্ষর)	সুরদয়িতা, কুমুদিনী, বৃত্ত, কৃতোদ্ধতা, পুষ্পসমৃদ্ধা, বিপুলভুজা
ত্রিষ্টুপ (একাদশাক্ষর)	সুরতবিচিত্রা

বৃহতী এবং ত্রিষ্টুপের অন্তর্গত ছন্দগুলি প্রাবেশিকী ধ্রুবায় ব্যবহৃত হত। ভরত ত্রিষ্টুপজাতীয় আরো কতকগুলি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। এইগুলি দ্রুতা প্রাবেশিকীতে প্রযুক্ত হত।

১ কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দে বিদ্যুন্মালা অষ্টাক্ষর অনুষ্টুপের অন্তর্গত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্রুবাগীতিতে প্রযুক্ত ছন্দের সঙ্গে কাব্যে প্রযুক্ত ছন্দের কেবলমাত্র নামের মিল থাকলেও প্রকৃতি ভিন্ন ছিল।

দ্রুতাপ্রাবেশিকীতে প্রযুক্ত ধ্রুবার ছন্দ

ছন্দোজাতি	ছন্দ
ত্রিষ্টুপ (একাদশাক্ষর)	চপলা, রুচিরমুখী, কমলদলাক্ষী, দ্রুতপদাগতি, অতিচপলা, বিমলা, রুচিরা,[২] অপরবক্ত্র
অতিজগতী (ত্রয়োদশাক্ষর)	লঘুগতিরতিচপলা, মদকলিত, কমললোচনা

এর পর ভরত ক্রমবর্ধমান অক্ষরে রচিত প্রতিষ্ঠা থেকে জগতী পর্যন্ত ছন্দের উল্লেখ করেছেন। এই ছন্দোজাতিগুলির প্রত্যেকটির পাদে ক্রমে একটি করে অক্ষর বাড়িয়ে এই বর্ধমান ছন্দ রচিত হয়েছে। ভরত একে 'চতুরশ্রবিবর্ধিত' ছন্দ বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রতিষ্ঠা জাতীয় ছন্দের উল্লেখ করা হল। ভরত এই উদাহরণ দিয়েছেন :

মেহরবং
ণব সরদে
ণিসমিয় কুন্ধো
এসো গয়প্যবরো

এর প্রথমপাদে 'মেহরবং' চারিটি শব্দে গ্রথিত। দ্বিতীয় পাদে একটি অক্ষর বাড়িয়ে অক্ষরসংখ্যা পাঁচ করা হল। তৃতীয় পাদে আর একটি অক্ষর বাড়িয়ে ছয় এবং শেষপাদে আরো একটি অক্ষর বাড়িয়ে সাত করা হয়েছে। এইটিই হচ্ছে বর্ধমানরীতি।

ধ্রুবার গণনিয়ম

অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ছন্দগুলি গণনিয়ম (লঘুগুরু মিলিয়ে তিন অক্ষরের সমষ্টি) অনুসারে কিভাবে গাওয়া হত তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভরত ছন্দোবিভাগ নামক পঞ্চদশাধ্যায়ে গণনিয়মের পরিচয় দিয়েছেন। এটি ছন্দশাস্ত্রে সুপরিচিত। এই গণনিয়ম গানেও প্রযুক্ত হত। প্রবন্ধসংগীত তাল ব্যতীত কেবলমাত্র গণনিয়ম অনুসারেও গাওয়া হত। তিনটি অক্ষরের সমষ্টিতে গঠিত গণবিভাগটি এইরূপ :

ভ-গণ — পূর্ব অক্ষর গুরু এবং পরের দুটি অক্ষর লঘু।
ম-গণ — তিনটি অক্ষরই গুরু।
জ-গণ — মধ্য অক্ষর গুরু, অপর দুটি লঘু।
স-গণ — প্রথম দুটি লঘু এবং শেষ অক্ষরটি গুরু।
র-গণ — মধ্য অক্ষরটি লঘু এবং অপর দুটি গুরু
ত-গণ — শেষ অক্ষরটি লঘু এবং অপর দুটি গুরু।
য-গণ — প্রথম অক্ষরটি লঘু এবং পরের দুটি গুরু।
ন-গণ — তিনটি অক্ষরই লঘু।

এই গণনিয়ম অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠা জাতীয় ছন্দের শেষপাদে দুই এবং অর্ধগণ নিবেশিত হত এবং চারটি

২ কাব্যে প্রযুক্ত রুচিরা ত্রয়োদশাক্ষরা অতিজগতী ছন্দোজাতির অন্তর্গত।

চরণে দুটি গণপ্রযুক্ত হত।[৩] অপকৃষ্ট ধ্রুবার ক্ষেত্রেও শেষ চরণে দুই এবং অর্ধগণ নিবেশিত হত এবং সমগ্র পদটি দশটি গণসমন্বিত হত। অড্ডিতা ধ্রুবার ক্ষেত্রে শেষপাদে সার্ধ তিনটি গণ থাকত এবং সমগ্র গানে চতুর্দশটি গণ সন্নিবেশিত হত। দ্বিপাদা ত্র্যস্রজাতীয় ধ্রুবার শেষচরণে অর্ধষষ্ঠগণ থাকত এবং সমগ্র গানে একাদশটি গণ যোজিত হত। চতুরশ্রধ্রুবার দুটি পাদে সার্ধ অষ্টগণ থাকত এবং অপর দুটি পাদে সর্বসমেত পঞ্চদশগণ যোজিত হত। চতুরশ্রধ্রুবায় প্রথম পাদে দুই থেকে নয় পর্যন্ত গণ থাকত এবং এইগণ সমূহে প্রথমে গুরু শেষে লঘু অক্ষর যুক্ত হত। ত্র্যস্রধ্রুবায় পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত গণ থাকত। চতুরশ্রধ্রুবায় সাত থেকে দশ পর্যন্ত গণ সন্নিবেশিত হত। সর্বগুরু অক্ষরযুক্ত গণ হলে ন্যূনপক্ষে পাঁচটি এবং সর্বলঘুগণ হলে নয়টি প্রযুক্ত হত। ভরত এ কথাও বলেছেন যে সর্বগুরুগণ হলে সাত এবং সর্বলঘুগণ হলে ত্রয়োদশ পর্যন্ত যোজিত হত। দ্বিপাদা ত্র্যস্রধ্রুবায় আদ্য পাদে গুরু এবং শেষে লঘুবর্ণযুক্ত গণের সংখ্যা ছিল একাদশ। এর শেষ পাদে লঘুবর্ণযুক্ত গণের সংখ্যা ছিল একুশ পর্যন্ত। চতুরশ্রাধ্রুবার ক্ষেত্রে আদ্যপাদে এইরূপ গুরুবর্ণের গণসংখ্যা ছিল ষোলটি এবং শেষপাদে লঘুবর্ণযুক্ত গণসংখ্যা ছিল কুড়িটি, শীর্ষকধ্রুবার ক্ষেত্রে পাদগুলিতে প্রযুক্ত গণের কোনো নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল না।

ত্র্যস্রধ্রুবার পাঁচটি গণের সন্নিপাত বা মিলন বিধিযুক্ত। চতুরশ্রে আটটি গণের সন্নিপাত বিধেয়। দ্রুত এবং শীর্ষক ধ্রুবা ও এতদ্ব্যতীত অপরাপর ধ্রুবায় দুটি পাদের সমতা থাকা কাম্য। ত্র্যস্রধ্রুবায় অক্ষরপিণ্ড বা গণসংখ্যা ন্যূনপক্ষে পাঁচটি এবং অধিকপক্ষে নয়টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চতুরশ্রধ্রুবায় ন্যূনপক্ষে আটটি এবং অধিকপক্ষে ত্রয়োদশ হওয়াই বিধেয়। ত্র্যস্রের ক্ষেত্রে সর্বগুরুগণ হলে পাঁচটি এবং সর্বলঘুগণ হলে নয়টির বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চতুরশ্রের ক্ষেত্রে সর্বগুরুগণ হলে আটটি এবং সর্বলঘুগণ হলে তেরটি বিধান করা কর্তব্য। ধ্রুবাবিধানজ্ঞগণ এইরূপ অক্ষরপিণ্ড বা গণনিয়ম নির্দেশ করেছেন। দ্রুতাধ্রুবায় অর্ধষষ্ঠগণের সন্নিপাত বিধেয় ছিল এবং গুরু ও লঘু সমন্বিত মাত্রার সংখ্যা ছিল বত্রিশ।

শীর্ষক ধ্রুবা

শীর্ষকধ্রুবায় পদ সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নির্ধারিত ছিল না। এই ধ্রুবার পদ বিভিন্ন ছন্দে গঠিত হত। এতে চতুর্মাত্রিক গণও সন্নিবেশিত হত এবং এই গণগুলির প্রথমে দুটি গুরু বা দুটি লঘু বর্ণ থাকত; অথবা গণগুলি সর্বলঘু অক্ষরেও সম্পন্ন হতে পারত। শীর্ষকের পাদসমূহে অষ্ট এবং অর্ধগণ প্রযুক্ত হত। যুগ্ম বা অযুগ্ম অক্ষরযুক্ত পদে গঠিত এর মাত্রা সংখ্যা ছিল ত্রিশ। শীর্ষকধ্রুবার পাদে একবিংশতি থেকে ষড়বিংশতি পর্যন্ত অক্ষরের সমাবেশ হত। এই ধ্রুবায় চারটি পাদে যুগ্ম বা অযুগ্ম অথবা মিশ্র অক্ষর যোজিত হত। নিয়ম অনুসারে এর শেষভাগে লঘু অক্ষরের সমষ্টি থাকত। এর মুখভাগে তিনটি গণ অবসানে তিনটি গণ, মধ্যে দুটি গুরু থাকলে তাকে 'চপলা শীর্ষক' নামে অভিহিত করা হত। এর পূর্বার্ধের পাদে চারটি হ্রস্ব অক্ষর, চারটি মিশ্রগণ যোজিত হত এবং শেষে লঘু অক্ষরের সমষ্টি থাকত।

শীর্ষকধ্রুবায় প্রযুক্ত ছন্দ

ছন্দোজাতি	ছন্দ
প্রকৃতি (একবিংশতি-অক্ষর)	শ্যেনী
আকৃতি (দ্বাবিংশতি-অক্ষর)	ক্রৌঞ্চা

৩ এই গণনিয়ম অংশে কিছু লিপিকার অথবা অন্য প্রমাদ আছে বলে মনে হয়; কারণ যে সব ছন্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলিতে ভরতোক্ত গণনিয়ম প্রয়োগ করলে মেলে না।

বিকৃতি (ত্রয়োবিংশতি-অক্ষর)	পুষ্পসমৃদ্ধা, মত্তক্রীড়া[৪]
সংকৃতি বা সংস্কৃতি (চতুর্বিংশতি-অক্ষর)	সম্ভ্রান্তা, স্খলিত
অতিকৃতি (পঞ্চবিংশাক্ষর)	চপলা
উৎকৃতি (ষড়বিংশাক্ষর)	বেগবতী

ধ্রুবাগায়নে বিরামের বিশেষ নির্দেশ ছিল। বিরাম কলা অনুসারে নির্ধারিত হত আবার পদের প্রকৃতি অনুসারেও নির্ধারিত হত। সাধারণ অর্থে কলা বলতে সংগীতে আমরা যাকে বর্তমানে 'মাত্রা' বলে থাকি সেইরকমই বোঝায়। ধ্রুবার বিরামকাল নিম্নলিখিত তালিকায় দেখান হল।

ধ্রুবা	কলা অনুসারে বিরাম
প্রাসাদিকী এবং আন্তরা	এককল, দ্বিকল, ত্রিকল, চতুষ্কল বা অষ্টকল
ত্র্যস্র	ত্রিকল
চতুরশ্র	চতুষ্কল
প্রাবেশিকী, নৈষ্ক্রামিকী	দ্বিকল
আন্তরা	দ্বিকল
	পদ অনুসারে বিরাম
আক্ষিপ্তা	পাদের শেষে
স্থিতা ও প্রাসাদিকী	অর্ধপাদান্তে। বিরামকালে গুরু বা লঘু একটি কলা বা অর্ধকলা সংযোগ করে নেওয়া হত।

স্থিতাধ্রুবায় গুরুপ্রায় অক্ষর, দ্রুতাধ্রুবায় লঘুপ্রায় অক্ষর এবং প্রাসাদিকী ও আন্তরা ধ্রুবায় গুরু-লঘু অক্ষরের মিশ্রণ থাকত। এই ধ্রুবাগুলিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রযুক্ত হত।

নৎকুট ধ্রুবার ছন্দ

এর পরে নৎকুট ধ্রুবায় প্রযুক্ত ছন্দের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধ্রুবায় নিম্নলিখিত ছন্দগুলি প্রযুক্ত হত।

ছন্দোজাতি	ছন্দ
ত্রিষ্টুপ (একাদশাক্ষর)	রথোদ্ধতা, বুদ্বুদ
জগতী (দ্বাদশাক্ষর)	প্রমিতাক্ষর, হংসাস্য, তোটক
অষ্টি (ষোড়শাক্ষর)	উদ্গাত
অত্যষ্টি (সপ্তদশাক্ষর)	বংশপত্রপতিত
অর্ধসমবৃত্ত	কেতুমতী

অতঃপর খঞ্জকধ্রুবার ছন্দসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৪ ভরত বলছেন মত্তক্রীড়ার অপর নাম বিদ্যুন্মালা। কাব্যছন্দে বিদ্যুন্মালা অষ্টাক্ষর বৃত্ত অনুষ্টুপের অন্তর্গত।

ছন্দোজাতি	ছন্দ
বিষমবৃত্ত	প্রমোদা
অনুষ্টুপ (অষ্টাক্ষর)	মত্তচেষ্টিত
বৃহতী (নবাক্ষর)	ভাবিনী

এতদ্ভিন্ন এই জাতীয় ছন্দাদি থেকে সম, অর্ধসম এবং বিষমপদীয় আরও বহুতর ছন্দ পরিকল্পিত হত। ভরত বলেছেন সম এবং বিষমবৃত্ত মিলিয়ে ধ্রুবার মূল জাতি ছিল চৌষট্টি প্রকার।

ধ্রুবার পঞ্চ হেতু

ভরত ধ্রুবার পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করেছেন। এগুলি হচ্ছে—জাতি, প্রকার, প্রমাণ, নাম এবং স্থান। অক্ষর সমন্বিত বৃত্ত বা ছন্দে ধ্রুবার জাতি সংজ্ঞিত হত। সম, অর্ধসম এবং বিষমপদ ছিল এইগুলির প্রকারভেদ। ষট্‌কল, অষ্টকল এইরকম কলাই ছিল এইগুলির প্রমাণ। মানুষের যেমন গোত্র, কুল এবং আচার দ্বারা নাম নির্দিষ্ট হয় সেইরূপ ধ্রুবাগুলিরও নাম ছিল। স্থান বা আশ্রয় অনুসারে ধ্রুবার স্থান নির্দিষ্ট হত। ধ্রুবা সম্পর্কে এই 'স্থান'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে ভরত ধ্রুবার পঞ্চস্থানের উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচটি স্থান হচ্ছে—প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রাম, প্রাসাদিক এবং আন্তর। স্থান অনুসারে ধ্রুবার প্রয়োগ এইরূপ :

ধ্রুবা	স্থান
প্রাবেশিকী	পাত্রদিগের প্রবেশকালে নানা রস এবং অর্থযুক্ত এই সকল ধ্রুবা গান করা হত।
নৈষ্ক্রামিকী	অঙ্কের শেষে পাত্রগণের নিষ্ক্রমণ উপলক্ষ্যে এই সকল ধ্রুবা গান করা হত।
আক্ষেপিকী (দ্রুতা ও স্থিতা)	এই জাতীয় ধ্রুবা বিধিজ্ঞ বা অভিজ্ঞ আচার্যগণ নাটকের চিরাচরিত ক্রম যখন উল্লঙ্ঘিত হত তখন প্রয়োগ করতেন। এটি দ্রুত এবং স্থিত দুই লয়েই গান করা হত। দ্রুতা ধ্রুবা প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত তদীয় টীকায় 'উদাত্তরাঘব' নাটক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন এবং স্থিতার উদাহরণ স্বরূপ 'বেণীসংহার' নাটক থেকে একটি শ্লোক প্রদান করেছেন। কিন্তু এটি কাব্যের দিক থেকে বিচার করে করা হয়েছে। ক্রমবিপর্যয় কিভাবে ঘটে সেইটা দেখানোই আচার্যের উদ্দেশ্য ছিল। ধ্রুবা বস্তুটি নেপথ্যেই সম্পাদিত হত।

প্রাসাদিকী	প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে নাট্যস্থলে সহসা রসান্তর ঘটে থাকে এবং রসের এই পরিবর্তন রঙ্গস্থলকে প্রসন্ন করে। এই রকম স্থলে রঞ্জন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাসাদিকী ধ্রুবা অনুষ্ঠিত হত।
আন্তরা	বিষণ্ণ, বিস্মৃত, ক্রুদ্ধ, মত্ত, সঙ্গকারী, গুরুভারে অবসন্ন, মূর্ছিত, ভ্রান্ত, বস্ত্রাভরণ সংযমন, দোষপ্রচ্ছাদন—এইসব ক্ষেত্রে আন্তরা ধ্রুবা গাওয়া হত। অভিনব গুপ্ত তদীয় টীকায় বলেছেন যে অন্তরে বা ছিদ্রে গান করা হত বলেই একে আন্তরা ধ্রুবা বলা হত। তিনি আরো বলেছেন যে কেবলমাত্র ছিদ্রাচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে এই ধ্রুবা পদসহযোগে গীত হত না, শুষ্ক অক্ষর সহযোগে গীত হত এবং এইসব গীত 'লতিকা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

এ ছাড়া ভরত আরো কয়েকটি ধ্রুবার কথা বলেছেন যেগুলি বিভিন্ন পরিবেশে গাওয়া হত। এইগুলিরও উল্লেখ করা হল।

অপকৃষ্ট ধ্রুবা	বদ্ধ, নিরুদ্ধ, পতিত, ব্যথিত, মূর্ছিত, মৃত প্রভৃতি করুণ ব্যাপারে প্রযুক্ত হত।
স্থিতা ধ্রুবা	ঔৎসুক্য, অবহিত্থ, চিন্তিত, পরিদেবিত, শ্রম, দৈন্য, বিষাদ—এইসব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত।
দ্রুতা ধ্রুবা	উপরোক্ত করুণ ভাবাদিতে আবেগযুক্ত দ্রুত ধ্রুবাও অনুষ্ঠিত হত।

চোখের সম্মুখে মৃত্যু বা আহত হবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে কেবলমাত্র স্থিতা ধ্রুবা গাওয়া হত। উৎপাত ক্রোধ, অদ্ভুত ব্যাপার, বিষাদ, প্রমাদ, রোষ, সত্ত্বভাব, রৌদ্র, বীর, ভয় এইসব ক্ষেত্রে দ্রুতাধ্রুবা গাওয়া হত। শরীরব্যসন, রোষ, সন্ধানকর্ম (শরসন্ধান), অনুবন্ধ বা ত্বরা—এইসব ব্যাপারে আন্তরাধ্রুবাও গাওয়া হত।

ধ্রুবার অপ্রয়োগ

যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধ্রুবা নিষিদ্ধ ভরত তাও নির্দেশ করেছেন। গান বা রোদন করতে করতে প্রবেশকালে, সম্ভ্রমাত্মক পরিস্থিতিতে, ঘোষণায়, উৎপাতে, বিস্ময়ে ধ্রুবার প্রয়োগ হত না।

ধ্রুবার প্রয়োগক্ষেত্রে বিচার

ধ্রুবাসমূহের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে একই রসে একাধিক ধ্রুবা প্রযুক্ত হত। এই বিরোধ নিরসনের জন্য ভরত বলেছেন যে এই প্রয়োগ বিচারপূর্বক করা হত। অর্থবিধি, দেশ, কাল, ঋতু, প্রকৃতি, ভাবলিঙ্গ— এই সব সম্যক্ জেনে তবেই ধ্রুবা যোজনা করা হত এবং আচার্যগণ বিশেষ অভিজ্ঞ হলে তবেই যথাযথভাবে ধ্রুবা নির্ণয়ে সমর্থ হতেন।

ষড়্‌ধ্রুবা

পাঁচটি মূল ধ্রুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ভরত আরো ছটি ধ্রুবার উল্লেখ করেছেন। এইগুলিও গান করা হত। এইগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

শীর্ষক	অভিনবগুপ্ত বলেছেন এটি উত্তমসমাশ্রিত। এই শিরস্থানীয় বা অগ্রবর্তী ধ্রুবা দেবতা বা রাজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
উদ্ধতা	ঔদ্ধত্যহেতু এই ধ্রুবার প্রয়োগ হত। এটিও দেবতা বা রাজার ক্ষেত্রে বীর এবং রৌদ্র বিষয়ে প্রযোজ্য।
অনুবন্ধ বা অনুবদ্ধ	যতি (সমপ্রভৃতি), লয় (দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতি), বাদ্যের গতি, পদ, বর্ণ (বৃত্তনিয়মানুসারে গুরু এবং লঘু), স্বর, অক্ষর (গেয় পদের অক্ষর বা চচ্চপুটাদি তালের অক্ষর)—এইগুলি যে ধ্রুবায় সম্বন্ধযুক্ত হয় তাই ছিল অনুবন্ধ বা অনুবদ্ধ ধ্রুবা। এটি প্রয়োগের ঔচিত্য অনুসারে কবি, নাট্যাচার্য, বর্ণকবি (যিনি বর্ণনায় অংশগ্রহণ করেন), গাতা এবং নট কর্তৃক সুসম্পন্ন হত। এই ধ্রুবা নাট্যের উপচার জানিত অর্থাৎ নানা কারণেই সাধারণভাবে প্রযুক্ত হত।
দ্রুতবিলম্বিতা	নাটকে যেটি ত্বরিত সঞ্চারা অর্থাৎ দ্রুতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত সেটি নাট্যধর্মের প্রয়োজনে বিলম্বিত হতে পারে। এইরূপ ধ্রুবাকে দ্রুতবিলম্বিত বলা হত। এটি মধ্যম শ্রেণীর প্রবেশ উপলক্ষ্যেও প্রযোজ্য ছিল।
অড্ডিতা	যে স্থানে শৃঙ্গাররস সম্বন্ধীয় ব্যাপার বিশেষভাবে স্ফুটিত সেই ক্ষেত্রে অড্ডিতা ধ্রুবা প্রযোজ্য ছিল। এটি দিব্যা, রাজকীয়া এবং বেশ্যা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হত।
অপকৃষ্টা	কেহ চিত্তবৃত্তির অবসাদজনিত করুণরসে আকৃষ্ট হলে এই ধ্রুবা আচরিত হত।

খঞ্জক এবং নংকুট (নকু´ট) নামক অপর দুই শ্রেণীর ধ্রুবা ললিতভাবাদি প্রকাশে, হাস্যরসে বা শৃঙ্গারে প্রযুক্ত হত। এটি নীচব্যক্তির ক্ষেত্রেই আচরিত হত।

ধ্রুবার উপমাগুণ

পুরুষ, স্ত্রী, উত্তম এবং অধম পাত্রপাত্রী—এই সকলকে বোঝাবার জন্য ধ্রুবায় বিশেষ বিশেষ তুলনীয় শব্দ ব্যবহৃত হত। এইগুলি নিম্নতালিকায় দেখান হল।

পাত্র	তুলনীয় শব্দ
দেবতা বা রাজা	চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, পবন।
দৈত্য, রাক্ষস	মেঘ, পর্বত, সাগর।
সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ	গ্রহ, নক্ষত্র, বৃষভ।
তপশ্চারী	সূর্য, অগ্নি, পবন।
ব্রাহ্মণ বা তপস্যায় নিযুক্ত অন্যব্যক্তি বা উক্ত শ্রেণীর নারী।	হব্যবাহ অর্থাৎ অগ্নি।
দিব্যবস্তু, দেবতা বা রাজা	বিদ্যুৎ, উল্কা, সূর্যরশ্মি।
যক্ষ, রাক্ষস, ভূত প্রভৃতি হিংস্র সত্ত্ব।	মহিষ, রুরু নামক হরিণ, সিংহ, মাংসাশী পশু।
উত্তম শ্রেণী	মত্তমাতঙ্গ, রাজহংস।
মধ্যম শ্রেণী	সারস, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ চক্রাহ্ব[৫] (?) কুমুদাকর।
অধম শ্রেণী	কোকিল, ভ্রমর, কাক, কুরর (করুণধ্বনিকারী হংসজাতীয় পক্ষী), পেচক, বক, পারাবত, কাদম্ব (হংস)।
নৃপস্ত্রী	শর্বরী, বসুধা, জ্যোৎস্না, নলিনী, করিণী, নদী।
মধ্যমা স্ত্রীলোক ও বেশ্যা	দীর্ঘিকা, কুররী, বল্লী, সারসী, শিখিনী, মৃগী।
অধমা স্ত্রীলোক	ভ্রমরী, কুক্কুটী, কাকী, কোকিলা, পেচকী।

ধ্রুবার কাল

গতি অর্থে প্রাবেশিকী এবং নৈষ্ক্রামিকী দুই প্রকার ধ্রুবাই প্রযোজ্য ছিল। প্রাবেশিকী পূর্বাহ্নে এবং নৈষ্ক্রামিকী রাত্রি এবং দিবা উভয় সময়েই প্রযুক্ত হত। পূর্বাহ্নকালে সৌম্যবস্তু অর্থাৎ শান্ত বিষয় এবং মধ্যাহ্নে দীপ্ত বা উদ্দীপনাযুক্ত বিষয় প্রয়োগ করা বিধেয় ছিল। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে অনেকের মতে সৌম্যবস্তু অর্থে বন্দি, মাগধি প্রভৃতি বোঝাত। অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় করুণাশ্রিত ধ্রুবা গাওয়া হত। চলনার্থে আক্ষেপিকী ধ্রুবা ব্যবহৃত হত; উদাহরণস্বরূপ অভিনবগুপ্ত অক্ষক্রীড়া বা জলক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন। এইগুলিতে আক্ষেপ বোঝায়।

ধ্রুবা রচনার নিয়ম

স্থাবরবস্তুকে স্থাবরের সঙ্গে, গতিযুক্ত বস্তুকে চলমান বস্তুর সঙ্গে, সুখদুঃখকৃতভাবের সঙ্গে অনুরূপ বস্তুর তুলনা করে ধ্রুবা রচনা করা হত। সাধারণত দ্রুতগমনে লঘুবর্ণ এবং বিলম্বিতে দীর্ঘবর্ণযুক্ত পদ গাওয়া

৫ সম্ভবত এটি চক্রাঙ্গ (একজাতীয় হংস) হবে। প্রকাশিত বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রে 'চক্রাহ্ব' এই শব্দই পাওয়া যায়।

হত। ভরত বিশেষভাবে বলেছেন যে গানের আশ্রয়ভুক্ত এমন কোনো পদ নেই যা ছন্দদ্বারা বদ্ধ নয়। সুতরাং গান অনুসারেই উপযুক্ত ছন্দটি যোজনা করতে হবে। শুধু তাই নয় এ ছন্দটি এমন হবে যাতে সংশ্লিষ্ট বাদ্যের সঙ্গে সমতা রক্ষিত হয়।

ধ্রুবার ভাষা

ধ্রুবায় সাধারণত শৌরসেনী ভাষা প্রযুক্ত হত। অধমব্যক্তির ক্ষেত্রে আচরিত নংকুট বা নর্কুট ধ্রুবায় মাগধী ব্যবহৃত হত। দিব্যব্যাপারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত গান নির্ধারিত ছিল। মনুষ্যাদির ব্যাপারে গানের ভাষা ছিল অর্ধসংস্কৃত। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে সংস্কৃতের মধ্যভাগে দেশীভাষা যুক্ত হলে তাকে অর্ধসংস্কৃত বলে গণ্য করা হত। উদাহরণস্বরূপ তিনি দক্ষিণাপথে 'মণিপ্রবাল' এবং কাশ্মীরে 'শাটকুল'— এই দুটির উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে অনেকের মতে শৌরসেনী ভিন্ন অপর প্রাকৃতই হচ্ছে অর্ধসংস্কৃত। তবে অভিনবগুপ্ত অনুমান করেন যে ভরতের নিজস্ব মত ছিল এই যে, যার যে ভাষা নাটকে পাঠের জন্য নির্দিষ্ট থাকত সেই ভাষাতেই অর্ধসংস্কৃত গান রচনা করা বিধেয়।

পূর্বরঙ্গে ধ্রুবার অনুষ্ঠান

নাটকের পূর্বরঙ্গে এবং প্রস্তাবনায় কয়েকটি প্রধান গানের বিশেষ প্রয়োগ ছিল। উক্ত বিধি কিভাবে আচরিত হত সেটি না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পূর্বরঙ্গে বর্ধমানক এবং আসারিত গীত আচরিত হত এবং এইগুলির সঙ্গে বহুপ্রকার বীণাবাদ্য এবং নৃত্যও নির্ধারিত ছিল। যবনিকার অন্তরালে যে অনুষ্ঠানগুলি হত সেগুলি প্রধানত বিভিন্ন বীণাবাদ্য। যবনিকা বিঘাটনপূর্বক মদ্রকজাতীয় পূর্বোক্ত সপ্তগীতির একটি গীতি গাওয়া হত এবং তার সঙ্গে নৃত্য ও পাঠ্যবস্তুও থাকত। এর পরে বর্ধমান নামক একটি গীতিও প্রযুক্ত হত। এই গীতের সঙ্গে তাণ্ডব নামক নৃত্যবিধি যুক্ত ছিল। বর্ধমানক বা আসারিতগীতগুলি প্রধানত মার্গতালাশ্রিত এবং আসরে সম্পূর্ণভাবে গাইলে তাদের দীর্ঘ সময় লাগবার কথা। এই তালগুলি ছিল চচ্চপুট, চাচপুট এবং পঞ্চপাণি। অঙ্গাদির বর্ধমানত্ব হেতুই বর্ধমানক নাম দেওয়া হয়েছে। বর্ধমানগীতির চারটি কাণ্ডিকা বা কাণ্ড ছিল বলে এই প্রকার গীতের নাম ছিল কাণ্ডিকা বর্ধমান। এই চারটি কাণ্ডের নাম—বিশালা, সঙ্গতা, সুনন্দা এবং সুমুখী। কলাসংখ্যা অনুসারে এই কাণ্ডিকাগুলির প্রকারভেদ ছিল। এই গীতিগুলিতে উপোহন আচরিত হত। যেমন বিশালা নামক বর্ধমান গীতে পাঁচটি কলা বা মাত্রার পর 'ঝণ্টুং ঝণ্টুং দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি কুচঝলবা'—এইরকম উচ্চারণ করে উপোহন আচরণ করা হত। এর প্রথমে থাকত 'ঝণ্টুং ঝণ্টুং' আর শেষ হত 'বা' শব্দে। এই উপোহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। নারদ উপোহন-সংযুক্ত বাদ্যবিধি রচনা করে যবনিকার অন্তরালে বহির্গীতি বা নির্গীতি নামক নাট্যগীতি স্থাপন করেন। বর্ধমান গীতেও বস্তু এবং মুখ অঙ্গ দুটি থাকত। কাণ্ডিকা বর্ধমানের দশটি পরিবর্তন স্বীকৃত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত আসারিতাভাস, মধ্যমাসারিতাভাস, কনিষ্ঠাসারিতাভাস এবং লয়ান্তরাভাস—এই চারপ্রকার বর্ধমানগীতিও প্রচলিত ছিল।

আসারিত গীতি চারপ্রকার—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ এবং লয়ান্তর। এই গীতেও উক্ত মার্গতালাদি

প্রযুক্ত হত এবং এতে উপোহন, বস্তু, মুখ এবং প্রতিমুখ—এই অঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত হত। এই গীতও সুদীর্ঘ এবং তালের নানাপ্রকার শাসনে ভারাক্রান্ত ছিল। বীণাতেও বিভিন্ন আসারিত বাজান হত।

এই গানগুলি অনুষ্ঠিত হবার পর নাটকের উত্থাপন, পরিবর্ত (লোকপাল বা বিভিন্ন অধিষ্ঠানকারী দেবতার চতুর্দিকে পরিভ্রমণপূর্বক বন্দনা), নান্দী, শুষ্কাপকৃষ্টা ধ্রুবা প্রভৃতি আচরণ করা হত। নান্দী-পাঠকগণ দেবদ্বিজনৃপদিগের আশীর্বচন উচ্চারণপূর্বক উত্থাপন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতেন। এই প্রসঙ্গে উত্থাপনী ধ্রুবার অনুষ্ঠান হত। এই ধ্রুবার চারটি পাদ ছিল। প্রতিপাদে প্রথম দুটি অক্ষর, চতুর্থ, অষ্টম এবং একাদশ অক্ষর গুরু হত। এই ছন্দটি একাদশাক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ ত্রিষ্টুপজাতীয়। পরিবর্ত ধ্রুবা বিশ্লোকজাতীয় ছন্দে রচিত হত। এই ছন্দের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এটি দ্বাদশাক্ষরা জগতীবৃত্তের অন্তর্গত। জর্জর বা বিঘ্ন-বিনাশক ধ্বজা স্থাপনের কালে পরিবর্ত ধ্রুবা চারবার অনুষ্ঠিত হত। এর পর অপকৃষ্টা বা চতুরশ্রাধ্রুবা গীত হত। এই দুটি ধ্রুবাই গুরুপ্রায় বর্ণে রচিত হত। সূত্রধার যে নান্দী পাঠ করতেন তা মধ্যমস্বরকে আশ্রয় করে পঠিত হত। নান্দী পাঠের পর শুষ্কাপকৃষ্টা ধ্রুবার অনুষ্ঠান হত। এই ধ্রুবার পাদে অষ্টাদশাক্ষর যোজিত হত। এর মধ্যে প্রথম নটি গুরু, তারপরে ছটি লঘু এবং অন্তে তিনটি গুরুবর্ণ থাকত। 'ঝণ্ডে ঝণ্ডে দিগ্নে দিগ্নে' প্রভৃতি অর্থহীন শুষ্ক স্বরে রচিত হত বলে এর নাম শুষ্কাপকৃষ্ট।

জর্জর গ্রহণের সঙ্গে অড্ডিতাধ্রুবার অনুষ্ঠানও কর্তব্য ছিল। এটি মধ্য লয়ে চতুরশ্র বা চচ্চৎপুটতালে বিশেষ পাতঃকলাবিধি অনুসারে, অনুষ্ঠিত হত। এই আড্ডিতা ধ্রুবার পাদে আদ্য, শেষ, চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই কটি গুরুবর্ণ হত।

চতুরশ্রাধ্রুবা দ্রুত লয়ে নির্ধারিত কলাবিধিতে গাওয়া হত। এই ধ্রুবা যে ছন্দসহযোগে গীত হত সেটি একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুপবৃত্তের অন্তর্গত। এর প্রথম, চতুর্থ, শেষ, সপ্তম এবং দশম বর্ণ গুরু এবং অপর বর্ণগুলি লঘু হত।

পূর্বরঙ্গে বিদূষক প্রবেশের পূর্বে নৎকুটক ধ্রুবার অনুষ্ঠান হত; কারণ হাস্যরসের ক্ষেত্রে নৎকুট ধ্রুবার প্রয়োগ কর্তব্য ছিল।

পূর্বরঙ্গে সূত্রধার নিষ্ক্রমণের পরে স্থাপক এসে কবির নাম ঘোষণা করে প্রস্তাবনা সম্পন্ন করতেন। এই সময় আর একবার মধ্যলয়ে চতুরশ্র বা ত্র্যস্রধ্রুবা অনুষ্ঠিত হত।

এই বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে পূর্বরঙ্গে গীত বাদ্য এবং নৃত্যের কিছু বিশেষ ব্যবস্থাই ছিল। এই ব্যবস্থা যাতে প্রলম্বিত না হয় সে বিষয়ে ভরত বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সংগীতের প্রসঙ্গ যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে প্রযোক্তা অর্থাৎ শিল্পীগণই যে পরিশ্রান্ত হন তাই নয় প্রেক্ষকগণও ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং পরিশ্রান্ত বা বিরক্ত ব্যক্তির কাছে রস এবং ভাব পরিষ্কার ভাবে প্রকটিত হয় না। এক্ষেত্রে স্বভাবতই বাকি প্রয়োগগুলি রাগজনক হয় না। এটি শুধু পূর্বরঙ্গের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র নাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ধর্ম ও প্রেম

হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় 'ধর্ম' আর 'প্রেম' পরস্পরের প্রতিশব্দ বলে মনে হয়। সরলতাই এই সাধনার অবলম্বন। সন্ধ্যাসংগীতের 'অনুগ্রহ' কবিতায় 'মহাশক্তি জগতের স্বামী'কে জগৎ সম্বন্ধে কবি প্রশ্ন করেন—'এ কি হে তোমার অনুগ্রহ' ?

কিন্তু অনুগ্রহ নয়, প্রেমেরই সাধক ছিলেন তিনি। তিনি ভালোবাসার জোরেই আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভীরুর অনুগ্রহবাদ বা কৃপাবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমল'এর প্রার্থনায় লেখেন—

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো সখা, তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই !

এই রকম নানা অনুভূতির লগ্ন তাঁর কাব্যপ্রবাহের পাঠক মাত্রেরই সুপরিচিত। তাঁর অজস্র প্রবন্ধেও এই সামীপ্যের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে।

নৈবেদ্য, চৈতালি, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্য ইত্যাদি কবিতা-সংগ্রহে বা গানে তিনি যেমন এইসব আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় রেখে গেছেন, তেমনি তাঁর অজস্র গদ্যরচনাতেও তাঁর ধর্মানুভূতি এবং ধর্মতত্ত্বচিন্তার অভিব্যক্তি সুপরিচিত। তাঁর বয়স যখন কুড়ির কাছাকাছি, সেই সময়ের কয়েকটি ছোটো ছোটো নিবন্ধে অতীতের গুরুত্ব, বিরোধের অন্বয়, সত্য নিরীক্ষায় মানুষের অসম্পূর্ণতাজনিত অসামর্থ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ দেখা দেয়। এগুলির নিদর্শন যথাক্রমে 'অনাবশ্যক' (প্রথম প্রকাশ ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০), 'তার্কিক' (ভারতী, আশ্বিন ১২৯০) এবং 'সত্যের অংশ'। তিনটিই 'সমালোচনা' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই একই সঙ্গে সে বইয়ের 'একটি পুরাতন কথা' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১) নিবন্ধটিও স্মরণীয়। তাতে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাসূত্রে 'অনন্ত নির্ঝর' এবং 'অনন্ত আকাশ'এর উল্লেখ ছিল। সেই ১২৯০ সালেই চৈত্র সংখ্যার ভারতীতে তাঁর 'ধর্ম' নামে একটি রচনা এবং শ্রাবণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'আত্মা' নামে আর-একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর ধর্মভাবনা-সম্পর্কিত আদিরচনা হিসেবে 'আলোচনা' বইয়ের এই দুটি প্রবন্ধই স্মরণীয়। 'ধর্ম' প্রবন্ধের সূচনাতেই প্রেমের যোগ্যতা সম্পর্কে এই তিনটি বাক্য ছিল—

> 'একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।'

পরার্থপরতাই যে মানবধর্ম এবং সম্প্রদায়বুদ্ধি যে তার বাধা, তাঁর এ প্রবন্ধের মূলে ছিল এই কথা। এই প্রেম বা পরার্থপরতার ফলে জগতের ঐক্যবোধে অধিকারী হওয়া মানুষের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব—

> 'জগতের সহিত এক হইবার উপায় জগতের অনুকূলতা করা, অর্থাৎ ধর্ম আশ্রয় করা। ধর্ম, জগতের প্রাণগত চেতনা, তিনি নহিলে তোমার অসাড়তা কে দূর করিবে ?'

পাপপুণ্যের কথাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধেই তিনি লেখেন—

'পাপীর ধর্মবুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে, কেবল পাপ থাকিবে না— যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পনপ্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতন্যের প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণ্যে পরিণত হইতে থাকিবে।'

১৩০৯ সালের 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটিতে তিনি আবার পাপপুণ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সংকীর্ণ স্বার্থপরতাই মানুষকে ধর্মহীন করে রাখে, এবং দীনাত্মার লক্ষণই হল স্বার্থপরতা— সে প্রবন্ধে এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

'আলোচনা'র 'আত্মা' নামে লেখাটিতেও এই পরার্থপরতার আদর্শই ছিল প্রধান বক্তব্য। এ সবই তাঁর তিরিশ বছর বয়সের আগেকার চিন্তা। তারপর ১৩০৬ সালের ৭ই মাঘ তাঁর 'ব্রহ্মোপনিষদ' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর 'ব্রহ্মমন্ত্র' রচনাটি পড়া হয়। ১৩০৮ সালে বেরোয় 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'। উত্তরোত্তর 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'সঞ্চয়', 'মানুষের ধর্ম' ইত্যাদি বিভিন্ন আয়তনের নিবন্ধগুলিতেই তাঁর ধর্ম-চিন্তার মূলকথাগুলি উচ্চারিত হয়। এ সবই তাঁর মধ্যবয়সের এবং আরো পরিণত কালের রচনা।

১৩১৫ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর ষোড়শভাগে 'ধর্ম' প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৩০৮ থেকে ১৩১৪ সালের মধ্যে বঙ্গদর্শনে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে তাঁর অন্যান্য বইয়ের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ একসূত্রে বিচার্য। ১৩৫৫ সালের সংস্করণে 'ধর্ম' বইখানিতে মোট চোদ্দটি প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশের তারিখ এবং মূলে কোন্ কোন্ পত্রিকার কোন্ কোন্ সংখ্যায় সেগুলি ছাপা হয়, তার উল্লেখ আছে। এই পরিচায়িকাতেই বলা হয় যে— 'প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতন-আশ্রমে পৌষ-উৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ প্রভৃতি উপলক্ষে অথবা আদিব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত হইয়াছিল।'

বোধ হয়, 'নৈবেদ্য' (১৩০৭) থেকেই গভীর ধর্মভাবুকতা রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান ধারাগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে। মাত্র চার মাসে— ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে এই কবিতাগুলি লেখা হয়। এই নৈবেদ্য কবিতাবলীর মধ্যেই তিনি নগর-সভ্যতার পরিবর্তে চেয়েছিলেন প্রাচীন তপোবনের আদর্শ। উপনিষদের প্রতি আগ্রহের লক্ষণ নৈবেদ্য বইখানিতেও সুপ্রচুর। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গভীর মননের নজীর আছে প্রথম জীবনের নানা গদ্য-নিবন্ধে। 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' এইরকম একটি রচনা। 'নৈবেদ্য' মূলতঃ সেই চিন্তাধারার সঙ্গেই জড়িত। তাঁর কবিমানসের ধর্মানুভূতির কথাপ্রসঙ্গে তাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে 'নৈবেদ্য'এর নাম। আর সেই সঙ্গে এ কথাও পুনর্বার স্বীকার করবার জোর পাওয়া যায় যে তাঁর ধর্মচিন্তা তাঁর প্রেম-বোধেরই নামান্তর।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত 'সঞ্চয়' (১৯১৬) বইখানির আটটি প্রবন্ধে তাঁর ধর্মানুভূতি এবং সৌন্দর্যবোধ— প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং রূপ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের কথাগুলি খুবই চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে। ১৩১৮ সালের (১৯১১) বৈশাখ থেকে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই প্রবন্ধগুলির নাম এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, প্রবাসীতে অথবা ভারতীতে এগুলির প্রথম প্রকাশকাল হল যথাক্রমে— 'রোগীর নববর্ষ'

(১৩১৯), 'রূপ ও অরূপ' (প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮), 'নামকরণ' (১৩১৮), 'ধর্মের নবযুগ' (ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮), 'ধর্মের অর্থ' (তত্ত্ববোধিনী, কার্তিক ১৩১৮), 'ধর্মশিক্ষা' (তত্ত্ববোধিনী, মাঘ ১৩১৮), 'ধর্মের অধিকার' (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮) এবং 'আমার জগৎ' (১৩২১)। অর্থাৎ খ্রীস্টাব্দের হিসেবে ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের অন্তর্বর্তী রচনা এগুলি। এইগুলির মধ্যে কেবল 'নামকরণ' প্রবন্ধটি ঈষৎ অন্য ধরণের, কিন্তু তাতেও পরমার্থ-প্রসঙ্গই প্রধান। ঐ সময়ের সমবিষয়ের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে স্মরণীয় 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা'— ১৩১৭-র মাঘ মাসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে তিনি যেটি পড়েন এবং যেটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় ১৩১৮-র বৈশাখে। তাছাড়া ১১ই মাঘ ১৩১৭ মাঘোৎসবে তাঁর ভাষণ ছিল 'আত্মবোধ' এবং 'কর্মযজ্ঞ'। 'কর্মযজ্ঞ' ছাপা হয় ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের ভারতীতে। সেই বছরেই পৌষ উৎসবে খ্রীস্টোৎসব হয় এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব স্মরণ। শান্তিনিকেতনে তাঁর ঐ সময়ের দুটি ভাষণের একটির নাম 'জাগরণ', অন্যটির 'সামঞ্জস্য'। প্রথমটি উৎসবের দিন সকালের এবং দ্বিতীয়টি সন্ধ্যার ঘটনা।

'শান্তিনিকেতন'এর 'সৃষ্টির ক্রিয়া' (রচনাকাল কার্তিক ১৩২১) লেখাটিতে ধর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত দেখা যায় যে— 'মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে।' আবার 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়' প্রার্থনাতেও মৃত্যুর খণ্ডতা থেকে অমৃতে পৌঁছোবার ইঙ্গিতই অব্যবহিত। ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড দুই-ই তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু বিশেষভাবে চেয়েছিলেন যথার্থ অনুভূতির উদ্‌বোধন। তাঁর জীবনের আদিপর্বের ধর্মচিন্তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এইটিই ছিল প্রধান যোগ। 'ডগমা' নয়, শাস্ত্র মতের অন্ধ আনুগত্য মাত্র নয়—আচারপ্রধান ধর্ম নয়— সরল প্রেমধর্মেরই উদ্‌বোধন চেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় ১৩১৭ অর্থাৎ ১৯১০এর সেপ্টেম্বর। সে এই প্রবন্ধগুলির পূর্ব-ঘটনা। 'গীতাঞ্জলি'র মোট ১৫৭টি রচনার মধ্যে ২০টি গান আগেই— 'শারদোৎসব' নাটকে (১৯০৮) এবং 'গান' (১৯০৯) নামে এক সংকলনে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৯০৯-১০এর মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র অন্যান্য রচনাগুলির জন্ম হয়। সেই গীতাঞ্জলিতেও অহংকার বর্জন এবং সরল সমর্পণের অনুভূতিই প্রধান। অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলি'ও রবীন্দ্র-কবিজীবনের আকস্মিক ফসল নয়।

'মানুষের ধর্ম' গীতাঞ্জলির অনেক পরের রচনা। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬, ১৮ এবং ২০ জানুয়ারি তারিখে প্রদত্ত ১৯৩০এর কমলা-বক্তৃতা এগুলি। 'মানুষের ধর্ম'র ১, ২, ৩ সংখ্যক আলোচনাই মূল বক্তৃতা। 'মানবসত্য' প্রবন্ধটি এই বক্তৃতারই অনুবৃত্তিরূপে শান্তিনিকেতনে কথিত হয়। ১৮ মাঘ ১৩৩৯ তারিখের ভূমিকায় তিনি এই আলোচনামালার উদ্দিষ্ট 'মানুষ'এর এই পরিচয় দিয়েছিলেন যে—'তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব'। তাঁর ধর্ম, সঞ্চয়, শান্তিনিকেতন, মানুষের ধর্ম ইত্যাদি রচনায় যেমন, গীতাঞ্জলিতেও তেমনি এই সর্বজনীন, সর্বকালীন মানুষই মুখ্য। 'গীতাঞ্জলি'র গানে প্রকৃতি-উপভোগ, আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ তো আছেই, তাছাড়া কোনো কোনো রচনায় স্বদেশের দীনাবনত মানুষের প্রতি গভীর অনুরাগের সুরটিও শোনা গেছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ মাঘ ১৩৫৫, পৃ. ২৩১) লিখেছেন যে, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এক নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণীর সঙ্গে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পত্রালাপ করেছেন। তারই

একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'ধর্মকে যে উপরে রেখেছে ধর্ম তাকে উপরে টেনেছে, কিন্তু হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে, সর্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্মই দরকার। এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত ক'রে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে—তাকে কোনো কারণেই, কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখতে হবে না। আমি নিজের জন্য এবং দেশের জন্য সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি— জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি, সে—প্রেমের মধ্যে মুক্তি।'

প্রেমের পথে এই মুক্তির সাধনার আদর্শই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার আদর্শ। সুফী সাধকদের সাধনার তত্ত্ব স্মরণ করে ঐ মহিলাকে তিনি তাই লেখেন—

'তুমি মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না। যদি সুফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কী আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কী অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন।'

এই চিঠির তারিখ ২০ আষাঢ় ১৩১৭।

সত্য, সুখ, ভূমা, আনন্দ, প্রেম ইত্যাদি শব্দগুলি তাঁর ধর্মচিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। 'সমগ্রতা' এবং 'ঐক্য' শব্দ দুটি তিনি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করেছেন। এ সব শব্দ তাঁর সারা জীবনের নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে বটে, তবে বিশেষ ভাবে এই সময়ের পূর্বোক্ত লেখাগুলিতে এবং সমশ্রেণীর নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে এই শব্দগুলি ভূরিপরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সব প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা, টীকা, মন্তব্য ইত্যাদির নিদর্শন হিসেবে এখানে কয়েকটি উদ্‌ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১৩১২ সালের 'উৎসব' প্রবন্ধে ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ এবং বিশ্বজগৎ যে ব্রহ্মের প্রেমেরই প্রকাশ, এই ধারণাটি ব্যক্ত হয়। তাঁর সেই কথাগুলি এই—

'মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানা স্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছি—তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা, মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।'

তাঁর ধর্ম-চিন্তায় এই প্রেমের দৌত্যই তিনি সর্বাধিক কামনা করেছেন। গীতাঞ্জলির ১৫৩ সংখ্যক গানে তাঁর এই অনুভূতিরই অনুরণন—

প্রেমের দূতকে পাঠাবে, নাথ, কবে।
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে আমার তবে।

১৫১ এবং ১৫২ সংখ্যক গানেও এই প্রেমেরই বাণী। আবার, গীতিমাল্যের ৫২ সংখ্যক গানে যেন পূর্বোক্ত 'উৎসব' প্রবন্ধেরই গীতিভাষ্য পাওয়া গেছে— 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।'

জ্ঞানময়, অনন্তসত্যই অমৃতরূপে প্রকাশিত। এই 'উৎসব' প্রবন্ধে এ কথাও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। তিনি লেখেন—

'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ, অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।'

আবার—

'সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ; সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ।· ·উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই; তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে; কারণ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-দ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ, তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুটসত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ— তাহার প্রেম উদ্‌বোধিত করে।'

প্রেমের এই অপরিসীম পরিব্যাপ্তিবোধ ব্যাখ্যা করবার প্রযত্ন এই প্রবন্ধটির বিশেষত্ব। এই পরিব্যাপ্তি-চিন্তাই তাঁর ভূমাবোধ। এর আগের কয়েকটি লেখায় এবং এর পরেও একাধিক রচনায় তিনি প্রেম ও ভূমাবোধের অবিচ্ছেদ্য অন্বয় ব্যাখ্যা করেছেন। এই 'উৎসব' প্রবন্ধেও অনুরূপ প্রয়াসই দেখা যায়। যেমন—

'যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই— কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।'

আবার—

'জগৎ আছে, এটুকু সত্য কিছুই নহে; কিন্তু জগৎ আনন্দ, এই সত্যই পূর্ণ। আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। · ·ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত— কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্য দানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে— সেই-যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম।'

এইভাবে প্রেম যে আমাদের ব্যবহারিক জগতের স্থূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাপার এবং সৌন্দর্যও যে তাই, এই বিশেষ ধারণাই প্রধান হয়ে উঠেছে। আমরা প্রতিদিন যে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জগতে বাস করি, তার অতিনির্ধারিত সীমাই আমাদের যন্ত্রণার কারণ। 'উৎসব' প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

'সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোকলিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না; সেখানে তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস যোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না।'

'জাগরণ' এবং 'সামঞ্জস্য' নামে তাঁর দুটি ভাষণের উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে। ১৩১০-এর 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে কতকটা সেইভাবেই মানব-জীবনে দিন ও রাত্রির তাৎপর্য প্রদর্শিত হয়—

'সূর্য এক সময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, রাত্রি নিঃশব্দ করে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষ নেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।'

দিন আমাদের চর্মচক্ষুর খণ্ডতায় আবদ্ধ রাখে, রাত্রি আমাদের নিখিল জগতের গভীর ঐক্যের দিকে সঞ্চালিত করে। যোগ্য উপমার সাহায্যে এ প্রবন্ধে এই কথাটিই তিনি বার বার বলেছেন —

'সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না, শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে ; সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক — স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি।'

উপমা, রূপক ইত্যাদি সাদৃশ্যচিন্তার বিচিত্র অলঙ্কার তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের মত এ সব প্রবন্ধেও বিদ্যমান। বাসনা এবং সুখতৃষ্ণার কথা-প্রসঙ্গে ১৩০৯-এর 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটির এক জায়গায় তিনি লেখেন —

'উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই ; বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায় সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিত শিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণ ভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুর বেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।'

'উৎসব', 'দিন ও রাত্রি', 'ধর্মের সরল আদর্শ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সবই তাঁর 'ধর্ম' বইখানির অন্তর্ভুক্ত। এইসব প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ সাদৃশ্যের অনুরণন তাঁর অনেকদিন পরের রচনাতেও অনুভব করা যায়। যেমন, ১৩১০-এর ঐ 'দিন ও রাত্রি' রূপকটির কথাই বলা যায়। দিন-রাত্রির এই একই রূপক ১৩১৭ সালের একটি গানের ভাষাতেও নিহিত। সেটি গীতাঞ্জলির ১৫৭ সংখ্যক গান —

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে—[রচনাকাল, ২৯ শ্রাবণ ১৩১৭]

দিন আর রাত্রি, আলো আর অন্ধকার, কেন্দ্র আর পরিধি, সীমা আর অসীম, অহং এবং অখিল — এইসব বিপরীত শব্দযুগ্মকের প্রয়োগ তাঁর এই লেখাগুলিতে সুপ্রচুর। 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে দিন আর রাত্রির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি লেখেন —

'নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দ পদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের

বাহ্য প্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে — তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।'

আবার, গতি আর স্থিতি, বিক্ষিপ্তি আর সংহৃতি, কর্ম এবং বিশ্রামের ভেদবোধ দিয়ে তিনি প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন —

'শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে, সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংহৃত করিয়া আনে, সে স্থির।··আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম তাহা প্রেম; প্রেমহীন যে বিরাম তাহা জড়ত্বমাত্র।'

'গীতবিতান'এর পূজা-পর্যায়ের সুপরিচিত একটি গানে তিনি লিখেছিলেন —

'দিন যদি হোলো অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দির-প্রাঙ্গণে
ঐ তব এল আহ্বান।'

ঠিক একই অনুভূতির গদ্যরূপ দেখা যায় 'দিন ও রাত্রি'র এই ছত্রগুলিতে —

'আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।'

গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতি অংশ সম্বন্ধে ১৩০৯ সালের রচনা 'ধর্মের সরল আদর্শ'তে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন, আর তার পরের বছরের এই 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধের নিখিল জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ অনুভব করবার আবেদন পুনর্ব্যক্ত হয়। তিনি লেখেন —

'যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্র রহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।'

বিশ্রাম, আবরণ, রাত্রি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেই তিনি প্রেমের অপরিসীম শক্তির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। যেমন —

'জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে, সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের

মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য— জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমুহূর্তে বলপ্রেরণ, প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।'

১৩১৮ সালের 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটিতে পুনরায় ঐ প্রেমের আদর্শ স্মরণ করে তিনি অনুরূপ ভাষাতেই লেখেন—

'সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্য দিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরামযুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্য দিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়।'

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ সম্বন্ধে ঐ একই প্রবন্ধে স্মরণ করা হয়—

'যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—

যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।'

অন্যান্য নানা প্রবন্ধে তিনি একথা জানিয়েছেন। তাঁর ধর্মানুভূতি এই স্থিতি আর গতি— এই অশেষ পরিব্যাপ্তিবোধ অবলম্বন ক'রে সজ্ঞান ও সাবলীল সমর্পণে পৌঁছেছে। এই সমর্পণতত্ত্বই তাঁর প্রধান বক্তব্য। উক্ত প্রবন্ধে সরল বাংলায় তিনি এই বিশেষ চিন্তার ব্যাখ্যা লেখেন—

'প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতা-লাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব।'

তাঁর এ সব রচনায় প্রকাশরীতির সারল্য অবশ্য অন্য বিষয়ের অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় খুব যে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত তা নয়। কিন্তু ধর্মচিন্তায় সরলতার দিকে তাঁর আন্তরিক সন্ধানের বিশেষত্ব এগুলিতে সুপরিস্ফুট। সুদূর ১২৯০ সালের ধর্ম-সম্পর্কিত যে লেখাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে তাঁর আরো পরিণত বয়সের সমবিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধের এই সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। ১৩০৯ সালের 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধ থেকেও এই সরলতাপ্রীতির উদাহরণ স্মরণ করা চলে। তিনি লেখেন—

'আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আবার—

'বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা; পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।'

ব্রহ্মকে পাওয়া নয়, আপনাকে দেওয়াই ধর্মের লক্ষ্য। 'শান্তিনিকেতন'এর 'আত্মসমর্পণ' প্রভৃতি

কয়েকটি রচনায় এ-কথা পুনরায় দেখা দেয়। 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'। সেই তন্ময়ত্বের অনুভূতি সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার এবং তা জটিল নয়, সরল।

ধর্মের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান এবং স্বভাবের এই মৌল সারল্য সত্ত্বেও পৃথিবীতে ধর্মঘটিত কলহের অন্ত নেই। মানবসমাজে ধর্মগত সম্প্রদায়ের সংখ্যা কেবলি বেড়ে যায়। তার কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ সেই কারণ বিশ্লেষণ করে লেখেন—

> 'ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মের নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের ন্যায় বিশেষ ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।'

'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটি এইরকম প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উক্তির গুণেই বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুখ আর ধর্মানুভূতির সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস তিনি আগেও করেছেন—এই লেখাটিতেও তার উদাহরণ আছে। যেমন—

> 'সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে —দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত জড়িত করিলে চলিবে না।'

আবার—

> 'বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি— কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতি-দ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না।'

উপনিষদে সত্যকে জ্ঞানকে অনন্তে লীন করে ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের যে বন্দনা উচ্চারিত হয়েছে, সেই আনন্দবাদই তাঁর মতে ধর্মের সরল আদর্শ। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'— এই বাণী উল্লেখ করে তিনি লেখেন— 'ঈশ্বর সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ।' আবার 'সোনা' এবং 'আলো'—এই দুটি সংকেতের সাহায্যে তিনি প্রেমের মুক্তিতত্ত্বের ইশারা দেন—

> 'ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধবিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।'

এই ব্যাখ্যাসূত্রেই অতঃপর গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করে তিনি লেখেন— 'ভারতবর্ষে এই

উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহাও অত্যন্ত সরল।' গায়ত্রীর 'ব্যাহৃতি' অংশের ব্যাখ্যাসূত্রে লেখা হয়—

'এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন।'

গায়ত্রীর এই 'ব্যাহৃতি'র অর্থ হল—

'চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়; মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে তিনি লিখে গেছেন—

'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।· ·এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব।· ·বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরের জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।'

'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটির এইসব উক্তির সঙ্গে তার এক বছর আগেকার প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতের একঃ' প্রবন্ধটির (ফাল্গুন ১৩০৮) একত্ব-উপলব্ধি স্মরণীয়। ব্রহ্মে সব বিভেদ বিচিত্রতা সমর্পণ করে, সম্পূর্ণভাবে তাঁরই পূর্ণতা এবং একত্ব আস্বাদনের ব্যাকুল আকাংক্ষা ধ্বনিত হয় সে-প্রবন্ধটিতে। পাপ, পুণ্য, কদর্যতা, সৌন্দর্য, বিশ্বের সব খণ্ডতা, মৃত্যু, বিচ্ছেদ সবই পরম একত্বে লীন করে দেখবার আকাংক্ষাই সে-প্রবন্ধের প্রধান কথা। আবার, 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন—

'বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়।· ·পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।'

তিনি তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে মানুষের এই অপূর্ণতার বেদনাই জানিয়ে গেছেন। এই প্রবন্ধটিতেও সেই একই কথা লেখা হয়—

'আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব— আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই।'

দুঃখ, পাপ, নিরানন্দ দূর করবার উপায় তাই ধর্মানুভূতি— অর্থাৎ ভূমাবোধের উদ্বোধন। তারই নামান্তর প্রেম। ভারতবর্ষের এই বিশেষ উপলব্ধিতে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্বই তাঁর ধর্মবিষয়ক রচনাগুলির উপজীব্য। এ উপলব্ধি যে ব্যক্তিগত কুহকমাত্র নয়, এ যে যথার্থ সত্যাশ্রিত জাতিগত এক সামর্থ্য, সে-বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। তাই তিনি লেখেন—

'আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তর-বাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা সেই অসত্য, সেই অন্ধকার, সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে, তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়; যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।'

ভারতীয় জীবনে সন্তোষের শুভাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর আরো কয়েকটি প্রবন্ধে যেমন, এতেও তেমনি তিনি লিখেছেন—

'সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন।'

কারণ, সুখের উপায় বাইরে নেই— তা আছে অন্তরে। এই বিষয়টির ব্যাখ্যাসূত্রে বলা হয়েছে—

'চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে— জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া— যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া।'

তাঁর ধর্মচিন্তায় 'সারল্য' শব্দটির এই বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবনীয়। 'ধর্মপ্রচার' (ফাল্গুন ১৩১০) প্রবন্ধে এই সরলতার ব্যাখ্যায় লেখা হয়— 'সংসারের যাহাকিছু মহোত্তম; যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই।' ঈশ্বরের 'করুণা' সম্বন্ধে অগোপন, সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস তাঁর মতে নিঃসন্দেহে 'সরল', কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে অভ্যস্ত কথার পুনরাবৃত্তির নাম সরলতা নয়। 'প্রেম' এবং 'অখণ্ডতা' যদি ধর্মের প্রতিশব্দ হয়, তাহলে তার বিপরীতার্থক শব্দ হবে 'ভাবাবেগ', 'মাদকতা', 'সম্মোহন', 'সম্প্রদায়বুদ্ধি' ইত্যাদি। 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে এই ধারণা প্রকাশ করে তিনি লেখেন— 'আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই।'

সামার্সেট্ মম্ ১৮৭৪ - ১৯৬৫

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যিক খ্যাতির উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি ছিলেন ইংরেজ লেখক উইলিয়ম সামার্সেট্ মম্। সাহিত্যক্ষেত্রের পিতামহ বা 'গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যান্ অভ্ লেটার্স্' বলতে যা বোঝায় তাই হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল শেষবয়সে। এক সময় জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে তিনি বার্নার্ড্শ-র প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরেছিলেন, যখন একসঙ্গে তাঁর চার চারটি নাটক লণ্ডনের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে চলেছিল। দীর্ঘায়ুর ব্যাপারেও তাঁর প্রতিযোগিতা দেখবার মত।

কিন্তু জনপ্রিয়তা বস্তুটা নিতান্ত সুখের নয়। তার অন্য একটা দিকও আছে। এক তো, জনপ্রিয় জীবনে ব্যক্তিগত অন্তরাল বলে কিছু থাকে না। তার উপর কারণে অকারণে নানাজনের ঈর্ষা এবং উপহাস তার প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর এ ছাড়া তার নিজস্ব মাদকতাও কম নয়, এবং শিল্পীর প্রতিভার পক্ষে সেটা বিঘ্ন হতে পারে। বিশেষতঃ, জনপ্রিয় হয়ে একানব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা বোধ হয় একটু ক্লান্তিকর। সে যেন নেপথ্যহীন রঙ্গভূমিতে অবিশ্রাম অভিনয়ের মত। মৃত্যুই তার পক্ষে একমাত্র শান্তি। হান্স্ আণ্ডার্সেন-এর লাল জুতোর গল্পের নায়িকার যেমন হয়েছিল।

এ কথা মম্ তাঁর সাহিত্যখ্যাতির মধ্যাহ্নেই বোধ হয় বুঝেছিলেন। কেননা, তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'কেক্স্ অ্যাণ্ড্ এল্' (১৯৩০)-এর অন্যতম বিষয়ই হচ্ছে এই 'গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যান্ অভ্ লেটার্স্' হবার বিড়ম্বনা। তার নায়ক এডোয়ার্ড্ ড্রিফীল্ড্ (লোকে বলে টমাস্ হার্ডিই এ চরিত্রের আদল) প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, ভগ্নস্বাস্থ্য, জরাজীর্ণ। কিন্তু তাঁর ভক্তদের তাঁকে নিয়ে মাতামাতির বিরাম নেই। তাঁরা বলাবলি করেন—

"'আহা ওর আশি বছরের জন্মদিনে ওকে ওর প্রতিকৃতি উপহার দিতে আমরা যখন গিয়েছিলাম তুমি থাকলে পারতে। সে সত্যিই বিরাট ব্যাপার হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, কাগজে পড়েছিলাম সে কথা।'

'শুধু লেখকরাই নয়, জানো, বেশ একটি বড়ো রকমের সমাগম হয়েছিল। বিজ্ঞান, রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, সব ক্ষেত্রের লোকই ছিল। সেদিন ট্রেন থেকে ব্ল্যাক্স্টেব্লে যে ধরণের সম্ভ্রান্ত একটি জনতা নেমেছিল, তার জুড়ি পেতে হলে বহুদূর যেতে হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী নিজে যখন বুড়োকে অর্ডার অভ্ মেরিট উপাধি দিলেন, সে সত্যিই দেখবার মত। বক্তৃতাটিও তাঁর চমৎকার হয়েছিল। তোমায় বলতে বাধা নেই অনেক চোখেই সেদিন জল দেখা দিয়েছিল।'

'ড্রিফীল্ড্ও কেঁদেছিল নাকি?'

'না, সে খুবই শান্ত ছিল। যেমন বরাবর, জানোই তো, একটু লাজুক, চুপচাপ, অতি ভদ্র। কৃতজ্ঞ তো বটেই, তবে একটু চাপা। মিসেস্ ড্রিফীল্ড্ চাইছিলেন না যে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ুক। তাই আমরা সবাই যখন খেতে গেলাম, ওকে পড়ার ঘরে রেখে, থালায় করে ওর খাবার পাঠিয়ে দেওয়া

হল। অন্যদের কফি খাবার অবসরে আমি একবার এলাম ওকে দেখতে। পাইপ মুখে দিয়ে বুড়ো নিজের ছবি দেখছিল। আমি ছবি সম্বন্ধে মতামত শুনতে চাইলাম। কিছু বলল না, একটু হাসল। জিজ্ঞেস করল বাঁধানো দাঁতগুলো এবার একটু খুলে রাখতে পারে কিনা। আমি বললাম, না, কারণ অতিথিরা এখনই বিদায় নিতে আসবেন। জানতে চাইলাম, তার কেমন লাগছে, এ একটা অপূর্ব মুহূর্ত মনে হচ্ছে কিনা। সে শুধু বলল, বেড়ে লাগছে, বেড়ে।'"

এর সঙ্গে তুলনীয় মমের নিজের নোটবইয়ের পাতা, ১৯৪৪এ, সত্তর বছরের সন্ধিক্ষণে লেখা। সেখানে তিনি বলছেন, "বুড়োমানুষকে সবাই কোনোমতে সহ্য করে, তাকে খুব সাবধানে চলতে হয়।··এক একদিন মনে হয় আমি যেন সবকিছুই অনেক অনেকবার ধরে করেছি, বড্ড বেশি লোকের সঙ্গে মিশেছি, বড্ড বেশি বই পড়েছি, বড্ড বেশি ছবি মূর্তি গীর্জা আর সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি দেখেছি, বড্ড বেশি গান শুনেছি।"

এখানেও ক্লান্তির সুর সুস্পষ্ট, এবং সে সুর নির্মোহ, পরিচ্ছন্ন। আর এই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে জীবনের প্রত্যন্তসীমায় দাঁড়িয়ে নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর মনে হয়েছে যে ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি জমাবার পাথেয় তাঁর খুবই স্বল্প, বড়জোর একটি উপন্যাস, দু তিনটি নাটক আর ডজন খানেক ছোটগল্প। "তবে একেবারে কিছু না-র চেয়ে ভালো। আর, যদি আমার হিসেবে ভুলই হয়ে থাকে, মৃত্যুর মাসখানেক পরেই যদি সবাই আমাকে ভুলেই যায়, আমি তো আর টের পাচ্ছি না!"

এ কথাগুলি বিনয়ের ভানমাত্র নয়। এই অকপট আত্মবিচার মমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এবং তাঁর লেখার দোষগুণ উভয়েরই উৎস। তিনি তাঁর ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ ছিলেন। মহত্তম শিল্পীদের সমকক্ষ বলে নিজেকে কখনোই মনে করেন নি, বরঞ্চ লোকরঞ্জক বলেই নিজেকে ঘোষণা করেছেন। এবং জনরুচিকে খুব বেশি প্রশ্রয় না দিয়েও তাঁর রচনা যে জনপ্রিয় হয়েছে তার পিছনে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ আছে। মমের পর্যবেক্ষণ-শক্তি অসাধারণ। মানুষ বা নিসর্গের আপাতরূপটুকু তিনি অত্যন্ত নিপুণ হাতে স্পষ্ট করে তুলতে পারতেন। এ ব্যাপারে তাঁর সংযমও লক্ষ্য করবার মত। মিতভাষিতা তাঁর লেখার প্রধান ধর্ম। একসময় নাকি তিনি চেষ্টা করেছিলেন একটিও বিশেষণ ব্যবহার না করে উপন্যাস লিখতে। সে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হলেও তাঁর নানা লেখাতেই কলমের স্বল্পতম দুয়েকটি আঁচড়ে অনেক সার্থক মূর্তি ফুটে উঠেছে।

এই পরিমিতিবোধ তাঁর ব্যক্তিত্বেরও গুণ ছিল। তাঁর নিজের লেখায় যেমন এর পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদের লেখাতেও এর সাক্ষ্য মেলে, যেমন আর্নল্ড্ বেনেটের দিনপঞ্জীর একটি পাতায় (জার্নালস, মার্চ ১৯০৫): "সামার্সেট্ মম্ চায়ের সময় এল। খুব শান্ত, প্রায় ঢিলেঢালা অলস চালচলন। দু কাপ চা বেশ প্রফুল্ল চিত্তে নিল। কিন্তু তার পর খুব স্পষ্টভাবেই না করল। ভাবে বেশ বোঝা যায় কিছুতেই তাকে আর তৃতীয় কাপে রাজি করানো যাবে না। বিস্কিটগুলি বেশ চটপট, প্রায় লোভীর মতই খেতে লাগল, তারপর হঠাৎ থেমে গেল। আমার একটি সিগারেট খেতে যা সময় লাগল তার চেয়েও কম সময়ে দুটি সিগারেট শেষ করল, জোরে জোরে টান দিয়ে, কিন্তু তৃতীয়টি তেমনি দৃঢ়ভাবেই ফিরিয়ে দিল। বেশ লাগল আমার ওকে।"

মমের লেখার ধর্ম আসলে তাঁর চরিত্রেরই ধর্ম। যার ফলে তাঁর লেখায় আমাদের আগ্রহ আসলে লেখকটি সম্পর্কেই আগ্রহ। তিনি নিজেই তাঁর লেখার অন্যতম, বিশিষ্টতম চরিত্র হয়ে বসে আছেন। যে শিল্পে লেখক তাঁর সৃষ্টির আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে ভালোবাসেন, মমের লেখা ঠিক সে জাতের নয়। নিজের সম্পর্কে ফলাও করে বলার ভঙ্গীটি অবশ্য তিনি অপছন্দ করতেন। কিন্তু এ-ও ঠিক যে তাঁর লেখার মধ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন, কোথাও রহস্যের কোনো আবরণ রাখেন নি। তাঁকে আমরা বড্ড বেশি জানি। তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়কেরা অনেকেই তাঁরই প্রতিরূপ। 'অভ্ হিউম্যান্ বণ্ডেজ্'এর নায়ক ফিলিপ কেরী বা ইংরেজ গুপ্তচর 'অ্যাশেন্ডেন্'এর ছদ্মবেশের আড়ালে তাদের স্রষ্টাকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। 'কেক্স্ অ্যাণ্ড্ এল্' বা 'দি রেজর্স্ এজ্'এ নিজেকে তো তিনি প্রকাশ্যেই কুশীলবের অন্তর্গত করেছেন।

এভাবে নিজেকেই বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাখানা করে দেখতে পারা ক্ষমতার প্রমাণ। কিন্তু মহত্তম শিল্পে আমরা আরও কিছু চাই। জগৎকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে না এসে নিজেকে জগতের মর্মে ছড়িয়ে দিতে পারাটাই শিল্পীর পক্ষে বড় কথা। এবং মমের লেখায় এই গুণের অভাব আমরা বোধ করি। নানা দেশে তিনি ঘুরেছেন, নানা জনের সঙ্গে তিনি মিশেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টিতে বহির্বিশ্বের সেই মানসিক বিস্তৃতি নেই। তিনিই তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের কেন্দ্র।

বোধ হয় মনে মনে এ কথা জানতেন বলেই মম্ বরাবর চেষ্টা করেছেন বাইরের দিক থেকে যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। তাঁর সময়কার অধিকাংশ সাহিত্যিক-ফ্যাশনের পুরোভাগে তাঁকে দেখা গিয়েছে। যখন ফরাসী কায়দায় 'বাস্তবধর্মী' উপন্যাস লেখার রেওয়াজ ছিল তখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লিজা অভ্ ল্যাম্বেথ' জনপ্রিয় হয়, যখন জনসাধারণ ইম্‌প্রেশনিস্ট ফরাসী শিল্পীদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠতে থাকে তখন তিনি 'দি মুন্ অ্যাণ্ড্ সিক্সপেন্স' উপন্যাস রচনা করেন, প্রথম মহাযুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন 'অ্যাশেন্ডেন্'এ, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশেষে য়ুরোপ যখন প্রাচ্য সভ্যতার থেকে আশ্বাস সন্ধান করে, তখন আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'দি রেজর্স্ এজ'। উপনিবেশনীতির যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত, প্রাচ্যদেশে ঘুরে ঘুরে তখন তিনি শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাদের গল্প স্বদেশে শুনিয়েছেন। মনে হতে পারে, এ সবের পিছনে সৃষ্টির অদম্য তাগিদ যতটুকু আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে ফ্যাশন সম্পর্কে সজাগতা। শৌখীন সাহিত্যের হাওয়া কোনদিকে বইছে সেটা আগে থাকতে বুঝে সেই অনুযায়ী নিজের শক্তিকে তিনি যেন কাজে খাটিয়েছেন পাকা ব্যবসায়ীদের মত।

এর ফলে, যুগোপযোগী থাকার এত চেষ্টা এবং এত বৈচিত্র্যবিলাস সত্ত্বেও, তাঁর মন মানবচরিত্রের আসল বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যকে পরিহার করে চলেছে। এ কথা আশ্চর্য নয় যখন আমরা তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে জানি: "অচেনা মানুষ দেখলে আমি একটু সঙ্কুচিত বোধ করি, ফলে তাদের অন্তরঙ্গ হওয়া আমার পক্ষে কঠিন।"[১] সেইজন্যেই অধিকাংশ গল্প উপন্যাসে তাঁর যে জীবনবোধের পরিচয় আমরা পাই, তা বিশেষ সূক্ষ্ম নয়, জটিল নয়, অথচ বক্র; একধরণের সহজ কটাক্ষ, যা তার অভিনব পরিপ্রেক্ষিত

১ দি সামিং আপ্, পৃ. ৪৬

সত্ত্বেও প্রায় যান্ত্রিক। মানবচরিত্রের আপাত অসঙ্গতিই তার প্রধান উপজীব্য। 'কেক্‌স্ অ্যাণ্ড্ এল্'এর মত দু-একটি রচনায় অবশ্য এই অসঙ্গতিবোধ বলিষ্ঠ এবং ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা ছাড়া তাঁর অধিকাংশ কাহিনীতেই শেষ অবধি যা পাওয়া যায়, ঔপন্যাসিক গ্রেহাম্ গ্রীনের ভাষায় বলতে হলে, তা হচ্ছে : "চীনে চরিত্রহানি, মালয়ে মৃত্যু, আর হাওয়াই দ্বীপে আত্মহত্যা।"

প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখায় যে মনের পরিচয়টি আমরা পাই, তার গঠন ঠিক আধুনিক নয়। সে মন আঠারো শতকের কাছাকাছি। মনে হয় যেন দুশো বছর আগেকার ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে জন্মালে মম্ অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারতেন, সেকালের জীবনদর্শনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারতেন এবং আধুনিক হবার প্রযত্ন তাঁর কল্পনাকে ক্লিষ্ট করত না। ফীল্ডিং বা শেরিডান্ তাঁর মনের মতন বন্ধু হতেন, সুইফট্ বা লারশ্‌ফুকো'কে হয়তো গুরু বলে মানতেন। রেস্টোরেশন নাট্যকারদের আদর্শও তিনি ভালোবেসেছিলেন। আসলে তাঁর মনের যোগ ঐসব লেখকদের সঙ্গেই এবং আনাতোল ফ্রাঁস্-এর মত তাঁর মার্জিত কটাক্ষও ঐ যুগেরই উত্তরাধিকার। বস্তুতঃ তাঁর গদ্যের যে গুণ, তা-ও ঐ যুগেরই গুণ। আত্মজীবনীর এক জায়গায় তো তিনি সোজাসুজিই বলেছেন : "যদি আপনার লেখা স্পষ্ট, সরল, সুশ্রাব্য এবং সজীব হয় তবে তা নিখুঁত হবে : তবে তা ভল্‌তেয়রের মতন হবে।"[২]

এটি একটি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, কিন্তু আধুনিক চিন্তার সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য আছে। বোধ হয় একটা বড় তফাত এই যে, আধুনিক মন কোনো ধ্রুব সত্যের চেয়ে ইতিহাসের তাৎপর্যে বেশি বিশ্বাসী। যুগধর্মের প্রভাবে সমাজ এবং সভ্যতার রূপ যে থেকে থেকে বদলায়, এবং ক্রমে জটিল হয়ে ওঠে, এটা এ কালের পক্ষে একটা মস্ত বড় কথা। এটা আপেক্ষিকতার যুগ। পরিবর্তনের নীতিকে সে গ্রাহ্য করে। কিন্তু যুক্তিবাদী আঠারো শতকের চোখে সত্য ছিল অপরিবর্তনীয়। সুবুদ্ধি এবং সুযুক্তির যে একটি অটল আদর্শকে তারা খাড়া করে তুলেছিল তার থেকে বিচ্যুতি সম্ভব ছিল, কিন্তু নূতনতর সত্য সৃষ্টি সম্ভব ছিল না।

এই অনাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মমের লেখা অনেকখানি চিহ্নিত। তাঁর শেষদিকের উপন্যাস 'দেন্ অ্যাণ্ড্ নাউ'তে তিনি মাকিয়াভেলি-র যুগকে চিত্রিত করেছেন। সে উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে পুরাতন ফরাসী আপ্তবাক্যটি দিয়ে : 'যতই পরিবর্তন ততই সেই একই জিনিস'। কিন্তু আধুনিক যুগ এ উক্তিকে সহজে মেনে নেবে না। সত্যের অনুসন্ধানে তার যত উৎসাহ, ধ্রুব সত্যে তার আস্থা সে তুলনায় কম। তাই মমের এ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার সহানুভূতি খুঁজে পাওয়া ভার। এবং মম্ নিজেও, তাঁর চরিত্রের অজস্র উদারতা সত্ত্বেও, এ যুগের অনেক কিছুর সঙ্গেই প্রাণের যোগ খুঁজে পান নি। হেন্‌রি জেম্‌স্ বা ডি. এচ্. লরেন্সের প্রতিভার প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি, 'অ্যাংরি ইয়ং' লেখকদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে এবং আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল। এগুলি তাঁর দুর্বলতার কেন্দ্র। তবে এ সব সত্ত্বেও মানতে হয় যে তিনি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সেই ব্যক্তিত্বই তাঁর সৃষ্টিকে এতদিন জীবনীশক্তি দিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিটি নশ্বর, তাঁর লেখার স্থায়িত্ব সম্পর্কেও তাই সংশয়ের অবকাশ আছে। আয়ু ক্ষণিকের, শিল্প সুচির। এমন শিল্প তিনি সৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন কি, যা তাঁর আয়ুকে অতিক্রম করে বেশিদূর যেতে পারবে?

২ দি সামিং আপ, পৃ. ৪২

ভারতবর্ষীয় সভা নবজাগরণের মুখে ১৮৭২-৭৬

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে নবাগত বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে অভিনন্দনপত্র দান প্রসঙ্গে বলেন যে, স্থানীয় সরকারের একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে অবিরাম নূতন নূতন আইন প্রণয়ন এবং প্রজাকুলের করভার বৃদ্ধি। তাহাদের আশা নূতন কর্ণধার রূপে বড়লাটের শাসনকালে দেশ এইরূপ আতিশয্য হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বস্তুতঃ সিপাহী যুদ্ধের পর প্রায় পনর বৎসর ধরিয়া এ দেশে স্থানীয় ও নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রে এত বিচিত্র ধরণের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং নানাভাবে এরূপ করবৃদ্ধি ঘটিয়াছে যে প্রজাকুল তাহাতে শুধু ভীতসন্ত্রস্ত নয়, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আত্মসচেতনতা যতই বাড়িতে থাকে ততই এইরূপ আইন-কানুন দ্বারা তাহা আগলাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলে। তাই জাতির প্রতিভূরূপে সভা বড়লাটকে এই দুইটি বিষয়ে সবিশেষ অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপ ও আন্দোলনাদির পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। ঐ সময়ে তাঁহারা দৃঢ়তররূপে এই দুইটি ব্যাপারে তাঁহাদের মতামত এ দেশে ও বিলাতে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্ত করিতে থাকেন। এই দুইটি বিষয়ের অনুসন্ধানকল্পে একটি সর্বাত্মক রয়াল কমিশন গঠনের প্রস্তাব কিরূপে বানচাল হইয়া যায় আমরা তাহা জানি। এতাদৃশ একটি সর্বাত্মক কমিশনের প্রস্তাব কংগ্রেসও প্রতিষ্ঠাবধি কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৮৭২ সনে আগেকার ফাইনান্স কমিটি পুনর্গঠিত করেন। ভারতবর্ষের অর্থ-ব্যবস্থাদির অনুসন্ধানই এই কমিটির কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত মাঝে মাঝে যাচ্ঞা করিতেন। ভারতবাসীরা কিন্তু ইহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় সভা প্রস্তাব করেন যে, এই কমিটির অন্ততঃ একজন সদস্যকেও ভারতবাসীদের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত এ দেশে পাঠানো হোক। কিন্তু তাঁহাদের এ প্রস্তাব কর্তৃমহলে গ্রাহ্য হয় নাই। তাঁহারা অগত্যা ১৮৭৩ সনে জেমস্ হাটন নামক একজন অভিজ্ঞ ইংরেজকে কমিটির কার্যাকার্য তদারক করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই কমিটি পরে সিলেক্ট কমিটি নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই উহা ভাঙিয়া দেওয়া হইল (১৮৭৪)। পরে অবশ্য একটি পার্লামেণ্টারি কমিটির উপর ইহার ভার পড়ে। এবং হেনরি ফসেট সভা-কর্তৃক ইহার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত হন। এ কমিটি নিয়োগে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই।

প্রতি বৎসর ভারতীয় বাজেট পার্লামেণ্টে পেশ হইত ইহার সেশন বা অধিবেশন শেষ হইবার প্রাক্কালে। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার প্রতিকারকল্পে ১৮৭২, ৩০শে সেপ্টেম্বর এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, সেশন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই পার্লামেণ্টে ভারতীয় বাজেট পেশ করা হোক। সভার এই প্রস্তাবে আন্তরিক সমর্থন জানান—বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের রাষ্ট্রীয় সভাসমূহ। এদিকে ভারত সরকারও যাহাতে পার্লামেণ্টে ভারতীয় বাজেট ভালোরূপে আলোচিত

হইতে পারে সে জন্য আর্থিক বৎসর এক মাস আগাইয়া দেন। হেনরি ফসেট উক্ত প্রস্তাব সম্বলিত সভার আবেদনপত্র পার্লামেণ্টে যথারীতি পেশ করিলেন। কিন্তু এরূপ সমীচীন প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত গৃহীত হইল না। পার্লামেণ্ট এই সময় ভারতীয় বাস্তুবিভাগের জন্য বড়লাটের পরিষদে একজন অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিল কর্তৃপক্ষ উত্থাপন করেন। ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিবাদে এই মর্মে লেখেন যে, এই বিভাগে অত্যধিক অনাবশ্যক ব্যয় হেতু বাজেটে ঘাটতি হইয়া থাকে তদুপরি একজন অতিরিক্ত সদস্যের বেতনবাবদ ব্যয় হইলে এই ঘাটতি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই তাঁহাদের মতে এরূপ সদস্যনিয়োগ অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকরও বটে। সভার নির্দেশে হেনরি ফসেট এই বিল কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব আনেন, যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। ফসেটের প্রস্তাব পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিলেন না বটে কিন্তু পরোক্ষে তাঁহারই জয় হইল। এই আইনে নূতন সদস্যের নিয়োগ ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন রাখা হয়।

ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৭২ সন হইতে এই প্রস্তাব করিতে থাকেন যে, পার্লামেণ্টে ভারতীয় বাজেট পেশ হইবার পূর্বে আলোচনার সুবিধার্থে ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা হোক। তাঁহারা ঐ সময়ে আরও বলেন, পার্লামেণ্টে ভারত সংক্রান্ত যেসব বিল উপস্থাপিত হয় তাহা যথারীতি লণ্ডন গেজেটে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে আলোচনার সুযোগদানের নিমিত্ত ইণ্ডিয়া গেজেটে উহা প্রকাশিত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষীয় সভা এইসব বিষয় সম্বলিত একখানি আবেদন-পত্র হেনরি ফসেট মারফত পার্লামেণ্টে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সঙ্গত বিষয়টিতেও তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না। পরন্তু অতঃপর পার্লামেণ্টে বিল উপস্থিত না করিয়াই বিলাতি কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক উপায়ে তাঁহাদের মতলব হাসিল করিতে উদ্যত হইলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতীয় সিবিল সার্বিস সম্পর্কিত তাহাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উল্লেখ করা যায়। ইতিপূর্বে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া একুশ করা হইয়াছিল। তখনই ইহা লইয়া এ দেশে ও বিলাতে তীব্র বাদানুবাদ হয়। কর্তৃপক্ষের প্রতিকূল মনোভাব এই দশকের গোড়া হইতেই বারবার প্রকটিত হইতে লাগিল। উক্ত পরীক্ষার্থীরূপে শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষম বিপাকে পড়েন। ইহা কোনো রকমে উৎরাইয়া উঠা গেল বটে কিন্তু পরে এ দেশে কর্মরত সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথকে সামান্যমাত্র বিচারের ত্রুটি হেতু ম্যাজিস্ট্রেট পদ হইতে অপসারিত করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিয়াও তিনি কোনো ফল পান নাই। এইবার এতাদৃশ প্রতিকূল মনোভাব প্রকট হইয়া দেখা দিল। ভারতসচিব সলস্‌বিউরি কলমের খোঁচায় সিবিলিয়ানদের বয়স একুশ হইতে কমাইয়া একেবারে উনিশ করিয়া দিলেন (১৮৭৬)। ভারতবর্ষে তখন নব্যশিক্ষার প্রভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হইয়াছে। তাহারা এই অপকর্মটিকে আদৌ বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। এই বিষয়ক আন্দোলন পরবর্তীকালে নবজাতীয়তার উন্মেষে কতখানি রসদ যোগাইয়াছে, ইতিহাস-পাঠক মাত্রই তাহা জানেন। ভারতবর্ষীয় সভা এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বতঃই জোরালো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। নেতৃবৃন্দ ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর এই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করেন। পরবর্তী পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনেও (১৮৭৭, ১২ই মে) এ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়। তাঁহারা সলস্‌বিউরির হঠকারিতার তীব্র নিন্দা করিয়া ইহার প্রতিকার দাবী করেন।

এই সময়ের মধ্যে ১৮৭৪ সনে অন্যান্য উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষ হইতেও পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের কথা উঠে। আর এ সম্বন্ধে বোম্বাইই ছিল অগ্রণী। ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু এ দেশে প্রতিনিধি-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী। তাঁহারা উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি দেখান যে পার্লামেণ্টে ভারতীয় সদস্য-সংখ্যা ন্যূন হইবে এবং তাঁহাদের মতামত গ্রাহ্য করানো সম্ভব হইবে না। অপিচ বিবিধ ভারত সংক্রান্ত আইন পাস হইয়া গেলে লোকের মনে এই ধারণা জন্মিবে যে, ভারতবাসীদেরও ইহাতে সায় রহিয়াছে। ভারতবর্ষের যথার্থ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তখনই সম্ভব যখন এ দেশে গণতন্ত্রভিত্তিক প্রতিনিধিমূলক আইনসভা প্রবর্তিত হইবে। ঐ প্রস্তাবটি আর বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই।

ভারতবাসীর প্রতি বিলাতি কর্তৃপক্ষের প্রতিকূল মনোভাব এ দেশের সরকারী ছোট বড় কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও অনুক্রামিত হইয়া পড়িল। বঙ্গের ছোটলাট সার্ জর্জ ক্যাম্পবেলের (১৮৭১-৭৪) নাম এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমাদের মনে উদিত হয়। তিনি আইন-কানুনের আশ্রয় না লইয়া প্রশাসনিক উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে অগ্রণী হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ তথা ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারকে প্রতিহত করিয়া বাঙালি জাতির মধ্যে যে নবচেতনা দেখা দিতেছিল উহার গতি রোধ করা। তিনি ১৮৭২ সনে প্রস্তাব করিলেন যে, বঙ্গপ্রদেশের আটটি সরকারী কলেজের মধ্যে চারিটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে অবনমিত করা হইবে এবং ঐ ঐ স্কুলের ছাত্রদের এফ. এ. পড়িবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে। জাতির পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করিয়া বড়লাটের নিকট একখানি আবেদন-পত্র পাঠাইলেন (১৭ই জুন ১৮৭২)। ইহার সপক্ষে ঢাকা ও নদীয়া পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন এবং রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনও অনুরূপ স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন। ইহাতে কাজ হইল। ক্যাম্পবেল জনমত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি পূর্বপ্রস্তাব সংশোধন করিয়া সংস্কৃত কলেজ, বহরমপুর কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে রূপায়িত করিলেন। এহেতু প্রেসিডেন্সি কলেজ অতিরিক্ত ভার হইতে রেহাই পাইল। ভারত সরকার একটি রেজলিউশানে (১৮৭৩, ৩১শে জানুয়ারি) ক্যাম্পবেলের এই সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। অবশ্য তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, ছোটলাটের প্রাথমিক-শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম জনসাধারণের উপকারে না আসিয়া পারিবে না। ভারতবর্ষীয় সভা ক্যাম্পবেলের আরও কয়েকটি উদ্ভট প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করায় তাহা পরিত্যক্ত হয়, যেমন কলেজীস্তরে সংস্কৃত শিক্ষা বাদ দেওয়া ও সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজি পাঠ না তুলিয়া দেওয়া। সভার প্রতিবাদ হেতু তাঁহার প্রস্তাবিত কলিকাতা নর্মাল স্কুলকে স্থানান্তরীকরণ এবং হুগলী নর্মাল স্কুলের সঙ্গে ইহাকে মিলাইবার সংকল্প ব্যাহত হইয়া যায়। সরকার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে টেকস্ট বুক কমিটি গঠন করেন। সভার প্রস্তাবে অন্যান্য বইয়ের মত বাংলা বইয়ের নির্বাচনও ইহার কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইল।

ছোটলাট ক্যাম্পবেলের অবিমৃষ্যকারিতার আর-একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই মফস্বল পৌরসভা আইন বঙ্গীয় আইনসভার দ্বারা সরাসরি পাস করাইয়া লইবার মধ্যে (১৯শে জুলাই ১৮৭৩)। তাঁহার এই ব্যাপারেও ভারতবর্ষীয় সভা প্রবল বিরোধিতা করেন। ১৮৬৮ সনের মফস্বল পৌরসভা আইন অনুযায়ী ২৫টি মফস্বল শহরে ও বড় গ্রামে পৌরসভা স্থাপিত হয়। স্বায়ত্ত শাসনের মূলসূত্র অনুসৃত হইলেও এগুলি তখন পরীক্ষামূলক অবস্থায়ই ছিল। নূতন আইনে ও সাংগঠনিক এবং অন্যান্য দিক

হইতে বিশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। ভারতবর্ষীয় সভা এই বলিয়া আপত্তি তুলেন যে, এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ আইন বিবেচনার জন্য জনসাধারণকে যেরূপ সময় দেওয়া উচিত ছিল তাহা দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা সরাসরি বড়লাটের নিকট এই আইনের বিরুদ্ধে একখানি স্মারকলিপি পাঠাইলেন। ইহাতে তাঁহারা পৌরসভা গঠন, কর ধার্য, কর আদায় প্রভৃতি আট দফা মারাত্মক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। তাঁহারা বড়লাটকে অনুরোধ জানান যে, এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ আইনে যেন তিনি সম্মতি না দেন। সভার প্রতিবাদে কাজ হইল। বড়লাট আইনে সম্মতি দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিলেন যে, বাংলা সরকার নূতন করিয়া পৌরসভা আইনের খসড়া উপস্থিত করিতে ক্ষমতাবান। ১৮৬৪ সনের তিন আইনে পৌরসভায় স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিবার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা এবং শিক্ষাখাতে স্বেচ্ছামত ব্যয়বরাদ্দের অধিকার নূতন আইনে থাকা দরকার। এই সব বিষয়ের নিরিখে বাংলা সরকার একটি আইনের খসড়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিলেন। ১৮৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল বঙ্গীয় আইন সভায় ইহা বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে পৌরসভার নিমিত্ত আংশিক নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। উক্ত আইনবলে শ্রীরামপুর পৌরসভায় সর্বপ্রথম নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইল। এক বৎসর পরে কৃষ্ণনগর পৌরসভা এই অধিকার পায়। ঐ আইনে পৌরসভার অধিবেশনে সদস্যদের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব চেয়ারম্যান বা সভাপতির অবশ্যপালনীয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যাপকতর ভিত্তিতে নূতন মফস্বল পৌরসভা আইন ১৮৭৬ সনে পাস হইয়া যায়। এ সময়েও ভারতবর্ষীয় সভা নির্বাচনপ্রথা সম্প্রসারণ ও পৌরসভার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া এবং অন্যান্য কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখপূর্বক বড়লাটের নিকট আবেদন জানান। কিন্তু ইহাতে তখন কোনো কাজ হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা ঐ সময়ে একটি বিষম ব্যাপারের সম্মুখীন হইলেন। এই সভার অধিকাংশ সদস্যই বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট-বড়-মাঝারি জমিদার বা ভূস্বামী। পাবনা জেলায় প্রজাকুল খাজনাবৃদ্ধির ওজুহাতে স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসে। তাহারা শুধু খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল না, জমিদারদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়া হটহুজ্জতেও লিপ্ত হইল। কেহ কেহ জমিদার সরকারে খাজনা না দিয়া আদালতে নির্দিষ্ট খাজনা জমা দিতে আরম্ভ করিলেন। ছোটলাট ক্যাম্পবেল ভারতবর্ষীয় সভার উপর খুবই চটা ছিলেন। এই সভা যাহাতে অন্যভাবে বিব্রত হইয়া পড়ে তিনি তাহার অছিলা খুঁজিতে লাগিয়া যান— তাঁহার কার্যকলাপে অনেকেরই এইরূপ ধারণা হয়। পাবনার কোনো কোনো অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল ১৮৭৩ সনের মাঝামাঝি। এই সময়ে ছোটলাট একটি সরকারী রেজলিউশ্যনে প্রচার করিলেন যে, জমিদারদের করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজাদের জোট বাঁধিবার অধিকার অবশ্যই আছে। তবে আইনগত দেয় খাজনা তাহাদিগকে আইনসঙ্গত প্রাপককে দিতেই হইবে। সরকার কখনো বে-আইনী দাঙ্গাহাঙ্গামা সহ্য করিবেন না; কঠোর হস্তে উহা তাঁহারা দমন করিবেন।[১] প্রজাকুল স্বভাবতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষোক্ত কথায় তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিল না। ইহার কারণও ছিল। পদস্থ জেলা ও মহকুমা হাকিমেরা তাহাদিগকে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে

---

১ Bengal Under The Lieutenant-Governors, Vol. I. P. 546.

আগে হইতেই লিপ্ত হইয়াছিল। প্রজারা হয়ত ভাবিয়াছিল শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে দাঙ্গার কু-ফল আর পোহাইতে হইবে না।

জমিদারদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ সম্পত্তিনাশে তাহারা লিপ্ত হইল। এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইয়া দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থাদির বিবরণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। পত্রিকা এ সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার উপরে প্রসন্ন ছিলেন না। তথাপি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই ধরণের দাঙ্গার কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়! ৮ই আগস্ট ১৮৭৩ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা অন্যান্য কথার মধ্যে স্পষ্টতই লেখেন যে, জমিদার ও প্রজার এতাদৃশ দ্বন্দ্বে উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য আর ইহার দ্বারা একমাত্র সরকারেরই বল সঞ্চয় হইবে। ('The ruin is certain and that the zeminders still more so, while the government will fatten upon the ruins or both.')

পত্রিকা অন্য একটি প্রসঙ্গে (১৮৭৪, ৩রা ডিসেম্বর) পরিষ্কার ভাষায় তৎকালীন পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টেলর ও সিরাজগঞ্জের মহকুমা হাকিম নোলনকেই প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদিগকে এতাদৃশ হুট-হুজ্জতে প্ররোচনা-দানকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই প্ররোচনাকারীরা যে শেষ পর্যন্ত অবোধ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং বে-আইনী কার্যে লিপ্ত বলিয়া তাঁহারাই তাহাদিগকে কঠোর সাজা দিতে অগ্রণী হন এ সম্বন্ধেও পত্রিকা ঐ উপলক্ষে বিশেষভাবে লিখিলেন।[২]

ঐরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় সভা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে এই বিষম ব্যাপারটি লইয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ইহার কারণ নির্ণয় ও স্থায়ী প্রতিষেধের উপায় সম্বন্ধেও বিশদভাবে আলোচনায় লিপ্ত হন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছোটলাট ক্যাম্পবেলের সরকারী রেজলিউশানকে এতাদৃশ ঘটনার ব্যাপ্তিলাভের জন্য দায়ী করেন। তাঁহার উক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য :

When the flame began to spread the matter was brought to the notice of His Honour the Lieutenant-Governor. Had we a Haliday, Grant or Grey at the head of the administration he would have at once put a stop to the spirit of

২ Mr. Nolan who acquired such a notoriety during the late Pubna disturbances is placed at the head of the district. Mr. Taylor the Pucca Magistrate is, we believe, going home on furlough and Mr. Nolan will act in his place as a Magistrate and Collector during his absence on leave. Mr. Taylor, had likewise played an important part in bringing about the Pubna riot and we will perhaps have something to say about him shortly··· the poor tenants who were seduced to run into an unequal warfare with their landlords, have, we believe, received too severe a lesson to listen any longer to the seductive counsel of Mr. Nolan. When the ryots rose against the zemindars, they hoped that in their last moments they would not be foresaken by their friends who instigated them to break loose and grow turbulent, but they saw to their horror and consternation, those very men whom they look for their friends turned their face against them in their calamity.

violence which agitated the people and would have made them submit to peace and order, but our Lieutenant-Governor was then and still is Sir G. Campbell. He at once took himself to his characteristic and universal remedy of writing a flaming resolution in which though not in direct terms, yet in pretty clear language he told the people 'my lads go on agitating ; you will gain your aim and you will find the government always ready to give countenance and support.'

সভাপতি দিগম্বর মিত্র এই বিসদৃশ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে সে জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেন। ইহার একটি হইল, সরকার যেন অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেন যাহারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মতে খাজনাসম্পর্কীয় আইনেরও বিশেষ রদবদল আবশ্যক। এ নিমিত্ত সভা একটি কমিশন গঠনকল্পে সরকারের নিকট অনুরোধ জানান। কিন্তু ছোটলাট ক্যাম্পবেল ইহাতেও কর্ণপাত করিলেন না। বাংলার প্রজাকুলের দুঃখ-দৈন্য, বিষম করভার এবং খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন-নিপীড়ন, তাহাদের অবস্থার উন্নতির উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সময়ে দুইজন প্রখ্যাত মনীষী— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত— বাংলা ও ইংরেজিতে সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী লেখেন। ইহার ফলে শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়। বঙ্গপ্রদেশে ১৮৭৩ সনের শেষার্ধে ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পতিত হয়। ভারতবর্ষীয় সভা জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ ইহার দিকে সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে আকর্ষণ করিলেন।

বাংলার রাঢ় দেশে, উত্তর-বঙ্গে এবং পূর্ব-বিহারে দুর্ভিক্ষের তখন বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতবর্ষীয় সভা শস্য-উৎপাদন শস্যহানি এবং শস্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় পরিসংখ্যান দিয়া সরকারের নিকট প্রেরিত একখানি স্মারকলিপিতে জানান যে, এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই অবহিত হওয়া উচিত। সভার প্রতি ক্যাম্পবেলের বিরুদ্ধ মনোভাব এ ব্যাপারেও প্রকট হইয়া পড়িল। স্মারকলিপির জবাবে সেক্রেটারি মারফত এই মর্মে তিনি সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া তাঁহারা যেন প্রজা ও জমিদারের সম্প্রীতি স্থাপনে নিজেদের নিয়োজিত করেন। সভা অবিলম্বে উত্তরে সরকারকে জানাইলেন, তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত রহিয়াছেন, এবং সরকারী ব্যবস্থাদি জানা সত্ত্বেও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যবোধেই তাঁহারা দুর্ভিক্ষের কথা তাঁহাদিগের গোচরে আনিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এ কথাও বলেন যে বিগত কুখ্যাত উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের কথা সকলেই জানেন, যাহাতে ঐ বারের মত ব্যাপক লোকক্ষয় না হয় সে জন্য আগে হইতেই কর্তৃপক্ষের সাবধান হওয়া উচিত। এই উত্তরের সঙ্গে তাঁহারা জেলাওয়ারী একটি পরিসংখ্যান জুড়িয়া দেন। দুর্ভিক্ষ শীঘ্রই ব্যাপক আকার ধারণ করিল এবং ছোটলাটের সুরও নরম হইয়া গেল। সরকার ভারতবর্ষীয় সভার সাহায্য বিশেষভাবে যাজ্ঞা করিলেন। এই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইয়া জনসাধারণের দুঃখ ও দুর্গতির বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং প্রতি সপ্তাহে তাহা বিস্তারিত ভাবে পত্রস্থ করিতে থাকেন।

উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের (১৮৬৬) বিষাদময় স্মৃতি তখনও কি সরকার কি জনসাধারণ সকলেরই মনে জাগরূক। সরকারী কর্তৃপক্ষ এবার পূর্বের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়ে সরাসরি দুর্গতদের সাহায্য দানে অগ্রসর হন। ভারতবর্ষীয় সভার সদস্যগণ বিশেষতঃ বিভিন্ন জেলার ভূস্বামীবর্গ বিভিন্ন উপায়ে সাধারণের দুর্গতি নিরসনের যথোপযুক্ত কর্মে ব্রতী হন। আনন্দের কথা এই যে, এবারকার দুর্ভিক্ষে জনসাধারণ অশেষ দুর্গতির মুখে পড়িলেও তাহাদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। তবে সাধারণের দুর্গতি পর বৎসরেও সমানভাবে চলে। সরকার অনুসৃত ত্রাণকার্যে সভার নেতৃবর্গ এবং ঐ ঐ অঞ্চলের জমিদারেরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৮) এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া একটি বিস্তারিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। ইহাতে তিনি ভূস্বামীগণের বিবিধ দুর্ভিক্ষত্রাণ কার্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এই মর্মে বলেন যে, ভূস্বামীগণ দুর্গতদের সাহায্যকল্পে নানাভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহারা দুর্ভিক্ষকালে প্রজাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট খাজনা আদায় এক বৎসর বা তদূর্ধ্বকালের জন্য স্থগিত রাখেন। খাদ্যশস্য আমদানী, ভূমির উন্নতি এবং প্রজার হিতার্থে জমিদার এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়, প্রধানত দেশীয় ব্যবসায়ীগণ সরকারী কোষাগার হইতে ৪০ লক্ষ টাকা আগাম লন। সরকার বিভিন্ন স্থলে রাস্তা নির্মাণদ্বারা সাধারণের শ্রমের সুযোগ করিয়া দেন যাহাতে তাহারা রীতিমত প্রয়োজনানুরূপ রসদ পাইতে পারে। এই ধরণের কার্যেও জমিদারেরা বিশেষ সহায় হন। তাঁহারা ছয় হাজার মাইল রাস্তা নির্মাণের জন্য নিজ নিজ খাস জমি ছাড়িয়া দেন।

দুর্ভিক্ষত্রাণ তহবিলে বাংলার অধিবাসীরা প্রায় পনর লক্ষ টাকা দান করেন। ইহার অধিকাংশই আসে জমিদারদের নিকট হইতে। ছোট ছোট জমিদারদেরও অনেক পোষ্য উপরন্তু বহু নিকট ও দূর আত্মীয় পরিবারকেও তাঁহাদের পুষিতে হয়। দুর্ভিক্ষকালে তাঁহারা যে কত ক্ষতি স্বীকার ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন কোনো দিনই হয়ত তাহার পরিমাপ হইবে না।

সরকার যে এইরূপ একটি ব্যাপক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিরসনে এবং দুর্গতদের দুর্গতিমোচনে সমর্থ হইয়াছেন তাহার মূলে ভারতবর্ষীয় সভার সদস্যবৃন্দ তথা ভূস্বামীদের সহায়তা রহিয়াছে অনেকখানি। যাহা হোক, ১৮৭৪ সনের শেষ নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী যুগ্ম প্রচেষ্টায় দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের দুর্গতি অনেকটা লাঘব হইল।

১৮৭৫-৭৬ সনটি ভারতবাসীর জাতীয়-জীবনে একটি সন্ধিক্ষণ। দুর্ভিক্ষ নিবারণে সার্থক কার্যে দেশবাসীকে স্বতঃই আত্মশক্তির পরিচয়লাভে সমর্থ করে। এই সময় নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালিরা সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে অংশীদার হইবার দাবী করিতে থাকেন। কিন্তু পূর্বে দেখিয়াছি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বার প্রায় রুদ্ধ। স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যে আত্মশক্তির সম্যক উন্মেষ লাভ সম্ভব ভাবিয়া ভারতবর্ষীয় সভা অন্যান্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলাইয়া কলিকাতা পৌর সভার নিয়মতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দাবী জানাইতে থাকেন। নির্বাচনপ্রথার দ্বারা পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের পৌরসভায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইহার কর্ম নির্বাহে নিজেদের শক্তি-সামর্থ-বুদ্ধি প্রয়োগের পথ সুগম হইবে। এই সময় অন্ধকারের মধ্যেও আশার বর্তিকা দেখা গেল। সরকার কলিকাতা পৌরসভার সংস্কারসাধন তথা এখানে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়া একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহা যথাসময়ে আইন সভায়

উপস্থাপিত হইল। কলিকাতা পৌরসভার বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার ঘনিষ্ঠ যোগ ইতিপূর্বে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। যখনই সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে কোনো আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তখনই জনস্বার্থের খাতিরে সভা নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়া ইহার সংস্কার ও উন্নতিতে যত্ন লন। পূর্ব দশকের মাঝামাঝি কলিকাতা পৌরসভার নিয়মতান্ত্রিক এমন কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয় যাহার ফলে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, ঘরবাড়ি, রাস্তার আলো প্রভৃতি সুখ-সুবিধাকর কার্যাবলী ক্রমান্বয়ে সাধিত হয়। বর্তমান আইনের পর্যালোচনাকালে সভা প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতার বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণী হইতে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের মতে এই সংখ্যা হইবে ১০০ জন। প্রতি বৎসর দশভাগের একভাগ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহা পূরণ করিবেন বাকি ৯/১০ অংশ সদস্যগণ। আরও একটি বিষয়ের উপরে তাঁহারা বিশেষ জোর দেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সভাপতির অত্যধিক ক্ষমতা এবং সরকারের যে কোনো বিষয় নাকচ করিবার অবাধ অধিকার স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানিবে—কাজেই সভা বলেন এইরূপ ক্ষমতা সংকুচিত করিয়া সদস্যদের অধিকার এবং দায়িত্ব বাড়ানো আবশ্যক। ১৮৭৬ সনের ৪ঠা মার্চ বঙ্গীয় আইন সভার ভারপ্রাপ্ত সিলেক্ট কমিটির একটি অধিবেশন হয়। ইহাতে সভা তাহার উপরোক্ত মতামত প্রতিনিধি মারফত পেশ করেন। যাহা হোক, সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক কিছু রদবদলের পর ২৫শে মার্চ (১৮৭৬) কলিকাতা পৌরসভা আইন পাস হইয়া গেল। এই আইনে স্থির হয় যে, পৌর সভার মোট সদস্য থাকিবেন ৭২ জন এবং ইহার ২/৩ অংশ হইবেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৌরসভাকে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপদানের নিমিত্ত শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগও খুবই যত্নপর হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু সংশোধিত আইনটিতেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কেননা ইহাতেও সরকারের ক্ষমতা প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল। বড়লাটের নিকট এই আপত্তি তুলিয়া আইনটির বিরুদ্ধে আবেদন করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া আইনে সম্মতি দান করিলেন।

পূর্ব পূর্ব বারের মত এই সময়ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ও অন্যান্য কারণে সরকার কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করেন, ইহার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য মফস্বলস্থ ইউরোপীয়দের বিচার সম্পর্কিত আইনটি। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচারবৈষম্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একটি বিশেষ কলঙ্ক। ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার শুধু কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারে ছিল। ইহার দরুণ উহাদের দ্বারা মফস্বলে নানা রকমের অত্যাচার উপদ্রব নির্বাধে চলিতে থাকে। এবারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এমন একটি আইন করিলেন যাহার ফলে ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারের ক্ষমতাবান হইলেন মাত্র মফস্বলস্থ ইউরোপীয় জজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ। ইহাতে কিন্তু আর-এক রকমের বিভ্রাট দেখা দিল। ভারতীয় সিবিলিয়ন বিচারকগণ ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা কালবিলম্ব না করিয়া এই বৈষম্য ও তাহার কুফলের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী দশকে বিখ্যাত ইলবার্ট বিল এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য মুখ্যতঃ সরকার কর্তৃক রচিত ও প্রচারিত হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভায় একটি নূতন আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয় পূর্ববর্তী চা শ্রমিক সংক্রান্ত আইনের ত্রুটি বিদূরণের জন্য। ভারতবর্ষীয় সভা বলেন যে, আইনে সরদারদের উপর অত্যধিক ক্ষমতা অর্পণ করায় পূর্ববর্তী আইন ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবারের আইনেও এই ব্যবস্থা রহিত হইল

না। উপরন্তু যাহাতে স্বাধীনভাবে কুলি সংগ্রহ করা যায় তাহার ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়া আপত্তি থাকিলেও সভা এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। এই বৎসরই কুলি আইন পাস হইয়া যায়।

এই সময়ে প্যারীচাঁদ সরকার প্রবর্তিত ও কেশবচন্দ্র সেন পরিপোষিত মাদকদ্রব্য নিবারণ আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করে। ভারতবর্ষীয় সভা পরিসংখ্যান সহযোগে মাদকদ্রব্যের কুফল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া বড়লাটের নিকট একখানি স্মারকলিপি পেশ করিলেন। সরকার এ বিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ১৮৭৬ সনে আবগারী আইনের একটি খসড়া উপস্থিত করেন। ইহার দ্বারা মাদকদ্রব্য বিক্রেতাদের সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা হয়। ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাবক্রমে আইনে এই মর্মে একটি ধারা জুড়িয়া দেওয়া হইল যে কলিকাতা পৌর সভার জাস্টিসগণ এইরূপ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

জ্বর মহামারী এই সময় পুনরায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। গত পনর বৎসর যাবৎ এই জ্বরে বিস্তর লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং অনেকে অকর্মণ্য হইয়া যায়। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকার যে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন ভারতবর্ষীয় সভা তাহা বরাবর সমর্থন করিলেও ইহার পক্ষে দিগম্বর মিত্র বিশেষ জোরের সঙ্গে মহামারীর কারণ নির্ণয় ও বিদূরণকল্পে সরকারকে অবহিত হইতে বলেন। মানব-প্রেমিক কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলও বিলাতে বসিয়া এ দেশের জ্বর মহামারীর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এবং ইহা বিদূরণকল্পে এমন কতকগুলি প্রস্তাব করেন যাহা ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাবের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। নাইটিংগেল এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, রেল লাইন ও বড় বড় রাস্তার দরুণ যে সব স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার ও সংস্কার আশু প্রয়োজন। ফলে জল চলাচল স্বাভাবিক ভাবেই হইতে থাকিবে, যেমনটি পূর্বে হইত, কোথায়ও জল জমা হইয়া মজিয়া যাইয়া জ্বর রোগ উৎপত্তির অবকাশ ঘটিবে না। এ দেশে ও বিলাতে যখন এইরূপ আলোচনা হইতেছিল তাহার মধ্যে ছোটলাট টেম্পল এ সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি অনুসন্ধান-কমিটি বসান। কমিটির রিপোর্ট পাইয়া তিনি স্বয়ং যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাহা মূলতঃ উক্ত মতামতেরই সমর্থক। তাহার মন্তব্য অংশত এই : "The lower classes in that part of the country are more than ordinarily poor, but poverty could hardly have been the cause of the extraordinary prevalence of this fever ; for the victims were found in all classes— the affluent, the well-to-do, the workers, and the paupers. It is hard, too, to argue that hunger, or physical depression from want of food, could have been the causes ; for when the scarcity began in 1873, the fever, instead of becoming worse, became better, and further improved during 1874. Defects in drainage will naturally suggest themselves as causes, but then the fever prevailed in the high and dry lands as well as in the swampy tracts. If, however, defective drainage be an element in the causation, as I suspect it is, though there is not clear proof, then that will be advant-

ageously affected in future by the several drainage schemes which have been set on foot."[৩]

এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভায় পয়ঃপ্রণালী সংস্কার, সেচ ও পথ সম্পর্কে একটি আইনের খসড়া সরকার উপস্থাপিত করেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সভার মতামত অনেকটা গ্রাহ্য হইয়াছিল।

এই বৎসরের আর-একটি আইনের কথাও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা হইল অভিনয় সম্পর্কিত আইন। তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আসিলে কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজগৃহে স্ত্রীলোকদের দ্বারা তাঁহার অভিনন্দনের আয়োজন করেন। ইহা লইয়া তখন কলিকাতার শিক্ষিত মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাৎ' নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় এই ঘটনা অমর করিয়া রাখিয়াছেন। এই ঘটনার উপরে 'গজদানন্দ' নামক একটি প্রহসন লিখিত হইয়া জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। বড়লাট অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া এই অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। সরকার ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা ১৮৭৬, ডিসেম্বর মাসে একটি রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন সরাসরি পাস করাইয়া লন। ভারতবর্ষীয় সভা আইনে-বর্ণিত বিষয়াদি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি জানান। তাঁহারা বলেন যে, ইহার দ্বারা সরকারকে অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে জাতীয় সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতি এবং স্বাধীন চিন্তা বিকাশের পক্ষে বিষম বিঘ্ন ঘটিবে। সভার প্রস্তাবক্রমে ধর্মানুষ্ঠানে যাত্রা কথকতা প্রভৃতিকে এই আইনের আওতার বাহিরে রাখা হয়। এই আইনে প্রেসের লাইসেন্স গ্রহণেরও কথা হয়।

এখন ভারতবর্ষীয় সভার আভ্যন্তরীণ ও অপরাপর কার্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ভারতবন্ধু হেনরি ফসেট পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের সপক্ষে নানাভাবে কার্য করিয়াছেন কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো ভারতবর্ষীয় সভার মুখপাত্ররূপে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাইটন হইতে সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। এই উপলক্ষে এখানে বসিয়া ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাকে ও তাঁহার নির্বাচকমণ্ডলীকে মানপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। সভার অনুরোধে ব্রাইটনের লর্ড মেয়র ১৮৭৩, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে ফসেটকে মানপত্র দিলেন এবং নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে নিজে দ্বিতীয় মানপত্রখানি গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে কেম্ব্রিজ হইতে অধ্যয়নরত আনন্দমোহন বসু ঐ সভায় গিয়া যোগদান করেন। তিনি একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় ভারতবাসীর আনন্দজ্ঞাপক বিবিধ কথার মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসন সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। আনন্দমোহন এই মর্মে বলেন যে, ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া ব্রিটেন মানবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, ভারতশাসনে ভারতবাসীর দায়িত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে এই ব্যাপারে অংশী করিয়া লইলে এই দেশ এক বিরাট ভূখণ্ডের মহদুপকার সাধন করিতে পারে।[৪]

ফসেট দ্বিতীয়বার সাধারণ নির্বাচনে ব্রাইটন ও হ্যাকনে এই দুইটি কেন্দ্র হইতেই পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত হন। এইবারে ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাকে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহার্থ একটি থোক টাকা

---

৩ Bengal Under The Lieutenant-Governors. Vol. II. p. 612

৪ দ্র: 'Ananda Mohan Bose on the Future of British Rule in India'—The Modern Review, March. 1948.

প্রদান করেন। তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশস্থ রাষ্ট্রনৈতিক সভাগুলিও যাহাতে তাঁহার নির্বাচন-ব্যয়ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করেন সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানান। পার্লামেণ্টে ফসেটের ভারতের শাসননীতি সংক্রান্ত হিতকর প্রস্তাবাদি বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। তৎকালীন বড়লাট নর্থব্রুক ইহার নিরিখে শাসননীতি পরিচালন করিতে কম প্রভাবিত হন নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা যে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতেছিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই সময়ে ১৮৭৩ সনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব আসে যে, সভার সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ৫০৲ টাকা স্থলে কমাইয়া ৫৲ টাকা করা হোক। ইহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষিত অথচ অল্পবিত্ত ব্যক্তিরাও যাহাতে বেশি সংখ্যায় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর শক্তিশালী এবং জনপ্রতিনিধিমূলক করিয়া তুলিতে পারেন। এই প্রস্তাব আসে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ও তদীয় অগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষের নিকট হইতে। শিশিরকুমার পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও এই বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনায় রত হন। সভা-কর্তৃপক্ষ এক অধিবেশনে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এরূপ বার্ষিক চাঁদা কমানো যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় একটু পরেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

ভারত সরকারের নিকট হইতেও ভারতবর্ষীয় সভা এই সময় কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। ভারতীয় আইনসভায় তাঁহারা সভাপতি রমানাথ ঠাকুরকে ১৮৭৩-৭৫ এই দুই বৎসরের জন্য সদস্য মনোনীত করিয়া লন। এই সময় তাঁহার স্থলে সভাপতির কার্য করেন সুবিখ্যাত দিগম্বর মিত্র। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম প্রধান সদস্য সুবক্তা ও সাহিত্যিক-প্রধান কিশোরীচাঁদ মিত্র ৬ই আগস্ট ১৮৭৩ তারিখে মারা যান। তিনি পূর্ববর্তী বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পর্কে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এখন দেখিতেছি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ডক্টর (ও পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিও ভারতবর্ষীয় সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং ইহার বিবিধ কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল একবিংশতি ও চতুর্বিংশতি অধিবেশনে সভার উদ্দেশ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত অধিবেশনে (২৯শে এপ্রিল ১৮৭৬) তিনি এই মর্মে বলেন যে, ভারত সরকারের উচ্চতম পদাধিকারী কোনো কোনো বড়লাট এবং বঙ্গপ্রদেশের ছোটলাটের নিকট হইতে তাহাদের কৃতকর্মের নিমিত্ত বিস্তর প্রশংসা পাইয়াছেন। আবার কোনো কোনো পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী তাঁহাদিগকে কুচক্রী, সরকারী কর্মে বাধাদানকারী, ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, তাহারা রাজদ্রোহী এবং নিকটতম বৃক্ষে ফাঁসী দিবার উপযুক্ত। সভার নেতৃবৃন্দ কিন্তু নিন্দা-প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ পালন করিয়াছেন। এ দেশে প্রতিনিধিমূলক আইনসভা না থাকায় ভারতবাসী জনসাধারণের বক্তব্য নিয়মানুগভাবে সরকারের নিকট পেশ করা সম্ভব নয়। এ কারণ তাঁহারা এ দেশের ও বিদেশের সরকারকে জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাইবার জন্য অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। কিশোরীচাঁদের মত রাজেন্দ্রলালও বলেন, পার্লামেণ্টের অপোজিশন বা বিরোধীদলের মত ভারতবর্ষীয় সভা বাহির হইতে বেসরকারী অপজিশনেরই কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এই দিক হইতে সভার কৃতিত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন।

ভারতবর্ষীয় সভা পঁচিশ বৎসর যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য করিয়া প্রত্যক্ষভাবে যাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার সঙ্গে আমরা কম বেশি পরিচিত। পরোক্ষভাবেও সভা অনন্যতুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বঙ্গেতর প্রদেশ সমূহে এবং বাংলার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইয়াছেন ভারতবর্ষীয় সভা। বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাবে এই সময়ে রাজনৈতিক সভাসমিতি স্থাপিত হয় ও তথাকার নেতৃবৃন্দ স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর হিতকল্পে রাষ্ট্রীয় আলোচনা ও আন্দোলনে লিপ্ত হইলেন। বাংলা দেশেও এই উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সভাসমিতি স্থাপিত হইল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যশোহর কৃষ্ণনগর ঢাকা বহরমপুর ও রাজসাহীর সভাগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিশিরকুমার ঘোষের প্রস্তাবের কথা একটু আগে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ব্যর্থকাম হইয়া জনপ্রতিনিধিদের একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপনে অগ্রসর হন। তাঁহারই উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে এই সভা স্থাপিত হইল ১৮৭৫, ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ভারতীয় সভার নেতৃবৃন্দ ইহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিলেও, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ যুবসমাজের নেতৃবৃন্দ ১৮৭৬, ২৬শে জুলাই কলিকাতায় যে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারতসভা' স্থাপন করেন তাহাতে বিশেষ আনুকূল্য করিলেন। সভার পক্ষে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল উপস্থিত থাকিয়া নূতন উদ্যোগে নিজেদের সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ভারতসভার নেতৃত্বে সিবিল সার্বিস আন্দোলন যে জোরালো হইয়া উঠে তাহার মূলেও বিশেষ রসদ যোগায় ভারতবর্ষীয় সভা ও বিভিন্ন অঞ্চলের শাখা সভাগুলি। ভারতসভা কিন্তু পরে কৃষককুলের সপক্ষে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেন। পূর্বে ও পরে এই বিষয়ে যেসব আন্দোলন হয় তাহারই পরিণতি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

বস্তুত শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষে ভারতবর্ষীয় সভা সার্থক কৃতিত্ব দেখান। ভারতসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ন্যাশানাল কনফারেন্সের (১৮৮৫) সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দও হাতে হাত মিলাইয়াছেন। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) অব্যবহিত পরেই তাঁহারা ইহার সঙ্গে একান্তভাবে যোগ দেন এবং পরবৎসর ১৮৮৬ সনে আয়োজিত কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করেন ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সভার কতকগুলি প্রস্তাব, যেমন প্রতিনিধিমূলক আইনসভা গঠন, সিবিল সার্বিস প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃক আরব্ধ আন্দোলন কংগ্রেস নিজেই গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যেক বৎসর নানাভাবে এই-সকল উদ্দেশ্যে প্রস্তাবাদিও গ্রহণ করিতে থাকেন। অবশ্য ইহা পরের কথা। এখানে ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম দিককার কথাই মাত্র আলোচিত হইল। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে একটি গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতবর্ষীয় সভা প্রথমাবধি এককভাবে দীর্ঘকাল যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাহা আমরা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

রামেশ্বর রচনাবলী। সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬। মূল্য কুড়ি টাকা।

চণ্ডীমঙ্গলের যত কবিই থাকুন একজনকেই আমরা মনে রাখিয়াছি, কারণ একজনই মনে থাকিবার মত। শিবমঙ্গলের ক্ষেত্রেও দ্বিজ রামেশ্বর অদ্বিতীয়, মুকুন্দরামের মতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দুইজনই চক্রবর্তী— আপন আপন রাজ্যে রাজচক্রবর্তী। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন রামেশ্বরের কুলপদবীও চক্রবর্তী, অন্ততঃ কবির পিতামহ প্রপিতামহ যে নামের সহিত চক্রবর্তী ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। 'চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া' কবি রামেশ্বর যে 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য' রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবিখ্যাতি সুচির কালের জন্য অম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রামেশ্বর রাম সিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥

রামেশ্বর যে দ্বিজ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন সে কথা কেবল আক্ষরিক অর্থে নয়, ব্যঙ্গ্যার্থেও সত্য। রাজা রামসিংহ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন সে তাঁহার প্রথম প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তাঁহার শিবায়ন কাব্য— যাহার 'অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু' তাহাই— যে তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা এবং অচল প্রতিষ্ঠা সে কথা গত আড়াই-শ বছর ধরিয়া নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

কবি ভণিতায় রাজা রামসিংহের গুণকীর্তন করিয়াছেন, অসময়ে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া বারংবার কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সিংহও কবির কাব্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন। 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়' এবং 'তার সুত রঘুনাথ'ও অনুরূপ আশ্রিত কবির আশ্রয় পাইয়া অদ্যাবধি অবিস্মৃত আছেন।

প্রাচীন সাহিত্য যতদিন পঠিত হইবে কবিদের সহিত তাঁহাদের পোষ্টারাও ততদিন অমর হইয়া থাকিবেন।

গ্রন্থসম্পাদক তাঁহার সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকায় রামেশ্বরের জীবনেতিহাস এবং তাঁহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাহা একটি উন্নতমানের প্রতিষ্ঠা করিবে। তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই তথ্যনির্ভর, এমন অনেক নূতন উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে আমাদের হস্তগত হয় নাই।

মুদ্রিত শিবায়নসমূহের ইতিবৃত্ত ও পাঠান্তর প্রসঙ্গটি প্রাচীনসাহিত্যরসিকদের পক্ষে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া মনে হয়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করিল, ইহা আমরা সকলেই জানি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য নিদর্শনগুলি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইল। পূর্বে যাহা দুর্লভ ছিল জনসাধারণের পক্ষে তাহা সুলভ হইল। এক এক গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বাহির হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদকের পুঁথি সম্পাদন করাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অশিক্ষিত অসতর্ক লিপিকরদের হাতে লেখা অধিকাংশ পুঁথিই ভ্রম-

প্রমাদ পরিপূর্ণ, কাজেই সম্পাদন না করিয়া প্রেসে দেওয়া যায় না। কিন্তু সম্পাদকও যদি অযোগ্য হন তাহা হইলে বিপদ বাড়ে বই কমে না। অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তির অক্ষম এবং অসতর্ক সম্পাদনার ফলে মুদ্রিত গ্রন্থে নূতন নূতন ভ্রান্ত পাঠ প্রবেশ করিতে লাগিল। অপণ্ডিতের সম্পাদনাই বিপত্তির একমাত্র কারণ নয়, অতিপণ্ডিতের সম্মার্জনাও আর-এক রকমের বিপদ সৃষ্টি করিল। তাঁহারা পুরাতন কবির পুরাতন ভাষাকে স্বকালীন করিয়া ফেলিলেন, কেহ বা নিজ নিজ ধারণা অনুসারে সুসংস্কৃত করিয়া দিলেন। অনেক সময় আধুনিক সম্পাদক পুরাতন শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মূল শব্দের বদলে নিজের বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে নূতন শব্দ বসাইয়া দিলেন। ইহা ছাড়া প্রক্ষেপণ তো আছেই। জনপ্রিয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহকে জয়গোপাল সম্প্রদায়ের হাত হইতে কে কবে রক্ষা করিতে পারিয়াছে? আলোচ্য গ্রন্থের পাঠ প্রসঙ্গে পূর্বপ্রকাশিত দুই-একটি শিবায়ন গ্রন্থের বহু ছত্র উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহার প্রতি প্রাচীন সাহিত্য-সম্পাদনব্রতী আধুনিক গবেষকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই। অসতর্ক লিপিকরের হাতে নকল করা যে-কোনো পুঁথি যেমন-তেমন করিয়া অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য সহকারে ছাপাইয়া দিলেই প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা হয় না এ-কথা উপলব্ধি করিবার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

ভাষানুশীলনের দিক্ দিয়া রামেশ্বরের রচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার পঞ্চম খণ্ডে যে দক্ষিণ-পশ্চিমী বাংলা উপভাষার উল্লেখ করিয়াছেন সে সম্পর্কে যদি কেহ গবেষণা করিতে চান তো রামেশ্বরের ভাষায় তাহার অনেক উপকরণ পাইবেন। যে-সকল পাণ্ডুলিপি হইতে পাঠনির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সম্পাদক বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কবি রামেশ্বরের জন্মভূমি যদুপুর কিম্বা কর্মস্থান কর্ণগড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত। সেই কারণে মেদিনীপুর অঞ্চলের উপভাষার ছাঁদটা এ গ্রন্থে অনেকটা অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে। এমন অনেকগুলি শব্দ আলোচ্য গ্রন্থে নজরে পড়ে যেগুলি মেদিনীপুর অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রচলিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিই—

গড় করা— প্রণাম করা

গড় কর্যা গিরিনাথে গিয়া শিব-সেনা সাথে
গর্জিল দক্ষের যজ্ঞশালে। পৃ. ৩৭০
গৌরী বিনে গতি নাঞি গড় কর্যা সাধে॥ পৃ. ৩৭৫
গড় কর্যা গিরিসুতা গদগদ ভাষে। পৃ. ৩৮৩

ঘুট্যা পাঁশ— ঘুঁটের ছাই

বাপমায়ের বয়স পায়্যা বিভা করিবেন লাজ থ্যায়্যা
আস্যাছেন ঘুট্যাপাঁশ মাখ্যা। পৃ. ৩৮৮

হুড়হুড়া দুড়দুড়্যা— বজ্র

ভাতারে ভৎর্সনা করি রাণী গালি পাড়ে।
হুড়হুড়া দুড়দুড়্যা পড়ুক তার ঘাড়ে॥ পৃ. ৬৮৮

মড়াচির— শ্মশান

অস্থুলের প্রিয় বেটা নির্ম্মূলের নাতি।
তিনকুল খায়্যা মড়াচিরে দিল বাতি॥ পৃ. ৩৬৭

এখানে দেখিতেছি দুই রকম পাঠ। সম্পাদক মূলগ্রন্থে যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই— 'তিন কুল খায়্যা মড়া চিতে দিনে রাতি।' পাদটীকায় খঃ গঃ পুঁথির ধৃত পাঠ দেওয়া হইয়াছে— 'তিন কুল খায়্যা মড়াচিরে দিল বাতি।' খঃ এবং গঃ পুঁথির প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর জেলা, খঃ পাওয়া গিয়াছে দাসপুর থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে এবং গঃ সংগৃহীত হইয়াছে ঘাটাল থানার কিসমৎপুর রামচন্দ্র গ্রাম হইতে। লিপিকর স্থানীয় লোক। খঃ পুঁথিতে সে কথা স্পষ্ট লেখা আছে। গঃ পুঁথিতে তাহার উল্লেখ সম্ভবতঃ নাই, কিন্তু অনুমান করা যায় ওই পুঁথির লেখকও যে অঞ্চলে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সেই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ফলে খঃ ও গঃ পুঁথির লিপিকর দুইজনের পক্ষে 'মড়াচির' শব্দটি বোঝার অসুবিধা হয় নাই। 'মড়াচিরে'ই যে প্রকৃত পাঠ তাহা প্রসঙ্গ হইতে সহজেই ধরা যায়। যে লিপিকর 'মড়া চিতে' লিখিয়াছেন তিনি 'মড়াচিরে'র অর্থ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই 'রে'র স্থানে 'তে' বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু খঃ গঃ পুঁথির 'দিল বাতি' অংশটি শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। 'বাতি'র স্থলে 'রাতি' অর্থের দিক্ দিয়া প্রশস্ত। গঃ পুঁথির লিপিকরের অনবধানতা সম্বন্ধে সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন। পুঁথিতে রচনাকাল সম্পর্কে লিখিত পংক্তি কয়টির মধ্যে তিনি একবার 'বাম'কে 'রাম' লিখিয়াছেন। অসতর্কতা বশতঃ 'ব'এর স্থলে 'র' এবং 'র'এর স্থলে 'ব' লেখা স্বাভাবিক। এখানেও 'রাতি'র স্থলে 'বাতি' লিখিত হইয়াছে। আমার মনে হয় সমগ্র ছত্রটির আসল রূপ হওয়া উচিত 'তিন কুল খায়্যা মড়াচিরে দিন রাতি'— অর্থাৎ তিন কুল খাইয়া দিবারাত্র শ্মশানে অবস্থান করেন।

টাঠি— মাটির খুরি

ভাঁড়টাঠি বাটাবাটি পরিপূর্ণ ঘর। পৃ. ৩৭৫

মেদিনীপুর অঞ্চলে এই শব্দটি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, উচ্চারণ টাঁঠি।

লুকলুকানি— লুকোচুরি খেলা

খেলে লুকলুকানি আপনি হইয়া বুড়ী। পৃ. ৩৭৬

আঁটু— হাঁটু

অগস্ত্যের নাম কর‍্যা আঁটু ধর‍্যা উঠে। পৃ. ৩৭৫

'আঁটু'র স্থানীয় উচ্চারণ 'আঁঠু', আঁটুও নয় হাঁটুও নয়।

ঝরকা— জানালা

ধূপাবলি রাখিল সকল ঝরকায়। পৃ. ৫০০

গিরা— গ্রন্থি, গাঁঠ

গড়িয়া বসিলা শঙ্খ গলে নাক্রি গিরা। পৃ. ৪৯৪

বাড়ি— ঋণ

কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি কর‍্যা আন। পৃ. ৪৪৭

বাড়ি > বাইড় > বাড়। বর্তমান উচ্চারণ বাড়।

ঔঁঠা— কোমর

ঔঁঠা ধর‍্যা উঠাইল শাঁখারীর পোকে। পৃ. ৪৮৬

শব্দটি ওড়িয়াতে 'অণ্টা' রূপে প্রচলিত। মেদিনীপুরে 'অঁটা' শুনিয়াছি। মহাপ্রাণ ধ্বনি শুনি নাই।

পেতি— প্রেতিনী

'আঁইষ্যা পেতি' 'গুয়্যা পেতি' প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পেতির নাম শোনা যায়। ভূতের গল্পে ইহাদের দেখা মিলে।

খোসাল হইয়া পেতি মশাল যোগায়। পৃ. ৩৮৪

পুড়া— খড়ের তৈয়ারি ধান্য রাখিবার আধার

নগরের ভিতরে আম্বাইয়া দিল পুড়া। পৃ. ৪৫৮

চাড়— অহঙ্কার

তার মাঝে চাড় কর‍্যা চাড়ু বলে কি। পৃ. ৩৯১

গাগর, গর্গরী—কলসী

গৌরী গর্গরী হইতে গড়াইল জল।

পাঠান্তর॥ গাগর হইতে গৌরী গড়াইল জল। পৃ. ৩৯৭

মেদিনীপুরে কলসী অর্থে 'গাগরা' শব্দ খুব চলে।

মেদিনীপুরে একটি প্রবাদ আছে— 'কারও ধায়্যা ধাপ্যা বার। কারও বুস্যা থায়্যা তের।' আলোচ্য গ্রন্থে 'ধায়্যা ধুপ্যা' এই ক্রিয়াযুগ্ম পাইতেছি। 'ধুপ্যা'র স্থলে 'ধাপ্যা' হইবে না তো?

চলিত বাংলায় বলি ঝাঁটার বাড়ি, মেদিনীপুরের উপভাষায় বলে 'ঝাঁটামুড়া'। 'মুড়া' শব্দের এই বিশিষ্ট প্রয়োগ শিবায়নে আছে। যেমন— 'খাড়ুমুড়া মার‍্যা মামায় দূর কর‍্যা দিতে।' পৃ. ৪৫৯

ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়াও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রধানতঃ অপিনিহিতি। মেদিনীপুরের ভাষায় অপিনিহিতির প্রাবল্য আছে। ক্রিয়াপদে তাহার উদাহরণের অভাব নাই। যেমন— কর‍্যা (উচ্চারণ কই র‍্যা), বস্যা (বই স্যা), কাট্যা (কাই ট্যা), লয়্যা (লই য়্যা), ভাঙ্গ্যা (ভাই ঙ্গ্যা) চাপাথ্যে (চাপাই তে), পাল্য (পাই ল), বারাল্য (বারাই ল), পায়্যাছিল (পাই য়াছিল), আইস্য আস্য (আই স) উড়াল্য (উড়াই ল), হল্য (হই ল)। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ক্রিয়াপদের প্রসারিত এবং সংকুচিত দুই রূপই বিদ্যমান। সংকুচিত রূপেই অপিনিহিতি ঘটিয়াছে। সংকুচিত রূপের পাশাপাশি প্রসারিত রূপও আছে তবে সংখ্যায় অনেক কম। দৃষ্টান্ত—

শূলভঙ্গ শুনিঞা শিবের হল্য কোপ। পৃ. ৪৪৮

রামেশ্বর বলে শুন্যা রুষিল রঙ্কিনী। পৃ. ৪৪৮

ধূর্জটির ধ্বনি শুনি ধায় সব নারী। পৃ. ৪৪৯

ভাড়া কর‍্যা ভড়ক করিয়া ভাল মতে। পৃ. ৪০২

পাইয়া ঘৃতের গন্ধ পলাইল পাপ। পৃ. ৪৬১

তৈল ছাড়া তন্থ তাতে বস্ত্রহীন পায়্যা। পৃ. ৪৬০
এড়াইতে নারে ভীম নিড়াইতে যান। পৃ. ৪৬২
প্রভাতে নিড়্যাত্যা যায় আইসে ডেড় পরে। পৃ. ৪৬৩
প্রভাতে নিড়াত্যা ক্ষেতে বৈসে বৃকোদর। পৃ. ৪৬৩
গোঁ কর‍্যা গোঁগাল্য বুড়া গৌরী বলে ছি।
গুহ গজানন বলে মা গোঁগাইল কি॥ পৃ. ৪৭৮

অনেক শব্দ বাহ্যতঃ প্রসারিত কার্যতঃ সংকুচিত। ছন্দের দিক্ দিয়া বিচার করিলেই তাহা ধরা পড়িবে। যেমন

কহ বাপু নারদ বিমোহ পাইল (২ মাত্রা) কেনে। পৃ. ৪৫৮
চল্যা যাইত্যে (২ মাত্রা) চৌদিগে চালের উড়ে খড়। পৃ. ৪৫৮
চষাইলেক (৪ মাত্রা) চাষ সেই চিতাইলেক (৪ মাত্রা) ফির‍্যা। পৃ. ৪৬২
ধরণী সুধন্য হল্য ধান্য আইল (২ মাত্রা) ফুল্যা। পৃ. ৪৬৩

ক্রিয়াপদ ছাড়া নামপদেও অপিনিহিতির প্রভাব প্রচুর।

যেমন—হাল্যা (হাল+ইয়া। উচ্চারণ হাইলা), হাল্ব্যা (হাল+উয়া। উচ্চারণ হাউলা), মেয়্যা, ছেল্যা, হেত্যার, আঁড়্যা।

মেদিনীপুর গ্রামাঞ্চলে কথ্যভাষায় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালেও 'না' স্থলে 'নি' ব্যবহৃত হয়। 'করি নি'— অর্থ করি নাই এবং করি না। 'যাউ নি'— যাস্ নাই এবং যাস্ না। 'খাব নি'— খাইব না। নি<নাই<নাহি। শিবায়নে 'নি'র পূর্ববর্তী রূপ 'নাই'এর (অন্য বানান নাঞি) ব্যবহার লক্ষণীয়।

দেখে নাঞি চক্ষে কিছু কর্ণে নাই শুনে।
বলে নাঞি বাক্য কিছু সতী সতী বিনে॥ পৃ. ৩৭২

দেখে নাঞি— দেখে না, নাই শুনে— শোনে না, বলে নাঞি— বলে না। তিনটি ক্রিয়াই বর্তমান কালে প্রযুক্ত, অতীতে নয়।

পূর্ণ হইল পেট আর আঁটে নাই কিছু। পৃ. ৩৭৫

আঁটে নাই— আঁটে না, ধরে না। বর্তমান কাল।

কুমারী বলেন কিছু কয়্য নাঞি আর। পৃ. ৩৮২

কয়্য নাঞি— কহিও না। অনুজ্ঞা।

সে মুখ দেখিতে সাধ কর নাঞি কেহ। পৃ. ৩৭২

কর নাঞি— করিও না। অনুজ্ঞা।

মেদিনীপুরের প্রাদেশিক কথ্যভাষায় বোই শোনি, কোই রোনি, যেয়োনি ইত্যাদি।

রামেশ্বরের শিবায়নে ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্পাদক আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি একটি বিশেষত্বের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। আমরা জানি শিবায়নে পয়ারেরই প্রাধান্য। পয়ার

চৌদ্দ মাত্রার ছন্দ, আট মাত্রায় অর্ধ যতি। 'আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়'। অর্ধযতি পদবিভাগের সূচক। ছান্দসিকদের মতে, পদ্য রচনার পক্ষে এই অর্ধযতি অত্যাবশ্যক। কবিদের হাতে এই অর্ধযতি মাঝে মাঝে লোপ পায়। অর্ধযতির বিলুপ্তি এ কালে কমই ঘটে, প্রাচীন সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত অধিক। এই বিলুপ্তিকে ছান্দসিকরা ত্রুটি বলিয়াই ধরেন। রামেশ্বর কিন্তু অর্ধযতি স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত করিয়া বহু ছত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে ছন্দের দোষ তো ঘটেই নাই বরং পয়ারের একঘেয়েমির উপর আঘাত হানিয়া কবি ইহাকে চমৎকারিত্ব দিয়াছেন।

যেমন— নবদ্বীপে শচীর উ/দরে অধিষ্ঠান।
বন্দ নন্দ যশোদা য/মুনা বৃন্দাবন।
রচে রাম অক্ষরে অ/ক্ষরে ক্ষরে মধু।
বেটা বেটী মাটির ক/রিয়া মনোহর।
পড়িয়া রহিল পার্ব/তীর পদতলে।
বর চোর দেখিতে স/ভার অভিলাষ।

এই চমৎকারিত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাসকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে অনুপ্রাস ব্যবহারে কবি অনেক ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন। দেখিতেছি ছত্রের প্রথম পঞ্চম ও অষ্টম অক্ষরে অনুপ্রাস প্রায়ই প্রযুক্ত হইতেছে। ইহার অতিরিক্ত অনুপ্রাসও দেখা যায়, কিন্তু প্রথম পঞ্চম অষ্টম অক্ষরেই যেন ঝোঁকটা বেশি। দৃষ্টান্ত

বাঁকশালী বাঁকই বু/য়ালি দাড়বাঙ্গী।
কোঙরের কল্যাণ ক/রিবে নিরন্তর।
কলিকালে কি কর্যা কৃ/তার্থ হবে নর।
বেদবিদ্যা বিহীন বি/শেষ নাহি জ্ঞান।
কর্মভুমে কুকর্ম ক/রিলে অধোগতি।
নরনাথ নরক নি/কটে উপস্থিত।
কৃষ্ণ ডাক্যা কবিরে ক/হিছে কলস্বরে।
দয়া কর্যা দিলীপে দ/য়ালু দিল কোল।
করে দিল করঙ্গ ক/পীন কটিদেশে।
গড় কর্যা গুরুকে গ/মন কৈল রাজা।
রামেশ্বর রচিল র/সিক রসোদয়।
চন্দ্রচূড় চরণ চি/ন্তিয়া নিরন্তর।
সুন্দরীর সংবাদ সু/ন্দর কর্যা বল।
দৃষ্ট দিব্য দুহিতা দ/ক্ষের হইল ঘরে।
নারদের নিকটে নি/শ্বাস ছাড়্যা উঠে।
দেবসভা দেখিতে দ/ক্ষের আগমন ;

চতুষ্পথে চলিছে চ/পল ছেল্যা সাথে
সায় দিল শঙ্কর স/ন্তোষ হইল ঋষি।
বাসা দিল বরকে বি/চিত্র বাটী মাঝে।
চেদিরাজ চলেন চা/পিয়া দিব্য রথে।
নিন্দা কর্য়া নগেন্দ্র না/রদে দেই শাপ।
সর্প সব সাজিল সো/নার অলঙ্কার।
বামে বামদেবের বি/রাজে বিধুমুখী।
কিছু দিল কার্ত্তিকে ক/ন্দুল গেল দূর।

দ্বিজ রামেশ্বরের ভাষা ভঙ্গী ছন্দ ও অলংকার প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ এখনও কিছু আছে। মুকুন্দরাম তাঁহাকে কতখানি দিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্র তাঁহার কাছে কতখানি পাইয়াছেন তাহার পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও হয় নাই, সেটা হওয়া আবশ্যক।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

বাংলা চরিতসাহিত্য। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। দাম দশ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে বাংলায় ইতিহাস নাই। শুধু যে বাংলার ইতিহাস নাই তাহা নহে, বাঙালির জীবনচরিতেরও খুব অভাব। কেবল প্রাচীন কালের কথা বলি কেন। আধুনিক যুগের অন্যতম স্রষ্টা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও জীবনচরিতও নাই বলিলেই চলে। এটা মায়াবাদের দেশ; পার্থিব জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও উৎসাহ কম। আর যদি কেহ আপন ব্যক্তিত্ববলে আমাদের জীবনে গভীর রেখাপাত করেন আমরা অতি সহজেই তাঁহার উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া বসি; জীবনচরিত কিংবদন্তী বা দৈবমাহাত্ম্য বর্ণনায় পর্যবসিত হইয়া পড়ে।

তবু মানুষ মানুষের কথা জানিতে চায়। প্রাচীন কাল হইতে ইতস্ততঃ ছড়ানো টুকিটাকির মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চলিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থকার সেই সকল বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে একত্র করিয়া চরিতসাহিত্যের আদিপর্বের অতি উপাদেয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। অস্পষ্ট সম্ভাবনার যুগ অতিক্রম করিয়া যখন ষোড়শ শতাব্দীতে উপনীত হই তখন পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের সন্ধান পাই। বাঙালির জীবনে চৈতন্যদেব খুব প্রবল আলোড়নের সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরবর্তী মহাপ্রভুদের বহু জীবনচরিত রচিত হইয়াছিল। এই সব গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও ইহাদিগকে ঠিক জীবনচরিত বলা যায় না, কারণ মহাপ্রভুদের অলৌকিক শক্তি বা অবতারত্ব প্রমাণ করাই এই সকল গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে তথ্যগত প্রামাণিকতার অভাবের জন্যও ইহাদিগকে বস্তুনিষ্ঠ জীবনচরিত মনে করা যায় না। দেবীপদবাবু মনে করেন যে, ইংরেজের অভ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করার এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় যে সূচনা দেখা যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত জীবনচরিত রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রচেষ্টা চরমে

পহুঁছায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'-গ্রন্থে যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হিসাবে চিত্রিত হইয়াছেন। দেবীপদবাবু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর চরিতসাহিত্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন এবং তাহাদের তথ্যগত প্রামাণিকতার সুষ্ঠু বিচার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া যে ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে এই চরিতসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন। এই সুচিন্তিত সুলিখিত গ্রন্থে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপরেখাও অঙ্কিত হইয়াছে।

'বাংলা চরিতসাহিত্য' বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবে। কিন্তু ইহা আর-একটি অভাবের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। জীবনচরিত প্রধানতঃ মানুষের কাহিনী, ঐতিহাসিক পরিবেশের নহে। ইহা ব্যক্তিস্বরূপের উদ্ঘাটন করে, শুধু দোষগুণের বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহা তথ্যনিষ্ঠ হইবে; সেই হিসাবে ইহা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের অঙ্গ। আবার ইহা চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করে; সেই জন্যই ইহা সাহিত্য। হ্যাম্‌লেট যেমন শেক্সপীয়রের সৃষ্টি, জন্‌সন্‌ও তেমনি বস্‌ওয়েলের সৃষ্টি। কেহ কেহ মনে করেন যে, যে সক্রেটিস্‌কে আমরা জানি তিনি প্লেটোর সৃষ্টি। যে কল্পনার প্রেরণায় চরিত্র সহস্রশিখায় দীপ্যমান হইয়া উঠে বাংলা চরিতসাহিত্যে তাহার কতদূর পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থকার তাহার বিচার করেন নাই। তাঁহার পরবর্তী কোনো সমালোচক এই অভাব পূরণ করিবেন এইরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। বর্তমান গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের দৃষ্টি যে পূর্ণতর পরিণতির দিকে প্রসারিত হয় তাহা ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

বাঁকুড়ার মন্দির। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ৯। দাম পনেরো টাকা।

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পুঁথির রুদ্ধকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দেশের কাব্যে গানে ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে গ্রাম্য পার্বণে ব্রতকথায় পল্লীর কুষিকুটিরে স্বদেশ-সন্ধানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন, স্বদেশ-সন্ধানের দায়িত্বপালনেও আমরা কবির আহ্বানকে বিশেষ মর্যাদা দিই নি।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা আপাতত ছেড়েই দিলাম, এই বাংলাদেশের— স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের— অন্যতম জেলা বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদ অপরূপ দেবালয়গুলি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কতটুকু? ক'জন সংস্কৃতি-উৎসাহী ভ্রমণবিলাসী বাঙালি বাঁকুড়ার মন্দির— সব না হোক অন্তত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি— দেখেছেন? হুগলী হাওড়া বর্ধমান ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বহু শিল্পকীর্তি ছড়ানো আছে, কিন্তু আমরা ক'জন সেগুলির খোঁজ রাখি?

সেইজন্যই অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়ার মন্দির'এর মত সুমুদ্রিত সুসজ্জিত ও উল্লেখ্যসংখ্যক আলোকচিত্র-সংবলিত গ্রন্থের প্রকাশে আনন্দিত বোধ করতে হয়, আশান্বিত হতে হয়। বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের শিল্পকীর্তির তথ্যঋদ্ধ ইতিহাস ছাড়াও এই গ্রন্থ আমাদের আত্মসমালোচনা করার সুযোগদানের জন্যও মূল্যবান; অন্যথা-সংস্কৃতিগর্বী আমরা জাতিগতভাবে পুরনো মন্দির ভাস্কর্যকৃতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির প্রতি কত উদাসীন বৃক্ষকবলিত ধ্বংসোন্মুখ কয়েকটি মন্দিরের নিষ্করুণ

আলোকচিত্র তারই ইঙ্গিত বহন করে। এই জাতিগত উদাসীনতায় সোহাগা হয়েছে অসহ্য বণিকবৃত্তি ও সীমাহীন লোভ, যার ফলে গ্রাম জনপদ থেকে তো বটেই, পাহারাদার-শোভিত মিউজিয়ামগুলি থেকেও প্রায়শঃই মূল্যবান শিল্পদ্রব্য অপহৃত হচ্ছে।

'উপক্রমণিকা' (১-১০ পৃষ্ঠা) সহ মোট আটটি অধ্যায়ে (১১-১৮৮ পৃষ্ঠা) গ্রন্থটি বিভক্ত। শিল্পকলা যেহেতু সমসাময়িক সমাজ-মানসেরই প্রতিফলন, সামাজিক পটভূমিতেই যেহেতু শিল্পকলার বিচার-বীক্ষণ করণীয়, সঙ্গতভাবেই লেখক তাই বাঁকুড়ার মন্দির ও মন্দিরভাস্কর্যের আলোচনার পূর্বে চারটি অধ্যায়ে— 'ভৌগোলিক বিবরণ' 'আদিবাসী সমাজ ও ধর্মজীবন' 'আর্য-অনার্য ধর্মসমন্বয়' এবং 'বাঁকুড়া অঞ্চলে আর্যধর্মের বিস্তার'— প্রাসঙ্গিক তথ্যতত্ত্বের সন্নিবেশ করেছেন। লেখকের নিজের কথাতেই :

'বাঁকুড়া জেলা তথা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দু মন্দির কেবলমাত্র দেব-উপাসনার জন্যই ব্যবহৃত হয় নি; সেগুলির দ্বারা নানাবিধ ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়েছে।··· বস্তুত রাঢ়দেশে কিংবা ভারতের অন্যত্র হিন্দু মন্দিরগুলি সমাজজীবনের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত থেকে দিকে দিকে প্রবাহিত গোষ্ঠীচেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, শুভবুদ্ধি সিঞ্চিত করেছে নানাভাবে। স্থানীয় মানবকুলের যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই মন্দিরগুলিকে প্রদক্ষিণ করেই শত আবর্তে প্রবাহিত হয়েছে আবহমানকাল। মন্দিরের ইতিহাস সেজন্য শুধুমাত্র ইমারতের গঠনপ্রকরণ বা বিগ্রহের বর্ণনা নয়, জনমানসের যাবতীয় স্পন্দন সেগুলিতে বিধৃত।' —পৃ. ১৮৭-৮৮।

স্পষ্টতঃই, উদ্ধৃতাংশে গ্রন্থকারের চোখের দেখার সঙ্গে দেখার চোখের সার্থক মেলবন্ধনের পরিচয় প্রমূর্ত।

মন্দির যখন দেবালয়, তখন ধর্মজীবন, বিস্তৃতভাবে সমাজজীবন, অধ্যয়নের জন্য মন্দিরগুলির গুরুত্ব অবিসংবাদিত। হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা বা অধ্যাত্মজগতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের আন্তরিক সমন্বয়-প্রয়াস বাঁকুড়ার অনেক ভাস্কর্য-অলংকৃত মন্দিরেই চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণতঃ, সোনামুখীর শ্রীধর বিগ্রহ শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণু, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলানটির দু'পাশে কালীমূর্তি, মন্দিরের সম্মুখভাগে শিব-বিবাহের একাধিক ভাস্কর্য ও দক্ষিণের দেওয়ালে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ-সমেত এক মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বাঁকুড়ার মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণগুলি থেকে সমসাময়িক জীবনচর্যা রুচিপ্রকৃতিরও পরিচয় মেলে। তৎকালীন সমাজে জনপ্রিয় বাইজী-নাচ বা বারাঙ্গনা-বিলাস, প্রমোদ-ভ্রমণের নানাবিধ আলেখ্য, শিবিকাবাহিত ফরসিসেবন-নিরত ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রতিমূর্তি, রূপসীদের প্রসাধন, সাজসজ্জা, বাদ্যযন্ত্র অনুশীলন প্রভৃতি বিষয় শিল্পীদের নানারূপ মোটিফের সন্ধান দিয়েছিল। বাঙালিজীবনের অঙ্গাঙ্গীভূত নানাবিধ উৎসবপার্বণ কন্যাসম্প্রদান বধূবরণ সিঁদুরদান পাশাখেলা প্রভৃতি বিবিধ সমাজগত উপকরণও বাঁকুড়ার মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যগুলিতে রূপাকীর্ণ। শুধু বাঁকুড়ার মন্দিরেই নয়, বাংলাদেশের তাবৎ মধ্যযুগীয় মন্দির-অলংকরণেই সমকালীন সমাজের রীতি-নীতি আচার-আচরণের স্বাক্ষর দীপ্যমান।

আর্নল্ড হাউজার তাঁর 'শিল্পেতিহাসের দর্শন' গ্রন্থে গথিকরীতির আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলেন : ক্রস-ভল্টিং এবং ভার্টিক্যাল কম্পোজিশনের ধারণা, গথিকরীতিতে কোন্‌টি আগে এসেছিল? গথিক ক্যাথিড্রালের নির্মাতারা 'ভার্টিক্যাল'এর ধারণা সেকাল-লভ্য উপাদান থেকে পেয়েছিলেন, না কি এই

ধারণা— উচ্চতা সম্পর্কিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ—তাঁদের সেই ধারণাকে রূপায়িত করবার উপযোগী উপাদান সন্ধানে প্রবুদ্ধ করেছিল? ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কেও এই ধরণের নানা মৌল প্রশ্ন জাগে, যদিচ সেইসব প্রশ্ন বিশেষ উত্থাপিত হয় না। বাঁকুড়ার মন্দির আলোচনাপ্রসঙ্গে, সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ধরণের কিছু প্রশ্ন তুলেছেন ও উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাঁকুড়ার তথা মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের অধিকাংশ মন্দিরই সাধারণ বাঙালির কুড়েঘরের আদর্শে তৈরি। এই সব মন্দির পোড়ামাটির ইঁটে তৈরি বলে সামগ্রিকভাবে বাংলার মন্দিরস্থাপত্য সর্বভারতীয় মাপকাঠিতে হ্রস্বাকৃতি ও আড়ম্বরহীন। অর্থাৎ পাথরের অপ্রতুলতার জন্য খুব বড় আকারের পাথুরে মন্দির বাংলাদেশে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। বাংলাদেশে মন্দিরস্থাপত্যের এই হ্রস্বাকৃতির কারণ কি শুধুমাত্র পাথরের অপ্রতুলতা এবং ইঁটের ব্যবহারেই নিহিত? না কি দেবতাকে দেখার চোখের উপরই দেবালয়ের গঠনপ্রকরণ নির্ভর করেছে? বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মতে, বাঙালি তার উপাস্য দেবতাকে নিজের পরিবারেরই একজন মনে করে (স্মরণীয় বাঙালি শিব 'মাতাল ভোলানাথ', বাঙালি কৃষ্ণ 'নন্দদুলাল' কিংবা 'শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি'), বাঙালি ভক্ত তাই তার দেবতাকে নিজ বাসগৃহের আকৃতির নিলয়ে রেখে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সাধনা করেছে, এই জন্যই কুড়েঘরের আদর্শ বাঙালি স্থপতিদের কল্পনা সহজে অধিকার করেছে (পৃ ৯৯)। কিন্তু দেবতাকে দেখার এই ভঙ্গী এবং সেই ভঙ্গীর উপযোগী মন্দিরনির্মাণ আগে, না কি উপাদানগত ও স্থাপত্যগত কারণে কুড়েঘরের আদর্শে দেবালয় নির্মিত হবার পরে দেবতাকে ও-রকম অন্তরঙ্গভাবে দেখার ভঙ্গী গড়ে উঠেছে? আপাততঃ এ প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এবং যে সংস্কৃতিতে অসংখ্য ধারা এসে মিশেছে, সে সংস্কৃতির শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ- ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। বাংলাদেশের সারল্যশোভন বিনীতদর্শন মন্দিরগুলি দেখে এক-এক সময় মনে হয়, এদের গঠনাদর্শ বেশ প্রাচীন, অর্থাৎ প্রাচীনকালেও খুব সম্ভবত বাংলার দেবালয়গুলি কাঠ-খড়-বাঁশের উপকরণে চালাঘর হিসাবেই নির্মিত হত। বাঁকুড়ার তথা রাঢ়-বাংলার মন্দিরগুলির স্থাপত্যচরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ের ধর্ম-চিন্তায় আর্যেতর ধ্যানধারণার ব্যাপক সংমিশ্রণের উল্লেখ করেছেন এবং অনুমান করেছেন, রাঢ় দেশবাসী অরণ্যচারী দরিদ্র আদিবাসী উপজাতিগুলি তাদের উপাস্য দেবতাদের জন্য স্থায়ী দেবালয় কখনো করতে পারে নি, স্বভাবতঃই বিত্তের ও সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে; সাধারণতঃ গাছতলায় মাটির বেদীতে দীর্ঘকাল ধর্মোপাসনার কাজ চালিয়ে আসার জন্য রাঢ় উপজাতিদের স্থাপত্যকলা সারল্যচিহ্নিত হয়েছিল এবং সেই স্থাপত্যগত সারল্য পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু যুগের মন্দিরনির্মাণরীতির উপরেও স্বভাবতঃই কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেখকের এই অনুমান অসঙ্গত নয়, স্বভাবী যুক্তিরই অনুগামী।

বাঁকুড়ার বর্তমান মন্দিরগুলির মধ্যে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটিই সর্বপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ, খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান। স্থাপত্যরীতি বিচারে, উড়িষ্যার রেখ-দেউল পর্যায়ের। দেউল শ্রেণীর আরও কিছু মন্দির বাঁকুড়ায় আছে, এ শ্রেণীর সর্বাধুনিক দেবালয় সপ্তদশ শতকের ঘুটগেড়িয়ার মন্দির। বাঁকুড়ায় তথা মধ্যযুগীয় বাংলায় অন্য যে-রীতির—'বাংলা রীতি' নামে যা অভিহিত—মন্দির তৈরি হয়েছিল, তার ব্যবহারিক রূপ প্রধানত তিনটি : বাংলা-মন্দির (যেমন, সতেরো শতকে), চালামন্দির (যেমন, বিষ্ণুপুরের চার-চালা-একচূড় লালজী মন্দির) ও 'রত্ন' বা বহু শিখরযুক্ত মন্দির (যেমন, বিষ্ণুপুরের

বহুলাড়া মন্দির । বাঁকুড়া
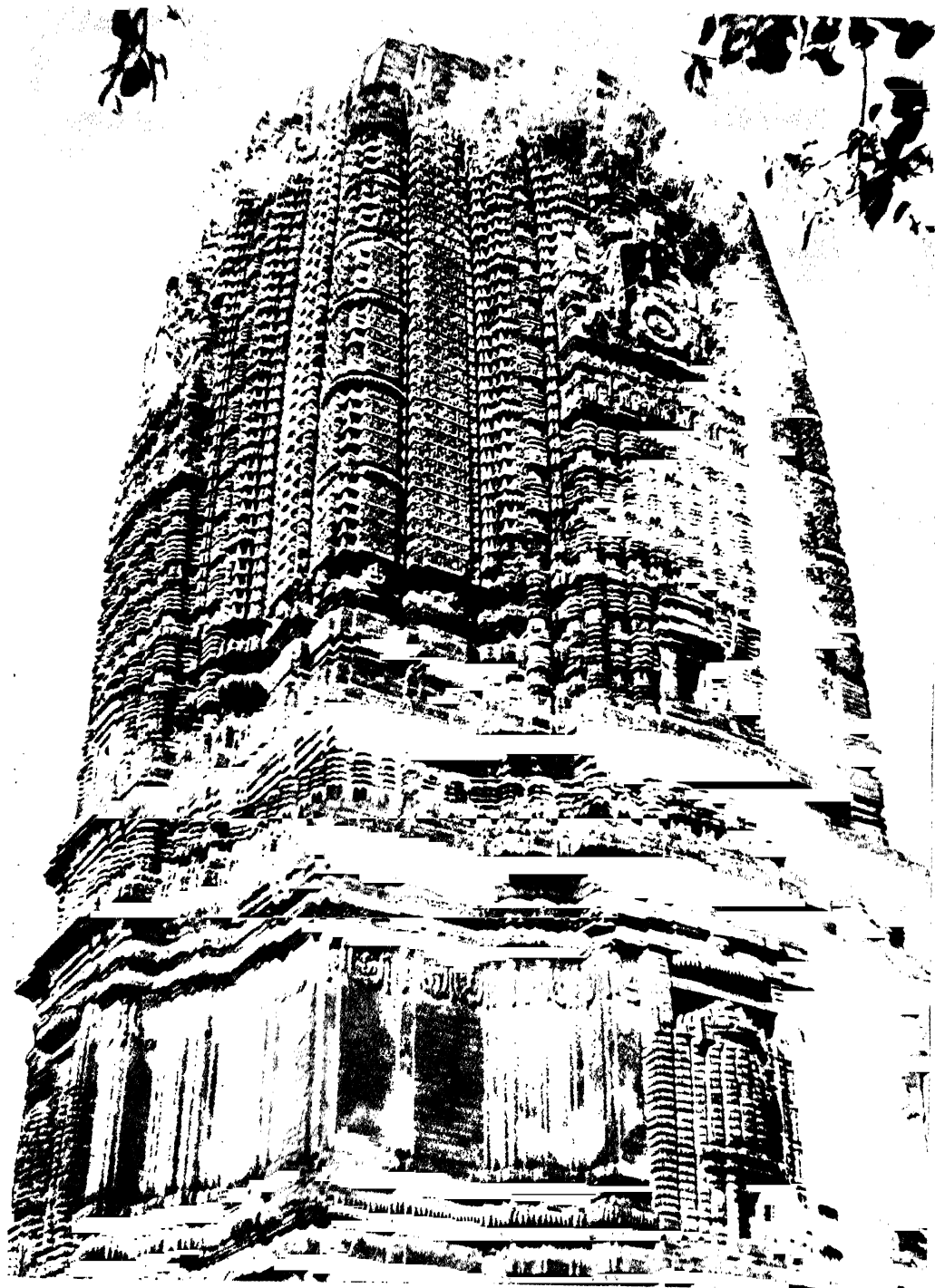
খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক

শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির)। এই তিন শ্রেণীর মন্দির ছাড়া আরও দু-এক ধরণের মন্দির আছে। বাঁকুড়া শহরের অদূরে এক্তেশ্বরের শিব মন্দির, বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর মন্দির ও পিরামিডাকৃতি রাসমঞ্চ ভিন্নতর স্থাপত্যরীতির দৃষ্টান্ত। 'বাঁকুড়ার মন্দিরস্থাপত্য' অধ্যায়ে সাধারণভাবে বাঁকুড়ার মন্দিরগুলিতে অনুসৃত স্থাপত্যরীতির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সঙ্গে 'মন্দির-পরিচয়' মন্দিরের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তথ্যঋদ্ধ বিবরণ পঠনীয়। অধ্যায় দুটি বলাই বাহুল্য পরস্পরের পরিপূরক।

লেখকের দু-একটি উক্তি সম্পর্কে আমার কিছু বিনীত জিজ্ঞাসা বর্তমান। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, জৈন তীর্থংকর মহাবীরের মাধ্যমে ঘোরতর অসভ্য সুব্বভূমি, লাঢ়, বজ্জভূমি প্রভৃতি বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে আর্য অনুপ্রবেশ সর্বপ্রথম সূচিত হয় (পৃ ৩১)। মহাবীর 'আর্য' ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে লাঢ় অঞ্চলে 'আর্য অনুপ্রবেশ সর্বপ্রথম সূচিত' হয়েছিল, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ আছে কি ? খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকেও তো বঙ্গদেশ (পশ্চিমবঙ্গ সহ নিশ্চয়ই) সঙ্কীর্ণযোনির দেশরূপে আর্যসংস্কৃতির ধারক-বাহকদের কাছে নিন্দিত। ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় পোড়ামাটির ভাস্কর্যে দেবালয় সজ্জিত করবার রীতিকে বাংলাদেশের, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের, নিজস্ব বলেছেন ; শুধু 'নিজস্ব' নয়, এই রীতিকে 'বঙ্গসংস্কৃতির একেবারে নিজস্ব ও অন্যতম মহামূল্যবান সম্পদ' বলে বর্ণনা করেছেন। পোড়ামাটির ভাস্কর্য বাংলাদেশের মন্দির-অলংকরণে বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল সত্য, কিন্তু 'নিজস্ব' বা 'একেবারে নিজস্ব' এবং 'বহুল ব্যবহার' সমার্থক নয়। তা ছাড়া পাহাড়পুরকে বাদ দিলে অধুনা বিদ্যমান পোড়ামাটির মন্দিরভাস্কর্যের সবই মধ্যযুগের, একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে নয়। অন্যপক্ষে ভারতের অন্যত্র পুরনো ইঁটের মন্দিরে (আপাতত সংখ্যায় অনুল্লেখ্য হলেও) পোড়ামাটির কাজের সার্থক ব্যবহার দুর্লভ নয়, প্রমাণ—ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরগাঁও মন্দিরের মনোরম পোড়ামাটির ভাস্কর্য। বস্তুতঃ অন্যান্য প্রাচীন দেশের মত ভারতেও পোড়ামাটির শিল্প-ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। বাস্তব নিদর্শন ছাড়া এর সাহিত্যগত প্রমাণও আছে। কালিদাস-প্রোক্ত 'চিত্রিতমৃত্তিকাময়ূর' বা বাণভট্ট-কৃত রাজ্যশ্রীর বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে মৃৎশিল্পকৃতির উল্লেখ এ সূত্রে স্মরণীয়। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, ইষ্টকনির্মিত মন্দিরগাত্র অলংকরণেও পোড়ামাটির কাজ স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহৃত হত।

এহ বাহ্য। 'বাঁকুড়ার মন্দির' সম্প্রতিকালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। প্রীতি-মমতা-সহানুভূতির চোখে দেখা বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির সুলিখিত বিবরণের মধ্যে পুরা-বাংলার একটি শিল্পকলা-সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রায়-অবহেলিত চিত্র পুনরুদ্ধৃত হতে দেখা গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গ্রন্থনায় বর্তমান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ বলে 'বাঁকুড়ার মন্দির' পরবর্তী গবেষকদের কাছে আকর-গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। গ্রন্থকার স্বয়ং কুশলী আলোকচিত্রশিল্পী, ফলতঃ তাঁর স্ব-কৃত বাঁকুড়ার মন্দির ও মন্দিরভাস্কর্যের সুন্দর আলোকচিত্রগুলি গ্রন্থের মূল্য বহুলপরিমাণে বর্ধিত করেছে। সংক্ষেপে, 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর লেখক বাঙালিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন, বিশেষতঃ মাতৃভাষায় এ-জাতীয় গ্রন্থরচনা করে তিনি সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ ঐতিহাসিকের, হাত লেখকের।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

Studies in Indian History and Culture. অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশাম্। সম্বোধি পাবলিকেশনস্, কলিকাতা ১। দাম পঁয়ত্রিশ টাকা।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল ও আফ্রিকান স্টাডিজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ব্যাশামের নাম ভারতীয় সুধীমহলে বিশেষ পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বই *The Wonder that was India* ও নানা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বই ও প্রবন্ধ অনেকেরই পড়া। এই বহু-অধীত পণ্ডিত মানুষটির সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা আত্মিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা ভারতবর্ষ, তার অতীত, তার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির, তার ঐতিহ্যের ধারার, তার বিচিত্র নরনারীর এমন একটা সহানুভূতিপূর্ণ অথচ বিচক্ষণ কিন্তু আবেগহীন তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ পেয়েছি যাতে মন খুশি হয়েছে।

সতেরোটি বিস্তৃত অধ্যায়ে ভারত-ইতিহাসের যাত্রাপথের কয়েকটি দিক্ নির্ণয়ের সহায়তা করেছেন অধ্যাপক ব্যাশাম্। ঐতিহাসিক বিবর্তনের দৃষ্টিতে ভারতীয় খণ্ড মহাদেশের ইতিহাস, দ্রাবিড় ও আর্যদের বিচার, ভারতীয় ইতিহাসের সাহিত্যের উপাদান, তার অনুবাদ সাহিত্য, অজাতশত্রু ও লিচ্ছবিদের কথা, কাশ্মীরের কাহিনী, প্রাচীন ভারতের কতকগুলি মৌলিক রাজনৈতিক বিশ্বাস, সে যুগের সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস, সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক, বিশেষ করে রাজপুত্র বিজয়ের বিজয়অভিযানের কথা এবং আরো অনেক খণ্ডখণ্ড কাহিনী উদ্ধৃত করে ড. ব্যাশাম্ ভারত-ইতিহাসকে ঘিরে এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা সত্যিই শুধু পড়তে মনোরম নয়, যুক্তিতেও বিচারসহ।

অধ্যাপক ব্যাশাম্ আমাদের কতকগুলি মৌলিক তথ্যও শুনিয়েছেন— এই দেশে কোনো দিন সারা ভারত জুড়ে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা টি঳কতে পারে নি কেন?— অবশ্য আমাদের বহুবিস্তৃত বিরাট দেশ, যানবাহনের অসুবিধা, কিন্তু মহাচীনে তো এ ত্রুটি ছিল না— তার একটি বিশেষ কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে একটা বড় দেশ চালাবার মত শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি যেটা সম্ভবপর হয়েছিল শুধু বৃটিশযুগে একটা সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের অভ্যুত্থানে। চীনে কিন্তু রাজবংশের উত্থানপতন তুচ্ছ করে ম্যাণ্ডারিন শাসন যুগযুগ ধরে চলে আসছে। আর-একটা দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন যে অনেকের ধারণা যে ভারতবর্ষের দৃষ্টি বুঝি সব সময়েই অন্য জগতের দিকে। অধ্যাত্মমানসের ধূম্রলোকের মায়াজালেই যেন আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস করতেন— তাদের কামকামনা ছিল না, আশাআকাঙ্ক্ষা ছিল না, ভোগলিপ্সা ছিল না, উগ্রতা ছিল না, লুব্ধতা ছিল না।

ভারতের ইতিহাস শুধু মৌর্য, কুশান, সাতবাহন, হুণ, শক, গুপ্ত, পল্লব, চালুক্য, চোল, গঙ্গা, পাঠান, মুঘল, শিখ, মারাঠা, রাজপুত, ব্রিটিশের কাহিনীই নয়। এর ইতিবৃত্তে এর অতিরিক্তও এমন একটা কিছু আছে যা জীবন্ত, গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়। বাইরে থেকে দেখলে দেখা যায় যে এই ঐতিহাসিক যুগেই সে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে দুবার (হাজার বছরের মধ্যে)। ইসলামের চণ্ড বেগ তাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছে আর প্রতীচি থেকে এসেছে আর-এক দুর্বার স্রোত, তার জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন রাষ্ট্রবোধ সমাজসংস্কারের বিচিত্র চেতনা নিয়ে। এই দুই আঘাতই আমাদের যেমন ভেঙেছে, তেমনি গড়েছে। আধুনিক চিন্তার ধারা বৈজ্ঞানিককে যেমন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের বদলে সর্বং খল্বিদং ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলে নিয়ে গেছে তেমনি ঐতিহাসিককেও সব ঘটনার মধ্যেই অদৃশ্য সূত্রের অনুসন্ধানে লিপ্ত করেছে। জানি,

অধ্যাপক ব্যাশাম্‌, ভিনসেণ্ট স্মিথের মত ভারত-ইতিহাসের এই মৌলিক ঐক্যবোধ (unity in diversity) মেনে নিতে পারেন নি।

অধ্যাপক ব্যাশামকে যখন ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যাতারূপে পেলাম তখন তাঁকে ড. লাসেনের হেগেলিয়ান মত বা মুন্সীজির 'জেনারল উইল' বা শাশ্বত মনকে খোঁজার চেষ্টা বা ভিনসেণ্ট স্মিথের মত বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র সন্ধানে চেষ্টিত দেখলাম না। তিনি বরং রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেম রায়চৌধুরীর সাথেই সায় দেন। তাঁর শেষ বক্তব্য ('when the facts are firmly established, the underlying causes and the overall patterns may become plain' পৃ ২৩৬)—আগে তথ্য সংগ্রহ করুন, তার পর সেগুলিকে বিচারবিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত করুন তবে তার অন্তর্নিহিত কারণ বা প্যাটার্ন স্পষ্ট হবে। কিন্তু ড. ব্যাশামের একটি কথা মনে রাখা উচিত 'The historian is also the prisoner of his own time and place in a subjective sense'। ঐতিহাসিক তাঁর নিজের স্থানের কালের ভাবদুর্গে বন্দী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী ও দার্শনিক ক্রোচের এই মত।

আসলে ঐতিহাসিক হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক যিনি তথ্যসংগ্রহে নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন কেন এই ঘটনাপুঞ্জ ঘটলো—সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন জীবনশিল্পীরও কাজ করবেন, ঐ নিছক শুকনো তথ্যগুলি থেকে একটা সবিশেষ প্যাটার্ন বা শৈলী তৈরি করবার চেষ্টাও করবেন যা যুগপৎ আনন্দ দেবে ও প্রেরণা জোগাবে (পৃ ৪)। মহাভারতের শান্তিপর্বে বা অন্যত্র বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা নানা ধরণের মতবাদ পাই। অতীন্দ্র বসুও নৈরাজ্যবাদের সমর্থনে অনেক কিছু মতবাদ এদেশে ওদেশের পুস্তক থেকে সংগ্রহ করেছেন। প্রাচীন ভারতে 'জন' বলতে কি বোঝাত, সেখানে আজকের মত 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' ডেমোক্রেসী ছিল কিনা, তার অর্ণবপোত কোন কোন সাগরে ভ্রমণ করত এসব নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন কাশীশ্বরপ্রসাদ জয়সোয়াল, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কিন্তু ড. ব্যাশাম ঠিকই বলেছেন যে এদের অবচেতনে কাজ করেছে তাদের মত ও পথের প্রেরণা। ভিনসেণ্ট স্মিথের ক্যাথলিক বা ল্যাসেনের হেগেলিয়ানপ্রীতি, হ্যাভেলের প্যান এরিয়ানিজম্‌; জয়সোওয়ালের ব্যারিস্টারী সওয়াল (Counsel for defence) বা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশকে বড় করে দেখানোর রাজনৈতিক প্রেরণা কেমন করে ঐতিহাসিক নিষ্ঠাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে তার বিশদ আলোচনা করেছেন ব্যাশাম সাহেব তাঁর পুস্তকের ষোড়শ অধ্যায়ে (Modern Historians of Ancient India)। এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে পঠিতব্য। এই প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, হেম রায়চৌধুরী, রমেশ মজুমদার, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেছেন বটে কিন্তু ভারত-ইতিহাসচর্চার মূল দুর্বলতাটি কোথায় তা ব্যক্ত করেছেন ড. মজুমদারের ভাষায় 'Indian history in a comprehensive sense, has so far been neither written nor even conceived in a proper spirit' (পৃ ২৩০)। ভারত-ইতিহাস সামগ্রিকভাবে এখনো লেখা হয় নি বা তার পরিকল্পনাও হয় নি। হয়তো কথাটা সত্য, কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনাকে ধরতে গেলে শুধু পাথুরে প্রমাণ, তাম্রশাসন জয়স্কন্দাবারের প্রশস্তি কাহিনী বা কবির জয়গানই সব নয়, সে যুগের মনকে উদ্ধার করবে কে? ইতিহাসের গতিতে মাঝে মাঝে ছেদ বা গমক থাকলেও

বা আকস্মিকের মালা গাঁথা হলেও এবং ইতিহাস খানিকটা প্যাটার্ন মাফিক চললেও কালসমুদ্রে এগিয়েই চলেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না (never repeats itself)।

তাই ইতিহাসের অমোঘ বাণী শুধু ঘটনার পঞ্জী নয়, রূপকথার আসরও নয়, সত্যের নির্মম বিচারবিশ্লেষণের সঙ্গে আরো কিছুর সন্ধান। দিনে দিনে সঞ্চিত দৈন্যের গ্লানিও তার সন্ধানী চক্ষু এড়ায় না, এই ভালো আর মন্দ নিয়েই ইতিহাসের যাত্রা শুরু, তার ছবির প্রতিফলন।

সেইজন্য ড. ব্যাশাম যখন বলেন যে ইতিহাসের তথ্য নিয়ে যতটা গবেষণা চলে, তত্ত্ব নিয়ে ততটা নয় তখন সেটা স্বীকার করতেই হয়।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Rabindranath. সতী ঘোষ। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। দাম বারো টাকা।

অন্যান্য ভাষার কথা বলা হচ্ছে না, বিশেষ ক'রে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা ও কর্মকৃতি সম্বলিত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। আরও যত বেশি প্রকাশিত হয় ততই ভালো। এই বইটি রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার এক তথ্যপূর্ণ আলোচনা। কবিজীবনের উপাদান একই, কিন্তু বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার বিচারবিশ্লেষণ করে থাকেন বিভিন্নভাবে।

তেরোটি অধ্যায়ে ভাগ ক'রে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ও কর্মের বিভিন্ন স্তর এই বইতে আলোচিত হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষের কথা থেকে আরম্ভ ক'রে যাবতীয় তথ্য এতে আছে। পরিশিষ্ট অংশ দশ ভাগে বিভক্ত— বংশলতিকা, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থের তালিকা, ইংরেজিতে ও বাংলায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত বইয়ের তালিকা ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের তেমন পরিচয় নেই তাঁদের কাছে বইটির আদরণীয় হবার কথা। অল্পপরিসরের মধ্যে কবিজীবনের অনেক তথ্য তাঁরা এই বইটিতে পাবেন।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্ররচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিরই ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে অনেক আগে থেকে অনেকে পরিচিত। অন্যান্য উৎসাহী অনুবাদক নূতন ক'রে আবার অনুবাদ করবেন এ'তে কারও আপত্তি থাকার কথা না, বরঞ্চ অনেকে উৎসাহই দিয়ে থাকেন; কেননা ইংরেজি ভাষারও বিবর্তন ঘটছে, সব ভাষার মতই একালের ইংরেজি ভাষাও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ইংরেজি ভাষার থেকে কিছুটা পৃথক। কিন্তু তবুও একটা কথা, অনুবাদ-কাজটা কেবল ভাষান্তরণ নয়, ভাবব্যঞ্জক হওয়া চাই।

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত

স্বরলিপি

আপনহারা মাতোয়ারা   আছি তোমার আশা ধরে—
ওগো সাকী, দেবে না কি   পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে ॥
রসের ধারা সুধায় ছাঁকা,   মৃগনাভির আভাস মাখা   গো,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি   দূরের থেকে মাতায় মোরে ॥
মুখ তুলে চাও, ওগো প্রিয়ে— তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার   দাও-না আমায় অমর ক'রে।
নন্দননিকুঞ্জশাখে   অনেক কুসুম ফুটে থাকে   গো—
এমন মোহন রূপ দেখি নাই,   গন্ধ এমন কোথায় ওরে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[^ঋ^র্জ্ঞা -র্ঋা । র্ঋা -র্সা র্সা -ণা I ণা -দা]

II মা -গা । মা -ণা ণা -দা I দা -া । দা -পা পা -া I
আ ০ প ন্ হা ০ য়া ০ মা ০ তো ০

I মা -পা । -দা -পা -মা -পা I ^প^মা -গা । গা -া গা -া I
য়া ০ ০ ০ ০ ০ রা ০ আ ০ ছি ০

I গা -পা । ^ম^পা -গা গা -া I গা -ঋা । ঋা -া সা -া I
তো ০ মা র্ আ ০ শা ০ ধ ০ রে ০

I সা -ন্া । সা -মা মা -া I মা -া । -া -া -া -া I
ও ০ গো ০ সা ০ কী ০ ০ ০ ০ ০

I মা -গা । মা -গা মা -গা I মা -দা । -া -া দা -া I
দে ০ বে ০ না ০ কি ০ ০ ০ পে ০

I পা -দা । -ণা -র্সা -র্ঋা[২] -র্জ্ঞা I ^ঋ^র্জ্ঞা -র্ঋা । র্ঋা -র্সা র্সা -ণা I
য়া ০ ০ ০ ০ ০ লা ০ মো র্ ভ ০

I ণা -দা । দা -পা পা -মগা II
রে ০ ভ ০ রে ০০

II { মা -দা । দা -া দা -পা I পা -র্সা । -া -া -া -া I
র ॰ সে র্ ধা ॰ রা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I র্সা -া । র্সা -া র্সা -ণা I র্সা -া । -া -া -া -া I
সু ॰ ধা য়্ ছাঁ ॰ কা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I ণর্সা -া । র্সদা -া দা -া I দা -ঋর্া । -া -া -া -া I
মৃ ॰ গ ॰ না ॰ ভি ॰ ॰ ॰ ॰ র্

I ঋর্া -া । ঋর্া -া ঋর্া -া I র্সা -ণা । -ণা -জ্ঞর্া -া -া I
আ ॰ ভা স্ মা ॰ থা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I ঋর্া -া । -র্সা -া -া -া } I র্সা -জ্ঞর্া । জ্ঞর্া -ঋর্া ঋর্া -া I
গো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ বা ॰ তা স্ বে ॰

I র্সা -া । -া -া -া -া I র্সা -ঋর্া । ঋর্সা -া ণা -া I
য়ে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ সু ॰ বা স্ তা ॰

I পদা -া । -া -া -পা -া I দা -া । দা -া দা -া I
রি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ দূ ॰ রে র্ থে ॰

I দা -া । -া -া -া -া I মা -দা । দা -া দা -া I
কে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ মা ॰ তা র্ মো ॰

I পা -দা । -ণা -র্সা -ঋর্া২ -জ্ঞর্া I [ ] I
রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

II {সা -ণ্ । সা -দা দা -া I পা -া । -া -া -দা -া I
মু খ্ তু ॰ লে ॰ চা ॰ ॰ ॰ ॰ ও

I পা -ণা । ণা -দা দা -া I পা -দা । -মা -া -া -া I
ও ॰ গো ॰ প্রি ॰ য়ে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -ণা । ণা -দা দা -পা I পা -া । -া -া -া -া I
তো ॰ মা র্ হা ॰ তে ॰ ॰ ॰ ॰ র্

I পা -দা । দা -া দা -া I দা -র্সা । -া -া -ণা -া I
প্র ॰ সা দ্ দি ॰ য়ে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I দণা -া । দণা -দা দা -পা I মপা -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -া I
এ ক্ র ॰ জ ॰ নী॰ র্ ম ॰ তো ॰

I জ্ঞা -া । জ্ঞা -া জ্ঞা -মা I মা -া । মা -জ্ঞা জ্ঞা -া I
এ ॰ বা র্ দা ও না ॰ আ ॰ মা র্

I জ্ঞা -া । জ্ঞরা -জ্ঞা ঋা -া I সা -া । -া -া -া -া} I
অ ॰ ম॰ র্ ক ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I {দা -া । দা -া দা -া I না -া । র্সা -ঋর্া র্সা -া I
ন ন্ দ ॰ ন ॰ নি ॰ কু ন্ জ ॰

I না -া । র্সা -া -া -া I ণর্সা -া । র্সদা -া দা -া I
শা ॰ খে ॰ ॰ ॰ অ॰ ॰ নে ক্ কু ॰

I দা -ঋর্া । ঋর্া -া র্সা -া I র্সা -া । -া র্সণা -জ্ঞর্া -া I
স্ব ম্ ফু ॰ টে ॰ থা ॰ ॰ কে॰ ॰ ॰

I র্ঋা -া । -র্সা -া -া -া } I র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা র্জ্ঞর্ঋা -র্সা I
গো ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ এ ∘ ম ন্ মো ∘

I র্সা -া । -া -া -া -া I র্সা -র্ঋা । র্ঋর্সা -ণা ণা -দা I
হ ∘ ∘ ∘ ∘ ন্ রূ প্ দে ∘ খি ∘

I দা -া । -পা -া -া -া I পা -া । পা -া দা -া I
না ∘ ∘ ∘ ∘ ই গ ন্ ধ ∘ এ ∘

I দা -া । -া -া -া -া I মা -দা । দা -া দা -া I
ম ∘ ∘ ∘ ∘ ন্ কো ∘ থা র্ ও ∘

I পা -দা । -ণা -র্সা -র্ঋা[২] -র্জ্ঞা II [ ] II
রে ∘ ∘ ∘ ∘ ∘

সংশোধন। বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪

পৃষ্ঠা ৩২০ ছত্র ৫ পা পা -া স্থলে পা পা ।-
দু হা ত্ যে হা ত্

সম্পাদকের নিবেদন

গত ২ বৈশাখ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। শীঘ্রই একটি বিশেষ নন্দলাল বসু-স্মরণসংখ্যা প্রকাশ করার পরিকল্পনা বিশ্বভারতী পত্রিকা গ্রহণ করেছেন।

এই সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০ - ১৯০৮) রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌রূপেই অধিক পরিচিত। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে আসার পূর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিবিড়-নিকটে আসেন। তরুণ সাহিত্যসেবীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র এতটা আকৃষ্ট হন এবং এতটা বিশ্বাস তাঁর উপর জন্মে যে 'বঙ্কিমবাবুর যত্নে সঞ্জীববাবুর হস্ত হইতে' বঙ্গদর্শন সম্পাদনার ভার পড়ে শ্রীশচন্দ্রের উপর (১২৯০)। কিন্তু নানা কারণে অল্পকালের মধ্যে বঙ্গদর্শন প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। এর কিছুকালের মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র সাব-ডেপুটি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হন, এবং তাঁকে কর্ম-উপলক্ষে কলকাতা ত্যাগ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা কতটা গভীর হয়ে উঠেছিল, বহু-পরিচিত পত্র-কবিতার এই অংশ থেকে তা অনুমান করা যায়—

> শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
> তুমি কর ডেপুটিত্ব
> একা পড়ে মোর চিত্ত
> করে ছট্‌ফট্‌।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম-পর্যায় বঙ্গদর্শন লুপ্ত হবার আঠারো বছর পরে (১৩০৮) নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রবর্তন করেন শ্রীশচন্দ্র এবং এই উপলক্ষে তিনি লেখেন, "বঙ্গের প্রধান সাময়িক-পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।"

এই সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রের কয়েকটিতে বঙ্গদর্শন-প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে।

স্বীকৃতি

নন্দলাল বসুর চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত নন্দলাল বসুর গৃহের স্কেচ্ কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রী গুজরাটের শ্রীমতী শান্তা দেশাইএর অটোগ্রাফ খাতা হইতে গৃহীত।

ইলোরার মহিষমর্দিনী মূর্তির চিত্র শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত।

সামার্সেট্ মম্এর চিত্র ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বাঁকুড়ায় বহুলাড়া মন্দির চিত্রের ব্লক সাহিত্য সংসদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জোড়াদীঘির উদয়াস্ত

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি

কবি, সমালোচক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যঙ্গকুশলী, বাংলার বার্নার্ড শ'—প্র. না. বি বা প্রমথনাথ বিশী কথাশিল্পী হিসাবে প্রথম সাহিত্য-পাঠকদের চমকে দিয়েছিলেন তাঁর "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" উপন্যাসে। এই উপন্যাসের অসামান্য জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে এবং থাকবেও—তার প্রমাণ সম্প্রতি এই বইটি চলচ্চিত্র-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, শ্রেষ্ঠশিল্পী সমন্বয়ে এর চিত্ররূপ আরোপ শুরু হয়ে গিয়েছে। "চলনবিল", ও "অশ্বত্থের অভিশাপ" এই গ্রন্থেরই পরবর্তী কাহিনী—এই দুটি উপন্যাসও অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্প্রতি বহু পাঠকের অনুরোধে এই তিনটি গ্রন্থ সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে একত্রে প্রকাশ করা হ'ল—"জোড়াদীঘির উদয়াস্ত" নাম দিয়ে। প্রায় একশত বৎসরের পৃষ্ঠপটে, উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত 'চলনবিলে'র পটভূমিকায় এক আশ্চর্য কাহিনী এই গ্রন্থ। দাম্ভিক, বিলাসী, নিষ্ঠুর, প্রেমিক—এই জমিদার-বংশের মানুষগুলি আবেগে, মনুষ্যত্বে, দয়ায়, প্রতিহিংসায়, প্রেমে, ঘৃণায়, স্বার্থপরতায় ও আত্মত্যাগে সাধারণ মানুষ থেকে একেবারে পৃথক ও স্বতন্ত্র; তাদের এই কাহিনীও তাই। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় ডিমাই সাইজ। দাম কুড়ি টাকা।

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী কমলাকান্ত প্রমথনাথের বিরচিত অন্যান্য বই

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড	৫·০০	**পূর্বাঙ্গ**	১৫·০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা	৫·০০	**নীরস গল্প-সঞ্চয়ন**	৩·৫০
শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬·০০	**নানা-রকম**	৬·০০

•

ডক্টর সুশীল রায়ের সর্বকালের সম্পাদনা

ব ঙ্গ প্র স ঙ্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন : "ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষা আমাদের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি নূতন দৃষ্টি ও চিন্তা আনয়ন করিয়াছিল মোটামুটিভাবে তাহার একটি সামগ্রিক পরিচয় জানিতে হইলে রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় লাভ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াই শ্রীসুশীল রায় মহাশয় "বঙ্গপ্রসঙ্গ" গ্রন্থখানি সুসম্পাদিতভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। নির্বাচন-ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয়ের এই একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যাহাতে লেখাগুলির ভিতর দিয়া আমাদের বাঙ্গালী জীবনের সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটিয়া ওঠে। তাই রামমোহনের আদিবঙ্গ লেখার পরেই রাসসুন্দরী দেবীর সেকালের গৃহবধূর রেখাচিত্রটি পাইয়া মন খুশী হইয়া ওঠে, সেকালের সেই গৃহবধূটির চিত্রের মধ্যেও ত আমাদের সমাজজীবনের একটি কমনীয় পরিচয় রহিয়াছে। লেখাগুলির মধ্যে যেমন বাংলার ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে, তেমনই আবার বাংলার ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, বাংলার গৌরব, বাংলার দুর্বলতা, বাংলার শিল্প, লিপি, বর্ণমালা—সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোচনা রহিয়াছে।" ডিমাই সাইজ। ৩১০+১০ পৃষ্ঠা। দাম দশ টাকা।

ডক্টর সুশীল রায়ের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তি

মনীষী-জীবনকথা	১০·০০	**গল্প-সঞ্চয়ন**	৩·৫০

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। ফোন ৩৪-৩৬৫৪

স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস...

এমন সময় আসে যখন আপনার দৈনন্দিন খাদ্যে দেহের সব প্রয়োজন পূরণ হয় না। তখন আপনাকে পুষ্টিকর টনিকের উপর নির্ভর করতে হয়। রোগান্তিক দুর্বলতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বা অন্য যে কোন কারণেই অবসন্ন বোধ করেন না কেন ভাইনো-মল্ট আপনার স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধাবৃদ্ধি করে, পরিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধি করে।
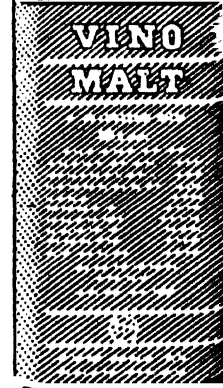
মল্ট

প্রাণোচ্ছল টনিক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

লং প্লেইং রেকর্ডে—কবিগুরুর বিশ্ববন্দিত গীতিনাট্য

"শাপমোচন"—EALP 1303

সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় একখানি পরম সুন্দর নাটক।

প্রধান অংশে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র।

এক্সটেনডেড্ প্লে রেকর্ডে—**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে** (SEDE 3008)

আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে ॥ এবার নীরব করে দাও ॥

পথের শেষ কোথায় ॥ আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান ॥

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে (7EPE 1025)

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি ॥ আমার মন কেমন করে ॥

আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥ আরো আরো, প্রভু, আরো আরো ॥

রেকর্ডে নজরুল

লং প্লেইং রেকর্ডে—THE BEST LOVED SONGS OF NAZRUL

ছ'জন শিল্পীর কণ্ঠে বারোখানি বিখ্যাত নজরুল-গীতি — EALP 1300

৭৮-আর-পি-এম রেকর্ডে—**তালাত মাহমুদ** N 83166

নিশি ভোর হল জাগিয়া ॥ আসলো যখন ফুলের আগুন

কবিপুত্র **কাজী সব্যসাচী ইসলাম**—N 83167

বিদ্রোহী — (আবৃত্তি)

— রেকর্ড-সঙ্গীত —

সম্পাদক—শ্রীসন্তোষকুমার দে

স্বরলিপি-সমন্বিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রতি সংখ্যা—১'৫০, বার্ষিক ৬'০০॥ রেজেষ্টি ডাকে প্রতি সংখ্যা—২'২০, বার্ষিক ৮'৮০।

সকল এইচ-এম-ভি ডীলারের কাছে পাবেন অথবা সোজা—'রেকর্ড সঙ্গীত'

৩৩ যশোর রোড, দমদম, কলিকাতার ঠিকানায় লিখুন।

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩

Spencer's
ICECREAM SODA

B.E. — Sihi Multistage self
priming pump for Industry
& Boiler-feed.
B.E. — Sihi
Engine driven self-priming pump
for General duties.
B.E. D self priming
pump for domestic
water supply.
B.E. — GEC Monoblock
for agriculture.
BE'M' Multistage
Centrifugal Pump for Mining
Irrigation and Boosting Pressure
in Water Mains.
BRITISH ELECTRICAL
& PUMPS (PVT) LTD.
4, Dalhousie Square East,
Calcutta-1.
Phone: 22-7826.
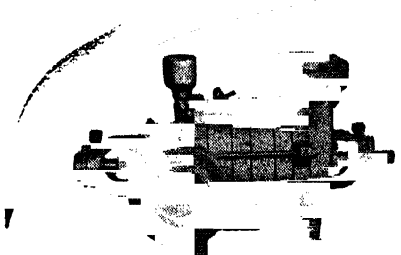
*"শরতের শান্তনির্মল আকাশ থেকে
অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বাণী এলো—
প্রস্তুত হও"*

—রবীন্দ্রনাথ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড। কলিকাতা-২৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

মৈত্রী

শিল্পী নন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

চিঠিপত্র দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

দীর্ঘকাল হইল ত্রিপুরায় পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত যখন কোন উত্তর পাওয়া গেলনা তখন সেখানকার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? বিষয় কর্ম্মোপলক্ষ্যে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই মফস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়— এবং বিচিত্র কর্ম্মের দায়ে আমার উদ্বেগের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে— নতুবা আমি কিছুকাল কলিকাতায় স্থির নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলে ইতস্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিতাম।

"পুত্রযজ্ঞ" গল্পটি সম্পূর্ণ আমার নহে। ইহা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরেন্দ্রের রচনা, তবে উহাতে আমারো কিছু হাত আছে। "শিক্ষাপ্রণালী" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখা। "ঢাকা" লিখিয়াছেন "সিরাজদ্দৌলা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ভারতী যাহাতে আপনাদের সমালোচনার যোগ্য হয় তৎসম্বন্ধে আমার চেষ্টার ক্রটি হইবে না— কেবল আশঙ্কা এই যে, নানা কাজের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাছে সম্পাদকের মনের মত আদর্শ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

সহৃদয়েষু

ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা গোলেমালে দীর্ঘকাল পরে আমার হস্তগত হইল।

আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরেও যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— যখন আপনার খবর পাইলাম তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিলনা। আশা করি আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার বন্দোবস্ত হইয়া গেছে।

শিলাইদহে আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি। আশা করি শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে দেখা পাইব। ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩০৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, চৈত্রের পর্য্যন্ত চোখের বালি লেখা ছিল তাহার পরে আর আলস্যের ভিড়ে এবং নানা অকাজের তাড়নায় লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আর বিলম্ব করিতে সাহস হয় না। আজই লিখিতে বসিয়াছিলাম— ঠিক দুটি লাইন যখন লিখিয়াছি এমন সময় আপনার চিঠি পাইলাম। কিন্তু আপনার কথা আমার স্মরণ নাই এমন মনে করিবেন না। গতকল্য অপরাহ্ণে আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছি— সেখান হইতে সে আমার প্রতি মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা কটাক্ষপাত করিতেছে— কিন্তু অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের অঙ্কুশাঘাতে আমার লেখনীকে অন্য পথে ছুটিতে হইতেছে। একটু অপেক্ষা করুন। গল্পটিকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে লইয়া পড়িব ইহাতে সংশয় করিবেন না।

তর্কবিতর্কের আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইবেননা। সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিয়া কোন প্রকার কুশের কাঁটা পায়ে ফোটে নাই এমন সৌভাগ্যবান্ কে আছে? শত্রুরা নিন্দাবাক্যে হাসেন এবং বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হন কিন্তু কুয়াশা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায় কাহারো মনেও থাকেনা। পাছে কলহের দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিয়া বসে সেইজন্য শরৎ শাস্ত্রীর লেখা আমি পড়িই নাই। তাহা ছাড়া আমি জানি হীরেন্দ্রবাবু যখন গাণ্ডীব ধরিয়াছেন তখন পরাজয়ের আশঙ্কামাত্র নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হইতেছে। তিনি যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন আমি সেরূপ কখনই পারিব না এই জন্য তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমি নেপথ্যে সরিয়া আসিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছি। দীর্ঘকাল আমি জনকোলাহলের মাঝখানে যাপন করিয়াছি— যুদ্ধের সংবাদে আমাকে আর প্রলুব্ধ করিবেন না— এখন আমার ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিন।

আপনার শরীর কেমন আছে? একবার এদিকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া যান না। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩০৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

আগামী ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নববর্ষের উৎসব হইবে— আপনার ছেলেটিকে লইয়া যদি সংক্রান্তি অথবা তাহার পূর্ব্বদিনে আসেন এবং উৎসবে যোগদান করেন ত আনন্দিত হইব। ছেলে লওয়া সম্বন্ধে আমাদের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেদের আমরা বিদ্যালয়ে লই না। কারণ ছোট ছেলেদের সহিত বড় ছেলেদের মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। আপনার ছেলেটির বয়স যদি অধিক না হয় তবে তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যান। আপনার শরীর ভাল হইবে— কাজ করিতে পারিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রণালীও দেখিয়া লইতে পারিবেন— আমাকে তাগিদ দিয়া সমালোচনা লিখাইয়া লইবারও অবসর পাইবেন। অতএব এমন সুবিধা ছাড়িবেন না। শৈলেশের দল বোধ হয় আসিতে পারে— আপনি তাহাকে পাণ্ডা স্বরূপে বরণ করিয়া লইবেন। পাথেয়ের ভার সম্পূর্ণ আমার উপর দিবেন— আহূতের পাথেয় আহ্বান-কর্ত্তার দেয় ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা— অতএব এ সম্বন্ধে আপনি যদি বিলাতী কায়দার অনুসরণ করেন তবে দুঃখিত হইব। রিক্ত হস্তে আসিবেন। কেবল যদি লেখাপড়া করিতে চান তবে আপনার অর্দ্ধসমাপ্ত ও সদ্য আরব্ধ প্রবন্ধগুলি সঙ্গে করিয়া আনিবেন। অবকাশের সময় আপনার বইখানি আপনার সঙ্গে বসিয়া পড়িবার ইচ্ছা করি— তাহা হইলে আলোচনার অনেক খোরাক পাওয়া যাইবে। শিলাইদহে আসিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে আপনাকে সেই সত্য হইতে মুক্তি দিব— অতএব ইহকাল পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না। ইতি ২৬শে চৈত্র ১৩০৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার শরীরটা ভাল নাই। আপনার চোখের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। একান্তমনে কামনা করি রোগ এবং চিকিৎসকের হাত হইতে চোখ দুটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

আপনার ছেলেটির জন্য যেমন করিয়া হউক জায়গা রাখিব আপনি ভাবিবেন না। সংখ্যা পূর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— তাহা হইলেও আপনার পুত্রের স্থান হইবে।

বিদ্যালয়ের কাজে চলিলাম— অতএব সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি শুক্রবার। [১৩০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে" ইত্যাদি শ্লোক মনে আছে? সজ্জনের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই— সূর্য্যও পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে আপনার সমালোচনাও শেষ করিয়াছি, মস্ত হইয়াছে— বঙ্গদর্শনের এক ফর্ম্মারও অধিক হইবে। এটা আলোচনা সমিতিতে পড়িবার ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে আলোচনা-যোগ্য অনেক কথার অবতারণ করিয়াছি।

ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই পাঠাইবেন— তাড়া নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চোখ দুটি সারাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি নানা শাস্ত্র হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে চক্ষু অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী। একটা পরামর্শ দিই— অন্ততঃ কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখুন। একজন ভাল হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান। বাছিয়া বাছিয়া হাতুড়ে ডাক্তার বাহির করিবেননা। যদি সম্পূর্ণ নির্জ্জন ঘরে কিছুদিন চোখ বুজিয়া থাকিতে চান তবে এখানে আসিবেন— আপনাকে অন্ধকারায় বন্দী করিয়া রাখিয়া দিব।

আজ এই পর্য্যন্ত ১২ই জ্যৈঃ ১৩০৯।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চোখের অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। একান্ত মনে কামনা করিতেছি আপনার চক্ষু দুটি নিরাময় হউক্।

আমি আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব। এগারই মাঘের কাজ সারিয়া আবার ফিরিব— সেই সময়েই হয় ত আপনার ও কবিরাজ মহাশয়ের এখানে আসা সুবিধাকর হইবে। গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনেকদিন হইতে আশা করিতেছি এখানে আপনি সপরিবারে আসিবেন, দেখিতে দেখিতে শীতকাল বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিল— গ্রীষ্ম পড়িলে এস্থান আপনাদের সুখকর বোধ হইবেনা হয় ত বেশিদিন থাকিতে পারিবেননা। অরুণ বেশ ভালই আছে— তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বিস্তারিত আলোচনা হইবে। রথী ও সন্তোষ জগদানন্দ এবং মনোরঞ্জনবাবুকে লইয়া কৃষ্ণনগরে Test Examination দিতে গেছেন। তাঁহারাও সম্ভবত বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে ফিরিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

হাজারীবাগ

বন্ধুবরেষু

পত্রে আপনার চোখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি। আশা করি আপনার দর্শন শক্তির কোন স্থায়ী ব্যাঘাত হইবেনা।

আমি এখানে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে একে একে আমাদের সকলকেই শয্যাশায়ী করিয়াছে। ঐ রোগটার দোষ এই যে উহার লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষা উত্তর কাণ্ডই বেশি নিদারুণ। কাশি দুর্ব্বলতা অরুচি মন্দাগ্নি, প্রভৃতি উপসর্গ কিছুতেই দখল ছাড়িতে চায় না।

বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইয়াছে— আধি ব্যাধির হাত হইতে কোনমতে একটুখানি ছুটি পাইলেই আমি আমার বালখিল্যগুলির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইব। সেখানে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেজন্য মন উদ্বিগ্ন আছে। শীঘ্র সেখানে একটি কারখানা খুলিবার সংকল্প আছে সেজন্যও আমার উপস্থিতি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া, আমার কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমি সমস্ত ভারই নির্ব্বিচারে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তিনি ক্রমশই ইহাকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতেছি।

কলিকাতায় প্লেগের যেরূপ উপদ্রব তাহাতে গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রীমান অরুণকে সেখানে পাঠানো কোনমতেই সঙ্গত হইবেনা। যদি আপত্তি না করেন, ছুটির সময় তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই তাহার পুরাতন পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইব। সে সময় যদি কোন সুযোগ করিতে পারি তবে আপনাদিগকেও আনাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। আমি সম্ভবত আর দিন পনেরোর মধ্যে বোলপুরে যাইব— কোন বাধা মানিবনা। ছুটির পূর্ব্বে আমি না গেলে নয়।

যতদিন বাঁচিয়া আছি আপনারা আমাকে আপনাদেরই কাজে এবং আপনাদেরই নিকটে পাইবেন; বাল্যকালে স্কুল পালাইয়াছি— প্রৌঢ় বয়সে আমার বিদ্যালয় হইতে পলাতক হইবনা।

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আর আমার চিন্তা ও চেষ্টাকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবনা। কর্ত্তব্য সঙ্কোচ না করিলে কর্ত্তব্য পালন করা যায়না কেবল বৃথা ভ্রাম্যমাণ হইতে হয়। নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়া হীরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবুকে পত্র লিখিয়াছি। Easterএর ছুটির সময় হীরেন্দ্রবাবু বোলপুরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি থাকি বা না থাকি তিনি গেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব একথা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইবেন এবং আপনিও তাঁহার সাথী হইবার চেষ্টা করিবেন। আপনাদের নিরাময় সংবাদ দিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৯শে চৈত্র ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শ্রীশবাবু আসিয়াছিলেন। নহিলে এতদিনে আপনার প্রশ্নের উত্তর পৌঁছিত। যাহা হউক আপনি আসিয়া পড়ুন— দ্বিধামাত্র করিবেন না। দুর্য্যোগ চলিতেছে। সঙ্গে সূর্য্যালোক আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইতি ১৯শে আশ্বিন ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

তাই করিবেন— আমার মন্তব্য হইতে কোন স্থান যদি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারেনা। একটু নিশ্চিন্ত না হইলে ভূমিকা লেখায় হাত দিতে পারিতেছিনা। বিদ্যালয়টি ছুটির পরে অধ্যাপকে ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া হঠাৎ কোটালের বানের মত আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— উক্ত ঘাড় অপটু আছে বলিয়া তাহার প্রতি লেশমাত্র অনুকম্পা করে নাই— আমিও হার মানিতে চাইনা— কাজেই আমাকে বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

আপনি যে পঞ্চাননবাবুর কথা বলিয়াছিলেন তাঁহাকে কি অল্প বেতনে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে? তাঁহাকে পাইলে বিশেষ সুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় লইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অম্বুবাহ মেঘের জন্য চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠ বিদ্যালয় আর কয়েকজন বেতনবর্ষী ছাত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আপনার মাথার অসুখ ভাল করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবেন না।

বড় ব্যস্ত আছি। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

শীতের জন্য চিন্তা করিবেন না। অরুণকে গরম রাখিব। ইতিমধ্যে সংস্কৃত পড়াইবার লোক পাওয়া গেছে অতএব পঞ্চাননবাবু নারাজ হওয়ায় সুবিধাই বিবেচনা করিতেছি— তিনি এখানকার যোগ্যলোক হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেন। বোটে গিয়া আপনার ভূমিকা লিখিব। অগ্রহায়ণের আরম্ভেই বোটে যাইবার সংকল্প আছে। তাহার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে। শৈলেশের গতিক কি

রকম বুঝিতেছেন? সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগরণ এই তিন অবস্থার মধ্যে সে কোন্ অবস্থায় আছে? ছাপাখানার করাল কবলের ভিতর হইতে গ্রন্থাবলী ত সাড়া দিতেছে না— হতভাগ্যের কথা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়— আজকাল হতাশ হইয়া মনে না করিবারই চেষ্টা করি। ইতি ২৪শে কার্ত্তিক [১৩১০]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১২

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

শরীর অপটু। মনও বিদ্যালয়ের অর্থচিন্তায় উৎকণ্ঠিত। রামায়ণের ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই। সে ক্ষমতা এখন নাই। কবে হইবে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনার ক্ষতি হইবে। অতএব অসময়ের এই সামান্য উপহারটুকু লইয়া আমাকে স্মরণে রাখিবেন। প্রাপ্তি সংবাদটুকু দিবেন। ইতি ২০শে পৌষ [১৩১০]।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

অরুণ যখন ছুটির পরে বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবধি তাহার চিকিৎসা ও পথ্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। এখন সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। তাহার মাথা ঘোরা সারিয়া গেছে— তাহার গায়ের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাইতেছে এবং সে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লতার সহিত অধ্যয়নে ও খেলায় মন দিতে পারিতেছে। তাহার জন্য আপনি লেশমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

পত্রে আপনার অর্থের অভাব ও শরীর মনের অবসাদের কথা পড়িয়া কষ্ট বোধ করিলাম। ঈশ্বর আপনার এ দুর্য্যোগ দূর করুন।

মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ওঁ

শিলাইদহ

প্রীতিভাজনেষু

আমার শরীর সুস্থ নহে। এখানকার আর সমস্ত খবর ভাল। অরুণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ কিন্তু নীরোগ নহে— তাহার জন্য আমার উদ্বেগ দূর হয়না— এবারে ছুটির সময় তাহাকে আমার কাছেই রাখিব।

"আমার জীবন" পুস্তকখানি উপাদেয়। শরীর তাজা থাকিলে সমালোচনা করিতাম। সমালোচনার ভার আপনিই গ্রহণ করিবেন। এরূপ গ্রন্থ গোপনে থাকিবার কোন কারণ দেখিনা।

বঙ্গদর্শন ত পাই নাই— আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন?

মোহিতবাবু বি,এ, পরীক্ষার কাগজ সংগ্রহের জন্য দিনদুয়েকের মত কলিকাতায় গিয়াছেন— বৃহস্পতিবারে ফিরিবার কথা। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

মোহিতবাবু হয় ত সোমবারে আসিবেন। তাঁহার ওখানে গিয়া খবর লইবেন। একসঙ্গে আসিলেই সুবিধা হয়— কারণ এখান হইতে কুষ্টিয়ায় বন্দোবস্ত করা কিঞ্চিৎ চেষ্টাসাধ্য— মোহিতবাবুর জন্য ব্যবস্থা করিতেই হইবে— একসঙ্গে আসিলে আমাদের পক্ষে সুতরাং আপনাদের পক্ষে সুবিধা হইবে। নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় ষ্টীমার একবার বই চলে না। সুতরাং ষ্টীমার খোয়াইলে, হয় সমস্ত দিনরাত্রি কুষ্টিয়ায় যাপন করিতে হয়, নতুবা নৌকাযোগে আসিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নৌকাপথে অন্তত ৬।৭ ঘণ্টা লাগিতে পারে। এই সমস্ত বিবেচ্য।

অরুণকে যদি হোমিয়োপ্যাথি দেখাইতে পারিতেন ভাল করিতেন।

ছাত্রগুলিকে লইয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি শুক্রবার, [চৈত্র ১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

১১ই বৈশাখ, ১৩১১

প্রিয় সম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশ বলে তাহার liability প্রায় ১২।১৩ হাজার হইবে। Assets অন্তত হাজার পনেরো টাকার আছে। যে দেনার সুদ খাটিতেছে অর্থাৎ যাহা আশু পরিশোধ করা কর্তব্য তাহার পরিমাণ ৬।৭ হাজার। বাকি টাকা ক্রমশঃ শুধিলে চলিবে ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন সমিতির কথা বলিয়াছি। যতীও উপস্থিত ছিলেন। আগামী রবিবারেই প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবেন— আপনি সেক্রেটারি।

মহারাজ আজ লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য কতক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্তমান বৈশাখ হইতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ··৫০ টাকা আপনার কর্ম্মচারীর নামে মানি অর্ডার করা হইবে"।

অতএব নিশ্চিন্ত হইবেন।

শৈলেশের নিকট হইতে কাগজপত্র সমস্ত লইবেন— যতী আপাকে Review of Reviews পত্রিকা দিবে— আরো দুই একটা ইংরাজি মাসিকের জোগাড় করিতে পারিলে ইংরাজি বাংলা সাহিত্যে মিলাইয়া আপনার সাহিত্য প্রসঙ্গকে উপাদেয় করিতে পারিবেন।

এখনি mail ধরিতে যাইতে হইবে। অতএব বিদায়ের নমস্কার। অরুণকে সুস্থ রাখিবেন ও পড়ায় প্রবৃত্ত রাখিবেন। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশকে অবশ্য হিসাব দেখাইতে হইবে। ব্যবসায়ের দস্তুর না মানিলে চলিবে কেন? আমি তাহার যে কয়টি দেনার কথা জানি তাহা এই:— মহিম ২॥০ হাজার, আর একব্যক্তি ২ হাজার, আমি ১ হাজার— এই সাড়ে পাঁচ হাজার তা ছাড়া উহাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে দেনা করিয়াছে তাহা আমি জানি— নিজের সম্বলও কিছু দিয়াছে তথাপি আমার বিশ্বাস ১০ হাজার টাকার উপরে দেনা হইবার কথা নহে। যাহা হউক্ দেনার হিসাব দূরে রাখিয়া দেখা যাইতে পারে assets কত আছে। তাহা এবং চল্‌তি কারবারের goodwill লইয়া তাহাকে কত দেওয়া যাইতে পারে ইহাই বিবেচ্য। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু যদি এই কারবার গ্রহণ করেন তবে এই কোম্পানির সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ থাকিবে— আমার সমস্ত গ্রন্থ ইঁহাদেরই হাতে রাখিব এবং সুবিধামত terms এই রাখিব। আপনি বোধহয় জানেন আমার সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুর বিদ্যালয়কে দিয়াছি— অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি— কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দ্দশা হইত না এই জন্য এবং দুর্ভাগা শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

এখানে আমার শরীর ভালই আছে— ইতিমধ্যে আর জ্বর আসে নাই। চুপচাপ করিয়া কেদারা হেলান্ দিয়া পড়িয়া আছি— অল্প-স্বল্প লিখিতেছি, যথাসাধ্য খাইতেছি— ইহাতে জ্বর আসিবার কথা নয়।

আমি "বঙ্গবিভাগ" লইয়া বঙ্গদর্শনে একটা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি। আপনি "সাহিত্যপ্রসঙ্গ" লিখিবেন। পথের মধ্যে এক খণ্ড "হিন্দুস্থান রিভিয়ু" কিনিয়াছিলাম সেটা আপনাকে পাঠাইয়া দিব— তাহাতে সামাজিক প্রবন্ধ লইয়া আলোচ্য বিষয় আছে।

আপনার গল্পটি কি করিলেন? আপনাকে কিছুদিন কাছে পাইলে আপনাকে দিয়া আমি গল্প লিখাইয়া লইতে পারিতাম— Collaborationএ দুইজনে মিলিয়া গল্প লেখাও মন্দ নয়, ফ্রান্সে খুব চলিত আছে— একবার এই প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। অরুণ ভাল আছে ত? তাহাকে পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখিবেন। ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১৫

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

নগেন্দ্রবাবুর পত্রের উত্তর দিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন। সমস্ত হিসাবপত্র দেখিয়া একটা সঙ্গত দর স্থির করাই business like হইবে। এই মজুমদার লাইব্রেরির জাল ছিন্ন করিতে পারিলে আমি কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। আপনি আমার এই যে উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হউন্ বা না হউন্ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।

আপনাকে Hindustan Review পাঠাইয়া দিলাম। যতীকে লিখিয়া দিলাম আপনাকে Review of Reviews খানা নিয়মমত পাঠাইয়া দিতে। যদি Spectator কাগজ খানা জোগাড় করিতে পারা যায় তাহা হইতে লেখ্য বিষয় অনেক পাওয়া যায়।

আমি য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া আষাঢ়ের সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢ়ের নৌকাডুবিও আজ শেষ করা গেল।

শৈলেশ Renal Colic লইয়া ভুগিতেছে— বোধহয় সেই জন্য সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠাইতে পারে নাই— যদিও, আমার বিশ্বাস এই Colic ধরিবার পূর্ব্বেই সে পাঠাইতে পারিত কিন্তু শৈলেশকে ত চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়াছে— শৈলেশের মতই সে অচল।

বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া এখানকার পাঠকগণ বিস্তর ধিক্কার দিয়াছে— আপনারা যদি পারেন বঙ্গদর্শনের এই ম্লানিমা দূর করিয়া দিবেন— আমার আর সাধ্য নাই।

আপনার গল্পের বই পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম। ইতি ২১ বৈশাখ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

মধ্যে কাশী ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই— শরীরটা আবার কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কলম ছাড়ি নাই একটু আধটু লেখা চলিতেছে— আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ

পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। আজ প্রার্থনা বলিয়া একটা প্রবন্ধ পাঠানো গেল। ইহাতে আষাঢ় মাসের খোরাক চলিবে।

আপনিও আষাঢ়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ত? যতী লিখিয়াছে আপনাকে Review of Reviews দিয়াছে। Academy Spectator প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে অনেক আলোচ্য বিষয় থাকে। হেমবাবু (হেম মল্লিক) Academy প্রভৃতি অনেকগুলি কাগজ লইয়া থাকেন [য]দি যথাসময়ে ফেরং দিবার আশা [দি]য়া এই কাগজগুলি আপনি দেখিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন [ত] কেমন হয়?

সমিতির অধিবেশনটা নিয়মমত চালাইবেন।

নগেনবাবুর সঙ্গে বাঁকিপুর ষ্টেশনে চকিতের মত আমার দেখা হইয়াছিল। যদি তিনি হিসাব দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে— আমি আপনার পত্র পাইলে শৈলেশকে হিসাব দেখাইতে লিখিব।

ত্রিপুরা হইতে নিয়মমত টাকা আসা দেখিতেছি সন্দেহস্থল। একবার মহিম ঠাকুরকে আপনি দুঃখ নিবেদন করিবেন। যদি দুই চারিদিনের মধ্যে আসিয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় খবর লইয়া জানিবেন। আমাদের কর্ম্মচারী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে আসিবার কথা। গগনদের বলিলে তাঁহারা যদুকে ডাকাইয়া খবর লইতে পারিবেন।

অরুণকে মোহিতবাবুর কাছে রাখিয়া দিন না— তাহার পড়াশুনাও হইবে— শারীরিক অযত্নও হইবেনা। ইতি ২৯শে বৈঃ ১৩১১।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

ওঁ

[বোলপুর]

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

বিদ্যালয়ের কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন আছি। পলায়ন ব্যতীত উপায় দেখিনা— অতএব কাল সোমবারে কন্যাগৃহে দৌড়িব। নিয়মাবলী মহারাজকুমারকে পাঠান গেল। এখানে আসিয়া সতীশের "গুরুদক্ষিণা" গ্রন্থের একটা সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াচি—আর কিছু লিখিবার সময় পাই নাই।

অরুণ ভাল আছে— ওজনে বাড়িতেছে। সাহিত্য প্রসঙ্গের কথা ভাবিতেছেন ত? ইতি রবিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ

"তিন বন্ধু" সম্বন্ধে আপনাকে যিনি যতই উৎসাহিত করুন আপনার এই বর্ত্তমান পত্রলেখক বন্ধুটি সায় দিতে পারিতেছেন না— আর একখানা ভাল বই আপনাকে লিখিতে হইবে— আপনার ছেলেবেলার কথা, গ্রামের কথা, ঘরের কথা লইয়া একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন—তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [আষাঢ় ১৩১১] শ্রী

২১

ওঁ

শুক্রবার

প্রিয়বরেষু

বুধবার ত কাটিয়া গেল। আছেন কেমন? আমার শরীর অসুস্থ। আগামী রবিবারে সকালে গিরিধি রওনা হইব।

শমী মীরাকে পড়ান ও শেলাই শেখানোর জন্য মেম ঠিক করিতে পারিলেন? যদি স্থির হইয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় সত্যকে জানাইবেন।

এখানে "গগনে গরজে মেঘ
ঘন বরষা।"

অরুণ বেশ ভাল আছে। এরূপ সুস্থ তাহাকে অনেক কাল দেখি নাই। ভারতী বা বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা আমার পক্ষে সম্প্রতি অসাধ্য হইয়াছে। *[২৮ শ্রাবণ ১৩১১]

শ্রীরবীন্দ্র

২২

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সম্ভবত আপনি আজ বোলপুরে রওনা হবেন না— না হলেই ভাল, কারণ জুরির আকর্ষণে কাল রবিবারে আমাকে কলকাতায় যেতেই হচ্চে। যদি এ পত্র সেখানে পান অপরাহ্ণে দেখা করবেন। ইতি শনিবার [২৯শে শ্রাবণ ১৩১১]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অরুণ আমার সঙ্গে নিরাপদে এসে পৌচেছে। কলকাতার চেয়ে এ জায়গা ঠাণ্ডা— অরুণের সঙ্গে গরম কাপড় দিয়েছেন ত?

সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।

বঙ্গবাবু তাঁর দুটি ছেলেকে এনেছেন। তিনি নিজে কাল কলকাতায় যাবেন। ইতি বুধবার। [১ অগ্রহায়ণ ১৩১১]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আর কাজের কথা তুলিবেন না— আমার এখন ছুটি। প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই— দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছেনা। এখানে খোলা মাঠের বিপুল রৌদ্রের মধ্যে মনটাকে একেবারে মুক্তি দিয়া চুপ করিয়া তপ্ত হাওয়ায় পড়িয়া আছি। কখনো বা নিতান্ত আলস্য ভরে অর্ধশয়ান অবস্থায় দুটো একটা বাজে কবিতা লিখিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি [মহা]শয় আমি আমার অন্তরের অন্তরে জাতীয়তা স্বদেশিতা প্রভৃতি কথার· ·হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ পাই তখনি নিজের এই পরিচয় আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত— তাহার মধ্যে শেখা বুলির ভাগই বিস্তর। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই— আমরা নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভ্রম করি। আমি এ সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাইনা— আগে বেশ একটু নিরালায় ভাল করিয়া নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লই— আগে নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমস্ত জিনিসটাকে তলাইয়া দেখি— তার পরে যদি কথা বলার আবশ্যক থাকে ত কথা বলিব। আমি এখন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি— আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের কাজ কখন করিব? অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম। মহিমকে আজই একটা তাগিদ পত্র পাঠাইব। আপনি আমার বৎসর ফল গণনার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

পরীক্ষার কাজ শেষ হইয়া গেলে একবার না হয় বোলপুরে বেড়াইয়া যাইবেন। জায়গাটা দার্জ্জিলিং নয় সে কথা সত্য কিন্তু আমি দেখিয়াছি মানুষ গরম গরম বলিতে বলিতে অত্যুক্তি দ্বারা নিজেকে অধীর করিয়া তুলে। বোলপুরের গরম আমার কাছে একদিনও অসহ্য বোধ হয় নাই।

আশা করি আপনাদের সমস্ত মঙ্গল। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

ওঁ

প্রিয়বরেষু

ক্লাসের ক্ষতি হইবে শুনিয়া অধ্যাপকদের এবং অরুণের অমতে অরুণকে পাঠাইতে দ্বিধা করিতেছিলাম— লোকেরও অভাব— কাহার সঙ্গে পাঠাই? আপনি আসিয়া যদি লইয়া যান তবে অল্পকালের জন্য তাহাকে ছুটি দেওয়া যায়।

বঙ্গভাষার অনতিবৃহৎ ইতিহাস যদি লেখেন তবে নিশ্চয় তাহা পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হইবে। আমার বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ গ্রন্থ ছাপিবার খরচ দিতে কার্পণ্য করিবেন না। গ্রন্থ প্রকাশের কোনো ফণ্ড যে সঞ্চিত হইয়াছিল বা হওয়া সম্ভব এমন ত আমার মনে হয় না।

নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাজাইতে হইলে আবশ্যক মত অনেক ভাল গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়— এ সকল কাজ নিপুণভাবে করিতে হইলে নিষ্ঠুর ভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত— তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়— কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতি ছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো অনেক বেশি কাটিতাম।

এখানে আসিয়া শরীরটা কলিকাতার চেয়ে অনেক ভাল আছে।

আপনাদের খবর ভাল ত? ইতি ১লা আষাঢ় ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

ওঁ

শিলাইদহ

প্রিয়বরেষু

এইমাত্র আপনার বেহুলা ও ফুল্লরা পড়িয়া শেষ করিলাম।

আমি মনসার ভাসান পূর্ব্বে পড়ি নাই। সুতরাং আপনার বেহুলার সঙ্গে প্রচলিত গল্পের তুলনা করিতে আমি অক্ষম। কিন্তু তুলনা নাই হইল আপনার বইখানি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের বালক বালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত করিয়া পুরাণ কথা রচনা করিবার জন্য আমি অনেকদিন হইতে অনেককে [উৎসা]হ দিয়াছি। সেই উৎসাহের······পরলোকগত সতীশের "গুরু দক্ষিণা" বইখানি রচিত হইয়াছে। সেই বইখানি আমার বিশেষ প্রিয়, আপনিও সেখানি পড়িয়া দেখিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শৈলেশ এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে এটা যেন জগদ্দল পাথর চাপা পড়িয়াছে।

ফুল্লরা বইখানাকে যথোচিত বড় করিয়া তুলিবার জন্য আপনি অনেকটা বাহুল্য টানাবোনা করিয়াছেন। খুব শাদাসিধা না হইলে এ রকম গল্পের রস রক্ষা হয় না। একপ্রকার আত্মবিস্মৃত গ্রাম্য ভাবই ইহার····· ·আপনি যেন সভ্যতার খাতিরে···

চিঠির বাকি অংশ লুপ্ত

২৮

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনি নানা কাজে ব্যস্ত আছেন তবু আপনাকে আর একবার বিরক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনার প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের কোনো দাবী নাই এমন কথা বলা চলেনা— সেই জন্যই এই বিদ্যালয় যদি কোনো বিষয়ে বঞ্চিত হইতে পারে— এমন আশঙ্কা ঘটে তবে তাহা দূর করিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়া নিষ্ফল হইবনা এরূপ আশা করিতে পারি। দুই সহস্র খণ্ড চারিত্রপূজা গ্রন্থ দুইবারকার বি এ পরীক্ষার্থী এবং অন্যান্য পাঠকদের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া যদি আপনার নিকট সম্ভবপর বোধ হয় এবং যদি দেখেন যে এখনো অনেক বই ভট্টাচার্য্যদের দোকানে বাকি আছে তবে আমাদের বঞ্চিত বিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া সামান্য কিছুও যদি চেষ্টা করেন তবে আমি তৃপ্তিলাভ করিব। আপনি এমন কথা মনেও করিবেন না যে অরুণকে আমি কিছুদিন বিদ্যালয়ে রাখিয়া পড়াইয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রতি উৎপাত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। অরুণ বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধাদ্বারা আমাদের গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করিয়াছে তাহার চেয়ে অধিক আমরা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আপনি নাকি ভট্টাচার্য্যদিগকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এই কারণে এই ঘটনায় আপনার কিছু দায়িত্ব আছেই। আমি সেইটুকুর প্রতি নির্ভর করিব। যদি প্রমাণ হয় যে ভট্টাচার্য্যরা আমাদের সম্বন্ধে ঠিক সাধুব্যবহার করেন নাই তবে আপনাকে কদাচ দোষী করিব এমন মনে করিবেন না— আমি আপনাকে কোনো প্রকারে অন্যায় দোষ বা দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিনা। কেবল আপনার সহায়তা প্রার্থনা করি মাত্র। এবং আপনিও বই কাটতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিরূপ অনুমান করেন তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে বোঝেন ভাল— এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে— সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইয়াছি ইহাতে আমার প্রতি বিরক্তিবোধ করিবেন না। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার প্রেরিত চেকটি অনাবৃষ্টির কালে মেঘোদয়ের মত দেখা দিয়েছে— ওকে শীঘ্র ভাঙিয়ে নিয়ে বর্ষণে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই দুঃখ স্বীকার করে আমাদের কতটা দুঃখ লাঘব করেছেন তা জানলে আপনি পুণ্যকর্ম্মসাধনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন।

আমার পিতা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সে সংবাদ আপনার কাছে এই প্রথম পাওয়া গেল।

এই বইখানি সন্ধান করতে হবে। আপনি গগনদেরও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আমার পিতার সমস্ত রচনা ছাপাবার যে প্রস্তাব করেচেন সেটা আলোচনা করে দেখব। এবার কলকাতায় গিয়ে সে সম্বন্ধে সন্ধান করা যাবে।

আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাব।

আপনার নূতন রচনাটির জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আপনি Y, M, C, A,তে কি এরই কোনো অধ্যায় সম্প্রতি পাঠ করেচেন ?

অরুণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল আপনার ওখানে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু নানা স্থান ঘুরিয়া কোনোমতেই সময় পাইলাম না— শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১১ই মাঘের পূর্ব্বে সময়মাত্রই ছিলনা— এখন এত অল্প সময় বাকী যে ইহার মধ্যে বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সশরীরে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে পারিলামনা বলিয়া অপরাধ [গ্রহণ] করিবেন না— আপনিও সম্ভবত সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু অরুণের ত কোনো বাধা নাই। বিবাহ ১৪ই মাঘে রাত্রি ৯টার সময়। বউ ভাত ১৭ই মাঘ রবিবারে মধ্যাহ্নে।

এখন আপনার শরীর ত ভাল আছে ?

[১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

508 W. High Street
Urbana, Illinois
১৯ পৌষ ১৩১৯

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুসী হইলাম কিন্তু শরীর ভাল নাই জানিয়া ভাল লাগিল না।

সতীর তর্জ্জমার প্রুফ পাঠাইলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু পাই নাই, বোধ হয় ভুলিয়াছেন। Paul Carus যে ধরণের বহি বাহির করেন তাহাতে মনে হয়না তিনি সতীর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিতে প্রস্তুত হইবেন। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজি গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬ - ১৯৩৯

প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য্য এবং ছাপার ভুল অপর্য্যাপ্ত। যাহাই হউক্ সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার বোধহয় Everyman's Library Series এর মধ্যে যদি আপনার বই চালাইতে পারেন তবে খ্যাতি অর্থ দুইই জুটিতে পারে। তাহা[দের কাছে manuscript] পাঠাইয়া দিবেন। Ernest Rhys ঐ Series এর Editor। আমাদের কালীমোহনের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব হইয়াছে।

ম্যাকমিলানেরা আমার লেখাগুলি ছাপাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। তাহার লেখাপড়া চলিতেছে। কথার কবিতা আমি এখানে বসিয়া নিজেই অনেকগুলা করিয়া ফেলিয়াছি। আমি দেখিলাম, নিজে না করিলে কোনমতেই সুবিধা হয় না। কারণ, বাংলার ভাষা ও ছন্দের সঙ্গীত ইংরেজিতে যখন আনা সম্ভব নয় তখন কেবল ভাবমাত্রটিকে অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিলে তবে তাহার ভিতরকার সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে। এই কাজটি আমার দ্বারা সহজেই হয়— কারণ সরল ইংরেজি ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নহে, তার পরে নিজের ভাবটুকু অন্তত নিজে যথাসম্ভব বুঝি। সেদিকে ভুল হওয়ার আশঙ্কা নাই। ভাষাটাকে অত্যন্ত না জানার একটু সুবিধা আছে। অল্প জমি একজোড়া গোরু জুতিয়াও খুব ভাল রকম চাষ দেওয়া যায়— তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে যেটুকু পারা যায় সেইটুকুর মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া বারবার করিয়া সেটাকে মাজাঘষা সহজ। যাহা ক্ষমতায় কুলায় না তাহা ছাড়িয়া দিই, যেখানে বাধা পাই সেখানে ঘুরিয়া যাই— নিজের জিনিষ বলিয়াই সেটা করা সম্ভব। এমন করিয়াও যে চলনসই কিছু খাড়া করিতে পারিব তাহা মনেও করি নাই— যাহা হউক চলিয়া ত গেছে। এখন লজ্জা ভাঙিয়াছে, সাহস বাড়িয়াছে। তাই অনুবাদ জমিয়া উঠিতেছে। আজ এইমাত্র শারদোৎসব শেষ করিলাম— বোধ হইতেছে এটাও চলিবে। যাহাই হউক্ ভাল করিয়া পারি আর না পারি নিজের কবিতা নিজে তর্জ্জমা করা ছাড়া উপায় নাই।

আপনার সেই Selection ছাপা কতদূর হইল জানিবার জন্য উৎসুক আছি।

অরুণকে এবং বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইমাত্র সতী পাইলাম। যদি বাহুল্য অংশ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মাজাঘষা করা যায় তবে এ জিনিষ চলিতে পারিবে। মুস্কিল এই এদেশের লোকের সময় এত অল্প যে এরূপ কাজে কাহারো রীতিমত সাহায্য পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি কোনো প্রকাশক ইহা গ্রহণ করে তবে তাহারা সম্ভবত কাহাকেও দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে পারে। আজ রোটেনস্টাইনকে লিখিয়া দিলাম যদি তিনি Wisdom of the East অথবা Everyman's Library ওয়ালাদের দ্বারা আপনার এ বই মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন। আগামী বসন্তে ইংলণ্ডে গিয়া আমি চেষ্টা দেখিব। আমেরিকার লোকেরা আমাদের দেশের মত—ইহারা ইংরেজ সমালোচকদের মুখ তাকাইয়া থাকে, ভালমন্দ নিজেরা বিচার করিতে সাহস করেনা— অতএব সেখান হইতে আদর না পাইলে এখানে প্রকাশক পাওয়া কঠিন।

৩২

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার পন্থা অনুসরণের চেষ্টায় আছি। কিছুদিন হইতে মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। বিশ্রাম করিতে না পারিলে একদা ক্ষতিপূরণ একেবারেই অসম্ভব হইবে। তাই সকলপ্রকার অনুরোধ এবং আমন্ত্রণ দূরে রাখিতে হইয়াছে।

ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকদিনের ছুটি লইয়া রাজসাহিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন বোধহয় আর ৩।৪ দিন মধ্যেই ফিরিবেন তখন আপনার প্রশ্নের উত্তর মেলা সহজ হইবে।

এখানে ব্যবস্থাবিভাগের কাজ এখন ত খালি নাই।

চিঠি সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি ২৭ ফাল্গুন ১৩২০।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস কেবল হয় পীড়াজনক তাহা নহে ইহা অনিষ্টজনক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন— সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল তাহা আমার দুর্গ্রহই জানে— আমি এই জানি আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই। জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প— এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল সে বড় কম কথা নহে।

কয়েকদিন হইল আপনার নূতন বইখানি পাইয়াছি। কিছুকাল হইতে এখানকার ছাত্রদের জন্য পাঠ্য রচনায় আমাকে এমন অধিকার করিয়াছে যে সমস্ত দিনে স্নানাহারের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই এই কাজে খাটাইতে হইয়াছে। লেখাপড়া সব বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি এখানকার লাইব্রেরিতে চালান হইয়া হাতে হাতে ফিরিতেছে এইবার তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পড়িব এবং কেমন লাগিল আপনাকে লিখিব।

এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম, এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভ করুন অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

নন্দলাল এখনো কলকাতায়। ফিরে এলে বৃহংবঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ নিশ্চয় করব।

শরীর যে ক্ষণভঙ্গুর আমার দেহ প্রতিদিন তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হচ্চে। এতদিন মন তাকে বহন করে জীবনযাত্রায় সারথ্য করছিল, কিন্তু বাহন এখন পিছনের দিকে ঘন ঘন লাথি ছুঁড়তে সুরু করেছে— পিঁজরাপোলের অভিমুখে তাঁর সমস্ত ঝোঁক, বোঝা যাচ্চে লাগামটা ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় যদি না নেমে পড়ি তাহোলে ঝাঁকানি দিয়ে নামিয়ে ফেলবে হঠাং রাস্তার মাঝখানে। এ অবস্থায় আমার কাছে যদি কিছু প্রত্যাশা করো তা হোলে তা পূরণের চেষ্টায় আমার নিঃস্বতা প্রকাশ পাবে। পূর্ব্বকালের তহবিলের মাপে এখনকার দাবী অসঙ্গত হবে। ইতি ২৭।২।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

ওঁ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
কল্যাণ নিলয়েষু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী ; কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রসংখ্যা

১ পুত্রযজ্ঞ : গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত।

২ "ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন" : দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৫ পৃ ১১৯। "আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার" : দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ প্রসঙ্গে ; এই সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯০১ সালে।

৩ পত্রে যে 'বইখানি'র উল্লেখ আছে তাহা সম্ভবত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দ্বিতীয় সংস্করণ।
হীরেন্দ্রবাবু : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৪ "আপনার ছেলেটিকে" : অরুণ— দীনেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। ইঁহার প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত পত্রগুলিতে আছে। ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০।
শৈলেশ : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৬ পত্রে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনার কথা বলা হইয়াছে। সমালোচনাটি বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৭ রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্তোষ : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়, আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক
মনোরঞ্জন : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক

৮ যতীন্দ্রবাবু : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৯ শ্রীশবাবু : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১১ পত্রে রামায়ণী কথার ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। এই বইখানিরই ভূমিকার কথা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পত্রেও উল্লেখিত। ভূমিকাটি 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ রূপে প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত।

১৩ মোহিতবাবু : মোহিতচন্দ্র সেন

১৪ "আমার জীবন" : রাসসুন্দরী দাসী -লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা, দীনেশচন্দ্র সেন -কর্তৃক গ্রন্থপরিচয় লিখিত।

১৮ পত্রে যে গল্পের বইয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্ভবত 'তিন বন্ধু' (প্রকাশ ১৫ জুলাই ১৯০৪)।

১৯ গগন : শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ সতীশ : সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০) ইনি "বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।"
'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের সমালোচনা : বঙ্গদর্শন ১৩১১ শ্রাবণ
তিন বন্ধু : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত উপন্যাস।
"একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন" : সম্ভবত কবির এই প্রেরণার ফলেই পরবর্তী কালে 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৩২৯) রচিত হয়।

২১ শমী : কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র
মীরা : কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বা অতসী।

২৩ বঙ্গবাবু : বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য

২৭ বেহুলা ও ফুল্লরা : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থদ্বয়
গুরুদক্ষিণা : সতীশচন্দ্র রায় -রচিত

২৯ আশু মুখুজ্জে : সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৩০ রথীন্দ্রনাথের বিবাহ ১৪ মাঘ ১৩১৬

৩১ সতী : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থ। ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।
কালীমোহন : কালীমোহন ঘোষ

৩২ ক্ষিতিমোহনবাবু : ক্ষিতিমোহন সেন

৩৩ নূতন বইখানি : 'নীলমাণিক', প্রকাশ ভাদ্র ১৩২৫। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৭, পৃ ১২১।

৩৪ নন্দলাল : নন্দলাল বসু
বৃহৎ বঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থ। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৯, পৃ ১২২।

৩৫ ময়মনসিংহ গীতিকা : দীনেশচন্দ্র সেন -"কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত।"

পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি শরণং

৮।১।৯৬

কুমিল্লা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বহুদিনের ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট একখানা পত্র লিখি ; যেদিন "সাধনা আর বাহির হইবে না" এই দুঃখকর সংবাদ পড়িলাম, সেই দিন পত্র লিখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু লিখি নাই ; মনের নিভৃতে যে পূজা দিবার প্রবৃত্তি হয়, সাধক তাহা গোপন করেন, আমিও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা লিখিতে কুণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু সাধনার লোপে মনে যে একটী অভাব হইয়াছে, তাহা পূরণ হইতেছে না, বাড়ীর চিঠির আশায় যেরূপ প্রীতিকম্পিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে ডাকঘরের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, সাধনার জন্যও কতকটা সেই ভাবের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। শুনিয়াছি সারসপক্ষীর মৃত্যুকালের সংগীতটিই মধুরতম হয় সাধনারও শেষ "বিদ্যাসাগর"-কথা বড়ই মিষ্ট হইয়াছিল ; উন্নত চরিত্রকে উন্নত মনে ধারণা করিবার শক্তি বাঙ্গলা সমালোচনায় সেই প্রথম পড়িয়াছিলাম ; আলো ও ছায়ার যথাযথ সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া বিশাল শাল্মলীতরুর ন্যায় ছবিখানিকে ফুলপল্লবের ফ্রেমে বাঁধিয়া দেখাইবার পরিণত কৌশল, সেই প্রবন্ধে ঠিক চিত্রকরের তুলির যোগ্যই হইয়াছিল।

পূর্ণ লীলা দেখাইতে দেখাইতে সাধনার অবসান হইল ; ক্রমে মন্দীভূত তেজে যাহা নিবিয়া যায়, তাহার শেষ দেখিতে মন অলক্ষিত ভাবে প্রস্তুত হয় ; সাধনার শেষ দেখিতে আমরা সেরূপ প্রস্তুত হইতে পারি নাই। 'সাধনা' গিয়াছে, সাধনার লেখক বর্তমান, ঈশ্বর তাহার আয়ু যশঃ লেখনী অক্ষয় করুন।

শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ঠিকানা—হেডমাস্টার, ভিক্টোরিয়া স্কুল, কুমিল্লা

২

শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা

১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯৯

[ফরিদপুর]

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার কণিকা নামক সুন্দর নীতিকাব্য উপহার পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। পুস্তকের অপূর্ব কবিত্ব হইতে কবির স্বহস্ত লিখিত প্রীতিসূচক ছত্রটি পর্য্যন্ত সকলই আমার চক্ষে সম্মানযোগ্য। এই কাব্য প্রকৃত ধনবানের হস্তের দান,—কণিকা হইলেও বিশেষ মূল্যবান ; গল্পের পরিচ্ছদে নীতিকথা এরূপ

মনোজ্ঞভাবে এদেশে আর গ্রথিত হয় নাই ; ছোট ছোট সন্দর্ভগুলি ছোট ছোট বনফুলের ন্যায় এক এক প্রকার রূপ ও সুরভির পরিচয় দিতেছে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর এবং পাঠকহৃদয়ে এক একটি সমগ্র ভাবের চিত্র মুদ্রণ করিতে সক্ষম ; এই নীতিকথা প্রসঙ্গে আমাদের অধঃপতিত জাতি সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তার উদয় হইয়াছে ; অনেকগুলি গল্পে কবির স্বজাতির উন্নতি নির্দ্দেশক সহানুভূতি কাতর উপদেশ অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মহামূল্য উপহার দ্বারা সম্মানিত করার জন্য আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ভবদীয় গুণানুরক্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৩

ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা
৯ই মাঘ, ১৩০৬।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার নব কাব্যখানি কল্য পাইয়া সাগ্রহে আদ্যন্ত পড়িয়াছি ; এই সুন্দর উপহার প্রাপ্তির সঙ্গে আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া কণিকার "উদারচরিতানাম্" কবিতার "সূর্য্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই" প্রভৃতি ছত্র মনে পড়িল।

"কথা" কাব্যের মধ্যে যে নৈতিক মাধুর্য্য আছে, তাহাতে কবির কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। কোশল রাজের শত্রু শিবিরে মহান আত্মসমর্পণ, একটি পূজার প্রদীপের ন্যায় শ্রীমতী দাসীর বৌদ্ধস্তূপ মূলে জীবন নির্ব্বাণ, বিগত সৌন্দর্য্য অনাথিনীর গৃহে উপগুপ্তের অপরূপ প্রতিশ্রুতি পালন, প্রজা দুঃখকাতর রাজার অভিনব প্রণালীর দণ্ড দ্বারা মহিষীকে দুঃখীর দুঃখ বুঝাইবার চেষ্টা, ভক্ত কবীরের পাপী রমণী ও তাহার চক্রান্তজনিত লোক-নিগ্রহকে প্রকৃত মাহাত্ম্য দ্বারা পরাজয় করা প্রভৃতি ভাবের সমস্ত গল্পই নৈতিক জগতের সুন্দর ও অদ্ভুত কথা। নির্ম্মম স্বার্থান্ধ সংসারে এই সন্দর্ভগুলি আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় আশ্চর্য্য, অথচ উহা বাস্তব জগতেরই কথা, কল্পনা নহে ; গল্পগুলির অনুষ্ঠান জীবন্ত মাহাত্ম্য মনুষ্যত্বের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিতেছে। অনেকগুলি গল্পই কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে হইয়াছে, এই অশ্রুতে ক্ষণেকের তরে যেন মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে ও কামনাহীন সততার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনে এরূপ সুখপ্রাপ্তি বড় বিরল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব উপাখ্যানগুলি প্রাচীন ভাষায় নানারূপ অলৌকিক ঘটনা ও আবর্জ্জনায় জড়িত ও তাহা সাধারণ পাঠকের অনধিগম্য, আপনি সেগুলি নূতন কবিত্ব মন্ত্রপূতঃ করিয়া সরল বাঙ্গলা পদ্যে করুণ রসের উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হইতে দেখিলে সুখী হইব, কিন্তু ইহার উন্নত ও নির্ম্মল নৈতিকতত্ত্ব বালকগণের অভিভাবকগণের পাঠের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। আপনার অনুপমেয় শব্দলালিত্য, শিল্পীর ন্যায় গল্পের চারুগ্রন্থন, ও উৎকৃষ্ট কবিত্ব এই কাব্যের সর্ব্বত্র সুলভ, তাহা সমালোচকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন ; কিন্তু সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের উর্দ্ধে এক মহানৈতিক ব্রত উদ্‌যাপন চেষ্টায়ই বোধ হয় কবির জীবনেরও প্রকৃত সফলতা ; সেই নীতি সূত্রগুলি সরস কবিত্ব কৌশলে "কণিকা"র প্রদর্শিত

হইয়াছে এবং তাহাদের অনুষ্ঠান ও দৃষ্টান্ত এই নূতন কাব্যখানিতে সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের নাম কবি বিনয়সহকারে "কথা" রাখিয়াছেন, পাঠকগণ ইহা "কথামৃত" বলিয়া বুঝিতেছেন। বসন্তের প্রাক্কালে এই নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্যের নূতন রাগিণী বাঙ্গলা কাব্যের সচরাচর লব্ধ স্বরের এক গ্রাম ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, এই কাব্যখানি দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের স্থান এক শ্রেণী উর্দ্ধে উন্নীত হইল, সন্দেহ নাই।

আপনার সদয় ও বহুমূল্য উপহারের জন্য আমার সসম্মান কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বিনীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৪

ফরিদপুর
তারাকুমার রায়ের বাসা
২৯শে মার্চ্চ, ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

'কাহিনী' সাগ্রহে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি; "কুন্তী-সংবাদ" ও "নরকবাস" দুইটি কবিতা করুণার প্রস্রবণ, উহাদের মর্ম্মাস্তিক ছন্দ মনকে একান্ত দ্রব করিয়া ফেলে, এত অশ্রু উপহার আমি জীবনে অল্প কাব্যের উদ্দেশেই দিয়াছি। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্য্যোধনের চিন্তাশীল দর্পকথায় রাজনীতির বিশ্লেষণ-কৌশল উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; কবি এই কবিতায় রাজদ্রোহ নিবারক বিধি প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রতি আভাসে কটাক্ষ করিয়া মহাভারতীয় বীর চরিত্রের স্বরূপ বজায় রাখিয়াছেন এবং গান্ধারী চরিত্রে মাতৃস্নেহের উর্দ্ধে রমণী হৃদয়ের উদারতা প্রদর্শন করিয়া উহা মহামহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার পড়িয়াছিলাম। উহা অনেকদিন যাবৎ আমার ক্লান্তিকর অবসরের সঙ্গী, ইহাতে রাণী কল্যাণীর চরিত্রের নৈতিক মাধুরীতে মন পবিত্র হইয়া যায়; যাঁহারা ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পৌরাণিক হিন্দুগণও দয়ার এমন একখানি মানসী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র কবিতাব্যাপী এক অনুপম শুভ্ররহস্যের অভ্রালোকে এই দেব প্রতিমা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন; সরলতাময়ী কল্যাণী কুটিলতাকে কুৎসিত প্রতিপন্ন করিয়া, অভিসন্ধিকে ঔদার্য্যগুণে ব্যর্থ করিয়া নিন্দা ও যশঃ উভয়কে নির্ম্মল দেব হাস্যে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর কল্যাণ ব্রত অব্যাহত রাখিয়াছেন। যে দাতার গৃহ বিচার-আলয়ের ন্যায় সঙ্কীর্ণ, "ফাঁকি দিয়া তারা ঘোচায় অভাব, আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।" এই উদারনীতি-উজ্জ্বলিত কল্যাণীর গৃহের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না, সে যেন কাচ, এ যেন কাঞ্চন। অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পড়িয়া সেই "ক্ষীরো" একরূপই আছে পরিচারিকা অবস্থায় তাহার ইচ্ছা প্রতিরুদ্ধ হইত, রাণী হইয়া তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রলয়ংকরী হইয়াছিল। প্রভুত্বের স্বপ্নভঙ্গে সে নিজের পরিচয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল এবং রাণী কল্যাণীর পদধূলি লইয়া নিজের অবনতি স্বীকার করিল, তাঁহার চরিত্র যেরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ নিপুণ প্রণালী আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খণ্ডকাব্যখানি পাঠ করিয়া কেবল 'কি সুন্দর'! 'কি সুন্দর'! বলিয়া হর্ষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

আমার একটি দুঃখের কথা আছে, আপনাকে দেখি নাই ; শিলাইদহ যাইবার পথ অসুবিধাজনক না হইলে ৫।৭ দিনের জন্য আপনার ওখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, আমার শরীর কাতর কিন্তু গাড়ীতে এখন বোধ হয় কতকটা দূর যাইতে পারিব, আপনার সুবিধানুসারে ও শরীর কতক পরিমাণে ভাল থাকিলে আপনার চিরানুরক্ত ভক্ত তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। শিলাইদহ, ষ্টেশন হইতে কতদূর ?

অনুগত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২৮ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৬শে আগষ্ট ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন হয় মহাশয়ের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য ক্ষণিকা উপহার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু নিতান্ত পীড়িত থাকায় এ পর্য্যন্ত ক্ষণিকার দৈব প্রতিভাশালী কবির প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। আমার স্নায়ব দুর্ব্বলতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একখানি সামান্য পত্র লিখিলেও অবসন্ন হইয়া পড়ি।

ক্ষণিকা সামাজিক হিসাবে একটুকু উচ্ছৃঙ্খল এবং বোধ হয় তজ্জন্যই উহা বিশেষরূপ উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের মায়াবাদী সমাজ, রূপ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা প্রভৃতি সংস্কারাধীন হইয়া বাগেদবীর প্রবেশ একরূপ রোধ করিয়া রাখিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে স্থানে সংসারের সকলই মিথ্যা, সেখানে কবি কোন্ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন! আপনার দৈব কবিত্ব পৃথিবীর প্রতি সৌন্দর্য্যটুকুর আস্বাদ অঙ্গীকার করিয়া এই তত্ত্বকণ্টকসংকুল সংসারকে ক্ষণেকের জন্য আবাস যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কবির সুখের হাস্যে আমাদের 'নশ্বর' 'অসার' সংসার মুখরিত হইয়া নবশ্রী লাভ করিয়াছে এবং মায়াবাদ যেন আপনা হইতে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কবির উচ্ছৃঙ্খলতায় নব জীবনের আনন্দ সূচিত হইয়াছে এবং উষর দুঃখময় ক্ষেত্রে গঙ্গাধারার ন্যায় একটি পুণ্য প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। কবি অশ্লেষাতে যাত্রা করিয়া অসময়ে অপথে চলিয়াছেন, শপথ করিয়া বিপথ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, মাতাল হইয়া গান গাহিয়াছেন, শুষ্ক ঋষির চিত্তে ও জ্যামিতির সূত্রে সত্যের আলয় নির্দ্দেশ করিয়া "মিথ্যা যদি মধুর রূপে, আসত কাছে চুপে চুপে, তাহা হ'লে কাহার হত ক্ষতি। স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি।" বলিয়া কল্পনার সৌন্দর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, পুষ্প পল্লব শোভিত, আলোক চূর্ণ বিক্ষেপে উজ্জ্বল বনের সৌন্দর্য্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়া যৌবনের জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কবি কলঙ্ক ও নিন্দাপঙ্কে তিলক টানিয়া হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, গীতিগুলির সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য্য। এই অসংযতবাক্ অথচ সুন্দর কবিকে সামাজিকগণ কি বলিবেন ? ইহার রমণীয়তা প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। ইনি হাসিয়া গাহিয়া চিত্ত অধিকার করিবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রাচীন পুঁথি ছিঁড়িয়া তাঁহাদের টিকি ধরিয়া টানা হেঁচড়া করিবেন, ইহাকে কে কি বলিবে ? ইনি অতৃপ্তির চক্ষু তৃপ্তির ফুলশার দ্বারা বিঁধাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন অতীত ও ভবিষ্যত হইতে বর্ত্তমানই শ্রেষ্ঠ। এই মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপনী লইয়া ক্ষণিকা

আমাদের নিকট আসিয়াছে। কিন্তু ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক, প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রতি কটাক্ষক্ষেপী আপাতচপল কবি মধ্যে মধ্যে যে সুগভীর রাগিণী জাগাইয়াছেন, তাহা ক্ষণিকায় ক্ষণ স্বপ্নকে গূঢ় তত্ত্ব সমাবেশে মহান করিয়া তুলিয়াছে। "অন্তরতম" শীর্ষক কবিতার গুরুত্ব অনেক বিপুলকায় কাব্যও বহন করে না।

আমার শরীর অসুস্থ। লিখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের আনন্দ কিছুই ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলাম না।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পুনর্মুদ্রণের জন্য কলিকাতা আসিয়াছি। আশা করি মহাশয় কুশলে আছেন,— আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২রা আশ্বিন, ১৩০৭
২৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

মহাশয়ের কৃপালিপি খানি পাইয়া প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি। এখানে আসা অবধি আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণিকার ক্ষণজন্মা কবি যে আমার প্রীতিজ্ঞাপক পত্রখানির আদর করিয়াছেন, ইহা আমার বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। যিনি পুস্তক খানির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন, সুতরাং এখন আমার জনৈক বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশক খুঁজিতে হইতেছে।

মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ আমার হৃদয়পোষিত চিরদিনের কামনা পরিতৃপ্তি স্বরূপ হইবে। শিলাইদহ যাইবার চেষ্টা করিয়া নানা কারণে বিফলকাম হইয়াছি। ফরিদপুর হইতে আসিবার সময় রেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পরিবারবর্গের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলাম, এ অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মহাশয় যখন কলিকাতায় পুনরায় আসিবেন, তখন দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে আমি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব। শৈশবকাল হইতে মহাশয় আমার হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তির অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, মহাশয়ের দর্শন লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

মহাশয়ের ভক্তদীন
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৭

ভক্তিভাজনেষু,

আমার এখন হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। আপনার কাছে আজ উপস্থিত হওয়ার তাহাও অন্যতর কারণ।

পারিবারিক কথা লইয়া যদি কোন সময়ে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকে, অবশ্যই এতদিনে সে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। বিশেষ যেদিন আপনি লিখিয়াছেন "যে কেহ মোরে দিয়েছে দুঃখ, চিনিয়েছে পথ

তাঁর তাহারে নমি আমি" সে দিনই আপনার শত্রুরা আপনার নিকট হার মানিয়াছে এবং নিতান্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। আমি কোন সময়ে যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তজ্জন্য অনুতপ্ত আছি। তবে আমি যদি কিছু বলিয়া থাকি, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, সাময়িক উত্তেজনার ফলে, এবং আমি কখনও আপনার নিন্দকের দলে মিশি নাই। যাহা হউক আমি আপনাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে আমার ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

আমার 'নীলমাণিক' নামক একখানা ছোট বই কয়েকদিন হয় আপনার নিকট পাঠান হইয়াছে। এই বইখানি সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগে নাই। কিন্তু আমি আপনার নিকট শিক্ষার্থী এবং চিরদিনই উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখেন, তবে তাহার কোন অংশ পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিব না, এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিব এবং শোধরাইবার চেষ্টা করিব।

আপনি বাংলায় এম, এ পরীক্ষার সম্বন্ধে "মডার্ণ রিভিউ"তে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা আমরা পড়িয়াছি এবং আশুবাবু অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িয়াছেন। তিনি বলেন ভাষার মুখে প্রাচীন আবর্জ্জনা ফেলিয়া তিনি তাহার প্রবাহ রোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত উপদেষ্টা কেহ নাই। আপনি এম-এ পরীক্ষার বোর্ডে যদি থাকিতে সম্মত হন, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজ হইবে। আশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি ইউনিভার্সিটির কমিশনের কার্য্যে সারাদিন এত ব্যাপৃত যে বোলপুরে যাইতে পারিতেছেন না। আপনি এখানে আসিলে খবর পাইলে দেখা করিতে চেষ্টা পাইবেন।

সূচনায় হিসাব নিকাশের কথা লিখিয়াছি, ইহা কথার কথা নহে। আমি ৩½ মাস যাবত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছি, রোজ সন্ধ্যার পরে জ্বর হয় এবং সারারাত্রি প্রবল জ্বর অনুভব করি। আত্মীয় ও ডাক্তাররা ভয় পাইয়াছেন, কারণ এখন আমার বয়স ৫০এর উপরে। কিন্তু সংসারের হিসাব নিকাশ লইয়া চিরকালই গোল করিয়া মরিব, আমার স্রষ্টার এ উদ্দেশ্য নহে, বোধ হয়।

আমার শরীর দিনের বেলায় কখনও কখনও ভাল থাকিলে গাড়ীতে কতকটা যাইতে পারি, কিন্তু সে শক্তিও বোধ হয় বেশী দিন থাকিবে না। আপনি এখানে আসিলে একবার আমাকে দেখিতে আসিবেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব। আপনার পায়ের ধূলা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে পড়িয়াছে, এই ভরসায় এই অনুরোধ করিলাম।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা যদি ছেঁড়া কাগজের দামেই বিকায়, তজ্জন্য আমার কোন দুঃখ নাই, কারণ এখন আমার নিকট প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা দুইই সমান। আমি কলিকাতায় যে ঠিকানায় আছি তাহা নীচে দিলাম।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
বাগবাজার

প্রণত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
শ্রীহরি বাগবাজার, কলিকাতা
৬।১২।১৮

ভক্তিভাজনেষু

আজ আপনার পত্রখানি পড়িয়া কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে। আপনি দুর্দ্দিনে আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আপনার কথায় গগনবাবু আমাকে বাড়ী তৈরী করিবার খরচের অনেকাংশ বহন করিয়াছিলেন, আপনার কথায় আমার ত্রিপুরার বৃত্তি হইয়াছে, আমার আর্থিক কষ্টের সময় আপনি চিঠিপত্র দিয়া নানাভাবে আমার উপকার করিয়াছেন ;…

আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার দিন আসিয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া চিনিলাম, যাঁহার কথায় ও ব্যবহারে আদর্শ পুরুষের অনেক গুণ দেখিলাম, তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা না দেখাইতে পারিলে আমার অসহণীয় ক্ষুদ্রত্ব আমার নিজকে পীড়ন করিবে। আজ যুক্তকরে আপনাকে নমস্কার জানাইতেছি।

আশুবাবু বাঙ্গলাভাষাকে কিরূপে ইউনিভার্সিটিতে চালাইতে হইবে, তাহার উপদেশ আপনার নিকট চান। তিনি যাঁহাদিগকে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করেন, তাহাদিগের উপর সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন ; আপনার মতন এই বিষয়ে কে তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারিবে ? তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে আপনার প্রত্যেক পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"নীলমাণিক" সাতদিনে লিখিত হইয়াছে, উহা আপনার পড়িবার যোগ্য হয় নাই ; পুরাতন জিনিষের উপর আমার একটা ঝোঁক আছে, সে ঝোঁকটা বোধহয় রোগে পরিণত হইয়াছে। আপনার বিচার প্রতিকূল হইলেও অবনত মস্তকে মানিয়া লইব।

আমার দুই দিন জর হয় নাই, এজন্য এই চিঠি নিজ হাতে লিখিতে পারিলাম। আপনার ক্ষমার মোহরাঙ্কিত পত্রখানি পাইয়া কত সুখী হইয়াছি, তাহা আর কি লিখিব উহা দুর্ল্লভবস্তুর মত রাখিয়া দিলাম।

চিরাশ্রিত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৩০।৩।৩৬

ভক্তিভাজনেষু,

নন্দলালবাবুর সঙ্গে আপনার জন্য এক সেট "বৃহৎ বঙ্গ" (দুইখণ্ড) পাঠাইয়াছিলাম, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে তাহা দাখিল করার দরকার হইয়াছে।

এই পুস্তক দশ বার বৎসর খাটিয়া লিখিয়াছি, সুতরাং আপনার মত ব্যক্তির নিকট তাহার একটা সমালোচনা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, যদি আপনার স্বাস্থ্য ও অনবকাশ বশত আপনি তাহা না লিখিতে পারেন, তবে ক্ষুদ্র একটি মন্তব্যের সহজ সৌজন্য হইতে কেন বঞ্চিত হইব, তাহা বুঝিতে পারি না, এই

পুস্তকের অনেক স্থলে আপনার কথা বহু সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছি। যিনি সমস্ত জগৎ কর্তৃক অভিনন্দিত, আমার মত ব্যক্তির সেইরূপ লেখা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন। আমি যাহা চাহিয়াছি তাহা দাবী নহে, অনুগ্রহ, সুতরাং অনুগ্রহ-প্রার্থীর কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার অধিকার নাই।

বিনীত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১০

Phone South 1123,
"Rupeswar House"
Behala, P. O.
Calcutta
১৭।১০।৩৯

শ্রীহরি শরণং

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

পূজার সংখ্যা বাতায়নে আপনি অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ সমালোচনা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না, আপনার অন্তর্দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রিত, যে তাহাতে যে কোন বিষয়ের জটিলতা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। আপনি বৃদ্ধ, কিন্তু মনের জগতে আপনার চিরযৌবন; তাহা বয়স এবং শারীরিক দৌর্বল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আপনার মন্তব্য ক্ষুদ্র একটি মণির ন্যায় বহুমূল্য ও উজ্জ্বল। আপনি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করুন।

বহুদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখিলাম, আমি আপনার অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট, তথাপি আপনার মত স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারি নাই। অনেক সময় বিছানায় মৃতের মত পড়িয়া থাকি এবং বিগত জীবনের সেই অধ্যায়টি বিশেষ করিয়া স্মরণ করি যখন আপনার দুর্লভ সঙ্গ ও সৌহার্দ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আপনার স্মৃতিতে যদি সেই অধ্যায়ে কোন দাগ কাটিয়া থাকে, তবে হয়ত বুঝিবেন, আপনার প্রীতি ও সহৃদয়তা বঞ্চিত হইয়া আমি কতটা রিক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

চিরানুরক্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১১

7, Biswakosh Lane,
Baghbazar,
Calcutta

শ্রীহরি

ভক্তিভাজনেষু,

অরুণ বলিতেছে, আপনি পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ চিঠি লিখিয়া পাঠাইবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন একজনে করেন, আর একজনে দেখিয়া দেন, ইহাই সাধারণ রীতি। সে অনুসারে আপনার কাজ আপনি করিয়াছেন, প্রত্যেকটি প্রশ্ন দেখিয়া দিয়াছেন। এবং আপনার অনুমোদন লইয়া আমি আশুবাবুকে বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং ব্যাপারটা একবারে সমাধা হইয়া

গিয়াছে। এখন যদি অন্যরূপ করেন, তবে কর্তৃপক্ষ মনে করিবেন, আমি আপনার কোনরূপ বিরক্তির কারণ দিয়াছি— উহা আমার পক্ষে বড়ই খারাপ হইবে। আশুবাবু আমাকে গালমন্দ দিবেন, যেহেতু সব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি। যে প্রশ্নটি বাদ দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বাদ দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যদি এখন আপনি অস্বীকার করেন, তবে আর একজন যোগ্য পরীক্ষককে নিযুক্ত করিতে হয়, কারণ প্রত্যেক Paperএ দুইজন করিয়া পরীক্ষক থাকেন। আপনি না করিলে আর একজন হইবেন। আমার আবার তাঁহার কাছে যাইয়া প্রশ্ন দেখাইয়া অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি অতিশয় অসুস্থ, আমার কাজ তাহা হইলে আরও বাড়িয়া যাইবে ও বড় ঝঞ্চাটে পড়িব। মহাশয় দয়া করিয়া যাহা অনুমোদন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিবেন। বরং কাগজ দেখা সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিলে সেই কাজ অস্বীকার করিয়া চিঠি দিতে পারেন। যাহা শেষ করিয়া দিয়াছেন এবং আমি তদনুসারে জানাইয়াছি, তাহা বহাল রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। আমি বড়ই অসুস্থ, তাহা না হইলে প্রণতিপূর্বক এই নিবেদন জানাইতে নিজেই যাইতাম আমার অসুস্থ অবস্থায় আমার দুঃখের মাত্রা বাড়াইবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন।

প্রণত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পত্রসংখ্যা

১ "বিদ্যাসাগর" কথা : 'বিদ্যাসাগর চরিত', সাধনা ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

২ কণিকা : প্রথম প্রকাশ ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ [১৮৯৯]

৩ কথা : প্রথম প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬ [১৯০০]

৪ কাহিনী : প্রথম প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬ [১৯০০]
'কুন্তী-সংবাদ' : কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

৫ ক্ষণিকা : প্রথম প্রকাশ ২৬ জুলাই [১৯০০]

৬ "মহাশয়ের কৃপালিপিখানি পাইয়া প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি।" দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ২, পৃ ৯৫

৭ নীলমাণিক : প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩২৫। দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৩৩, পৃ ১১২

৮ গগনবাবু : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯ নন্দলালবাবু : নন্দলাল বসু। দ্র° রবীন্দ্রনাথ -লিখিত পত্র ৩৪, পৃ ১১৩

বঙ্গভাষার ইতিহাস।

প্রথমভাগ।

প্রণেতা

শ্রী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গুপ্তযন্ত্র

কলিকাতা—২৪ মির্জ্জাফর্শ লেন।

সম্বৎ ১৯২৮, জ্যৈষ্ঠ।

'বঙ্গভাষার ইতিহাস' : ১৯২৮ সম্বৎ (১৮৭১ খ্রীঃ)। আখ্যাপত্র

ও কজ্জল' উপন্যাসটির চাহিদা থাকা উচিত। নিছক স্টাইলের জন্যও 'আলোকে আঁধারে' যে-কোনো পাঠককে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করবে।

অথচ তাঁর রচনার পরিমাণ কম নয়। এমনকি মৌলিক রচনা বলতে যা বুঝি তার সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নয়। তাঁর রচনার নিদর্শন হিসেবে কোনো কোনো সংকলনগ্রন্থে যে সামান্য অংশ স্থান পেয়েছে, তাতে তাঁর প্রতিভাকে বোঝবার সুযোগ নেই। এ কথা আমরা অনেকেই জানি না যে, রামরাম বসুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দীনেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ কথা কি সত্য নয়, সম্প্রতি যে লোক-সাহিত্য ও -সংস্কৃতির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়েছি— তার পিছনে তাঁরই কৃতিত্ব আছে? দীনেশচন্দ্রের রচনা বা সাধনা সম্পর্কে সাধারণ পাঠক যে প্রায় উদাসীন, এ কথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু সাহিত্যসাধক বলতে যা বোঝায়, দীনেশচন্দ্র ছিলেন তাই। সাহিত্যসাধনার দুটি পথ। এক দিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে পুরাতন সৃষ্টির আবিষ্কার। দীনেশচন্দ্র এক দিকে যেমন নিজে সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি পুরাতন সৃষ্টিকে আবিষ্কার ক'রে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এক দিকে তিনি প্রাজ্ঞ-গবেষক, অন্য দিকে তিনি রসিক-সাহিত্যিক। আবার, গভীরতর অর্থে তাঁর লেখক-সত্তা ও সমগ্র রচনা এই দুটি উপাদানের সমাহারে রচিত। স্রষ্টা ও সমালোচক অর্থে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী আখ্যা দিয়েছিলেন। ঠিক পুরোপুরি এই অর্থে না হলেও, তাঁকেও সব্যসাচী বলা যায়। তিনি মূলত গবেষক, কিন্তু গবেষণাও কি বৃহত্তর অর্থে সমালোচনা নয়? বস্তুত, গবেষণার কাজে সমাহিত হয়ে তিনি রসসৃষ্টির কাজেও আত্মমগ্ন[৫]; প্রাজ্ঞ হয়েও রসিক। আমরা অনেক সময়ে মনে করি, পণ্ডিত মাত্রই অ-রসিক, রসিক মাত্রই অ-পণ্ডিত।

এক দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ শেষ হতে চলেছে, অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব তখনো বিদ্যমান; অন্য দিকে রবীন্দ্র-পর্বের সূচনা— এর মধ্য দিয়েই দীনেশচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি যেমন বঙ্কিম-গোষ্ঠীর লেখকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি রবীন্দ্র-প্রতিভার মাধুর্যও অনুভব করেছিলেন।[৬] অর্থাৎ কালগত বিচারে, তিনি এমন-একটি পর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন যখন তাঁর সামনে দুটি আদর্শই বিদ্যমান। তবে, যেহেতু প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সম্রাটের মতো তৎকালীন লেখক-গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিলেন, যেহেতু তাঁর মধ্যেই নবযুগের বা নবজাগরণের প্রভাব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল, সেই কারণেই দীনেশচন্দ্র অজ্ঞাতসারেই একলব্যের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন।

√উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার আলোচনায় সকলেই ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা বলেছেন। এর ফলে, এক দিকে যেমন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীকে আমরা পেয়েছিলাম— যাঁরা আচারে-ব্যবহারে সাহেব হবার স্বপ্ন দেখতেন, অন্য দিকে তেমনি আমাদের দৃষ্টি পড়েছিল প্রাচীন

---

৫. দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন শুরু হয় অনেকের মতোই কবিতা-রচনার মধ্য দিয়ে।

৬. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত লেখা পাঠ করিলেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক জানিবার বাকী থাকে!"

"এই শিল্পকলা বঙ্গসাহিত্যে নতুন যুগ আনয়ন করিয়াছে।"— ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য

সংস্কৃতির দিকে। এ কথাও আমরা জানি যে, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাবধারাই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং অতীত-সম্প্রীতির প্রেরণায় আমাদের সমগ্র সমাজজীবনে এক নবজীবনের উদ্‌ভব ঘটে। প্রাচীন মধ্য যুগের 'অন্ধকার পর্ব' অতিক্রম করেও প্রাচীন জীবনের দিকেই দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছিল— তবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এই অতীত-সম্প্রীতির প্রধান উপাদান ইতিহাস-চেতনা। যদিও এই চেতনা ক্ষীণভাবে উনিশ শতকের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়, তথাপি সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এর পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[৭]

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এই চেতনাকে আশ্রয় করেই সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন। এবং, শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই নয়, তৎকালীন প্রায় সমস্ত খ্যাত-অখ্যাত লেখক, রাজনীতিক এবং চিন্তানায়কদের মধ্যেই এই বোধ জাগ্রত ছিল। আসলে, নবজাগরণ বা রেনেসাঁস পুরাতনীর নবজন্ম; এবং পুরাতন সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যকে আধুনিক মানসের কাছে, শিল্পে বা সাহিত্যে, নতুন রূপে রূপদান করাই রেনেসাঁসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।[৮] য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে— প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় শিল্প-সাহিত্য অনুশীলনের মধ্য দিয়েই 'ডার্ক-এজ্'এর অবসানের পর নবযুগ ও মানবতাবাদের উদ্‌ভব হয়েছে। ঠিক এতটা ব্যাপক না হলেও, বাংলাদেশেও উনিশ শতকে অনুরূপ একটি মানসিকতার সঞ্চার হয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নবযুগের সূত্রপাত— তা বাহ্যত প্রাচীন 'ডার্ক-এজ্'এর হাত থেকে মুক্তি হলেও নবযুগের উপাদানের জন্য সেই প্রাচীন যুগের দিকেই দৃষ্টিপাত। সাহিত্যক্ষেত্রে, এই মানসিকতার ফলে দুটি প্রবণতা দেখা যায়— এক: প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসমিশ্রিত সাহিত্য-সৃষ্টি, দুই: প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার বা আবিষ্কার।

বাস্তবিক পক্ষে, উনিশ শতকে যে ইতিহাস-চেতনার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের স্ফুরণ ঘটেছিল, যা বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্যদের মধ্যে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, সেই চেতনাই দীনেশচন্দ্রের মধ্যে সদা জাগ্রত ছিল এবং এর ফলেই তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্যের, বিশেষত লোকসাহিত্যের অর্থাৎ গীতিকা পালাগান প্রভৃতির, বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কেননা, কোনো জাতির বা সমাজের ইতিবৃত্ত আসলে সমাজজীবনেরই ইতিবৃত্ত। যার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় লোকসংস্কৃতির মধ্যেই সব থেকে ভালোভাবে পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্রের মধ্যে এই ইতিহাস-চেতনা এবং ইতিহাস-চেতনা -জনিত অতীত সম্প্রীতি প্রবল ছিল বলেই[৯] তিনি বাংলার লোকগাথাগুলিকে জাতির মূলবান সম্পদ বলে মনে করেছিলেন; এই কারণেই পল্লীগাথাগুলিকে তিনি শিক্ষিত নাগরিক মানসের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, আধুনিক সমাজের কাছে প্রাচীন সমাজের যথার্থ পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর

---

৭. "যখন বাঙালীর প্রাণ মনের পূর্ণ জাগরণ ঘটিল, যুগের সেই তৃতীয় ও শেষ পর্বে, সে আত্মপ্রকাশের ভাষাও খুঁজিয়া পাইল— নব্য বাঙলা সাহিত্যের জন্ম হইল। এই নব্য সাহিত্যই জাতি হিসাবে তাহার পূর্ণ জাগরণের নিদর্শন; ইতিপূর্বে সে যাহা কিছু করিতেছিল, তাহার আত্মাকেই খুঁজিতেছিল—তখনও পায় নাই—।" ভূমিকা। বাংলার নবযুগ, মোহিতলাল মজুমদার।

৮. ···The Renaissance was re-birth; ···Or it may mean the resuscitation of simply intellectual activities, stimulated by the revival of antique learning and its application to the arts and literature of modern peoples." Renaissance—Encyclopaedia Britanika, Vol 19, p 122.

৯. দীনেশচন্দ্রের উক্তি স্মরণযোগ্য: "বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায় তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?"— ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য।

প্রধান কৃতিত্ব এখানেই। যদিও নবজাগরণের সূচনার বেশ কিছু পরে তাঁর এই প্রয়াস, তথাপি এ কথা সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়— দীনেশচন্দ্রের সত্তা ও মানসপ্রকৃতি নবজাগরণের আলোকেই আলোকিত।

প্রায় সকলেই, বিশেষত সাহিত্যিকরা, সেদিন একটি সত্য অনুভব করেছিলেন যে, অতীতকে তুচ্ছ করলে চলবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে এর সূচনা, এমনকি মধুসূদনের মধ্যেও দেখি একই প্রেরণা ক্রিয়াশীল, বঙ্কিমচন্দ্র তো প্রত্যক্ষভাবেই এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত।[১০] পরে রবীন্দ্রনাথ আরো ব্যাপকভাবে অতীতকে স্মরণ করেছিলেন। এখনো পর্যন্ত এই প্রবণতা সাহিত্যে বা শিল্পে বজায় রয়েছে। দীনেশচন্দ্রের সমগ্র প্রয়াস ও সাধনা এই কাজেই সমর্পিত হয়েছিল।

সম্ভবত, ঈশ্বর গুপ্তই 'সংবাদ প্রভাকর'এর (১৮৩১) মাধ্যমে সর্বপ্রথম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। তার পর বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম দিকে অনেকেরই ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগরই বাংলা ভাষার জন্মদাতা।[১১] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হওয়ার পরে অবশ্য এই ধারণা দূর হয়েছিল। রামগতি এই গ্রন্থে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ প্রমুখ প্রাচীন কবিদের পরিচিতি দেন। তাঁর অনুসরণে অনেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন।[১২]

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই শুধু মৌলিক সৃষ্টিরই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুনরুদ্ধারেরও চেষ্টা চলছিল। এবং, স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই অতীত-সম্প্রীতি আসলে ইতিহাস-চেতনা থেকেই উদ্ভূত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন ; সেখানে তিনি কয়েকটি প্রাচীন বাংলা বই দেখেছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পঠিত একটি প্রবন্ধে তিনি প্রায় দেড় শো কবির নাম ও তাঁদের গ্রন্থের সমালোচনা করেন। এই সূত্রেই দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎসাহ থেকেই বৌদ্ধ গান ও দোঁহা-র আবিষ্কার। এই সময়ে বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর পুঁথি আবিষ্কার করেন। এইভাবে, যখন একদিকে কলকাতায় সমবেতভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য তথা পুঁথি আবিষ্কারের আয়োজন চলেছে (যে ধারার শুরু হয়েছিল কলকাতায়) তখন একক চেষ্টায় লোকচক্ষুর আড়ালে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দীনেশচন্দ্র সেনও অনুরূপ সাধনায় লিপ্ত। তখনকার স্মৃতিকথায় দীনেশচন্দ্র বলেছেন—

"ইংরেজি সাহিত্যের একখানি ইতিহাস— ভারতীয় আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে শুরু করিব— এই সংকল্প করিতেছিলাম। এমন সময় কলিকাতার পিস্ এসোসিয়েশনের

১০. 'আনন্দমঠ'এর 'মা যা ছিলেন' মূর্তির কথা স্মরণীয়।

"Bankimchandra was the greatest figure of the second phase of the Bengal Renaissance as Rammohan Ray was of the first. In this phase Bengal did not merely look beyond the seas to western science and philosophy, she wanted also to look but at her own heritage.!!"

—Bankimchandra Chatterjee—Subodh chandra Sengupta. Studies in Bengal Renaissance, p 96

১১. মুখবন্ধ। বৌদ্ধগান ও দোঁহা— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১২. এই ধরণের কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য : হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবি-চরিত (১৮৬৮), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১), রাজনারায়ণ বসুর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), প্রভৃতি।

নোটিশ পড়িলাম, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণামূলক সর্বোত্তম প্রবন্ধের পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে।· ·

আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া এতদিন ঘাটাঘাটি করিতেছিলাম, সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম।· ·পিস্ এসোসিয়েশনে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য মনে করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।'[১৩]

এই সূত্রেই তিনি বলেছেন—

"আমি তখন সর্বপ্রথম বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ কার্যে অনুরাগী হইয়াছিলাম।"[১৪]

তা ছাড়া, তাঁর নিজের কথাতেই জানা যায়—

"সংস্কৃত পুঁথিরই লোক সন্ধান করিত, বাঙ্গালা পুঁথির কোন খোঁজ কেহ লইত না।· ·চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ আমি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়িলাম বটে কিন্তু বাঙ্গালা পুঁথি যে পল্লীতে পল্লীতে তুলট কাগজের খনি খুঁজিলে পাওয়া যায়, এ কথা তখন কাহারও মনে উদিত হয় নাই।· ·তখন এই কাজে আমার প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সঙ্গে লাগিয়া গেলাম।· ·এইভাবে যখন প্রায় ১০০শত অপ্রকাশিত বাঙ্গলা পুঁথির সংগ্রহ হইল, তখন মাসে মাসে তাহার বিবরণ সম্বলিত সন্দর্ভ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত করিতে লাগিলাম এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন।"[১৫]

তাঁর প্রথম উক্তির অন্তর্গত 'এতদিন' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপরোক্ত বিবৃতি থেকে জানা গেল—

১. চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

২. পিস্ অ্যাসোসিয়েশনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণার আগেই (অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই) তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বা পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

৩. তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

দীনেশচন্দ্রের এই বিবৃতির সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তিও স্মরণযোগ্য—

"এই সময় বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন।···দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধ পর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।"[১৬]

এঁদের যুগ্ম-বিবৃতি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, দীনেশচন্দ্রই বাংলা পুঁথি সংগ্রহের কাজে পথিকৃৎ[১৭]। এবং, মনে হয়, প্রাচীন পল্লীগাথা সংগ্রহের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের ফলেই 'বৌদ্ধগান

১৩. কুমিল্লায় চাকরী, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'

১৪. তদেব, পৃ ২০৭।

১৫. তদেব, পৃ ২১৪।

১৬. মুখবন্ধ। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা

১৭. দীনেশচন্দ্রের নিজের কথার উপর ভিত্তি ক'রেই এই মন্তব্য করা হল। বস্তুত, বাংলা পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা সর্ব প্রথম কে করেছিলেন, তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে— ঈশ্বর গুপ্ত কিসের উপর ভিত্তি ক'রে প্রাচীন কবিদের জীবনী বা কাব্য সংগ্রহ করেছিলেন? এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার সুযোগ আছে। এখানে দীনেশচন্দ্র সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হল মাত্র।

ও দোঁহা' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার সুগম হয়েছে; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, এই ধরণের কাজে তিনি দীনেশচন্দ্রের সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর আবিষ্কারও অনুরূপ উৎসাহেরই ফল। প্রকারান্তরে বলা যায়, দীনেশচন্দ্রই ব্যাপকভাবে প্রাচীন বাংলা কাব্যের পুনরুদ্ধার করেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রামগতির মধ্যে যার সূচনা দেখা গিয়েছিল, দীনেশচন্দ্রের সাধনায় তা পূর্ণতা পেয়েছে। গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের সপ্তম দশকের আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা হয় নি। কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেন। সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে ঐ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যদি হয় 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র আবিষ্কার (কারণ, তার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি ইতিহাস জানা গেছে), তবে বলতে হয়, এই কাজে এবং প্রায় সমগ্র বাংলা লোকসাহিত্যের ও প্রাচীন কাব্যের আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর কীর্তি নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। আবার, এখানেই তাঁর সঙ্গে উনিশ শতকের নবজাগরণের যোগ। য়ুরোপে গ্রীক-রোমীয় সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেমন আধুনিক জীবন ও সাহিত্য আলোকিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের দর্পণেই বাঙালির আসল স্বরূপ ধরা পড়েছিল। দীনেশচন্দ্রের লক্ষ্য ও আদর্শও তাই।—

"প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়িয়াছিলাম, —তাহারও পূর্বে যেদিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমরুর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনোই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি পাঠকালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের পথে কানাকড়ি খুঁজিতে গিয়া যেন আমি স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার পাইয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় আমরা জানি না যে বঙ্গদেশের পল্লী-লক্ষ্মী এইরূপ শতশত রত্ন তাহার অঞ্চলে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের ইতিহাস-সম্বলিত পালাগান এই দেশময় প্রচলিত ছিল।"[১৮]

আধুনিক সাহিত্যের রসিক পাঠক হয়েও পল্লীগাথা বা পালাগানের প্রতি তাঁর অনুরাগ যে কত গভীর ছিল, এ তারই প্রমাণ। এই অনুরাগ বা প্রেরণাতেই তিনি সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন :

"আমি বুঝিয়াছিলাম, এই বাঙ্গলা ভাষার চর্চাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার হাত রিক্ত হইবে, প্রাণ অবলম্বনশূন্য হইবে, এবং যা একটু অবশিষ্ট আনন্দ আছে— তা হারাইয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে।"[১৯]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের অন্যতম মানদণ্ড ছিল বাঙালিত্ব। একদল সমালোচক 'খাটি বাঙালি লেখক'কে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। দীনেশচন্দ্র অন্তত এই কারণেও স্মরণযোগ্য, সন্দেহ নেই! তবে, সৌভাগ্যের কথা, তিনি এইসব পল্লীগাথার মধ্যে এক চিরন্তন মানবজীবনের সত্যকে অনুভব করেছিলেন। এবং বিশ্বের সামনে তার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। য়ুরোপের অনেক মনীষী বা সাহিত্যিক এইসব অখ্যাত পালাগানের চিরন্তনতা স্বীকার করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র এইভাবে 'গৃহের বণিতা'কে 'বিশ্বের কবিতা'য় পরিণত করেছেন!

১৮. ভূমিকা, ১৮৯০। পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

১৯. কুমিল্লা জীবনের শেষাঙ্ক। 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য'।

দীনেশচন্দ্র পল্লীগাথাগুলিকেই বাংলার যথার্থ ইতিহাস মনে করেছিলেন। এই উপলব্ধির পিছনে তাঁর ইতিহাস-চেতনার কথা বলেছি। কিন্তু তাঁর সাহিত্যসাধনার পিছনে যদি নিছক এই তাগিদ থাকত তাহলে ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থাকত না। তিনি তারিখ-সালের তর্কাতীত সূক্ষ্ম বিচারকে মুখ্য মনে করেন নি, এগুলির বিচার করেছেন একটি গভীর সাহিত্যিক-মন নিয়ে। এবং, এর মধ্যে তাঁর 'ভক্তি মিশ্রিত পূজা'র[২০] পরিচয় পাই। প্রাচীন লোকসাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ নবজাগরণেরই ফল। সি. এফ. এণ্ড্রুজ বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন।[২১] বস্তুত, প্রাচীন কবিদের 'ইতর' মনে করা হত, দেশীয় সংস্কৃতিকে ঘৃণা না হোক, অন্তত অবহেলা করাই ছিল নিয়ম, তখন তিনি ভক্তিপূর্ণ অন্তরে এগুলির উদ্ধারে লেগে গেলেন, কতকটা রামচন্দ্রের অহল্যা-উদ্ধারের মত।

কিন্তু কেন? বাংলার প্রতি গভীর অনুরাগ বা দেশপ্রেমের প্রেরণাতেই তিনি 'ইতর' জনের সৃষ্টিকে সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত লেখকদের মধ্যে, এমনকি মধুসূদনের মধ্যেও, এই প্রেরণাই উজ্জীবিত ছিল। রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে এই দেশপ্রেমের প্রেরণা ক্রমশ গভীরতর হচ্ছিল। দীনেশচন্দ্র এই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা, বৃহৎ বঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তারই নিদর্শন। প্রাচীন পৌরাণিক গাথা, মঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকা বা গীতিকার কাহিনীগুলি এইজন্যই তিনি বাঙালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। 'বেহুলা'র ভূমিকায় বলেছেন—

"যে বঙ্গের পল্লীতে২ এই যে একটা মহাভাবের আবর্ত চলিয়া যায়, তাহার একটা লহরী পর্যন্ত আসিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে না। স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে· ·"

এবং 'সতী'র ভূমিকায় বলেছেন—

"আমাদের সর্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্তমানের উপযোগী সমাজ গঠনের ভিত্তিভূমি পাইব,· ·সেই পরিচয়-সাধনের চেষ্টা কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি শিক্ষা, সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত।"

'পুরাতনী'র ভূমিকায় বলেছেন—

"বঙ্গের পল্লীতে২ যেসকল রত্ন-মাণিক্য লুক্কায়িত আছে· ·এই বঙ্গভূমির লুপ্তরত্নের খোঁজে আমার মন ·উতল হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইত।"

স্বভাবতই তিনি যা-কিছু করেছেন, তার পিছনে ছিল এই আদর্শবোধ। অতীতের দিকে তাঁর মনের এক অংশ, আর-এক অংশ বর্তমানের দিকে—যার প্রকাশ উপন্যাসের মধ্যে। তবে সুর একই, শুধু রূপ ভিন্ন। 'পৌরাণিকী'র আখ্যায়িকাগুলি অতীত-সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত, তেমনি সমকালীন সমাজ-চেতনার পরিচয় পাই দেশমঙ্গল, চাকুরীর বিড়ম্বনা প্রভৃতি উপন্যাসে। সন্দেহ নেই, এইসব লেখা উদ্দেশ্যমূলক।

---

২০. "কবি কথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন।"—রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকা, রামায়ণী কথা।

২১. **An essay on the Bengal Renaissance**—*Letters to a Friend.*

যদি তাঁকে রবীন্দ্রযুগের লেখক বলা যায়[২২] তথাপি এক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাবশিষ্য। অন্তত, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা মানতেই হবে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করলেও তাঁর মত কল্পনাশক্তি ছিল না, তাই দীনেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তেমন রসোত্তীর্ণ নয়।

তিনি নিজে যেমন গবেষক-গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, তেমনি তাঁর পথ অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্যের অনেক লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। বস্তুত, যে পথ তিনি সামনে খুলে দিয়েছেন, আশা করা যায়, উত্তরসূরীরা সেইপথ লক্ষ্য করেই নতুন আবিষ্কারের কাজ গ্রহণ করবেন। দীনেশচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত সেই আশাই পোষণ করতেন :

"আজ যাঁহারা বাঙ্গালায় এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছেন ও করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।"[২৩]

---

২২. বাংলা সাহিত্যের একদিক, শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২৩. আমার শ্রমের সার্থকতা। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃ ৪০৭

ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র

প্রবোধচন্দ্র সেন

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৮৮৫ সালে। ওই গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে আভাস দেন যে, রচনার ধরণে ঈশ্বরচন্দ্র অনেকাংশেই ছিলেন ভারতচন্দ্রের অনুবর্তী। সে সময় থেকে এই ধারণাটা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। আমি অন্য প্রবন্ধে[১] দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাবও কম ছিল না। বরং ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রতিই যে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা গভীরতর ছিল তার সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। ফলে তাঁর রচনায় রামপ্রসাদী ছাপটাই গাঢ়তর হওয়া স্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলীর ভাব, ভাষা ও অলংকারে সে প্রভাব কতখানি, উক্ত প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে তথ্যপ্রমাণযোগে কিছু আলোচনা করেছি। ছন্দশিল্পে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের দ্বারা কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

আধুনিক কালে বাংলা কবিতা রচিত হয় তিনটি বিভিন্ন ছন্দোরীতিতে। এই রীতিগুলির প্রচলিত নাম স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। আধুনিকতম পরিভাষায় এগুলিকে বলি যথাক্রমে দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত।[২] এই তিন রীতির পরিণতিসাধনে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের দান ও কৃতিত্ব কতখানি, এখন একে একে তা নিরূপণ করতে চেষ্টিত হব।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি

রামপ্রসাদের আমলে বাংলায় এই তিন রীতির ছন্দই প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে মিশ্রকলাবৃত্ত (প্রচলিত পরিভাষায় 'অক্ষরবৃত্ত') রীতির ছন্দই সবচেয়ে সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সবচেয়ে বনেদি বলে গণ্য ছিল। এই রীতির উদ্‌ভব হয় প্রাচীন কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) রীতির উপরে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির অলক্ষিত অথচ সুনিশ্চিত প্রভাবের ফলে। তার প্রথম শৈশবলীলা দেখা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। তখন তা কোনো ধ্রুবনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণরীতির বদ্ধমূল সংস্কার এবং অপর দিকে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের বিপরীতমুখী প্রবণতা, ওই নবোদ্‌ভূত ছন্দোরীতি ছিল এই দুএর মধ্যে দোলায়মান। কখনও ঝোঁক এদিকে, কখনও ওদিকে। তা ছাড়া সংগীতের প্রভাবও ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক বাক্‌রীতির উপরে প্রতিষ্ঠালাভের আর-এক অন্তরায়। এই অবস্থা চলল দীর্ঘকাল। অবশেষে ভারতচন্দ্র এসে তার এই অব্যবস্থিত দশা থেকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে তাকে বাঁধলেন বাংলা অক্ষরসংখ্যার কৃত্রিম নীতির বন্ধনে। এ ভাবেই দেখা দিল 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত' রীতি। কিন্তু অক্ষরসংখ্যার সংস্কারও একটা ভ্রান্ত সংস্কার। অথচ এই সংস্কারই আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

---

১ 'কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র', অমৃত ১৩৭৩ ভাদ্র ৩০।

২ এই পারিভাষিক নামগুলির বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে লেখকের 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থের (১৩৭২) শেষ অধ্যায়ে।

কিন্তু কৃত্রিম হলেও এই অক্ষরবৃত্ত রীতির মধ্যে কি কোনো নিগূঢ় ছন্দোনীতি নেই? নিশ্চয়ই আছে। যদি না থাকত তবে এতকাল ধরে কবিরা এই রীতিতে যে কবিতা রচনা করে আসছেন তা সমস্ত বাঙালির কানের এমন দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পেতেই পারত না। কৃত্রিম অক্ষরবৃত্ত রীতির অন্তর্নিহিত ওই ধ্রুব ছন্দোনীতির আবিষ্কারই বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় প্রয়াস, ছন্দোজগতে সংস্কারমুক্তির প্রয়াস। কিন্তু আমাদের পক্ষে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ভারতচন্দ্রের মতো রামপ্রসাদও এই রীতির ছন্দে অক্ষরসংখ্যার নীতিই অনুসরণ করতেন এবং এই রীতির ছন্দকেই সাহিত্যের, বিশেষত: অ-গেয় সাহিত্যের, প্রধান বাহন বলে মনে করতেন। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যাবে।

গানরচনায় রামপ্রসাদ প্রয়োজনমতো তিন রীতির ছন্দই ব্যবহার করতেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছন্দের নীতি (সে নীতি কৃত্রিম বা অকৃত্রিম যা-ই হক না কেন) অনুসরণ করে চলা অত্যাবশ্যক নয়। অনায়াসেই গানের সুরের উপরে ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া চলে। আবৃত্তিযোগ্য রচনায় যেখানেই মাত্রাহানি, মাত্রাবৃদ্ধি, যতিলঙ্ঘন বা রীতিমিশ্রণ -জনিত ত্রুটি থাকে সেখানেই কণ্ঠের স্খলন ঘটে ও শ্রুতি পীড়িত হয়। কিন্তু গানের সুরে এসব ত্রুটি অনায়াসেই সেরে নেওয়া যায়। রামপ্রসাদের গীতিরচনায় সবরকম ত্রুটিই পাওয়া যায়। কিন্তু সবরকম ত্রুটির দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। শুধু একরকম ত্রুটির উদাহরণ দেওয়াই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—

অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মন-ভৃঙ্গ।
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য 'যেমন', নিদ্রাভঙ্গে ভাব 'কেমন',
বিষয় জানিবে 'তেমন', হোলে নিদ্রাভঙ্গ॥

.. ..

এই যে তোমার ঘরে ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও 'পরের' ঘরে, এত বড় রঙ্গ।
'প্রসাদ' বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ॥

—ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ-সঙ্গ, 'কবিজীবনী' (ভবতোষ দত্ত), পৃ ৩৩৯-৪০

এই গানটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির ছন্দে করিত। এর প্রতি পংক্তি চৌপদী। প্রথম তিন পদে আট 'অক্ষর' এবং চতুর্থ পদে ছয় অক্ষর— এ ছন্দোবন্ধের এই হল আদর্শ। কিন্তু পাঁচটি পদে আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, কারণ এসব পদে একটি করে বাড়তি অক্ষর আছে। অর্থাৎ এসব স্থলে মাত্রাবৃদ্ধি দোষ ঘটেছে। কিন্তু আসলে তা হয় নি, হয়েছে রীতিমিশ্রণ দোষ। উচ্চারণভঙ্গির প্রতি একটু মন দিলেই বোঝা যাবে যে, ছন্দোরক্ষার খাতিরে আমরা স্বভাবতঃই উদ্‌ধৃতিচিহ্নির্দিষ্ট পাঁচটি শব্দকে দলবৃত্ত রীতির ভঙ্গিতে উচ্চারণ করি, অক্ষরবৃত্ত রীতির ভঙ্গিতে নয়। অর্থাৎ ওই পাঁচটি শব্দে আমরা তিন অক্ষরে তিন মাত্রা না ধরে দুই দলে (অর্থাৎ দুই সিলেব্‌ল্‌এ) দুই মাত্রা ধরে ছন্দোরক্ষা করি। মানে, অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে দলবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়ে টাল সামলাই।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের যুগটা ছিল ছাপাখানার যুগ। সে যুগে কবির রচনা ও পাঠকের কানের মধ্যে কণ্ঠস্বরের ঘটকালি করবার সুযোগ ছিল না। ফলে স্বরলিপি যেমন করে গানের সুরের প্রতিনিধিত্ব করে, তখনকার দিনে তেমনি করেই ছাপাখানায় মুদ্রিত নীরব ধ্বনিলিপিকে ছন্দের প্রতিনিধিত্ব করতে হত। এমন অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে রামপ্রসাদের ন্যায় পাঠকের উপরে ছন্দের ত্রুটি সেরে নেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় ছিল না। মনে রাখতে হবে, এ কথা বলা হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত রীতির গীতিরচনা সম্পর্কে। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে এজাতীয় ত্রুটি দেখা যায় না, যা-কিছু দেখা যায় তা তাঁর গীতিরচনাতেই। আর, ঈশ্বরচন্দ্র গেয় ও অগেয় উভয়প্রকার রচনাতেই ওরকম ত্রুটি সযত্নে বাঁচিয়ে চলতেন।

মোট কথা, অক্ষরবৃত্ত (অর্থাৎ মিশ্রকলাবৃত্ত) রীতির সংস্কার বা উন্নতি -সাধনে রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্রের কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বাগত প্রথারই অনুবর্তন করেছেন। কেননা, সে প্রথা তখন অল্পাধিক পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং তার সংস্কার বা উন্নতি -সাধনের অবকাশও বেশি ছিল না। এখনও নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁদের সব প্রচেষ্টাই নিবদ্ধ ছিল ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যসাধনের দিকে, ছন্দোরীতির সংস্কারসাধনের দিকে নয়। কিন্তু অতিবাহুল্যের ভয়ে আমরা ছন্দোবন্ধের প্রসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত রইলাম।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ক্ষেত্রে যা-ই হয়, দলবৃত্ত ও সরল কলাবৃত্ত রীতির ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব আছে।

দলবৃত্ত রীতি

এবার দলবৃত্ত (প্রচলিত পরিভাষায় 'স্বরবৃত্ত') রীতির কথা ধরা যাক। এ রীতি মূলতঃ মেয়েলি ছড়া, পল্লীগীতি প্রভৃতি লোকসাহিত্যের ছন্দোরীতি, সুতরাং বাংলাভাষার স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এই লৌকিক রীতি দীর্ঘকাল সাধুসাহিত্যের আসরে স্থান পায় নি। লোচনদাসের (ষোড়শ শতক) ধামালি রচনাতেই এই ছন্দোরীতির প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই হল এ রীতির প্রথম সাহিত্যিক প্রয়োগ। কিন্তু ধামালি রচনাও লোকসাহিত্যেরই প্রকারভেদ মাত্র, উচ্চাঙ্গ বা সাধু -সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। ধামালিগুলি লোকশিক্ষা তথা লোকরঞ্জনের অভিপ্রায়ে রচিত। তাই তার ভাব, ভাষা ও অলংকার হয়েছে লোকচিত্তের পক্ষে সহজগ্রাহ্য। আর ওই একই অভিপ্রায়ে তাতে অনুসৃত হয়েছে লৌকিক ছন্দোরীতি। মনে রাখতে হবে লোচনদাস তাঁর রচিত সাধুসাহিত্যে (যেমন 'চৈতন্যমঙ্গল') দলবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক রীতির ছন্দ প্রয়োগ করেন নি। তাকে ধামালিজাতীয় লোকসাহিত্যের স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে সাধুসাহিত্যের পর্যায়ে স্থান দিতে সাহস করেন নি।

লোচনদাসের পরেও দীর্ঘকাল এই অবহেলিত ছন্দোরীতিটি লোকসাহিত্যের অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রইল। ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্ ছন্দোবিলাসী কবিও তাকে আমল দিলেন না। তিনখণ্ডব্যাপী সুবৃহৎ অন্নদামঙ্গল কাব্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র রচনায় তিনি ওই ছন্দোরীতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তাও একটি ছড়াজাতীয় রচনা, মেয়েদের মুখে বসানো। তাতেই বোঝা যায়, তখনকার দিনেও সাধুসাহিত্যিকরা এই ছন্দোরীতিটিকে কি নজরে দেখতেন।

অবশেষে রামপ্রসাদের হাতে এসে এই ছন্দোরীতি ভদ্রসমাজে স্থান পাবার অধিকার লাভ করল। ষোলো আনা অধিকার না হলেও রামপ্রসাদ যে অধিকার তাকে দিলেন তাতেই সাধুসাহিত্যের আসরে অন্য দুই ছন্দোরীতির সঙ্গে তার সমকক্ষতা লাভের পক্ষ সুগম হল। রামপ্রসাদও লোচনদাসের মতোই সাধুসাহিত্য রচনায় (যেমন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে) এই লৌকিক ছন্দোরীতিটিকে আমল দেন নি। কিন্তু তাঁর গীতিরচনার ফলে এই রীতিটি যে জনপ্রিয়তা ও উচ্চমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েছে, লোচনদাসের ধামালি তাকে সে সুযোগ দিতে পারে নি। লোচনদাসের ধামালি রচনায় যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল, রামপ্রসাদের গানে তা নেই। রামপ্রসাদের গানগুলি যদিও প্রত্যক্ষতঃ কালী, তারা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতার নামেই রচিত তথাপি সেগুলির অন্তর্নিহিত সর্বজনীনতা সংশয়াতীত। 'মা তুমি অন্তরে আছ', 'ডুব দে রে মন কালী বলে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে', 'মা বিরাজে সর্বঘটে', 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি' প্রভৃতি বহু উক্তির কথা স্মরণ করলেই এই সর্বজনীনতার কারণ উপলব্ধি হবে। ফলে রামপ্রসাদের গানে সম্প্রদায়নির্বিশেষে বাঙালির জাতীয় চিত্তকে অধিকার করবার যে শক্তি ছিল, লোচনদাসের ধামালিতে তা ছিল না। তা ছাড়া রামপ্রসাদের গান যতখানি উঁচু সুরে বাঁধা, লোচনের ধামালি তা নয়। রামপ্রসাদের গানে ভক্তির নিষ্ঠা ও গভীরতা আছে, গদ্‌গদ বিহ্বলতা বা অস্থির ব্যাকুলতা নেই। তা ছাড়া ওই ভক্তি দার্শনিক তত্ত্বোপলব্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তরল ভাবপ্রবণতার স্রোতে ভেসে-যাওয়া মাত্র নয়। ফলে রামপ্রসাদের গানগুলি শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সমাজের উঁচুনীচু সকল স্তরেই সমাদর লাভের সুযোগ পেয়েছিল যা লোচনদাসের ধামালির পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আর, এই গানের যোগেই অবহেলিত লৌকিক ছন্দোরীতিটিও প্রায় অলক্ষিতেই ভদ্রসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করল। বস্তুতঃ গানরচনার ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ যে এই উপেক্ষিত ছন্দোরীতিটিকে উচ্চাঙ্গ ভাবের আসরে বিনা দ্বিধায় প্রবেশাধিকার দিলেন, ছন্দশিল্পী হিসাবে এটা তাঁর একটা বড় কৃতিত্ব।

রামপ্রসাদের অনুবর্তী ঈশ্বরচন্দ্রও এতটা সাহস করেন নি। তিনিও এই ছন্দোরীতিটিকে উচ্চাঙ্গ ধর্মভাবের কবিতার বাহনরূপে প্রযুক্ত হবার যোগ্য বিবেচনা করেন নি, লোকরঞ্জক গীতি-রচনার যোগ্য বলেই মতে করতেন। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যে তার ব্যতিক্রম নেই তা নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় 'মনুষ্য' নামে একটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১২৬০ কার্তিক ৩)। আলোচিত ভাবের পরিপূরক হিসাবে একটি পদ্যরচনাও ছিল ওই প্রবন্ধের অন্তর্গত। এই রচনাটি পরবর্তী কালে 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গৃহীত হয় 'ক্ষমা'র সংগীত রূপে।[৩] এই রচনাটি উচ্চভাবের হলেও লৌকিক দলবৃত্ত রীতিতেই রচিত। তার থেকে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

হতে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তিনদী
এই বেলা পার হও রে তবে।···
নয়নে ছোট বড় দেখবে যারে,
তুষবে তারে প্রিয় রবে।

---

৩ রচনাটি প্রচলিত বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে (পৃ ৮৮-৯০) সংকলিত আছে 'সংগীত-১' নামে।

জগতে হাড়ি মুচি সবাই শুচি,
সমভাবে ভাববে সবে ॥···
স্বভাবে হও রে সোজা, ভূতের বোঝা
আর কত দিন মাথায় ববে ?

—'বোধেন্দুবিকাস' (গ্রন্থাবলী : মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত), চতুর্থ অঙ্ক, পৃ ১৫৭

এই রচনার ছন্দোরীতিটাই শুধু নয়, এর ছন্দোবন্ধের উপভোগ্য বিশেষ ভঙ্গিটাও লক্ষণীয়। যা হক, এই ধরণের উচ্চভাবের বাহন হিসাবে দলবৃত্ত রীতির প্রয়োগ ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় বেশি দেখা যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের পরে মধুসূদন হেমচন্দ্র -প্রমুখ কবিরাও দীর্ঘকাল এই রীতিটিকে লঘুভাবের বাহন হিসাবেই প্রয়োগ করেছেন, তাকে গুরুভাবের যোগ্য বাহন বলে মনে করেন নি। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এই রীতির যথার্থ শক্তি উপলব্ধি করে তাকে অন্য দুটি সাধু ছন্দোরীতির সমান মর্যাদা দেন। তাঁর খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, পলাতকা প্রভৃতি কাব্যে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ধর্মভাব তথা অন্যবিধ উচ্চভাবের বাহনরূপে এই লৌকিক রীতির শক্তি ও সৌন্দর্য সাধুরীতি-দুটির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এই হিসাবে রামপ্রসাদকে আধুনিক কালের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়।

এই লৌকিক ছন্দোরীতিটি রামপ্রসাদের প্রতিভাবলে সাহিত্যসমাজে ব্যাপ্তি এবং মর্যাদা -লাভ করলেও তাঁর রচনায় এটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত হতে পারে নি। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মন কেন রে ভাবিস এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে 'কালের কাল' 'মহাকাল', সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে 'ভেকে ভয়', এ যে বড় অদ্‌ভুত।
ওরে তুই করিস কি 'কালের ভয়' হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত ॥

—মন কেন রে ভাবিস এত, 'কবিজীবনী', পৃ ৮৯

এখানে উদ্‌ধৃতিচিহ্ন-নির্দিষ্ট চারটি পর্বে একটি করে দলমাত্রা কম পড়ছে। অর্থাৎ মাত্রাহানি দোষ ঘটেছে। আসলে কিন্তু এটা মাত্রাহানি দোষ নয়, রীতিমিশ্রণ দোষ। কেননা, এখানে দুটো 'কাল' এবং দুটো 'ভয়' শব্দে মাত্রা রক্ষিত হচ্ছে বাংলা অক্ষরবৃত্ত রীতির উচ্চারণের দ্বারা। কিন্তু 'অদ্‌ভুত' পর্বে মাত্রাহানিই ঘটেছে।

পূর্বে দেখেছি রামপ্রসাদের রচনায় অক্ষরবৃত্ত রীতির সঙ্গে দলবৃত্ত রীতির মিশ্রণদোষ। এখন দেখলাম ঠিক তার বিপরীত রকমের দোষ। এ দুটিই তাঁর রচনার প্রধান দোষ। অন্যবিধ দোষও যে নেই তা নয়। তার প্রধান কারণ রামপ্রসাদের এসব রচনা গাওয়ার জন্য রচিত, পাঠ বা আবৃত্তির জন্য নয়। আর গানের সুরে ও তালে সব ছন্দোদোষ আপনা থেকেই শুধরে যায়, কানে ধরা পড়ে না। তা ছাড়া গীতিরচনায় পঠিত ছন্দ রক্ষা করে চলাও অত্যাবশ্যক নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রধানতঃ গেয় রচনাতেই দলবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রয়োগ করেছেন, তাঁর অ-গেয় রচনায় এই রীতির প্রয়োগ বেশি নেই। অবশ্য 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উক্তিতে এই ছন্দোরীতির

কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। যা হক, তাঁর গেয় ও অ-গেয় উভয় প্রকার রচনাই রীতিমিশ্রণ প্রভৃতি দোষ থেকে অনেকাংশেই মুক্ত এবং রামপ্রসাদের রচনার তুলনায় অধিকতর সুগঠিত ছিল। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমটি এই নাটকের 'প্রস্তাবনা'-য় নটীর একটি উক্তির অংশ।—

ও কথা আর বলো না, আর বলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে ॥
বল হে বলব কত, বলব কত,
বলতে হল মনের দুখে।
এ বড় অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি,
সুধাবৃষ্টি সাপের মুখে ॥
কাণার চোখে চশমা দিয়ে কার্য কিবা আছে।
পতিব্রতা-ধর্মকথা বারাঙ্গনার কাছে ॥
কালার কাছে কাব্যকথা, [এ] কি তোমার ভ্রান্তি।
চোরের কাছে পুণ্যকথা, বীরের কাছে শান্তি ॥

—বোধেন্দুবিকাস (রামচন্দ্র গুপ্ত), পৃ ৫

ঈশ্বরচন্দ্র এ ছন্দের নাম দিয়েছেন 'প্রকৃতিচ্ছন্দ'। যে লৌকিক রীতির ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'প্রাকৃত ছন্দ', তাকেই এস্থলে বলা হয়েছে প্রকৃতিচ্ছন্দ।

এবার দ্বিতীয় অঙ্কে বিভ্রমাবতীর গীত থেকে কয়েক পংক্তি তুলে দিচ্ছি।—

দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত-পোয়ানো ভার।
হল পুন্নিমেতে অমাবস্যা, তেরো পহর অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে জর্ম-অষ্টমী,
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে চড়ক-পূজার দিন এবার ॥
.. .. ..
ঐ সুজ্জিমামা পুব্বু দিগে অস্তে চলে যায়,
উত্তুর-দখিন কোণ থেকে আজ বাতাস লাগছে গায়,
সেই রাজার বাড়ির টাটু ঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার ॥

—বোধেন্দুবিকাস (রামচন্দ্র গুপ্ত), পৃ ৬৫-৬৬

বলা বাহুল্য, এটাও ঈশ্বরচন্দ্র-আখ্যাত প্রকৃতিচ্ছন্দে অর্থাৎ লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দেই রচিত। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলা ভালো যে, এই রচনাটিকে উত্তরকালীন সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' বা রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' -জাতীয় রচনার অগ্রদূত বলে মনে করা অসমীচীন নয়।

দলবৃত্ত রীতির ছন্দকে শুধু সুগঠিত রূপদানেই নয়, তার বন্ধবৈচিত্র্যসাধনেও ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব কম

নয়। রামপ্রসাদের সব দলবৃত্ত রচনাই প্রায় এক ধরণের, তাঁর বিভিন্ন রচনার বহিরাকৃতিতে নূতন নূতন রূপ বড় দেখা যায় না। এ ছন্দের গীতিরচনায় ভাবের প্রতিই কবির দৃষ্টি বেশি, তার শিল্পরূপের প্রতি নয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রচনার শিল্পরূপের প্রতি সর্বদাই অবহিত থাকতেন। তাই তাঁর রচনায় ছন্দের বন্ধবৈচিত্র্যের অভাব ঘটে নি। তাঁর রচনা থেকে এ রীতির ছন্দের যে-কয়টি দৃষ্টান্ত পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। কিন্তু বন্ধবৈচিত্র্য বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের লঘুরচনা থেকে নমুনাস্বরূপ আর-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।—

দয়াল বাবু কোথায় আছে,
পূরে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব, কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো মুখে মিঠে।...
এমন দাতা আছে কেবা,
সুখে করায় উদর-সেবা,
পিটে-পুলির ছিটে গুলি
মারবে কসে আমার পেটে॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৌষড়ার গীত

কলাবৃত্ত রীতি

কলাবৃত্ত (প্রচলিত পরিভাষায় 'মাত্রাবৃত্ত') রীতির ছন্দ রচনাতেই বোধ করি রামপ্রসাদের এবং কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রেরও কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। অথচ তাঁদের এই কৃতিত্বের কথাটাই সাহিত্যসমাজে এখন পর্যন্ত অলক্ষিত রয়েছে। তাই এই বিষয়টা একটু বিশদভাবেই বোঝাতে হচ্ছে।

আধা-জয়দেবী কলাবৃত্ত

চর্যাগীতিগুলিতেই বাংলা কলাবৃত্ত রীতির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চর্যাগীতির ছন্দ ত্রুটিহীন নয়। এগুলিতে নানা স্থানেই কলাবৃত্ত রীতির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। তা ছাড়া এগুলি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ ছন্দোরচনার প্রেরণাস্থল বলে গণ্য হয় নি। সে প্রেরণা জুগিয়েছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের গানগুলি। এই গানগুলির ছন্দ নিখুঁত ও আদর্শস্থানীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণরীতি বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই চর্যাকারদের ন্যায় জয়দেবের অনুবর্তীদের ছন্দও নিখুঁত হতে পারে নি। তাঁদের রচনায় স্বভাবতঃই (হয় তো তাঁদের অলক্ষিতেই) নানা স্থানে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণরীতির মিশ্রণ ঘটে গিয়েছে। জয়দেবের প্রধান অনুবর্তী বিদ্যাপতির পদাবলীতেই এই মিশ্রণজনিত ত্রুটির বহু নিদর্শন আছে। আর বিদ্যাপতির অনুগামী গোবিন্দদাসপ্রমুখ কবিদের রচনাতেও এই ত্রুটির অভাব নেই। ছন্দোনিপুণ গোবিন্দদাসের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলিগান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত-চোরণি॥

—বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্যসংসদ্), পৃ ৬৩৭

এই কয়েক পংক্তিতেই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত রীতির স্খলন ঘটেছে অনেক স্থানে। এরকম খোঁড়া মাত্রাবৃত্ত রীতিকে বলতে পারি 'ভাঙা-জয়দেবী' বা 'আধা-জয়দেবী' রীতি। এই আধা-জয়দেবী রীতি বৈষ্ণব গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান বাহন হিসাবে আদৃত ছিল ওই সাহিত্যের শেষ পর্ব পর্যন্ত। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'রও অবলম্বন এই আধা-জয়দেবী রীতি।

বলা বাহুল্য, এই রফা-করা ছন্দোরীতিও বাংলাভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কেননা, বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ অচল। তাই তখনকার দিনের কবিরা স্বভাবতঃই এই কৃত্রিম ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন, খাঁটি বাংলায় এই রীতির প্রয়োগ করেন নি। বাংলায় এই রফাপ্রবণতা প্রথম দেখা দেয় চর্যাগীতিগুলিতে। আর তার বিলীয়মান শেষ নিদর্শন পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। তার পর থেকে বাংলায় সংস্কৃত ধরণে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। যেটুকু অবশিষ্ট রইল তা শুধু বৈষ্ণব গীতিকবিতায়, আর তাও শুধু তার ব্রজবুলি বিভাগে।

রামপ্রসাদের কৃতিত্ব

পরম ছন্দোবিলাসী কবি ভারতচন্দ্রও আধা-জয়দেবী রীতির ছন্দ চালাতে চেষ্টা করেন নি। যেসব গীতিরচনায় মাত্রাবৃত্ত রীতি প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেসব স্থানে নিখুঁত ভাবেই জয়দেবী রীতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বাংলায় বিশুদ্ধ জয়দেবী রীতি চালানো সহজসাধ্য নয়। তা ছাড়া সংস্কৃত উচ্চারণের লোহার ছাঁচে পড়ে বাংলা ভাষাও অনেক পরিমাণে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতচন্দ্রও অন্নদামঙ্গলের গীতিরচনাগুলিকে এই কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা থেকে বাঁচাতে পারেন নি।

স্বভাবকবি রামপ্রসাদ কিন্তু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত গানগুলিতে এই কৃত্রিমতাকে মানতে রাজি ছিলেন না। তাই এসব রচনায় তিনি এক দিকে সংস্কৃত উচ্চারণের উদাত্ত মাধুর্য ও অপর দিকে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এই দুএর মধ্যে রফানিষ্পত্তি করে আধা-জয়দেবী রীতিরই আশ্রয় নিলেন।

মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, রামপ্রসাদ কি এই ভাঙা ছন্দোরীতি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন বৈষ্ণব কবিদের কাছেই। মনে হয় এ বিষয়ে বৈষ্ণব গীতিকবিতাই তাঁর প্রেরণার উৎসস্থল। রামপ্রসাদ শাক্ত হলেও বৈষ্ণব গীতিকবিতার রসগ্রহণে তাঁর কুণ্ঠা বা অরুচি ছিল না। তাঁর 'কালীকীর্তন' কাব্যেই তার

সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে ওই কাব্য থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করলেই উক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হবে।

নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
. .
দর দর দর ঝরত লোর,
চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর
থোর থোর দোলনা।
রানী বদন হেরি হেরি
হসিত বদন বেরি বেরি
চোরি চোরি থোরি থোরি
মন্দ মন্দ বোলনা॥
. .
কষিত কনক বিমল কান্তি
মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়ন-সুখ
কল্মষ নিকর-ভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস
সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয়-শঙ্কা
মদনমথন-অঙ্গনা॥

—শ্রীশ্রীকালীকীর্তন (গ্রন্থাবলী : বসুমতী), পৃ ৩

বলা বাহুল্য এর ভাব, ভাষা, ছন্দ সবকিছুর দ্বারাই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রভাব সূচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এই রচনাটির আধা-জয়দেবী ছন্দোরীতি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য।

এবার রামপ্রসাদের সমরসংগীতগুলি থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই গানগুলির প্রতিই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি এই।—

"এই মহাশয়··যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীররসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণনাঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না। এ কারণ তাহাই সর্বাগ্রে উদিত করিলাম।"

—'কবিজীবনী', পৃ ৬৬-৬৭

প্রথম দৃষ্টান্ত এই।—

১। ভূতপিশাচ প্রমথ সঙ্গে
ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,

রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী—,
নর্তনা সমান বেশ।
গজ রথ রথি করত গ্রাস,
সুরাসুরনর-হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গরগর,
নরকর কটিদেশ॥

—কুলবালা উলঙ্গ, 'কবিজীবনী', পৃ ৬৯

এটিতেও বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি-রচনার ভাষা ও ছন্দের অনুকৃতি সুস্পষ্ট। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

২। নাসে মুকুতা-ফল বিলোর,
পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর,
মন্দ মন্দ হাসি।...
নীলকমল-দলজিতাস্য,
তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য,
ভালে শিশু শশী॥...
মম সর্ব গর্ব খর্ব করে,
এ কি সর্বনাশী।
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস
ঘোর তিমির-পুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস,
শ্যামা দীর্ঘকেশী॥

—শ্যামা বামা গুণধামা, 'কবিজীবনী', পৃ ৭০-৭১

সর্বশেষে রামপ্রসাদের আর-একটি রচনা সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত করছি। এটিই বোধ করি রামপ্রসাদী রচনায় আধা-জয়দেবী ছন্দোরীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।—

৩। ও কে রে মনোমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা,
মণিমরকত কান্তিছটা,
একি চিত্তছলনা দৈত্যদলনা
ললনা নলিনীবিড়ম্বিনী॥

সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি
সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশি -খণ্ড শিরসি, মহেশ-উরসি,
হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট-ফলকে অলকা ঝলকে,
নাসা নলকে, বেসরে মণি।
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
রসসুধাকূপ বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস,
কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুরে দরদা,
নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ,
পড়িল প্রসাদ স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে,
করুণাময়ীরে বল জননী॥

—ও কেরে মনোমোহিনী, 'কবিজীবনী', পৃ ৯৩

রামপ্রসাদের রচনা থেকে আধা-জয়দেবী রীতির যে-কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করা হল সেগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন।—

এক। এই দৃষ্টান্তগুলি সবই ছয় মাত্রার পর্ব নিয়ে গঠিত। গীতগোবিন্দ কাব্যে ছয়মাত্রা পর্বের রচনা একটিও নেই। ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব প্রথম দেখা দেয় বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি পদাবলীতে। রামপ্রসাদ যে এ বিষয়ে ব্রজবুলি পদাবলীর কাছে ঋণী, তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই। তাঁর এইজাতীয় অনেক রচনাতেই ব্রজবুলির ছাপ দেখা যায়।

দুই। রামপ্রসাদের কলাবৃত্ত রচনায় ব্রজবুলির ক্রমক্ষীয়মাণ প্রভাবও লক্ষণীয়। তাঁর ভাষা ব্রজবুলির প্রভাব থেকে ক্রমে মুক্ত হয়ে খাঁটি বাংলায় পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ বাংলায় কলাবৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তক হিসাবে রামপ্রসাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সর্বশেষে উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তটি বিশুদ্ধ বাংলা কলাবৃত্ত রচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তিন। কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ এতদিন শুধু বৈষ্ণবসাহিত্যেই নিবদ্ধ ছিল। রামপ্রসাদই প্রথম এই ছন্দোরীতিকে অ-বৈষ্ণব গীতিরচনার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা দান করলেন। এটা তাঁর আর-একটি ঐতিহাসিক কীর্তি।

চার। রামপ্রসাদ তাঁর গীতিরচনাগুলিতে বিশুদ্ধ জয়দেবী রীতি প্রয়োগে সচেষ্ট না হয়ে আধা-জয়দেবী রীতিকেই মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ সংস্কৃত কায়দায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণের সঙ্গে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের মিতালি ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। গের রচনায় এরকম মিতালি

সহজেই চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দেখি সংস্কৃত উচ্চারণ ক্রমে হঠে গিয়ে বাংলাকেই পুরো দখল ছেড়ে দিয়েছে। সবশেষের দৃষ্টান্তটিতেই দেখা যায়, তার প্রথম পংক্তিগুলিতে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে মিতালি চলেছে, কিন্তু শেষ কয়টি পংক্তি খাঁটি বাংলা উচ্চারণের দখলে চলে গিয়েছে। পরে ছয়মাত্রা পর্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে এরকম খাঁটি বাংলা কলাবৃত্তের উৎকৃষ্টতর নিদর্শন দেওয়া যাবে।

এই হিসাবে রামপ্রসাদ আপন সময়ের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। বস্তুতঃ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে (১৮৯০) যে নব্য ছন্দোরীতি প্রবর্তিত হয়, তারই কিছু প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায় রামপ্রসাদের এই গীতিরচনাগুলিতে।

ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব

এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী। তাঁর রচনায় কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে অন্যত্র[৪] কিছু আলোচনা করেছি। তাতে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতে রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নব্যকলাবৃত্ত রীতির অন্যতম প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এস্থলে আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রয়োগেও তিনি ছিলেন রামপ্রসাদের অনুবর্তী। আর কথা না বাড়িয়ে প্রথমেই তাঁর 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে দুটি গীতিরচনা উদ্‌ধৃত করা যাক। দুটিই কাপালিনী-বেশধারিণী রাজসী-শ্রদ্ধার গীত। ছন্দের প্রয়োজনে প্রথম গীতটিতে যেসব স্থলে সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের উচ্চারণ দীর্ঘ, সেসব স্থলে হাইফেনচিহ্নযোগে তা নির্দেশ করা গেল।—

কে- রে বা- মা, বারিদবরণী,
তরুণী ভা- লে ধরেছে তরণি,
কাহার ঘরণী আসিয়ে ধরণী
                করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূ- প, কি অপরূ- প,
অনুপ রূ- প, নাহি স্বরূ- প,
মদননিধনকরণকারণ
                -চরণ শরণ লয়।
বামা হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
'হুহুঙ্কার' রবে সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, 'বিপক্ষ' নাশিছে,
                গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, 'লাবণ্য' গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
                ছলিছে ভুবনময়।

---

৪ 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, হরপ্রসাদ মিত্র-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থ (১৩৬৯ শ্রাবণ)।

কে রে ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা
আসবে মগনা রয় ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), তৃতীয় অঙ্ক পৃ ১১১

বলা বাহুল্য, এই সবগুলি পংক্তিই চৌপদী। দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে শুধু প্রথম দুই পংক্তিতেই প্রয়োজনমতো স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়েছে। এই দুই পংক্তির আট পদে সাতটিমাত্র স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ, বাকি সব হ্রস্ব। তা ছাড়া, এই দুই পংক্তিতে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল একটিও নেই। পরের তিন পংক্তিতে সংস্কৃত ধরণের দীর্ঘ উচ্চারণ কোথাও নেই। কিন্তু হুহুঙ্কার, বিপক্ষ ও লাবণ্য, এই তিনটিমাত্র শব্দে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল আছে। এই তিনটি রুদ্ধদলেরই উচ্চারণ সংকুচিত অর্থাৎ একমাত্রক, সরল বা অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতি অনুসারে দ্বিমাত্রক নয়। অর্থাৎ এই তিন পংক্তিতে মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) রীতি অনুসৃত হয়েছে, সরল কলাবৃত্ত রীতি নয়। অথচ প্রথম দুই পংক্তিতে আধা-জয়দেবী কায়দায় সরল কলাবৃত্ত রীতিরই পত্তন করা হয়েছে। এক রীতিতে আরম্ভ করে অন্য রীতিতে শেষ করা একটা বড় ত্রুটি বলেই স্বীকার্য। তা ছাড়া, ছয়মাত্রা পর্বের রচনায় মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) কায়দায় রুদ্ধদলের একমাত্রক উচ্চারণটাও বড় শ্রুতিকটু হয়। আর সরল কলাবৃত্তে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল বর্জন করে চললেও রচনা বড় দুর্বল হয়। এই সবরকম ত্রুটিই এই প্রথম গীতটিকে পঙ্গু করে রেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সহজাত ছন্দপ্রতিভাগুণে দ্বিতীয় গীতটিতে এই সবরকম ত্রুটি ও দুর্বলতাকে অনায়াসেই এড়িয়ে গেছেন। তাঁর এই অপূর্ব নৈপুণ্যের জন্য এই দ্বিতীয় গীতটি বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।—

কে- রে বা- মা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী এ- যে, নহে মা- নুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি,
রূপ মসী, চারু ভাস।

দেখ বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি,
চরণে কৃত্তিবাস ॥

কে রে করাল কামিনী মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত হাস।

কে রে যোগিনীসঙ্গে রুধিররঙ্গে
রণতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,

কুটিলাপাঙ্গে তিমির অঙ্গে
করিছে তিমির নাশ ॥
আহা, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব,
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব,
করিছে সর্বনাশ।
দেখি' নিকট মরণ কর রে স্মরণ
মরণহরণ অভয় চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ
মানসে কর প্রকাশ ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), তৃতীয় অঙ্ক পৃ ১১৩

এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের ছন্দপ্রতিভার চরম পরিণতি। পরবর্তী কালে 'সোনার তরী' (১৮৯৪) ও 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্য রচনার সময়ে নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ যে শক্তি অর্জন করেছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের এই রচনাটিতে সে শক্তিই প্রভূতপরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। এই রচনাটির ছন্দোভঙ্গি সর্বাংশেই রমণীয়। তবু দুএকটি সামান্য ত্রুটির কথা বলা উচিত। প্রথমতঃ, আধা-জয়াদেবী কায়দায় এর প্রথম দুই পদে চার জায়গায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকৃত হয়েছে। গীতিরচনায় এই সামান্য ত্রুটি উপেক্ষণীয়। তবু বলতে হবে 'নহে মানুষী'তে তালভঙ্গ হয়েছে। 'নহে তো মানুষী' হলে কানে খটকা লাগত না। দ্বিতীয়তঃ, এই রচনাটির প্রায় সর্বত্রই, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক পর্বেই তিন মাত্রার পরে একটি করে উপযতি রাখা হয়েছে, উপযতিলোপ ঘটানো হয় নি। ফলে রচনাটি অনেকাংশে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, এটিতে অন্যবিধ যে দোষই থাক না কেন, ছন্দোগত আর কোনো ত্রুটি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও নব্যকলাবৃত্ত রীতি

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'বিরহ' (১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন) এবং 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা (১২৯৪ বৈশাখ), এই দুটি কবিতাই নব্যকলাবৃত্ত রীতির অগ্রদূত বলে স্বীকৃত। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সহসা নূতন পথে চলবার প্রেরণা পেলেন কোথায়? তাঁর এই প্রেরণার উৎসস্থল একাধিক হতে পারে। 'বিরহ' কবিতা প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' (১২৯২ আশ্বিন ১৫)[৫]। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক থেকে কাপালিনীর উক্ত দুটি গীত উদ্ধৃত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 'শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি' বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁর অপূর্ব শব্দকুশলতার প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় রচনাটির শুধু শব্দকুশলতাই নয়, ছন্দকুশলতাও অপূর্ব। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এই ছন্দকুশলতা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হয় রচনাটির শব্দঝংকারই তাঁর কাছে এটির ছন্দোমাধুর্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অর্থাৎ এটির ছন্দকুশলতা তাঁর কানকে খুশি করলেও তাঁর জ্ঞানে ধরা পড়ে নি। কিন্তু তখনকার দিনে

৫ এটি গ্রন্থের প্রকাশক-লিখিত 'বিজ্ঞাপন'এর তারিখ। সুতরাং বইখানি তার কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয় মনে করা যায়।

কোনো রচনার পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের প্রখর ছন্দোবোধকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের এই বিখ্যাত ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি এমন হতে পারে না। আর, ওই ভূমিকায় উদ্‌ধৃত ঈশ্বরচন্দ্রের এই রচনাটির ছন্দোগত সৌন্দর্য ও অভিনবত্ব তাঁর কানে ও জ্ঞানে ধরা পড়ে নি, এমন মনে করাও কঠিন। সুতরাং নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রবর্তনে তাঁর পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের এই রচনাটি থেকে কিছু প্রেরণা লাভ করা একেবারে অসম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি সম্ভাব্য প্রেরণাস্থলের কথাও মনে রাখা উচিত। এ কথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি, বিশেষতঃ তার ছন্দসৌন্দর্যের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। তার বাল্যরচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ছন্দো-বৈচিত্র্য এই আকর্ষণেরই প্রত্যক্ষ ফল। তার আর-এক ফল তাঁর সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের প্রকাশ (১২৯২ বৈশাখ)। গোবিন্দদাস বলরামদাস -প্রমুখ ছন্দোবিলাসী কবিদের অনেকগুলি নৃত্যঝংকৃত রচনাই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এইসব আধা-জয়দেবী কলাবৃত্ত রচনার ছন্দোমাধুর্যে রবীন্দ্রনাথের কান অর্থাৎ শ্রুতিরুচি এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁর নিজের রচনাতেও তার প্রতিফলন ঘটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার দুটি অন্তরায়ও ছিল। এক তার ব্রজবুলি ভাষা, আর তার সংস্কৃত কায়দার উচ্চারণ। এই দুই কৃত্রিমতাই পদাবলীর ছন্দকে বাংলায় চালাবার প্রধান বাধা।

'পদরত্নাবলী' প্রকাশের (১২৯২ বৈশাখ) মাসকয়েক পরেই ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বোধেন্দুবিকাস'এর ওই ঝংকারবহুল রচনা-দুটির প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন (১২৯২ আশ্বিন ১৫)। এই দুটি রচনার দ্বিতীয়টিতে নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ যে অনবদ্য সুষমায় বিলসিত হয়ে উঠেছে তা রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ ছন্দশ্রুতিকেও এড়িয়ে গেল, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। এ রচনাটিতে ব্রজবুলি ভাষা ও সংস্কৃত ভঙ্গির উচ্চারণ কোনো বাধাই ঘটাতে পারে নি। সংস্কৃত ও ব্রজবুলি -বিহারী প্রাচীন কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দোরীতি এই রচনাটিকে আশ্রয় করেই নবজন্ম লাভ করল বিশুদ্ধ বাংলা-ভাষার নবজন্মভূমিতে। বিষয়টা যেন অনেকটা 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি' ধরণের। প্রাচীন ভাষা ও উচ্চারণের জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির নিত্য ও শাশ্বত আত্মা বাংলা ভাষা ও উচ্চারণের নবদেহ ধারণ করল ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত গীতিরচনাটির সূতিকাগৃহে। অর্থাৎ 'কে রে বামা যোড়শী রূপসী' ইত্যাদি রচনাটির আবির্ভাবের দ্বারা প্রাচীন ভাষা ও উচ্চারণের বাধা কেটে গিয়ে বাংলায় নব্যকলাবৃত্ত ছন্দোরীতি প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হল। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্কিমলিখিত ভূমিকাযোগে এই রচনাটির সুপ্রচারহেতু মনে হয় এটির ছন্দোগত অভিনবত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর তা হলে তাঁর পক্ষে এর থেকে প্রেরণা পাওয়াও কিছু অসম্ভাবিত ব্যাপার নয়।

'পদরত্নাবলী' সম্পাদনকালে বৈষ্ণব কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পুনরুজ্জীবিত ঔৎসুক্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তিযোগে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত রচনাটির ছন্দোগত অভিনবতা থেকে প্রেরণালাভের সম্ভাবনা এবং 'বিরহ' ও 'ভুলভাঙা' কবিতাযোগে নব্যকলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন, এই তিনের পৌর্বাপর্য ও কালগত সান্নিধ্যের কথাই আমরা বলতে পারি। এগুলির মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনার কথাও বলতে পারি। কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো সংশয়াতীত তথ্য উপস্থাপন করতে পারি না।

নব্যকলাবৃত্ত রীতি প্রবর্তনের প্রেরণাস্থল যা-ই হক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন ক্রমে ক্রমে অতি ধীর গতিতে। প্রথমেই প্রবলবেগে বা ব্যাপকভাবে এই নূতন রীতির প্রয়োগ করেন নি। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'বিরহ' এবং 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা', নূতন রীতির এই প্রথম দুটি কবিতাতেই তার নিদর্শন আছে। এই দুটি রচনায় যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদলের বিরলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্প বয়সে ছয়মাত্রা পর্বের সমস্ত রচনাতেই যুক্তাক্ষরওয়ালা শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। কেননা, ওসব যুক্তাক্ষরই ছন্দকে বন্ধুর ও তার ধ্বনিকে শ্রুতিকটু করে তোলে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'বিশ্বের' মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে 'বঙ্গ'ভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়,
ঘুচে যায় অপমান ॥

—'কড়ি ও কোমল', আহ্বানগীত

এর প্রথম পংক্তিতে যুক্তাক্ষরজাত রুদ্ধদল আছে দুটি— বিশ্ ও বঙ্। এই দুটি রুদ্ধদলই নিরেট উপলখণ্ডের মত উদ্ধত হয়ে ছন্দের মসৃণ গতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। এইজন্যই কবি এইজাতীয় যুক্তাক্ষরকে সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। পরবর্তী তিন পংক্তিতে ওরকম যুক্তাক্ষরজাত রুদ্ধদল একটিও নেই। ফলে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহও মসৃণ গতিতে অবাধে বয়ে চলেছে। কিন্তু ওরকম রুদ্ধদলের অভাবে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এটাও একটা দুর্বলতা। এক দিকে যুক্তাক্ষরজাত বন্ধুরতা, অপর দিকে যুক্তাক্ষরহীন নিস্তরঙ্গ একঘেয়েমি— এই উভয়সংকট থেকে ছয়মাত্রা পর্বের ছন্দকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, এই ছিল তৎকালে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সমস্যা। 'কড়ি ও কোমল' রচনার কালেই তিনি এই সমস্যার মীমাংসা করলেন উক্তপ্রকার রুদ্ধদলকে একমাত্রার বদলে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়ে। ও কাব্যের 'বিরহ' কবিতাটিতেই তার প্রথম পরীক্ষা। যেমন—

কত শারদ যামিনী যাইবে চলিয়া
'বসন্ত' যাবে চলিয়া।
কত উঠিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাত যাইবে ছলিয়া ॥
. . . .
ওই বাঁশি-স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না।

এই হৃদয়-আসন 'শূন্য' যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা ॥

—'কড়ি ও কোমল', বিরহ

এর চার পংক্তিতে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল আছে মাত্র দুটি— 'বসন্ত' শব্দের সন্ এবং 'শূন্য' শব্দের শূন্। কিন্তু তাতে ছন্দোমাধুর্য কমে নি, বরং বেড়েছে। কারণ এখানে প্রত্যেক রুদ্ধদলকে দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বের দৃষ্টান্তে বিশ্ ও বঙ্ যে শ্রুতিকটুতা ঘটিয়েছে, এখানে সন্ ও শূন্ তা ঘটায় নি। প্রথম দৃষ্টান্তে রুদ্ধদল ছন্দকে করেছে বন্ধুর, আর এখানে করেছে তরঙ্গিত। কারণ প্রথমটিতে রুদ্ধদল কুঞ্চিত ও নিরেট হয়ে নিয়েছে একমাত্রার স্থান, আর দ্বিতীয়টিতে বিস্তৃত হয়ে পেয়েছে দুই মাত্রার স্থান। তাতেই ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রসন্নতা দেখা দিয়েছে। তেমনি ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত দুটি কবিতার প্রথমটিতে 'হুহুঙ্কার রবে', 'বিপক্ষ নাশিছে' ও 'লাবণ্য গলিছে', এই তিন পর্বের রুদ্ধদলগুলি যেন পথের মধ্যে অনাবশ্যক ইঁটপাটকেলের মতো মাথা উঁচু করে ছন্দের অবাধ গতিকে ব্যাহত করছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কবিতাটির 'গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃত্তিবাস', এই তিন পর্বের রুদ্ধদলগুলি যেন ছন্দের তরল গতিপ্রবাহকে আঘাতে আঘাতে তরঙ্গিত করে তুলছে। প্রথমটিতে রুদ্ধদল নিরেট ও কুঞ্চিত, দ্বিতীয়টিতে স্ফীত ও প্রসারিত।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'বিরহ' কবিতাটিতে দ্বিমাত্রক রুদ্ধদল আছে মাত্র তিনটি, আর 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা' কবিতায় আছে ছয়টি। 'ভুলভাঙা'র পূর্বে রচিত 'ভুলে' কবিতায় একটিও নেই। বস্তুতঃ নব্যকলাবৃত্ত রীতির রচনায় দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলের এই বিরলতা দেখা যায় 'মানসী' কাব্যের অনেক কবিতাতেই। অর্থাৎ 'মানসী' কাব্যে এই রীতির প্রথম প্রবর্তন হলেও এই কাব্যের সর্বত্র তার পূর্ণশক্তি প্রকাশ পায় নি। নব্যকলাবৃত্ত রীতির পূর্ণশক্তি প্রকাশ পেয়েছে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যের রচনাগুলিতে।

ঈশ্বরচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

অথচ ঈশ্বরচন্দ্রের 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' ইত্যাদি দ্বিতীয় রচনাটিতে নব্যকলাবৃত্ত রীতি তার পূর্ণশক্তি ও সৌন্দর্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্যের এই আকস্মিক আবির্ভাবটা সত্যই বিস্ময়কর। এ যেন অনেকটাই—

'যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।'

বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এই নূতন ছন্দোরীতির ক্রমপরিণতির কোনো নিদর্শন নেই। বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যের, বিশেষতঃ ব্রজবুলি গীতিকবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর সংগৃহীত কবিদের জীবনবৃত্তান্তে কোনো বৈষ্ণব গীতিকবির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই, তাঁদের রচনা-সংকলন তো দূরের কথা। সুতরাং তিনি যে বৈষ্ণব কবিদের কাছ থেকে নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ রচনার প্রেরণা পান নি তাতে বোধ করি কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যে তাঁর বহুপ্রশংসিত

'অদ্বিতীয় মহাকবি' 'মহাত্মা' রামপ্রসাদের 'ভগবতীর রণবর্ণনাঘটিত পদাবলী' থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। তিনি এই রণগীতিগুলির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা পূর্বেই যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। কলাবৃত্ত রীতির আলোচনাপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদের রণগীতি থেকে যে তিনটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত দুটি রণগীতির ভাষা মিলিয়ে দেখলে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণার উৎস কোথায় তা অনায়াসেই বোঝা যাবে। তবু পাঠকের সুবিধার জন্য এই ভাষাগত সাদৃশ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে সাজিয়ে দিলাম।—

ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম রচনা	রামপ্রসাদ পদাবলী
১। কে রে বামা 'বারিদবরণী'	আরে ঐ আইল কে রে 'ঘনবরণী' —আরে ঐ আইল
২। হের হে ভূপ, কি অপরূপ	হেরি এ কি রূপ, দেখ দেখ ভূপ সুধারসকূপ বদনখানি। —ও কে রে মনোমোহিনী মরি কিবা অপরূপ নিরখ দনুজভূপ। —কে মোহিনী
৩। হাসিছে ভাসিছে 'লাজ না বাসিছে'	কি সুখে হাসিছে, 'লাজ না বাসিছে', নাচিছে মহেশ উরসে। —বামা ওকে এলোকেশে কে রে নবীনা নগনা লাজরহিত। —আরে ঐ আইল
৪। গ্রাসিছে বারণ হয়	গজরথরথী করত গ্রাস —ফুলবালা উলঙ্গ রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে, রথরথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে। —মরি, ও রমণী কি সমর করে রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে —শ্যামা বামা কে

দ্বিতীয় রচনা

১। কে রে বামা ষোড়শী রূপসী সুরেশী এ যে, নহে মানুষী, 'ভালে শিশু শশী'· ·	কে মোহিনী 'ভালে বালশশী' পরম রূপসী। · · · · · · সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী। —কে মোহিনী তড়িতজড়িত মধুর হাস্য, লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য, 'ভালে শিশুশশী'। —শ্যামা বামা গুণধামা
২। · ·করে শোভে অসি, 'রূপ মসী', চারুভাস।	···বামকরে মুণ্ড অসি। বামেতর কর যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা 'রূপ মসী'॥ —এলো 'চকুরনিকর
৩। যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব, হইল খর্ব, গেল রে সর্ব, · ·করিছে সর্বনাশ।	মম সর্ব গর্ব খর্ব করে এ কি সর্বনাশী। —শ্যামা বামা গুণধামা

ভালো করে খুঁজলে দুজনের রচনার মধ্যে আরও সাদৃশ্য বার করা যেতে পারে। কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। আশা করি এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রিয় কবি রামপ্রসাদের রণগীতিগুলির আদর্শে এবং সেগুলি থেকে নানাভাবে ভাব ও কথা আহরণ করেই বোধেন্দুবিকাসের ওই দুটি রণগীতি রচনা করেছিলেন। শুধু ভাব ও ভাষা নয়, অলংকার ও ছন্দ রচনাতেও তিনি এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদেরই অনুবর্তী। বস্তুতঃ রচনার গুণদোষের বিচারেও দেখা যায় তিনি রামপ্রসাদেরই উত্তরাধিকারী। এই অনুবর্তন ও উত্তরাধিকার এতই ব্যাপক যে, ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোদ্‌ধৃত উক্তিদুটি রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য বললে খুব অন্যায় হয় না। উক্তিদুটি এই।—

১। "ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা-সরহদ্দ নাই, একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনো দিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে।"

২। "ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে— যখন অনুপ্রাস-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই।"

—'কবিতাসংগ্রহ' : ভূমিকা, পৃ ৭২ এবং ৭৪

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার 'দোষগুণের উদাহরণস্বরূপ' বঙ্কিমচন্দ্র বোধেন্দুবিকাস থেকে যে-দুটি গীত উদ্ধৃত করেছেন, আমরা দেখলাম সে-দুটি রামপ্রসাদের বিভিন্ন রণগীতির প্রতিধ্বনি মাত্র— ভাবে ভাষায় ছন্দে ও অলংকারে। সুতরাং

"শব্দব্যবহারে তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র] অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য উনবিংশ শতক সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও বাংলা সাহিত্যের সর্বকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে মনে করি না। শব্দব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয় নন, দ্বিতীয়। প্রথম রামপ্রসাদ। শব্দ-প্রয়োগে তাঁর কোনো প্রতিযোগী না থাকতে পারে, কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন রামপ্রসাদের প্রতিযোগী। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র অনুবর্তক মাত্র, প্রবর্তক রামপ্রসাদ। শব্দ ও শব্দালংকার -প্রয়োগে অনুবর্তক অনেকাংশে প্রবর্তককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু ছন্দোনৈপুণ্যে শিষ্য যে গুরুকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

‘তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ’

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

> “বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়! তার মানে, গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্‌-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুইয়ে মিশে আছে।”[1]

প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। আকাশ বাতাস রৌদ্র জ্যোৎস্না পাহাড় নদী মেঘ সমুদ্র ইত্যাদির সমন্বয়ে আমাদের জীবনের যে একটি দৈব বাতাবরণ রচিত হয়েছে, তার সবকিছুকেই তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর বৃক্ষানুরাগ সেই সার্বিক ভালোবাসারই একটি অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। রবীন্দ্ররচনার আদ্যন্ত সেই অভিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে; তাঁর সাহিত্যসাধনার যে-কোনও অধ্যায়ে যে-কোনও পর্যায়ে তাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। কান পাতলেই শুনতে পারি, বৃক্ষলতা সম্পর্কে এক আশ্চর্য ভালোবাসা তাঁর কণ্ঠে সর্বদা ধ্বনিত হয়েছে।

আমরা কান পেতে সেই ভালোবাসার সুর শুনি; কবি সেক্ষেত্রে ‘প্রাণ পেতে’ গাছের মধ্যেকার প্রাণের বিশুদ্ধ সুরটিকে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। উপরন্তু বৃক্ষকে যে শুধুই মানবজীবনের অপরিহার্য সঙ্গী-রূপে তিনি জেনেছিলেন তা নয়, সৃষ্টির বিবর্তনের ইতিহাসে বৃক্ষলতার ভূমিকার প্রাচীনতাও তাঁকে আনন্দে-বিস্ময়ে আলোড়িত করেছে। সেই বনেদী ভূমিকাটিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে তাঁর কুণ্ঠা হয় নি।

> অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
> প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
> ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
> ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-’পরে; আনিলে বেদনা
> নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।[2]

বৃক্ষ তাঁর কাছে মৃত্তিকার ‘বীর সন্তান’; তার শাখাকে তিনি ‘সংগীতের আদিম আশ্রয়’ বলে গণ্য করেন; তিনি স্বীকার করেন, ‘বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে’ শক্তির শান্তিরূপ যে দেখাতে পেরেছে, সে এই বৃক্ষ; তারই কাছে তিনি শান্তিদীক্ষা নিতে চান; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, বৃক্ষই এই বসুন্ধরাকে ‘অনন্তযৌবনা’ করে সাজাতে পেরেছে।

বৃক্ষকে কেউ ভালোবাসে ফুলের জন্য, কেউ ফলের প্রত্যাশায়। সেক্ষেত্রে তাকে যিনি ‘মৌনের মহাবাণী’র উদ্‌গাতা বলে জেনেছেন, কোনোরকম প্রত্যাশা না-রেখেও তাঁর পক্ষে হয়তো বৃক্ষকে শ্রদ্ধা

---

১ ভূমিকা। ‘বনবাণী’   ২ বৃক্ষবন্দনা। ‘বনবাণী’
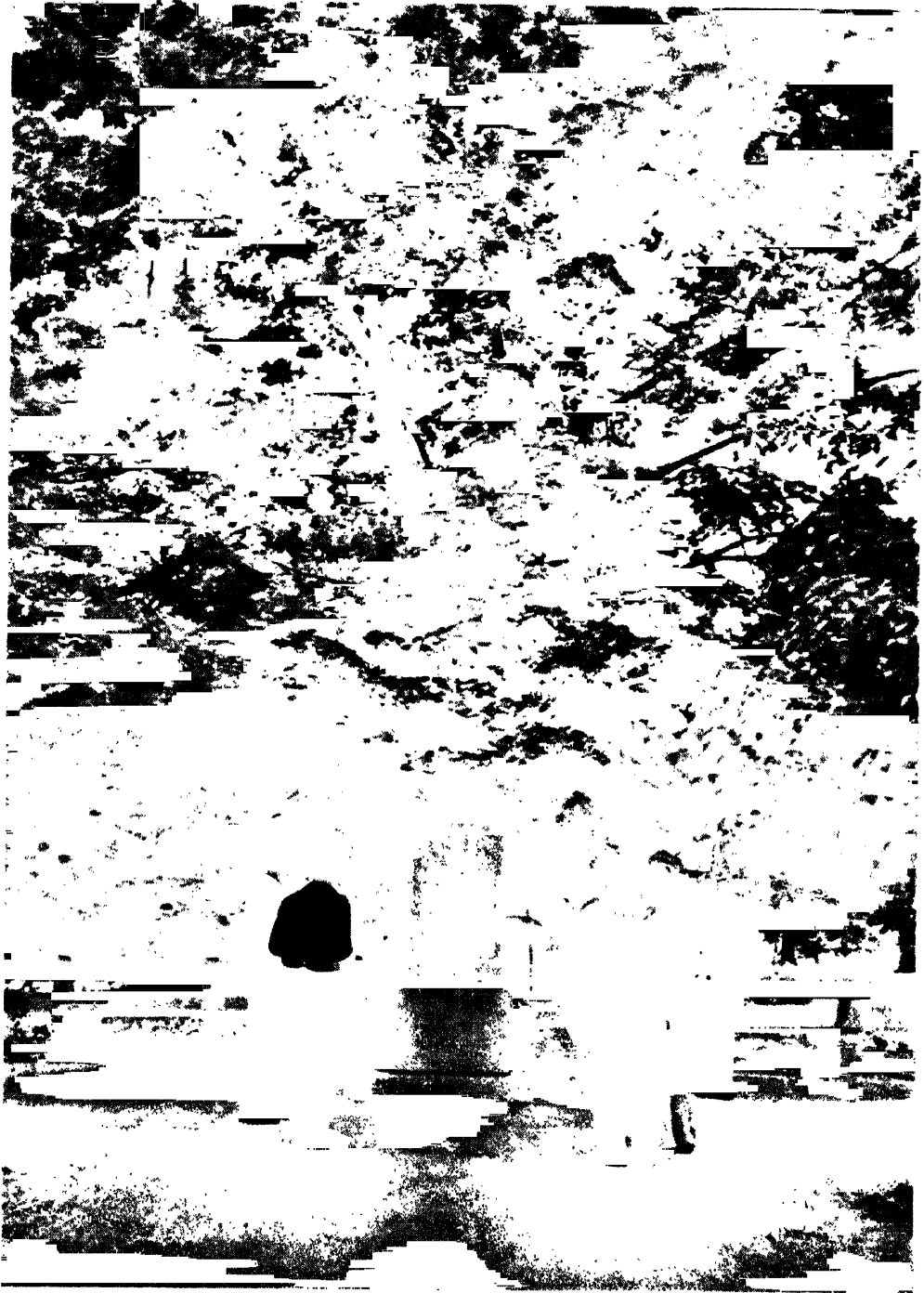
১৯২৬ সালে হাঙ্গেরীর সাগর বালাতন হ্রদের তীরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষচারা মহীরুহে পরিণত
সম্মুখে স্তম্ভের উপর রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি

A FAÜLETTÉS EMLÉKÉRE
A NAGY HINDU KÖLTŐ AZ ALÁBBI VERSET IRTA
A FÜREDI VENDÉGKÖNYVBE:

„When I am no longer
on this earth my tree
Let the ever renewed
leaves of thy spring
Murmur to the wayfarer:
The poet did love while he lived

magyar
fordítása

Ha nem vagyok többé a földön Ó fám
Susoglasd lavasszal megujulo leveleid
Az erre vandorlók felett
A költő szeretett míg élt.“

8 November 1926 Rabindranath Tagore

১৯২৬ সালের ৮ নভেম্বর অতিথিদের মন্তব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত কবিতা

RABINDRANATH TAGORE
A NAGY HINDU KÖLTŐ
ÜLTETTE EZT A FÁT
1926 NOVEMBER 6-ÁN
ANNAK EMLÉKÉRE, HOGY
BALATONFÜREDEN
NYERTE VISSZA EGÉSZSÉGÉT.

ফলকের ভাষ্য : 'নিজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের স্মরণে মহান ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালের ৬ নভেম্বর বালাতন ফুরেডে এই বৃক্ষ রোপণ করেন।'

নিবেদন করা সম্ভব। শুধু বর্ণাঢ্য ফুল কেন, নিরলঙ্কার পাতাগুলিকেও তিনি ভালোবাসতে পারেন। তিনি বলতে পারেন :

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা ॥[৩]

যদি বলি যে, পত্রাবলীর নৈঃশব্দ্য যেমন পুষ্পের বাঙ্ময়তাকে আরও পরিস্ফুট করে তোলে, সমগ্র বিশ্ব-জগৎও তেমনি বিশ্ব-চরাচরের বাঙ্ময়তাকে আরও তাৎপর্য দেবার জন্যই তার একটি শান্ত পশ্চাৎপট রচনা করে রেখেছে, তাহলে হয়তো খুব অসঙ্গত কিছু বলা হবে না। রবীন্দ্রনাথ সেই শান্ত পটভূমিকাতেও, বৃক্ষশাখায় যখন হাওয়ার মর্মর ওঠে, 'বিশ্ববাউলের একতারা' শুনতে পেয়েছেন। বৃক্ষের কাছে তিনি যেমন 'শান্তিদীক্ষা' নিতে চেয়েছেন, তেমনি আবার তার উতরোল মর্মর-সংগীত শুনে, তার পত্রালির সানন্দ আন্দোলন দেখে, তারই কাছে মুক্তির মন্ত্র প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, ওই গাছগুলোর "মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে ; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"[৪]

বৃক্ষলতাপত্রপুষ্পের সঙ্গে একদিকে তাঁর সম্পর্ক ছিল জীবনের গভীরতম উপলব্ধিতে অনুস্যূত ; অন্য দিকে সেই সম্পর্ক ছিল ঘরোয়া। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনকে আরও সরস আর মধুর করবার প্রয়োজনেই প্রকৃতির সঙ্গে একটি খোলামেলা আটপৌরে হার্দ্য সম্পর্কও তিনি গড়ে নিয়েছিলেন। সম্পর্ক যাতে সহজ হয়, তারই জন্য বিদেশী বৃক্ষ কিংবা লতার স্বদেশী নাম রাখতেন তিনি, এবং এইভাবেই তার বিদেশিয়ানা ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে ঘরের জিনিস করে নিতেন। দৃষ্টান্ত 'নীলমণিলতা'। কবিতাটির ভূমিকায় তিনি বলছেন, "শান্তিনিকেতন-উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে শুব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা।"[৫]

নীলমণিলতাকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি"। কিন্তু তখন নূতন এলেও, অনুমান করা যায়, সে নূতন থাকে নি। বিদেশ থেকে কত বৃক্ষই তো এসেছে

৩ লেখন। ৪ ভূমিকা। 'বনবাণী' ৫ নীলমণিলতা। 'বনবাণী'

এ-দেশে; তাদের অনেকেই আর আজ নূতন নয়। এমনকি, এ-দেশের রৌদ্র-হাওয়া-জল থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে এ-দেশের দৃশ্যপটে তারা এতই সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছে যে, কখনও যে তারা নূতন ছিল, তাও আর আজ অনেকের মনে পড়ে না। কিন্তু সে-কথা থাক। যে-কথা বলবার তা এই যে, কী গভীর মমতায় যে বৃক্ষলতার জগৎকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, বিদেশী লতার এই স্বদেশী নামকরণ থেকেও তা বুঝতে পারা যায়।

বৃক্ষ-লালনে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। এবং বৃক্ষ-রোপণও তাঁর কাছে ছিল ধর্মাচরণের মতই পবিত্র একটি অনুষ্ঠান। এমন কি, বিদেশেও একাধিকবার সেই অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছেন। ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি স্বহস্তে একটি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন।[৬]

১৯২৬ সনের ইউরোপ-সফরের সঙ্গেও বৃক্ষ-রোপণের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। সফর-সূত্রে সেই বছর অক্টোবর মাসের শেষে তিনি হাঙ্গারিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য বিকল হয়ে পড়ে, এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে দিন কয়েক তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হয়। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তখন তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন বালাতন হ্রদের তীরে। হাঙ্গারির সেটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। সেইখানে একটি বৃক্ষচারা রোপণ করেছিলেন তিনি।[৭] সেই শিশুতরু আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বিদেশে গিয়েও বৃক্ষ-রোপণের আনন্দ-অনুষ্ঠানে নিজেকে যখন তিনি সাগ্রহে যুক্ত করেছেন, ভাবতে ভালো লাগে যে, বাংলা দেশের ঘরোয়া প্রকৃতির চেনা বাতাবরণের হাতছানি তখনও তাঁকে উন্মনা করে তুলত। ভাবতে ভালো লাগে, হাঙ্গারিতে পৌঁছবার মাত্র কয়েকদিন আগে (২৩ অক্টোবর ১৯২৬) ভিয়েনার 'হোটেল ইম্পীরিয়ল'এ বসে 'বনবাণী'র ভূমিকা লিখেছিলেন তিনি। দেখে ভালো লাগে যে, সেই ভূমিকার মধ্যেও তাঁর পরিচিত বৃক্ষলতার ছায়া পড়েছে।

"এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি, শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে।··এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে—তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে।"[৮]

---

৬ "পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া স্টেটের প্রধান শহর—Pittsburghএ ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ক্লেভল্যাণ্ডে তাঁহাকে একবার নামিতে হইল; সেখানে Shakespeare Gardenএ কবিকে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়; বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল।" 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৪২।

বস্তুত এই 'বৃক্ষ'টি একটি আইভিলতা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ সংখ্যায় চিত্র দ্রষ্টব্য।

৭ "হাঙ্গারি বাসকালে· তথাকার সাহিত্যিকগণের অনুরোধে হাঙ্গারির বিখ্যাত কবি Karoly Kisfaludyর (১৭৮৮-১৮৩০) মর্মর মুর্তির নিকট রবীন্দ্রনাথকে একটি বৃক্ষরোপণ করিতে হইয়াছিল"। 'রবীন্দ্রজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৯৮।

৮ ভূমিকা। 'বনবাণী'

যুগের শিল্প

অমিয় চক্রবর্তী

প্রকাশের গভীর সহজ ভঙ্গী শুধু বাংলায় নয়, বর্তমান যুগের বিবিধ দেশীয় সাহিত্যে লক্ষণীয়। সেইদিক থেকে বলা চলে শব্দের অতিমাত্রা, পৌরাণিক বা নবযুগের দামামাধ্বনি শিল্পের বহির্গত। বীটনিকের পশ্চিমী বাক্যস্রোত নতুন যুগে অবান্তর : মিলটনের গরিমা তাতে নেই, শুধু ঘোষণা বিদ্যমান। সংস্কৃত-বহুল জটিল শব্দবিলাস বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিহীন ; প্রচারের অজস্রত্বে ধরা পড়ে প্রয়াস, ছড়িয়ে থাকে কথার নুড়ি। প্রাণপ্রবাহিণী উৎকর্ষের ধারা অন্য।

চতুর্দিকের জাগ্রত শিল্পজগতে দেখতে পাই বৈরল্যের আঙ্গিক। নতুন ইস্পানি মার্কিনি চীনজাপানি যে-কোনো কবিতার বই খুললে মনে হয় কাব্যের পৃষ্ঠায় অক্ষরের ভার স্বল্প। কাব্যিক বা রাষ্ট্রিক প্রপাগাণ্ডার কথা বাদ দিচ্ছি। নতুন বাড়ি বানানোর ছাঁদে, এমনকি বিরাট স্থাপত্যের গঠনে দেখি ঋজুতার আমেজ। কাঠে পাথরে কাঁচে সংহতির উদ্যম। হোক সে চণ্ডিগড়, জাকার্তার আধুনিক পাড়া, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের শেষতম অনুকরণে গাঁথা ডামাস্কাসের বা কাইরোর পুনরুজ্জীবিত নগর রচনা। ন্যুইয়র্কে বিরাট নতুন দৈত্য বাড়ি উর্ধ্বাকাশে হাল্কা হয়ে দাঁড়াতে চায় ; অন্ততপক্ষে নতুন শৈলীর প্রেরণা সেই আঙ্গিকে। ছবির জগতে দেখি প্রাচুর্যের ঠাট সঙ্গত হয়েছে মাধুর্যের কঠিন রেখাপাতে, রঙের ব্যঞ্জনায়। সূক্ষ্মের মধ্য দিয়ে প্রবলকে উদ্ধৃত ক'রে ইতালির চিত্রী আনন্দিত। মার্কিনেও তাই, ভারতবর্ষের নতুন প্রাচীন দৃষ্টান্ত আরো দেবো। শ্রুতি-জালের প্রচ্ছন্ন বা আপাত অনির্দিষ্ট বিন্যাসে দূর থেকে ক্যাস্টানেট বা ড্রাম বেজে ওঠে পশ্চিমী সংগীতে ; মধ্যে মধ্যে বাঁশির ধ্বনিতে বাঁধা অনেকখানি স্তব্ধতা। ভেবে দেখুন, য়ুরোপীয় অর্কেস্ট্রার বিরাট আয়োজনে এ কোন্ নতুন পর্ব। ভারতীয় বীণার তান, ঝালার কাজের প্রভাব শেষ পর্যন্ত এ দেশেও দেখা দিল। আরণ্য আফ্রিকার রূঢ় কোমল উচ্চারণ বাদ্য পশ্চিমে প্রবেশ করেছে নিগূঢ় নৃত্যবাহন ছন্দে, অথচ সিম্ফনির মূল ধুয়োয় প্রমিত হয়ে। উগ্রজাতীয় jazz-এর সপক্ষে নয় উল্টো পথে এই অনুপ্রেরণা ; পশ্চিমী নূতন মার্গসংগীতের কথা বলছি। এমনকি jazz এবং রক্ অ্যাণ্ড রোলের তাণ্ডব-লোকে রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁয়ের দূর প্রভাব পৌঁছল ; তার আলোচনা এখানে নয়। শুধু উল্লেখ করি, রাশিয়ান সংগীতস্রষ্টা Shostakovitchএর সঙ্গে একবার মস্কোএ কথা হয়েছিল ; ফরাসী Ravel, Debussy এবং মার্কিনি Gershwinএর পূর্বদেশীয় ও আফ্রিকান্ প্রভাবান্বিত সংগীতের তারিফ করে তিনি বললেন ঐ মিশ্র ধারাই এগিয়ে চলবে। ঘটা ক'রে আন্তর্জাতিকতার বাদ্য বাজে না এই রকমের আশ্চর্য স্বীকৃতি তাঁর কথায় ছিল ; অন্তরঙ্গ মিলের ক্ষেত্র ভিড়ে ধরা দেয় না। সংগীতের কানে শোনা চাই মিলনের সূত্র।

যে ভাবেই দেখি, পৃথিবী জুড়ে একটি সূক্ষ্মচেতন শমিত সৃষ্টিবিদ্যার পথে আমরা চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে সংহার এবং স্থূলতার ছায়াও চলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিয়েৎনামে যতই অনাসৃষ্টি চলুক-না কেন মানুষের যথার্থ সৃষ্টি সেই সমবেত যান্ত্রিক এবং পাশবিক অভিরুচিকে ছাড়িয়ে যাবে এ বিশ্বাস এখনো আছে। আংকোর্‌ভাট সাইগন থেকে বেশি দূরে নয়, বীর বন্ধুদলও সে কথা জানেন। যুগে

যুগে কম্বোডিয়ার শিল্পাক্ষর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুভ্রের সেই সাক্ষ্য প্রতিবেশীর এবং অভ্যাগতের বোমা-বারুদে চাপা পড়বে না।

বলা বাহুল্য, সংহতির প্রবণতা শিল্পে নতুন নয়, কিন্তু আজকের অভ্যাস বিশেষভাবে সূক্ষ্মতায় স্বীকৃত। বহুকাল থেকে চীনে বা জাপানে একটি পদ্ম বা দুটি বাঁশপাতার একাগ্র মূর্তি ছবির আকাশ জুড়েছে। নো-নাটকে প্রেক্ষাগার, আখ্যায়িকা নিষ্পন্নের অবিশ্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞ শিল্পে বিধৃত; যা নিভৃত তাই যেন একত্বে বিচিত্র হয়েছে। জেন্‌-ধ্যানের সংগতি এইখানে। আয়তন জাপানি প্রথায় কত স্বল্প প্রসাধিত হতে পারে য়ুরোপ তা প্রথমে দেখেও ধরতে পারে নি। তার পর চীন-জাপানের উত্তরসাধক ফরাসী শিল্পী সাক্‌রেদ্‌ দল— এখানে নাম করা যায় Cezanne এবং অন্য প্রসঙ্গে Gaugin প্রভৃতি যোগধর্মী শিল্পীর— য়ুরোপ জুড়ে ছড়ালেন স্বচ্ছতার টেক্‌নিক। বস্তুভারাক্রান্ত শিল্প নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। ভার নামানোর বিদ্যা রঙ্গমঞ্চে চিত্রে চলচ্চিত্রে দূরতম এশিয়ার ইশারা বহন ক'রে পশ্চিম যুগে এসেছিল সন্দেহ নেই। তার ক্রিয়া থামে নি।

স্বীকার করতে হবে পৌরাণিক ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্য জড়ের বহু অত্যাচার সহ্য করেছে। য়ুরোপের অনুজ্জ্বল পর্বের মতো আমদের এপিকে মহাকাব্যে মন্দিরে বহুর বিরাট কীর্তন সহজিয়ার গভীর সন্ধান হারিয়েছিল। আজ পর্যন্ত আড়ম্বরের দৌরাত্ম্য পূজায় পার্বণে, কথকতায়, 'সাধু-ভাষা'র অসামঞ্জস্যে শিল্পের জায়গা জুড়ে আছে। অথচ প্রাচীন আর্যাবর্তে দেখি শিল্পসূত্রের ধ্যান; এমনকি মনু— হায় মনু— তাঁরও ভাবে না হোক বচনে সংযমের ছন্দ। ভারতীয় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে অতিকথনের সাক্ষ্য অস্বীকার করব না— যদিও অত্যুক্তি পুনরুক্তির পিছনে বিশেষ চিরন্তন উক্তিকে মানা চাই— কিন্তু পাশাপাশি প্রবর্তিত হল ঐতিহ্যের শ্লোক। তা না হলে সারনাথের বুদ্ধ, কাংগ্রার ছবি দেখা দিত না; বৈষ্ণব পদাবলী লিরিকের তারে বাঁধা না হয়ে দোহার স্রোতে বইত। গ্রীক পারসিক প্রভাব ভারতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ সমাহিত করেছে কিন্তু বৈদিক সত্তা তারও পূর্বগামী। মধ্যযুগের সন্ত কবির ও মীরার ভাষা রত্নোজ্জ্বল অথচ হৃদ্‌রঞ্জিত, কোমলে কঠিনে রচিত ভক্ত নামাবলীর স্বধার্মিক। গঙ্গা-যমুনার তীরে তীরে জেগেছে ভজনের আশ্চর্য স্বাল্পিক গূঢ় পূর্ণতা। যেমন পদ্মানদীর বাউল-সংগীতে, ময়নামতীর লোককাব্যে। পুরোনো কালীঘাটের এবং যামিনী রায়ের নব উদ্ভাবিত পট একই পথ প্রদর্শক। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নিপুণ ছবি 'লজ্জন লঘুমায়া'র দক্ষ উদাহরণ, আচার্য নন্দলাল বসুর সংহত স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের গানে, 'লিপিকা'য় তাঁর স্ফটিকশুভ্র ঘন নিবিষ্ট শিল্পের উদাহরণ।

স্থানীয়, জাতীয় বা ব্যক্তিবিশিষ্ট পরিমণ্ডলে যে শিল্পাগ্রহ সেদিন পর্যন্ত দূরলগ্ন বা অসংলগ্ন রূপে দেখা দিয়েছে আজ তার ছোঁয়াচ একই যুগে দ্রুত বিস্তারিত। জগৎজোড়া প্রচলনের কালে শিল্পের মূল অভ্যাস, এবং তার নূতন উৎসারিত বিধি প্রভৃত অলংকরণের পরিপন্থী, এই কথা উপরে লিখেছি। বিজ্ঞাপনের পাতায় বা টেলিভিশনের কাঁচে— অথবা রাস্তায় বেরিয়ে হেঁটে— স্পষ্ট চোখে পড়ে শাড়ি কিমোনোর হাল্কা ঐশ্বর্য যা পশ্চিমী মেয়েদের ফ্যাশানে গরিমার হিল্লোল এনেছে। একান্ত হ্রস্বতার বেশ সেই পূর্বীয় প্রসাধনের কাছে লজ্জা পায়; উৎকর্ষের সমন্বয় ক্রমে দেখা দেবে। এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপন সুরুচি এবং আধুনিক দৃষ্টির মর্যাদা বহন করে এদেশে প্রশংসিত হল। প্লেনের কর্মরত ভারতীয় নারীমূর্তি জাপানী বা

পশ্চিমী হোস্টেস্‌দের মতোই নম্র, সুন্দর। গৃহসজ্জায়, টালির রঙিন প্রাঞ্জল গাঁথুনিতে, নাইলনের বা নব সুগন্ধের মসৃণতায়, বাক্যের ঐশ্বর্যে আমরা খুঁজি বাহুল্যবর্জিত লক্ষণ। উৎকৃষ্ট ব্যবহারে আলাপে বক্তৃতায় তৃপ্তি আনে হৃদয়ভরা অথচ অনুচ্চ স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ, বেশির চেয়ে যা একটু কম। বাংলা কবিতায় আমরা কম্‌তির জাদু মেনেছি। যেখানে কথার প্রসাধন ঘনঘটায় দেখা দেয়, আমরা বলি 'আভরণে আজি আবরণ কেন তবে'। কাব্যে ধ্যানের ভাব আনতে হলে অতিবন্দনার দরকার নেই।

সূক্ষ্ম-সচেতনার প্রকাশ স্বল্পতার আশ্রয় নেবে এমন বাধ্যতা নেই; দীর্ঘ সংহতিও একই ধর্মসঙ্গত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে নাম করা যায় 'পৃথিবী' কবিতার (রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' গ্রন্থে); সেখানে ঋক্-ধ্বনিময় দীর্ঘায়ত বন্দনা। কিন্তু বলিষ্ঠ, কালধর্মী অথচ শিল্প-সনাতন এই কারুসৃষ্টি নিখুঁত সমুদ্রশঙ্খের মতো একক, ধ্রুবপদের মতো তার ঐকধ্বনি। তবুও বলতে হবে এ রকম শিল্প বিশেষভাবে এবং সংকীর্ণ (অথচ সমৃদ্ধ প্রয়োগে) যুগ-সংশ্লিষ্ট নয়। ফ্রস্টের 'Nothing Gold Will Stay' Yeatsএর 'The Second Coming', রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য', Eliotএর Four Quartetsএর কিছু স্তবক বিবিধ অর্থে নতুন কালের লক্ষণাক্রান্ত।

শহরের রাস্তায় দেখি ক্ষুদ্র নিপুণ নিয়ন-আলোর বাতি পরিচ্ছন্ন অথচ সহস্রদীপান্বিত মালায় জ্বলছে; হয়তো এই পথে এজরা পাউণ্ড হেঁটে যাবেন। রাজামহারাজার যোগ্য আয়োজন অথচ যুগের পথযাত্রী যে-কোনো দেশের সর্বজন-হিতার্থে আলোর এই প্রসন্ন সংহত পদাবলী রচনা। প্রত্যেকটি আলো স্পষ্ট ও সুন্দর। মাটির প্রদীপও জ্বালব কিন্তু প্রগল্‌ভ ধনবিলাসী ঝাড়লণ্ঠন এবং ধ্বংসোদ্ধত জমিদারী প্রাসাদের প্রভৃত মর্যাদা এবং আত্মপ্রচার পৌরাণিক বা ভিক্টোরীয় মধ্যযুগের অজস্র বাক্য-বর্ষণের মতো এখন বন্ধ থাক্।

নর্থ হ্যাম্পটন
অগস্ট ১৯৬৬

ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ভারতী লাইব্রেরি, কলিকাতা ১২। কুড়ি টাকা।

সংস্কৃতি শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-কোনো একটি জাতির অধ্যাত্ম ও বাস্তব জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ যত ভাস্বর, তাহাদের সংস্কৃতিও তত প্রকাশমান ও প্রভাময়। জাতির প্রাণের প্রাঞ্জলতা ও প্রাচুর্য, মনের সুরুচি ও শালীনতাবোধ সংস্কৃতির পরিমাপ নির্দেশ করে এবং পরিচয় প্রদান করে। সংগীতে এবং চিত্রে, স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যে, কুটীরশিল্পে এবং কৃষিকার্যে জাতির সংস্কৃতিরই প্রকাশ দেখিতে পাই। এমনকি জাতির লৌকিক ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাপনেও সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই কথাগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে যত সত্য, হয়তো অন্যদেশের পক্ষে তেমন না হইতেও পারে। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সে দিন পর্যন্ত ধর্মই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান অবলম্বন ছিল। ধর্মকে ভারতবর্ষের সর্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতে প্রধানতঃ ধর্ম হইতেই সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। ধর্মই সংস্কৃতিকে সুবিকশিত করিয়াছে, ধর্মই সংস্কৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য, বাস্তব জীবনে ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাই। যদিও ভারতবর্ষ সমস্ত কিছুকেই ধর্মের বাঁধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে তাহার লৌকিক ব্যবহারে ও দৈনন্দিন আচারে যে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়াও নিছক ধর্মমূলক বলিতে পারি না।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনো শেষকথা বলিবার সময় আসে নাই। শীঘ্র আসিবে বলিয়াও মনে হয় না। হারাপ্পা মাহেঞ্জদারোর সর্বনিম্ন স্তরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ পর্যন্ত সেখানে প্রাপ্ত কীলক-লিপির পাঠোদ্ধারও কেহ করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। এমনকি এ বিষয়ে সায়নের ব্যাখ্যাও ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অপর একটি বিষয়েও পণ্ডিতগণ কেহ উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব বিভাগ দিনের পর দিন যে নব নব আবিষ্কার করিতেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ ভারতীয় সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা আছে। কোনো সভ্যতাই একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই। পরবর্তী সভ্যতার প্রবল স্রোতে তাহা মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। অনুসন্ধান করিলে বর্তমান সভ্যতার মধ্যেই তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। সুতরাং এই ঐতিহ্যপ্রবাহের অনুসরণে যতদূর অতীতে যাওয়া যায়, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিকে হারাপ্পার তুল্য মর্যাদা দেওয়া হইতেছে। ঢিবির বয়স তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজারে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি দেউলপোতা একেবারে পঞ্চাশ হাজারের কোঠায় গিয়া পৌছিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব হয় পৃথিবীর প্রত্নবিদ্যা-বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া এই সমস্ত আবিষ্কারের মূল্যায়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্যের হিতোপদেশ দিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া প্রকাশিত সঙ্কলনটিকে অবহেলা করা চলিবে না। মাত্র তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ নহে, সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকেরও

পুস্তকখানি পড়িয়া দেখা দরকার। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। পণ্ডিতগণ গবেষকগণ পুস্তকখানির আলোচনা করুন। ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসধারার আবিষ্কারে অমূল্যচরণের সংকেত বিচারের ভার তাঁহাদের উপরেই বর্তিয়াছে।

অমূল্যচরণের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কিছু কম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ 'মহাদেব' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করেন। ব্রহ্মাকে লইয়া কিছু পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন হরপ্রসাদের কৃতী পুত্র ডক্টর বিনয়তোষ। দেখাদেখি বিষ্ণু বিষয়ে প্রবন্ধ অমূল্যচরণ পাঠ করিয়াছিলেন। আমি প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পাঠের দিনেই উপস্থিত ছিলাম। সেসব দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বকোষ প্রকাশের সময় আমি নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকমণ্ডলী-মধ্যে প্রবন্ধলেখক ও সংগ্রাহক রূপে কাজ করিতাম। সুতরাং মহাকোষ প্রকাশের সংবাদও জানি। এইজন্যেই অমূল্যচরণের কতকগুলি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

অমূল্যচরণের অনুসন্ধিৎসা ছিল বহুমুখী। সন্ধানও তিনি রাখিতেন অনেক বিষয়ের। প্রবন্ধগুলির বৈচিত্র্যই এ কথার প্রমাণ দিবে। ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা, আর্য ও অনার্য, অসুর জাতি, বিষ্ণু, অগ্নি, অদিতি, ঋষি অত্রি, অথর্ববেদ, মহাভারত— প্রত্যেকটি প্রবন্ধই পড়িবার মত ও আলোচনার যোগ্য।

দর্শন ধর্ম ও সম্প্রদায় বিষয়েও বহু প্রবন্ধ এই সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের অনেকের কথা তিনি বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। তাহার পর আছে নাটক ও নাট্যশালা। এই বিভাগে ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি, বঙ্গীয় নাটকের গোড়ার কথা, ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ায় কথা, রামগড়ের নাট্যশালা, বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা, কন্নড় নাটক, কেরল নাটকচক্র, প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা, যাত্রা, কবিগান— এই কয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

অমূল্যচরণের লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধেই কিছু-না-কিছু নূতন কথা আছে। তথ্যসংগ্রহে তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, প্রতিটি প্রবন্ধেই সে পরিচয় পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুতরাং প্রবন্ধগুলি শিক্ষার্থীগণেরও কাজে লাগিবে। তবে অমূল্যচরণের পরলোকগমনের পর বহু বিষয়েই অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কোনো কোনো প্রবন্ধে অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। অথর্ববেদ বিষয়ে স্বর্গত পণ্ডিত দুর্গামোহন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের আবিষ্কার এ কালের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাত্রা ও কবি-গান বিষয়েও সম্প্রতি অনেকেই নূতন নূতন তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভাগবত ধর্ম, বৈষ্ণবের প্রেম প্রভৃতি বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। তথাপি অমূল্যচরণের গৌরবের লাঘব ঘটিবে না। তাঁহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। সঙ্কলনগ্রন্থখানি বাঙ্গলা-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। অমূল্যচরণের জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সুতরাং অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেইসমস্ত প্রবন্ধ হইতেও আমরা অনেক বিষয় জানিতে ও শিখিতে পারিব।

সঙ্কলনখানির প্রধান গুণ ইংরাজী জানা অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ একটি পুস্তকের মধ্যেই বহু বিষয়ের ও

অনেক অজানা বিষয়ের সংবাদ জানিতে পারিবেন। পশ্চিমের পণ্ডিতগণের রচনা অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। আর অল্প ইংরাজী জানা অথবা কেবলমাত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার মধ্যে মহামূল্য রত্নরাজীর সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। তাঁহারা দেখা দূরের কথা, কস্মিন্‌-কালে যাহার নামও জানিতে পারিতেন না, সেইসমস্ত মূল্যবান বস্তু হাতের নাগালের মধ্যে পাইবেন। বাঙ্গালী পাঠকগণের পক্ষে ইহা বড় কম লাভের কথা নহে। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রকাশ যে আমাদের পক্ষে একটি সুসংবাদ ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

এই বৃহদাকার গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিয়াছি। মাত্র সামান্য একটু তুলিয়া দিতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিব অমূল্যচরণ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের রচনা হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিলেও তাঁহার মন ছিল ভারতীয় সাধনার মর্মমূলে। দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল ভারতীয়। ভারতসংস্কৃতির গোড়ার কথায় তিনি বলিতেছেন—

"ভারতবর্ষে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোনদিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষরপরিচয়ে সাহিত্যজ্ঞান কোনদিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এদেশে বিদ্যা কখনো Academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোনদিন বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই— ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ। সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার Macrocosm ও Microcosm ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দও ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে ও তাহা সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সুতরাং এদেশে (ভারতে) কোনো বিদ্যা watertight compartmentএর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষ বাণীই ধর্ম; তাহাদের মধ্যে কোন বিভাগ বা বিদ্বেষ ঘটে নাই। ভারতে প্রাচীন যুগে তাই ধর্মকে বাদ দিয়া কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প সৃষ্টি হয় নাই।"

পরিশেষে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। অমূল্যচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত যিনি লিখিয়াছেন তিনি অনেকের পত্রের অংশ বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। এইসমস্ত পত্রাংশে কতকগুলি প্রশ্ন রহিয়াছে। প্রশ্নগুলি দেখিলাম, কিন্তু উত্তরগুলি কোথায়? কোন্ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি যথাযথ হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তর আদৌ দেওয়া হইয়াছিল কিনা এ সন্দেহেরও অবকাশ রহিয়া গেল। অমূল্যচরণ নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন, বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন, এইজন্য নানা জনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সব সময় সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত। সম্পাদক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী, কলিকাতা-৯। মূল্য বারো টাকা।

দীর্ঘকাল পরে পুরাতন প্রসঙ্গ বইটি বার হওয়াতে প্রকাশক-সম্পাদক উভয়েই ধন্যবাদার্হ হলেন। পুরাতন প্রসঙ্গের এক-একটি অধ্যায় যখন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। সে সময় পুরাতন প্রসঙ্গের বক্তব্য নিয়ে কিছু কিছু বাদ-প্রতিবাদও হয়েছিল। তখনকার দিনে পুরাতন প্রসঙ্গ যে পাঠকসমাজে আলোড়ন এনেছিল সে সম্বন্ধে সংশয় নেই। কারণ, পুরাতন প্রসঙ্গে এমন-সব সংবাদ আছে যা ইতিপূর্বে কারও জানা ছিল না। এসব অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের মূল্য সমাজেতিহাসের দিক থেকে অপরিসীম।

আজও সে মূল্য নিঃশেষিত হয় নি। বইটির পুনর্মুদ্রণ সেই কারণে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবে। বিপিনবিহারী গুপ্ত নিছক কৌতূহলপরবশ হয়ে আচার্য কৃষ্ণকমলের কাছে সেকালের কথা শুনতে চেয়েছিলেন। বিপিনবিহারীর এই কৌতূহলই পরে ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, রাধামাধব কর, উমেশচন্দ্র দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— এই আটজনের (প্রকৃতপক্ষে সাতজন নয়) কাছ থেকে বিপিনবিহারী গুপ্ত উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হন। অবশ্য কিছু কিছু জীবনচরিত এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ব্যতীত এই জাতীয় গ্রন্থ খুব বেশি ছিল না। সেজন্য বিপিনবাবুর পরিশ্রম সার্থক। আজ বিপিনবাবুর বহু তথ্যই নানা গবেষণাগ্রন্থে ব্যবহৃত। এইসব গবেষণাগ্রন্থ থেকে বিপিনবাবুর লব্ধ জ্ঞানের পরিচয় জানতে পারা যায়। তথাপি পুরাতন প্রসঙ্গের মূল্য আকরগ্রন্থের।

বিপিনবিহারী গুপ্ত যাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা অল্পবিস্তর সকলেই উনিশ শতকের নানা কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেজন্য এসব 'ইতিহাস পড়া নয়, ইতিহাসের স্রোতের মধ্যে দিয়ে অবাধে সন্তরণ। কথক ও লেখক দুজনেই এই গুণের অংশ দাবী করতে পারেন।'[১]

আরও একটি কারণে এই বইর উপযোগিতা। সে হচ্ছে, যাঁরা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসাহকে যুক্ত করেছিলেন তাঁরা এমন একটা সময়ে আত্মকাহিনী বিবৃত করেছেন যখন এঁরা এঁদের কর্মজীবনের ব্যর্থতা-সার্থকতা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পেরেছেন। যৌবনের জলধিতরঙ্গ প্রৌঢ়ত্বে যখন শান্ত হয়েছে তখনই এ কাহিনী প্রকাশ করবার সময়। ইতিহাস কেবল কোলাহল কিংবা চাঞ্চল্য-প্রকাশকেই মনে রাখে না— আলোড়নের ফলশ্রুতি ঘোষণাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আচার্য কৃষ্ণকমলের বিবৃতি গ্রন্থটির প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ স্থান নিয়েছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আচার্যের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে কিছু বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন কৃষ্ণকমলের উক্তিতে তার কিছু প্রতিবাদ আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে কৃষ্ণকমল অনবহিত ছিলেন না তাঁর প্রমাণ পুরাতন প্রসঙ্গের নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণকমল বলেছেন, বিদ্যাসাগর কিঞ্চিৎ ঈর্ষালু ছিলেন, শ্যামাচরণের গ্রন্থ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর

১ পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রমথনাথ বিশী লিখিত ভূমিকার অংশবিশেষ।

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা মানুষ বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ পরিচয় কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না। কৃষ্ণকমলও সে কথা বার বার বলেছেন। আর, মানুষ দেবতা নয়। মানুষ মানুষই। বিদ্যাসাগরও মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। কৃষ্ণকমলের কোঁৎ-প্রীতি সর্বজনবিদিত। লক্ষণীয়, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির কোঁৎ-প্রীতি প্রায় মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে)। এখানে তার কারণ নির্ণয় করবার অবকাশ নেই। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে কেবল ফ্যাসনরূপেই পর্যবসিত করেন নি! কোঁৎ মিল ইত্যাদি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল যে বিস্ময়কর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা অতীব দুর্লভ বস্তু। একজন বাঙালি বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও দার্শনিক মত ব্যক্ত করার জন্য দু শ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ লিখে ফেললেন। সব বস্তুকেই শিক্ষিত বাঙালি সিরিয়াস বলে মনে করতেন বলেই এরকম সম্ভব। অবান্তর হলেও বলি, জীবনচরিতের এসব অংশ থেকে স্বচ্ছন্দে আমরা এযুগেও কিছু ভোজ্যবস্তু পেতে পারি। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের ধারণা একটু চমক সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন, বিহারীলাল নাস্তিক ছিলেন। বিহারীলালের কাব্যবিচারে এই সূত্রটি নূতন কোনো ইঙ্গিত দেয় কি? বিদ্যাসাগর যে পাইকপাড়ার রাজাদের থিয়েটারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন সে সংবাদে মন প্রসন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা এবং তাঁর কারুণ্য আমাদের মনকে অধিকার করে আছে। কিন্তু ঐ সামান্য একটি সংবাদ প্রমাণ করছে নাট্যরচনার আদিযুগে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা কারও চেয়ে কম ছিল না। বাংলার সাহিত্য-উদ্বোধনে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

পুরাতন প্রসঙ্গে বাংলা নাট্যকর্মের বিস্তৃত ইতিহাস অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর প্রমুখ অনেকে দিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আজ সকলের পরিচিত। বলা বাহুল্য ব্রজেনবাবু কিছু কিছু তথ্যের জন্য এই গ্রন্থের কাছে ঋণী। 'স্মৃতিকথা'য় কিছু কিছু সাল-তারিখের গোলমাল আছে, যেগুলি আধুনিক গবেষণায় সংশোধিত। নাট্যশালার বিবরণে অমৃতবাবু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিজের দলের যে কিঞ্চিৎ মনান্তর হয়েছিল সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে এই বিরোধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু অমৃতলাল বসুর বক্তব্য থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারের আরও একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই মনান্তরের ইতিহাস নাট্যরচনার বিবরণের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সেই আদিযুগে বাংলার যুবকরা যে পরিশ্রম দিয়ে রঙ্গমঞ্চ গড়ার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন আজ তা অনুধাবন করা সম্ভব হত না যদি-না এসব সংবাদ আমরা পেতাম। জি. বি. হ্যারিসন শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। পুরাতন প্রসঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ বিশদ তথ্য আছে। এতে করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাট্যরচনার যোগসূত্রটি স্পষ্ট হয়েছে। বাংলা পাবলিক থিয়েটার নবীন বাংলার জাগরণের এক অংশের প্রতীক। রাধামাধব কর সেকালের আমোদ-প্রমোদের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাধামাধববাবু বাংলা নাট্যপ্রয়াস সম্বন্ধে যেসকল কথা বলেছেন তার চাইতে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক সেকালের ছড়া-গান তরজা কবির লড়াই সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত তথ্য। শিক্ষিত বাঙালির নাট্য-কর্মের উৎসাহ সত্ত্বেও সুলভ প্রমোদের ব্যবস্থাগুলি তখনও অন্তর্হিত হয় নি। সঞ্জীবচন্দ্রের যাত্রা সমালোচন পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিসংগীত প্রবন্ধের জন্য এসব আমোদ-প্রমোদের কথা সকলের নজরে পড়ে

নি। রাধামাধববাবু পাবলিক থিয়েটারের পত্তনের পূর্বে যেসকল অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন তা থেকে সেকালের অন্তত একশ্রেণীর লোকের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, বৌমাস্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল, মদন মাস্টারের দল, লোকা ধোপার দলের যাত্রা বাঙালি সমাজে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এসব দলের অনুষ্ঠানের কিছু কিছু নিদর্শনও রাধামাধববাবু উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীস্টাব্দে শখের থিয়েটারের আসর জমজমাট। আমাদের মনে হয় শখের থিয়েটারের এরকম বাড়বাড়ন্ত হবার কারণ ধনী ব্যক্তিদের নাট্যকর্ম মঞ্চস্থ করার আকস্মিকভাবে আগ্রহের অভাব। স্বল্পব্যয়ে, কম খরচে নাট্যরস আস্বাদন করবার আগ্রহ কিন্তু সাধারণের মধ্যে প্রবল ছিল। এই আগ্রহই জাতীয় বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ঘটাল। বলা বাহুল্য, পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে যাত্রার সমাদর ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। কিংবা বলা উচিত আমাদের নাট্যকর্মে যাত্রার রীতিনীতি কিছু পরিমাণে আত্মগোপন করল। রাধামাধববাবুর এই বিবরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি রচনায় এই বিবরণের গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পুরাতন প্রসঙ্গে এমন কতগুলি অংশ আছে যেগুলি আজও আমাদের মুগ্ধ করে।— কৃষ্ণকমলের বাল্যজীবনের করুণ-মধুর কাহিনী, রামতনু লাহিড়ী এবং পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিহাস-রসিকতা, বিহারীলালের অকুতোভয়তা, রাসবিহারী ঘোষের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, অমৃতলালের রিহার্সল প্রসঙ্গ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ গিরিশচন্দ্রের বিলাসিতা, কৃষ্ণকমলের গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, সংস্কৃতবিদ্যা প্রসারে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের (গ্রিফিথ সাহেবের রামায়ণ অনুবাদ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে স্মরণীয়) উদ্যোগ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অভিনয়-কেলেঙ্কারি, রাধামাধবের বংশীপ্রীতি ('বই ফেলিয়া বাঁশী ধরিলাম')। উনিশ শতকের মানুষগুলির সঙ্গে একালের মানুষের যোগাযোগ একটা প্রীতিপ্রসন্ন মনোভাব সৃষ্টি করে।

কিছু কিছু আপাততুচ্ছ তথ্যও ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান। কবির অনাদর হলে কবিরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে হুল ফোটাতেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মূলে প্রায়শই বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব থাকে। হুতোম প্যাঁচার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপগুলির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা কে তা জানতে পারলে ইতিহাস তথ্যসমৃদ্ধ হয়। পুরাতন প্রসঙ্গে সেরকম কিছু উল্লেখ আছে। অমৃতলাল বসু বলেছেন রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব সম্ভবত রামনারায়ণের দাদার রচনা। এর প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু অমৃতলালের যুক্তিতেও সারবত্তা আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি তো রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করে। স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো কোনো অংশ বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিচারে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন— দ্বিজেন্দ্রনাথের এরকম উক্তি রয়েছে। বিষয়টির প্রণিধানযোগ্যতা একালেও রয়েছে। তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে এরকম রচনার তিনিই বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ এরকম্ দাবি দ্বিজেন্দ্রনাথ করেছেন। অনেক বিষয়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ যে পাইয়োনিয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরাতন প্রসঙ্গে অধুনাবিস্মৃত এমন কয়েকজন বাঙালি মনীষীর সম্বন্ধে যে সপ্রশংস শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে তার মূল্য এখন কিছুটা স্বীকৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত, পুরাতন প্রসঙ্গের বিবরণ থেকেই তা

জানতে পারি। তারানাথ তর্কবাচস্পতির কথা তো রামকমল বারবার উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতম্মন্যতা যেমন ধিক্কৃত হয়েছে তেমনি যথার্থ পাণ্ডিত্যের মূল্য যে অপরিসীম তা তারানাথের জীবনীর যে অংশ কৃষ্ণকমল বলেছেন সেই থেকে জানতে পারি। হ্যালিডে ও গ্রাণ্টের স্মরণীয় কর্মপ্রচেষ্টা বাংলার সমাজেতিহাসেরই অঙ্গ। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা পুরাতন প্রসঙ্গে আছে। এসকল 'বড়ো' ইংরেজের কথা উমেশচন্দ্র দত্ত বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' নবসংস্করণে মোট তিনটি পর্যায় একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। বিপিনবিহারী গুপ্ত ইতিহাসবিস্মৃত জাতির কলঙ্কমোচন করেছেন। বিপিনবাবুর উদ্দেশ্য ও ইতিহাসজিজ্ঞাসার প্রণালী নিয়ে আজকের দিনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ থাকতে পারে। প্রায়শই বিপিনবাবু নীরব শ্রোতা। প্রশ্ন তিনি কদাচিৎ করেছেন। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালির কি অভিমত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পরিচয় যদি এঁদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যেত। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে যদি কিছু রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পেতাম। স্বদেশীযুগে বাংলার অস্থিরতা যদি এঁরা স্পষ্ট করতেন। এসব খুঁটিনাটি তথ্য জানবার প্রত্যাশা আমাদের জাগে। হতে পারে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই এসব বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। সুতরাং যা পাই নি তার জন্য খেদ হয়তো অশোভন। বোধ করি, বিপিনবাবুর উদ্দেশ্যই ছিল বক্তাদের কর্মজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে এমন বিবরণ সংগ্রহ করা। সেদিক থেকে বিপিনবাবুর প্রচেষ্টা কেবল সার্থকই নয়, তিনি একটি জাতীয় কর্তব্যও পালন করেছেন।

এ বই'র নূতন সংস্করণ বার হওয়াতে মনে হয় এসব গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় বাংলাদেশে বিপিনবাবুর মত যদি এরকম নিরভিমান জ্ঞানতাপসের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আমাদেরও তো দায়িত্ব আছে বিগত কয়েক দশকের বিবরণ এরকম স্মৃতিকথার সাহায্যে সংগ্রহ করে রাখার। এ বিষয়ে কিছু কাজ হয় নি তা নয়। শ্রীসুশীল রায়ের মনীষী-জীবনকথা এ প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে। কিছুদির আগে 'দেশ' সাময়িক পত্রিকায় এরকম উদ্যোগ লক্ষ্য করে আমরা খুশি হয়েছিলাম। কেউ কেউ আত্মচরিত রচনা করে এ দায়িত্ব কিছুটা পালন করেছেন। এসব উদ্যোগ যত বেশি হয় ততই জাতিপরিচয় সংস্কৃতিপরিচয় সমৃদ্ধ হবে।

আলোচ্য বইটি সম্পাদনা করেছেন শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। 'স্মৃতিকথা'য় উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিষ্ণুবাবু যথাসম্ভব দিয়েছেন। পাদটীকায় আধুনিক গবেষণায় লব্ধ তথ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেসব তথ্য আরও একটু বেশি হলে বোধ করি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

বিজিতকুমার দত্ত

বাণীবীণা। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রকাশন, ২ রিজেণ্ট স্টেট, কলিকাতা ৩২। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কলকাতায় বিষ্ণুপুর ঘরানার যে অল্পসংখ্যক গায়ক আছেন প্রবীণ গীতশিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তাঁর কতিপয় রচনা বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা থেকে এই পুস্তকে সঙ্কলিত হয়েছে এবং বহু গানের স্বরলিপিও সংযোজিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গানের মূল্য নির্ধারণ করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের স্বরলিপিগুলি প্রধানতঃ তাঁর পিতৃদেব গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতচন্দ্রিকা এবং পিতৃব্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতমঞ্জরী থেকে আকারমাত্রিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, তানসেন, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, সদারঙ্গ, অচপল, মানরঙ্গ, শোরী, কদর, সনদ, জুগরাজদাস এবং যদুভট্টের গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, দাশরথি, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গানও বাংলা গানের আলোচনা উপলক্ষে সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্রহ্মসঙ্গীতের আলোচনা উপলক্ষে গ্রন্থকার রামমোহন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি গানের স্বরলিপি দিয়েছেন। বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতসাধনার ইতিবৃত্ত নির্ধারণ করবার একটি বিশেষ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রচেষ্টায় মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীতে কিভাবে ধ্রুপদ খেয়াল ও ভজন গাওয়া হত এবং পরবর্তীকালে টপ্পা ও ঠুংরীর প্রসার কিভাবে ঘটেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। যাঁরা এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁরা এই গ্রন্থের গানগুলি অনুশীলন করে বিশেষ উপকৃত হবেন।

অভিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর বিষয়বস্তু নিয়ে যে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি ইতিহাসের দিক থেকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুসম্বদ্ধ হবে। বলা বাহুল্য গ্রন্থটি প্রধানতঃ প্রয়োগশিল্পের দিকে নজর রেখেই রচনা করা হয়েছে এবং সেদিক থেকে গ্রন্থকার যথেষ্ট সাধুবাদ অর্জনে সমর্থ হবেন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

মুক্তধারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত অনুবাদ: শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। শ্রীমতী উষা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২।৫ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা ৩১। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ। গ্রন্থের প্রারম্ভে অনুবাদক সংস্কৃত ভাষায় একটি সুদীর্ঘ ভূমিকাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বহু তথ্যের সমাবেশে ভূমিকাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও রসজ্ঞ হইয়াছে।

অনুবাদ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। কারণ, মূলগ্রন্থের ভাষার সৌষ্ঠব হানি না করিয়া, যতদূর সম্ভব অর্থ অপরিবর্তিত রাখিয়া, যথাযথভাবে সম্পূর্ণ ভাব ও ভাষাটিকে আয়ত্ত করিয়া অনুবাদ করিতে

হয়, তাহা হইলেই উহা হৃদয়গ্রাহী হয় এবং পাঠকবর্গও উহার রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ধ্যানেশবাবু সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখায় অনুবাদটি হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ সেই দেশের জলবায়ু আচার-ব্যবহার রীতিনীতি চিন্তাধারা জীবনযাপনপ্রণালী ভাবভঙ্গী স্মরণীয় ঘটনা এবং বহুকালসঞ্চিত জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও ধর্মের মাধ্যমে সেই ভাষায় প্রবেশ করে এবং কালক্রমে তাহার সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত হইয়া যায়। অনুবাদে সেই দেশজ বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু উভয় ভাষায় দক্ষতা থাকিলে অনুবাদকারীর তুলিকায় তাহার মহিমা হয়তো কিছুটা প্রকটিত হইতে পারে। আসল কথা, মূলের রচনাভঙ্গী ও বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালী যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া অনুবাদ করিলে অনুবাদকের কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্যানেশবাবুর অনুবাদে এই গুণের পরিচয় আছে। তাঁহার যে উভয় ভাষাতেই পারদর্শিতা আছে, তাহা এই অনুবাদ পাঠে বোঝা যায়। অনুবাদ করা কালীন তিনি এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

কোনো বৈদেশিক কবি বলিয়াছিলেন—

> En la traduccion es consiguinte
> Que pierda la dulzura competente.
> ["The perfume of a pristine thought
> Can't in translation be caught."]

যাকে বলে 'ভাবময়ী ভাষার সুবাস, ভিন্নভাষে পায় না প্রকাশ'।

এই উক্তির তাৎপর্য এই যে সুনিপুণ শিল্পী অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে চিত্রপটে একটি ফুল আঁকিলেও তাহাতে যেমন ফুলের বর্ণসুষমা, স্নিগ্ধকোমলতা ও স্বর্গীয় সৌরভ প্রতিফলিত করিতে পারেন না, সেইরূপ কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৌন্দর্য মাধুর্য ঔদার্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণসমূহ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাষান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব।

সংস্কৃত ও বাংলা উভয়েই এক আর্য-শাখায় অন্তর্ভুক্ত। একটি সুপ্রাচীন, আর-একটি অতি নবীন। একটি ভাব ও শব্দসম্পদে অতুলনীয়, অপরটি শব্দচয়নে ও বয়নে অদ্বিতীয়। একটি উদ্যানের রাজীব, অপরটি উহার বনলতা। সুতরাং এই দুইএর সমন্বয় সাধন করার অর্থ হইল অতীত ও বর্তমানকে একসূত্রে গ্রথিত করা।

অনুবাদের ফলপ্রসূতা নির্ভর করে সাধারণতঃ তিনটি অঙ্গের উপর। প্রথমটি হইতেছে শব্দানুবাদ বা আখ্যানানুবাদ। এই অনুবাদের মাধ্যমে মূলভাষার সাহিত্যের সহিত কেবল পরিচয়মাত্র ঘটে। মূলের ভাষার forceটুকুকে অনুবাদ করা হয় না। যে ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তাহার idomটুকু রক্ষিত হয়। এই শব্দানুবাদেও নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়টি ভাবানুবাদ। যে গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করা হয় তাহার সম্পূর্ণ ভাবটিকে অনুবাদ করা। যাহাকে বলে ভাষার spiritকে অনুবাদ করা। ইহা খুব কঠিন কাজ। কারণ, অন্যের ভাবকে নিজের করিয়া পরে সেই ভাবটিকে অন্যের করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বলাই বাহুল্য, ধ্যানেশবাবু এই ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্গটি হইতেছে ভাষানুবাদ। অনুবাদের ভাবকে যথোপযুক্তরূপে রূপায়িত করিবার জন্য প্রভূত শব্দসম্পদের প্রয়োজন। যে ভাবটি অতি আধুনিক ভাষায় সহজভাবে প্রকাশ করা যায়, প্রাচীন ভাষার আশ্রয়ে উহা প্রকাশ করা তত সহজসাধ্য নয়। আধুনিক ভাব ও শব্দকে প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইলে যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় তাহার উপর দখল থাকা প্রয়োজন। অনুবাদকের এ দখল আছে।

আসল কথা, ধ্যানেশবাবু এই অনুবাদে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষার সারল্যে ও প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গাম্ভীর্যে ও মহিমায়, শব্দের চয়নে ও বয়নে, বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী ও রীতিতে অনুবাদটি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে।
ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি ॥
দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে,
যাক ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা ॥
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী তুলিকায় অতীতের বিদ্রূপবাণী দিক মুছায়ে
স্মরণের পত্র হতে।
স্তব্ধ হোক বেদনগুঞ্জন
সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো—
আনো তমস্বিনী,
শ্রান্ত দুঃখের মৌনতিমিরে শান্তির দান ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

সা সা II মা মা রা -া । সা -া সা সা I সা সমা মা রা । সা -া -া -া I
ও রে জা গা য়ো • না • ও যে বি রা• ম মা গে • • •

I সা -া মা মা । রা -া সা সা I মা -া মা -া । -া -া র্সা র্সা I
নি র্ ম ম ভা গ্ গে র পা • য়ে • • • ও যে

I র্সা -র্গা র্গা -া । র্রা -া র্সা -না I ধনা -া র্সা -না । ধা -পা পা -হ্মা I
স ব্ চা ও য়া • দি • তে • চা • হে • অ •

I পা -না না -ধা । ধা -পা পহ্মা -ধা I ধপা -া পা -মা । -া -া -া -া I
ত • লে • জ • লা• ন্ জ • লি • • • • •

I পা -র্সা -া -হ্মা । পা -ধা -া -হ্মা I পা -মা -া -া । -া -া মা মা I
না • • • না • • • না • • • • • ও রে

স্বরলিপি

I মা মা মা -গা । গা -পা -া -া I { পা -হ্মা ধা -পা । না -া -র্সা -া

জা গা য়ো ০ না ০ ০ ০ তু ০ রা ০ শা ০ ০ র্

I র্সা -া র্রা না । র্সা -া -া -া I র্সা -া র্সা -না । (ধ)না -া -া -ধা

দুঃ ০ স হ ভা ০ ০ র্ দি ক্ না ০ মা ০ ০ ০

I ধা -র্সা -া -া । -া -া -া -া I র্সর্গা -া র্গা -া । র্গা -া -র্রা -া

রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দি০ ক্ না ০ মা ০ ০ ০

I র্গা -র্পা -া -র্গর্রা । -র্সা -া -া -া } I র্সা -র্গা র্গা -র্রা । র্রা -র্সা -া -া

য়ে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ যা ক্ ভু ০ লে ০ ০ ০

I র্সা -না র্সা -র্গা । র্গা -র্রা র্রা -র্সা I র্সা -না -র্রা র্রর্সা । র্সা -া র্সা -না

অ ০ কি ন্ চ ০ ন ০ জী ০ ০ ব০ নে ০ র ০

I ধা -র্সা -া না । ধা -পা -া -হ্মা I পা -র্সা -া -হ্মা । পা -ধা -া -হ্মা

ব ০ ন্ চ না ০ ০ ০ না ০ ০ ০ না ০ ০ ০

I (ধ)পা -মা -া -া । -া -া মা মা I মা মা মা -গা । গা -পা -া -া

না ০ ০ ০ ০ ০ ও রে জা গা য়ো ০ না ০ ০ ০

I { সা -মা মা মা । মা -া মা মা I মা -া মা -া । -া -া -া -া

আ ০ সু ক নি ০ বি ড় নি ০ দ্রা ০ ০ ০ ০ ০

I সা -মা মা মা । মা -া মা -গা I গা -পা -া -া । -া -া -া -া

তা ০ ম সী তু ০ লি ০ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

I ধা না র্সা না । ধা -না র্সা না I (ধ)না -া ধপা -হ্মা । পা -র্সা না -ধা

অ তী তে র বি ০ দ্রূ প বা ০ ণী০ ০ দি ক্ মু ০

I ধা -পা পা -া । ক্ষা পা ধা পা I পা -ক্ষা ধা [ধ]পা । পা -মা -া -া } I

ছা ০ য়ে ০ স্ম র ণে র প ৎ ত্র হ তে ০ ০ ০

I { পা -ক্ষা ধা -পা । না -া -ধা -নর্সা I র্সা -া [র্স]র্রা র্সা । র্সা -া র্সা র্সা I

স্ত ব্ ধ ০ হো ০ ০ ০ক্ বে ০ দ ন গু ন্ জ ন

[-া]

I র্সা -র্গা র্গা র্গর্রা । [র্গ]র্রা -র্সা র্সা না I [ধ]না -া র্সা না । [ধ]না -া ধপা -ক্ষা } I

স্ব প্ ত বি০ হ ঙ্ গে র নী ০ ড়ে র ম ০ তো০ ০

I র্সা -র্গা র্গা -া । র্গা -া র্গা -র্পা I র্গা -র্রা র্রা -র্সা । -া -া -া -া I

আ ০ নো ০ ত ০ ম ০ স্বি ০ নী ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া -র্গা র্গর্রা । র্রা -া র্সা র্সা I র্সা -না -র্রা র্সা । র্সা র্সা না -া I

শ্রা ০ ন্ ত০ দু ক্ খে র মো ০ উ ন তি মি রে ০

I ধা -না র্সা [র্স]না । ধপা -া -া -ক্ষা I পা -র্সা -া -ক্ষা । পা -ধা -া -ক্ষা I

শা ন্ তি র দা০ ০ ০ ন্ না ০ ০ ০ না ০ ০ ০

I [ধ]পা -মা -া -া । -া -া মা মা I মা মা মা -গা । গা -পা -া -া II II

না ০ ০ ০ ০ ০ ও রে জা গা য়ো ০ না ০ ০ ০

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে কৃতজ্ঞ। ইতিহাস-বিস্মৃত জাতিকে তিনি অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে উপহার দিয়েছেন সাহিত্যের ইতিহাস। এজন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করেছেন, এবং প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন যে, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফল পাওয়া যায়ই।

দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁকে নূতন ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসাধনা সম্ভবত পৃথক জিনিস। দীনেশচন্দ্র সাহিত্যকে সাধনার ধন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যে কাজ তিনি ক'রে গিয়েছেন তার মধ্যেই এর প্রমাণ আছে।

সাহিত্যসৃজনের প্রতি তাঁর যেমন নিষ্ঠা ছিল, সাহিত্যমন্থনের কাজেও তাঁর উৎসাহ ছিল তেমনি প্রবল। মৌলিক রচনা তাঁর যেমন আছে, সাহিত্যের অনেক লুপ্তরত্ন ও গুপ্তরত্নও তিনি তেমনি উদ্ধার করেছেন।

এই সংখ্যায় দীনেশচন্দ্রের ইতিহাসচর্চা ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র এক সময়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎও যেমন হয়েছে পত্রবিনিময়ও হয়েছে। কয়েকটি পত্র এই সংখ্যায় সংকলিত হল।

স্বীকৃতি

নন্দলাল বসু -অঙ্কিত চিত্র শ্রীবিমলকুমার দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র শ্রীবিনয়চন্দ্র সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হাংগেরীতে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত চিত্রগুলি দিয়েছেন শ্রীঅলক গুহ।

দুষ্প্রাপ্য 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থের আখ্যাপত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আনুকূল্যে মুদ্রিত।

সম্প্রতি প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রাঙ্গদা : সচিত্র

চিত্রাঙ্গদা প্রথম-প্রকাশকালে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা যে চিত্রাবলী এই কাব্য-গ্রন্থখানিকে অলংকৃত করেছিল, সেই চিত্রগুলিসহ এই স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি ভিন্ন রঙে মুদ্রিত। মূল্য ২.৫০ টাকা

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর অনেকগুলি রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মূল্য ৭.০০ টাকা।

চিঠিপত্র। প্রথম খণ্ড

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। দীর্ঘদিন পরে পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ এই সংস্করণে নূতন সংযোজন। মূল্য ৩.০০ টাকা।

Tagore for You

ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের রচনা, অভিভাষণ, পত্রাবলী, কবিতা ও রূপক-কাহিনীর সংকলন। তথ্যমূলক কবিপরিচিতি সম্বলিত। সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। মূল্য ৪.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

রূপান্তর

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী —নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রাবলী সংবলিত। মূল্য ৭.০০ টাকা।

খাপছাড়া

'সহজ কথা'য় লেখা ১২৪টি কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত রঙিন ছবি ও রেখাচিত্রে ভূষিত। দীর্ঘকাল পরে মুদ্রিত পরিবর্ধিত সংস্করণ।

মূল্য ১২.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

বহু শতাব্দী পূর্বে
জনৈক ভারতীয় সন্ন্যাসী
চা-এর গুণ
আবিষ্কার করেন
১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ফাউনডেসন" নামক একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের এই অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন যে চা অবসাদ দুর করতে সাহায্য করে।
ক্লান্তি দুরীকরণে চা-এর গুণের কথা নাকি বহু শতাব্দী আগে আবিষ্কার করেছিলেন ভারতেরই জনৈক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম দারুমা। চীন ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ৫২০ খৃষ্টাব্দে ভারত থেকে যাত্রা করেন।
আজ লক্ষ লক্ষ পরিবারে চা যে শুধু একটি দৈনন্দিন পানীয় হিসেবেই গৃহীত হয়েছে তা নয়, চা আতিথেয়তার প্রতীক হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে,—চা খেতে খেতে যে কোন আলাপ আলোচনা সরস হয়ে ওঠে, ভাবনা চিন্তা দূরে চলে যায়।
আমার নাম চা—আমি মৈত্রীর প্রতীক
TEA BOARD INDIA
PST 188

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়   বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩

এক্সক্লুসিভ (৭৬) ৩২.৯৫
পুরুষের পদমর্যাদা
অটুট রাখে
বাটার জুতো
বাটার জুতোর নির্মাণ তাঁদেরই কথা মনে রেখে যাঁরা কর্ম-সাধনে তৎপর। রূপবান, বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত বাটার জুতো—তাঁদেরই জন্য যাঁদের পদক্ষেপ অবিরাম জীবনের বিচিত্র পথে। বাটার জুতোর গঠন আধুনিক রুচিসম্মত, নির্মাণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, কারিগর নিপুণ, কুশলী; উপকরণ হাতবাছাই, উৎকৃষ্ট। ফলে আরামে চলনে দীর্ঘস্থায়ী, নিশ্চিত। দিনের পর দিন, সমাজের সকল ক্ষেত্রে, পুরুষের পদমর্যাদা অটুট রাখে বাটার জুতো।
ডি ভি পি ওয়াকমাস্টার ২৮.৯৫
Bata
প্লেজার ২৮.৯৫

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩ · ১৮৮৮-৯ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

নীহারিকা

শিল্পী প্রতিমা দেবী

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩ · ১৮৮৮-৯ শক

চিঠিপত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাতঃ

বাবামহাশয়ের শরীরের অবস্থা···দুর্ব্বল— আমার···নড়বার জো নেই— কারণ এখন এখানে সকলেই অনুপস্থিত।

রথী যদি সেখান থেকে পয়লা অক্টোবরে ছাড়ে তাহলে এদের সঙ্গে দেখা করে শরৎদের সঙ্গে ৪ঠা যেতে পারবে। শরৎরা লুপ মেলে যাবে···একত্রে যাওয়া···

···ঘি এখানে ওজন করে নিয়ে দেখা গেল— ১৭ সের ১৩ ছটাক। অর্থাৎ প্রায় ১৮ সের। ১৯ সের নয়। তোমাদের ওজনের বাটখারা বোধ হয় ঠিক নয়।

মোহিতবাবুরা নবেম্বরের আরম্ভেই যাবেন। তাঁকে পড়াবার কাজে লাগিয়ে দিয়ো।

বুধগয়া থেকে···মূর্ত্তি আনা গিয়েছিল সেটা কাপড় দিয়ে মুড়ে রথীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ো।

রথীর কুস্তির ব্যবস্থা করেছ কি? ওদের জর্ম্মান মাঝে মাঝে Ehlers সাহেবের কাছে চল্‌চে কি?

এখানে সম্প্রতি অতি···ঠাণ্ডা পড়েছে কিন্তু···সহ করা যায়না।···পক্ষে বোধ হয় দিনের গাড়িতে আসাই ভাল হবে। রাত্রে যদি ভিড় হয় ঘুমতে পারবে না— যদি ঠাণ্ডা হয় ত অসুখ করতেও পারে।

সত্যেন্দ্র কি গেছেন? ভোলাকে পড়াচ্চেন কি?

[সেপ্টেম্বর ১৯০৪]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

···চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট

ওঁ

ভ্রাতঃ

রথীর নামে একটা পার্শেলে দুটো থান পাঠিয়েছিলেম— পিসিমা বল্‌চেন রসিদও পাননি সুতরাং মালও পাননি। দোহাই তোমার একটা বণ্ড্ লিখে দিয়ে রেলোয়ের মুষ্টি থেকে রসিদ উদ্ধার কোরো। আজকাল দিশি কাপড় এতই দুর্লভ হয়েছে যে ও থান দুটো হারালে চল্‌বেনা। দিশি শাদা কাপড় কলকাতা সহরে আর পাওয়াই যাচ্চেনা।

বক্তৃতাপাঠ হল— তার বিবরণ নিজের মুখে দেওয়া উচিত নয়। এখন লোকের ভিড় ঠেকাচ্ছি।

একটা সমাজ গঠন করবার জন্যে চেষ্টা চল্‌চে— তাই বিষম আটকে পড়েছি। কবে ছুটি পাব জানিনা। শরীর ভাল কি মন্দ তা বিচার করে দেখবারই সময় পাচ্চিনে। কিন্তু পালাবার জন্যে ভিতরে ভিতরে মনটা ছট্‌ফট্‌ করচে, অথচ যদি পালাই তাহলে ঐখেনেই ইতি। দেশে উদ্যোগী লোক এতই অল্প!

পিসিমা গয়ায় যেতে উৎসুক। তাঁকে একবার বেড়িয়ে নিয়ে এসনা। মীরা শমীকে তোমার সহধর্ম্মিণীর জিম্মা করে দিয়ো।

ছাত্রের দল তোমার ওখানে কি রকম উপদ্রব করচে?

তোমার জর্ম্মন প্রতিবেশীর কাছে রথী সন্তোষরা কি জর্ম্মন পড়বার সুযোগ পেয়েছে? ইতি সোমবার

তোমার

[১৯০৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো

ভ্রাতঃ

আমার পিতার শরীর ভাল নয়। এখন আমার কোথাও নড়বার জো নেই।

বৌদ্ধমূর্ত্তি পেয়েছি— কিন্তু বই দুখানি পাইনি— তবু তোমার উপর এটুকু বিশ্বাস আছে যে তুমি সে দুটো অপহরণ করবে না— দীর্ঘকাল ল্যাণ্ড্ অ্যাকুইজিশন করে অ্যাকুইজিশনের বৃত্তি তোমার এত দুর্দান্ত হয়ে ওঠেনি।

বেলা শরৎ কাল চলে গেল।

মৈনুকে বোলো তার মেয়ের একটি নতুন নাম আমাব মনে পড়েছে— নীপমালা। নীপ শব্দটার অর্থ সকলে জানে না কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়।

যে পর্য্যন্ত না ডেকে পাঠাই রথী সন্তোষদের তোমার কাছে রেখেই পড়িয়ো। তাদের এইটুকু বোলো যেন সমস্ত দিনের কর্ত্তব্যের একটা কাল-পর্য্যায় ঠিক করে নিয়ে সেই অনুসারে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যায়। সংস্কৃত তর্জ্জমা ও ব্যাকরণটা প্রত্যহই যেন চলে তাছাড়া Buddhist India পড়ে ইংরেজিতে তার প্রত্যেক অধ্যায়ের একটা সংক্ষেপ মর্ম্ম লেখে। ✓রামায়ণ মহাভারতটা বেশ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন পূর্ব্বক তার থেকে উদ্ধারযোগ্য তথ্যগুলি যেন উদ্ধার করে।✓ এবং জার্ম্মানশিক্ষার প্রতিও অবহেলা না করে। Palgrave থেকে ইংরাজি গীতিকবিতাগুলি দুজনে সন্ধ্যাবেলায় যদি আবৃত্তি করে পড়ে ত ভাল হয়— যেগুলো ওদের ভাল লাগবে সেগুলো মুখস্থ করে ফেল্‌তে পারলে ভবিষ্যতে ওদের আনন্দের বিষয় হবে। Light of Asia কাব্যখানি ওদের পড়া হয়েছে কি?

তোমরা কে কেমন আছ লিখো। সবুবাবুর বাগ্মিতা ও সঙ্গীতচর্চ্চা কি রকম চল্‌চে?

যদি ইতিমধ্যে আমি Sulphur 200 একশিশি তোমার ঠিকানায় পাঠাই তাহলে রথীকে সে ওষুধটা সপ্তাহে একবার মাস দুয়েক খাইয়ো। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩১১

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[বোলপুর]

ভ্রাতঃ

মইনুর ছেলেটির কথা শুনে চিন্তিত হলুম। আশা করি এত দিনে তার সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হয়েচ। ভোলার কি করচ? তাকে গিরিডিতে আনিয়ে সুস্থ করে তোল— কলকাতায় ফেলে রেখোনা। গিরিডিতে রেখে তাকে অল্প অল্প পড়াশুনা ধরানো উচিত। একজন কাউকে রেখো যে ওকে অন্তত ইংরেজি ও অঙ্ক অল্প অল্প এগিয়ে নিয়ে চল্‌তে পারে।

সুধাংশুবাবুরা গিরিডিতে একটা ছোটখাটো বিদ্যালয় করবেন বলেছিলেন— তদুপলক্ষ্যে একজন এফ্ এ পর্য্যন্ত পড়া ভদ্রলোক আমাদের এখানে থেকে কয়েকদিন এখানকার শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা করচেন। লোকটি মন্দ নয়। সুধাংশুবাবুকে বোলো খাওয়া ও বাসস্থানের জোগাড় পেলে ইনি মাসে দশটাকা বেতনে কাজ করতে পারেন। আমাদের এখানে স্থানাভাব— অতএব যদি তিনি এই লোকটিকে চান তবে আমাকে যেন শীঘ্র খবর দেন। আমি যে ক্লাসে ইংরিজি পড়াই সেই ক্লাসে তিনি পড়ানোর কাজ দেখে যাচ্চেন। আজ থেকে বাংলা ক্লাসগুলি ঘুরচেন।

গুপ্তর সঙ্গে ত শীঘ্র আমার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে আসবার পূর্ব্বে একদিন দেখা হয়েছে। এখন দীর্ঘকাল কলকাতায় যাবার আশঙ্কা নেই, যা হোক্ যুদ্ধে তুমি জয়লাভ কর ব্রাহ্মণের এই আশীর্ব্বাদ।

গিরীন্দ্রবাবু সোরাইষ্যার জমি সম্বন্ধে যে পত্র লিখেছিলেন তার কি হল? পার্শাবাদেরই বা খবর কি? ম্যানেজারবাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ো।

তোমার

[১৯০৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[শিলাইদহ]

ভ্রাতঃ

এবারে ছুটিতে কো[থায়] যাইব তাই ভাবিতেছি। মী[রার] ইচ্ছা কোনো নূতন জায়গায় যাওয়া হয়। তুমি সন্ধান করিয়া দেখিয়ো পরেশ[নাথ] পাহাড়ে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক কিরূপ স্বাস্থ্যের অবস্থা। সেখানে উক্ত কয়মাস বাড়ি ভাড়া পাইতে পারিব কিনা এবং কত ভাড়া— আহারের [স্না]ন পানের জলের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহাও জানা চাই। দার্জ্জিলিং অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য [নতুবা] সেখানেই যাইতাম…আমার পকেটের…কিরূপ তাহা তোমার…সহৃদয় লোক অনুমানেই বুঝিতে পারিবে।

বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কি কিনারা হইল জানিনা। বড়দাদা মেজদাদা রাজি নহেন। আমি ত অচল অটল— তুমি ত কর্ম্মে বদ্ধ। তাহা হইলে যেমন শৈলেশ আছে তেমনি থাকি[য়া] যাক্। কিন্তু আমি যে সম্পাদকী পরিত্যাগ করিলাম তাহা না জানাইলে পাঠকদিগকে নিতান্ত ঠকানো হইবে— কারণ এ…আমার নাম বঙ্গদর্শনে বা……হয় নাই। ইহা কর্ত্তব্য হইবে না। আমি কয়েকদিন শিলাইদহে

আছি। শীঘ্র বোলপুরে যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। মেজ্‌লুর পাত্রের কথা নিশ্চয় শুনিয়াছ। মেজ্‌লুকে একবার সুবোধের অভিভাবকতাধীনে বোলপুরে পাঠাইয়া দিয়ো।

মীরার জন্যও চেষ্টায় আছি।

[জুন ১৯০৬]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…চিহ্নিত অংশ ছিন্ন

ওঁ

ভ্রাতঃ

রথীদের গত সপ্তাহের পত্রে তাহারা এই বেলা জমী সংগ্রহের কথা বলিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা, যেখানে তাহাদিগকে চাষ করিতে হইবে সেখানকার মাটির নমুনা লইয়া তাহাদের কলেজ laboratoryতে an[a]lyse করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং সেখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক বিবরণ জানিয়া অধ্যাপকদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসে। ম্যালেরিয়া গ্রস্ত স্থানে জমী সন্ধানের চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ছোট নাগপুরে কর্ড লাইনের ধারে কি আর জমি পাইবার কোনো আশা নাই? তোমাদের হাজারিবাগের কর্ত্তারা বোধ হয় তাঁহাদের এলাকায় আমাদিগকে কোনোমতেই প্রবেশ করিতে দিবেন না সেইজন্য সেবার অত শশব্যস্ত হইয়া আমাদের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন যখন জমী পাওয়া গেল না তখন বোধ হয় ইহার পরে আর সুলভ মূল্যে পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তবু তোমার মুখ হইতে একটা শেষ জবাব পাইবার প্রত্যাশায় আছি— যদি জবাব দাও তবে আমার যথোচিত সাধ্যমত অন্যত্র কোথাও চেষ্টা দেখিতে পারি— যখন এত খরচ করিয়া একটা বিদ্যা শিখাইতে পাঠানই গেল তখন তাহার একটা ক্ষেত্র তাহাদিগকে দিতেই হইবে। যদি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিতান্তই না পাওয়া যায় তবে অগত্যা অন্য কোথাও অনুসন্ধান করিব। তুমি কি এখনো গিরীন্দ্রবাবুকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছ? যাহা হউক সত্বর এ সম্বন্ধে আমাকে জানাইবে।

আমি এখন মন্দ নাই। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বোটে যাইবার ইচ্ছা আছে। ভোলার কি রকম চলিতেছে, তোমারই বা খবর কি? গৃহিণীকে [আমার] সাদর অভিবাদন জানাইতে ভুলিয়ো না। মৈনু ও তাহার সন্তান সন্ততির খবর ভাল ত? ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৩

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

ভ্রাতঃ

মেয়ের বিয়ে নিয়ে ক'দিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলুম। কাজটি কন্যার পিতার পক্ষে নিতান্ত সহজ নয় সে ত তোমার মত অভিজ্ঞ লোকের কাছে অবিদিত নেই। যা হোক ২২ জ্যৈষ্ঠ দিন স্থির করেছি। সে সময়ে তোমাদের দর্শন পাব কি? তুমি ত ১৫ই তারিখে উত্তীর্ণ হবে— তার পরে বোধ হয় জের সামলাতে

জ্যৈষ্ঠ মাস কেটে যাবে— যা হোক যদি ফাঁক পাও তবে একবার ধাঁ করে বাষ্পযান যোগে এখানকার নিমন্ত্রণটা সংক্ষেপে সেরে যেতে পার। তোমার টাকাটা শীঘ্র তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আজই যদুকে লিখে দিয়েছি— পেতে বিলম্ব হবে না। আমার ভাবী জামাতাটিকেও রথীর আশ্রয়ে কৃষিচর্চ্চায় পাঠাতে হবে। কেউ বা গোরুর লাঙ্গুল পীড়ন করবে, কেউ বা লাঙল ঠেলবে।

মাদ্রামোর জমি সম্বন্ধে সকল কথা আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে যদি পাওয়া যায় তবে জমি নিতে দ্বিধা করবার কোনো হেতু নেই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে পাওয়া যাবে কি— যদি যায় ত কত পরিমাণ জমি? ভালরূপ তদন্ত করে জানিয়ো— এবং যাতে হস্তগত হয় তার জন্যে একটু চেষ্টাও রেখো— বরাবর দগ্ধভাগ্যের যে রকম পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে আশা করতে সাহস হয় না।

গৃহিণীকে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো— বোলো আমার জন্মদিনটা পথেই মারা গেছে— কাল রাত্রি দুপুরের সময় বোলপুরে এসেছি— তখন আর পায়সান্নের অবকাশ ছিল না। ভোলা কেমন আছে? ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

ভ্রাতঃ

তোমার ভাইয়ের হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর। মনে করিয়াছিলাম পূজার পূর্ব্বে গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তত সাহিত্য-প্রবন্ধ পর্য্যায় ছাপা শেষ হইয়া যাইবে— তাহা হইলে পূজা উপলক্ষ্যে হয়ত গোটাকতক বই বিক্রি হইতে পারিবে। কিন্তু সাতদিন অন্তর এক ফর্ম্মা করিয়া প্রুফ পাইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এমন করিয়া ৫।৬ বৎসরেও আমার বই ছাপা শেষ হইবে না। ওদিকে, এই সকল কারণেই আমি যোগীন সরকারের সঙ্গে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা প্রায় পাকা করিয়াছিলাম— ইতিমধ্যে পুনশ্চ আমার দুর্ভাগ্য ও দুর্বুদ্ধিক্রমে শৈলেশেরই পরামর্শ শুনিয়া শিলাইদহে আসিবার পূর্ব্বে যোগীন সরকারকে জবাব দিয়া পত্র লিখিয়াছি। শৈলেশ এ পর্য্যন্ত যতটা ছাপাইয়াছেন কোনোমতে তাহার হিসাব তাঁহার কাছে আদায় করিতে পারিলাম না। ছাপাখানার দেনা আমি ক্রমে ক্রমে শোধ করিয়া চলিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম— হিসাব না পাইয়া কিছুই করিতে পারিতেছি না। আমি তাহাকে এতবার এতরকম শাসাইয়া পত্র লিখিয়াছি যে সে আমার শাসনবাক্যে আর ভয়ই করে না— জানে আমি কেবল গর্জ্জনই করি। যাহাই হৌক্ এ স্থলে আমি কি করিব তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়ো। কাব্য-গ্রন্থ গল্পগুচ্ছ প্রভৃতির হিসাব শৈলেশ দেয় নাই এবং দিবেও না তাহা আমি জানি— ঐ সকল গ্রন্থের উপস্বত্ব শৈলেশ সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে ও অবাধে ভোগ করিয়া আসিয়াছে— আর কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ কাণ্ড করিত তবে শৈলেশই তাহার আচরণকে কি নাম দিত! যাহাই হউক্ অন্তত আমার নূতন বইগুলির হিসাব যেন প্রতি মাসের আরম্ভেই শৈলেশ জগন্নাথকে বিনা ওজরে দেয় তুমি সেইরূপ বন্দোবস্ত নিশ্চয় করিয়া দিয়ো। আমি জগন্নাথকে লিখিয়া দিয়াছি হিসাব না পাইলেই যেন সে অবিলম্বে বই

তুলিয়া আনে। আমার গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রত্যেক পুস্তক যেন কুড়িখানি রাখিয়া বাকি জগন্নাথকে ফেরৎ দেয়। বিক্রি হইয়া গেলে আবার কুড়িখানি পূরণ করিয়া দিব।

এখানে আসিয়া ভালই আছি। শিলাইদহে বোধ হয় আরো সপ্তাহ খানেক থাকিব। তারপর কালিগ্রামে রওনা হইব— সেখানে দিন দশেক থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিব। প্রবাসীর জন্য একটা গল্প লিখিতে সুরু করিয়াছি। তুমি কোনো লেখায় হাত দিয়াছ কি? "গুমোর" কথাটা আবার যেন চাপা না পড়ে। মাঝে মাঝে খবর লইয়ো। ইতি ১লা শ্রাবণ ১৩১৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

ভ্রাতঃ

তোমার সাহায্যে "গোমো"র জমি যে পাওয়া যাবে সে আশা ক্রমে আমার মন হতে চলে যাচ্চে। আজ রমণীর কাছ থেকে শুন্‌চি যে "গোমো"তে Building করবার উপযুক্ত বাড়ি lease দেবার জন্যে কোন্ জমিদার কাগজে advertize করচে। যদি available জমি এই রকম করেই বেহাত হয় তাহলে আমাদের অদৃষ্ট কবে সুপ্রসন্ন হবে। তুমি একটু যত্ন করে এটার জন্যে চেষ্টা দেখ— তোমার দোহাই দিচ্চি— অনেকদিন থেকেই তোমার শরণাপন্ন হয়ে আছি— যদি এমনিভাবেই দিনের পর দিন কেটে যায় তাহলে— তাহলে কি আর বলব! নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়ে নীরবে বসে থাকব। এ পর্য্যন্ত সুবিধে ত কোনো দিকেই কিছুতেই করতে পারিনি এটাতেও যে হবে এমন ভরসা করিনে— তবু আশা ছেড়েও আশা ছাড়তে পারচিনে— একেবারে যদি নির্ম্মূল করে দিতে পার তাহলেও এক রকম শান্তি পাই। যদি না পাওয়াটাই বেশি সম্ভবপর হয় তাহলে সেইটে সময় থাকতে জানিয়ো। ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩১৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শরৎ। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী: মাধুরীলতার স্বামী

সত্যেন্দ্র। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: রেণুকার স্বামী

পিসিমা। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী

সুধাংশু। সুধাংশুপ্রকাশ রায়

যদু। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

যোগীন সরকার। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রমণী। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

মেয়ের বিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ

ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র : উত্তরার্ধ

প্রবোধচন্দ্র সেন

কলাবৃত্ত রীতির পর্ববৈচিত্র্য

কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রতি পর্বে চার, পাঁচ ও ছয় বা সাত কলামাত্রা থাকে। এই বিভিন্ন আয়তনের পর্ব রচনায় রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র এই দুই জনের মধ্যে কার কতখানি কৃতিত্ব, অতঃপর একে একে তাই দেখাতে চেষ্টা করছি।

চার কলামাত্রার পর্ব

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে চারমাত্রা পর্বের প্রয়োগই সবচেয়ে বেশি। বৈষ্ণব পদাবলীতেও তাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রামপ্রসাদ ব্রজবুলি রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর রণগীতিগুলিতে চারমাত্রা পর্বের প্রয়োগ খুবই কম। কিন্তু যে দুএকটি ক্ষেত্রে চার মাত্রার পর্ব প্রযুক্ত হয়েছে সেসব স্থানে ছন্দের উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য খুবই প্রশংসনীয়।—

তনু দলিতাঞ্জন, শরদসুধা- কর
মণ্ডলবদনী- রে।
কুণ্ডলবিগলিত, শো- ণিত শো- ভিত,
তড়িতজড়িত নব ঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কাজ, লা- জ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে॥
… … …
ভী- ম ভবা- র্ণব তা- রণ হে- তু
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সে- তু,
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন
কুরু কৃপালে- শ জননি কালিকে॥

—শ্যামা বামা কে, 'কবিজীবনী', পৃ ৭০

এখানে হাইফেনচিহ্নিত কয়েকটি স্থানে আধা-জয়দেবী কায়দায় দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অব্যাহত আছে। বলা বাহুল্য 'প্রসাদ' শব্দে অগত্যাই দলবৃত্ত কায়দায় দুই মাত্রা ধরে রীতিমিশ্রণ দোষ ঘটাতে হয়েছে।

এইজাতীয় রচনায় বৈষ্ণব কবিরা ব্রজবুলির আশ্রয় নিতেন। রামপ্রসাদ তা না করে বাংলা ভাষাতেই চারমাত্রা পর্বের ছন্দ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর পদাবলীতে অনুরূপ ছন্দের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। আর তাঁর অনুবর্তী ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় বোধ করি একটিও নেই। অবশ্য পুরোপুরি জয়দেবী কায়দায় রচিত চারমাত্রা পর্বের কিছু কিছু নিদর্শন আছে তাঁর 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে।

পাঁচ কলামাত্রার পব

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে পাঁচ মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বের প্রয়োগ কিছু দেখা যায়, যদিও বেশি নয়। যেমন—

১। অহহ কল | -য়ামি বল | -য়াদি মণি | -ভূষণম্।
হরিবিরহ | -দহনবহ | -নেন বহু | -দূষণম্॥

২। বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | -কৌমুদী
হরতি দর | -তিমিরমতি | -ঘোরম্।

—'গীতগোবিন্দ', গীত ১৩ ও ১৯

বৈষ্ণব পদাবলীতেও কলাবৃত্ত রীতিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব প্রচলিত ছিল, কিন্তু খুব কম। এত কম যে, বৈষ্ণব কবিতার পরম অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথও তার সন্ধান পান নি। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে—

"বিষমমাত্রার [তিন-দুই যোগে পাঁচ মাত্রার] দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েছে, সেও কেবল গানের আরম্ভে— শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি।

চিকনকালা গলায় মালা
'বাজন নূপুর' পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
'তেরছ নয়ানে' চায়॥"

—'ছন্দ' (১৩৬৯), ছন্দের অর্থ

এই দুই পংক্তিতেও দুটি পর্বে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটেছে। এই গানটি আসলে পাঁচমাত্রা পর্বের ছন্দে রচিত নয়। বিদ্যাপতি ও শশিশেখরের রচনা থেকে যথাক্রমে পাঁচমাত্রা পর্বের দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

খনরি খন মহঘি ভই কিছু অরুন নয়ন কই
কপটে ধরি মান সম্মান লেহী।
কনক জয়ঁ পেম কসি পুনু পলটি বাঙ্ক হাসি
আধি সয়ঁ অধরমধু পান দেহী॥

… …

সরস কবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে
নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।
সকল জন সুজনগতি রানি লখিমাক পতি
রূপনারায়ন সিবসিংঘ জানা॥[১]

—বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্যসংসদ), পৃ ৯১

---

১ দ্রষ্টব্য : খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার -সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' (১৩৫৯), ১১১-সংখ্যক পদ, পৃ ৮২।

বাংলাদেশে প্রচলিত পদসংগ্রহগুলিতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির কোনো রচনাতেই পাঁচমাত্রা পর্বের প্রয়োগ দেখা যায় না। বাংলাদেশের বাইরে প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতেও এরকম প্রয়োগ খুব বিরল। বিদ্যাপতির অনুবর্তক গোবিন্দদাসের পদাবলীতেও পাঁচমাত্রার পর্ব দেখা যায় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঁচমাত্রা পর্বের দৃষ্টান্ত পান নি তা বিচিত্র নয়।

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেহরুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতি মণ্ডলী পন্থমাঝ পেখলি
কোই নহ রাইক সমানা॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপগুণ সাররি সৃজিল ইহ নাররি
ধনি রে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥
... ...
রতন অট্টালিকা উপরি রহু রাধিকা
হেরি হরি অচল পদ পাণি।
রসিকজন মানসে হরিগুণ সুধারসে
লাগি রহু শশিশেখর বাণী॥

—বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্যসংসদ), পৃ ১০২২

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দুটি দৃষ্টান্তই আধা-জয়দেবী ভঙ্গিতে রচিত। জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি রচনাটিই যে এই দুটি রচনার আদর্শ তাতেও সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে তিন মাত্রা বেশি আছে।

যা হক, বৈষ্ণব পদাবলীতে এরকম পাঁচমাত্রা পর্বের ছন্দ রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে নি।[২] রামপ্রসাদের মনও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয় না। এইজাতীয় ছন্দের আদর্শস্থানীয় জয়দেবের রচনাগুলি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন কি না জানি না। যে-কোনো কারণেই হক, রামপ্রসাদের পদাবলীতে পাঁচমাত্রা পর্বের প্রয়োগ দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যে ওরকম পর্ব প্রয়োগের বিরলতাই সম্ভবতঃ তার আসল কারণ।

ঈশ্বরচন্দ্রের দুএকটি রচনায় পাঁচমাত্রা পর্বের নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) রীতিতে রচিত, সরল অর্থাৎ অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে নয়।[৩] এখানে অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং মিশ্রকলাবৃত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন অনাবশ্যক।

ছয় কলামাত্রার পর্ব

গীতগোবিন্দ কাব্যে ছয়মাত্রা পর্বের প্রয়োগ নেই বললেই হয়।[৪] বৈষ্ণব পদাবলীতেই কলাবৃত্ত

২ অথচ রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচিত 'ফুলবালা' কবিতার অন্তর্গত 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ হোথা যাস নে' ইত্যাদি গানটিতেই পাঁচমাত্রা পর্বের প্রয়োগ দেখা যায়। জয়দেবের 'অহহ কলয়ামি' ইত্যাদি রচনাটিই প্রত্যক্ষতঃ এই গানটির আদর্শ কিনা তা বিবেচনার যোগ্য। তা ছাড়া 'মানসী' কাব্যেও পাঁচমাত্রা পর্বের বহু নিদর্শন আছে। জয়দেবের রচনাই বোধ করি সেগুলিরও প্রেরণাস্থল, অন্ততঃ বৈষ্ণব পদাবলী যে নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩ দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ মিত্র -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থে (১৩৬৮ শ্রাবণ) লেখকের 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, পৃ ৭৭-৭৯।

৪ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'রবিপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থে (১৩৬৮ আষাঢ়) লেখকের 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, পৃ ৩৫২-৫৩।

রীতির ছয়মাত্রা পর্বের প্রথম প্রবর্তন। ও সাহিত্যে তার প্রচলনও কম ছিল না। রামপ্রসাদের রচনাতেও কলাবৃত্ত রীতির ছয়মাত্রা পর্বের ছন্দ যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তাঁর পদাবলীতে এ ছন্দের একটা দোলায়মান অবস্থা লক্ষিত হয়। এক দিকে ব্রজবুলি ভাষা ও আধা-জয়দেবী ভঙ্গির মিশ্র উচ্চারণ আর অন্য দিকে বাংলা ভাষা ও বাংলার স্বীকৃত উচ্চারণ, এই দুএর মধ্যে এ ছন্দ দোলায়মান। আসলে হয় তো তাঁর রচনায় এই ভাষা ও ছন্দোরীতিতে একটা বিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু রচনার কালক্রম জানা না থাকাতে ওই ক্রমপরিণতির ধারা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার মধ্যেও এই ক্রমপরিণতির আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রচনা থেকে 'ও কে রে মনোমোহিনী' ইত্যাদি ছয়মাত্রা পর্বের যে দৃষ্টান্তটি সর্বশেষে উদ্‌ধৃত করেছি তার প্রথমাংশে আধা-জয়দেবী ও শেষাংশে বাংলা রীতির প্রাধান্য ঘটেছে, এ কথা যথাস্থানে বলেছি। কিন্তু বাংলা অংশটা যথেষ্ট জোরালো নয়। এখানে তাঁর রচনা থেকে খাঁটি বাংলা কলাবৃত্ত রীতির একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মদনমথন-উরসি রূপসী
হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদগর্জে
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে,
জনমনোহরা শমনসোদরা
গর্ব খর্ব করে ॥
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা,
প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে নিরখে যে জনে
গমন শমন-নগরে ॥
কলয়তি প্রসাদ্, হে জগদম্বে,
সমরে নিপাত' রিপুকদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ,
রক্ষ বিবুধ-নিকরে ॥

—ও যে ইন্দীবর-নিন্দি কান্তি, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', পৃ ৩২৮

রবীন্দ্রনাথের মানসী-সোনার তরী-চিত্রার (১৮৯০-৯৬) প্রায় সওয়া শো বৎসর পূর্বে রামপ্রসাদের রচনায় খাঁটি বাংলা কলাবৃত্ত রীতিতে ছয়মাত্রা পর্বের ছন্দ যে এমন পূর্ণতেজে প্রকাশ পেয়েছিল, তা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে সত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। রামপ্রসাদের রচনার প্রধান যে দোষ অনুপ্রাস-যমকের অতিবাহুল্য, তাও এটিতে নেই। তা ছাড়া, প্রত্যেক পর্বে তিন মাত্রার পরে উপযতিস্থাপনের ফলে যে একঘেয়েমি দেখা দেয়, সে দোষও এটিতে ঘটেনি। মাঝে মাঝে উপযতিলোপ ঘটাতে সে দোষ অনেকটাই কেটে গেছে। তবে 'গর্ব খর্ব করে'তে এক মাত্রা কম এবং 'প্রসাদ' শব্দের উচ্চারণ দলবৃত্ত-সম্মত, এ দুটি ত্রুটি আছে এটিতে।

মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের চেয়ে কিছু বেশি ছন্দসচেতন ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বোধের চেয়ে জ্ঞান বেশি ছিল। কিন্তু সে জ্ঞান সুগভীর ছিল না, ফলে ছন্দের মূলনীতিগুলি তাঁর কাছে অনাবিষ্কৃতই ছিল। এ বিষয়ে তিনি প্রধানতঃ চলতি ধারণার দ্বারাই চালিত হতেন। অথচ তাঁর ছন্দের বোধ ছিল সুপ্রখর। তাই যখন তিনি শুধু বোধের দ্বারা চালিত হতেন তখনই তাঁর ছন্দে দেখা দিত সুষমা ও মাধুর্য। কিন্তু যেই তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন অমনি ছন্দ বাঁধা পথে চলতে শুরু করত। তাঁর রচনায় যা-কিছু অভিনবত্ব তার অধিকাংশই চলতি প্রথার গণ্ডির মধ্যে এবং ছন্দোবদ্ধ রচনায় অর্থাৎ ছন্দের বহিরাকৃতিতে, অন্তঃপ্রকৃতিতে নয়। এটা হল তাঁর সচেতন মনের খেলা। ছন্দের বোধ বাসা বেঁধেছিল তাঁর কানে, জ্ঞানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে নি। তাই অনেক সময় ওই বোধের দ্বারা চালিত হয়ে ছন্দ-সরস্বতীর দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়েই তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে। মায়াবী জ্ঞান তাঁকে উলটো দিকেই পথ দেখিয়েছে। এই করুণ ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কলাবৃত্ত ছন্দ রচনার বেলায়। কান ও জ্ঞানের বিরোধঘটিত এই যে ট্র্যাজেডি, তার দুএকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঈশ্বরচন্দ্রের 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক থেকে। এই নাটকের 'মঙ্গলাচরণ' অংশেই আছে—

শিশির, 'বসন্ত', নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এসব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার।

ছন্দ-জগতের দুষ্ট-সরস্বতী স্পষ্টতঃই এখানে অক্ষরসংখ্যার সমতা দেখিয়ে কবিকে ভুলপথে চালিয়েছেন। নতুবা 'বসন্তে'র আগে কিছুতেই 'শিশির' আসতে পারত না, আসত 'শীত' বা অন্য কিছু। ছলনাময়ীর মায়াজাল-বিস্তারের আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

মরকতমণিমণ্ডলমণ্ডিত
মোহনমুকুট মুখ সুশোভিত
মথুরামহীপ মুকুন্দমাধব
মধুরমুরলীধর হে।
...
পরমানন্দ প্রেমপ্রসঙ্গ,
প্রমোদপীযূষ-পূরিত অঙ্গ,
পতিতপাবন প্রণতপালক,
পরমপুরুষ পর হে॥

—'বোধেন্দুবিকাস', (মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত), পঞ্চম অঙ্ক, পৃ ১৮১

এটির প্রথম অংশে কবির সচেতন মন সযত্নে অক্ষরসংখ্যার সমতা রক্ষা করে চলেছে। এখানে কবির শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অতন্দ্র। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ রচনার কালে দেখি জ্ঞানের প্রহরী ঝিমিয়ে

পড়েছে। তাই তিনি কানের দ্বারা চালিত হয়ে অনায়াসেই ছন্দ-সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেন। কানই হল সহজাত ছন্দবোধের স্বাভাবিক অধিষ্ঠান।

পূর্বে বলেছি ঈশ্বরচন্দ্রের কানের চেয়ে জ্ঞানের প্রভাবই ছিল বেশি। তাই তাঁর কান মাঝে মাঝে প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁকে ছন্দভারতীর পদ্মাসনের কাছে পৌঁছে দিলেও জ্ঞানের তর্জনীসংকেতে তাঁকে বারবারই ফিরে আসতে হয়েছে। সেজন্যেই তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে কলাবৃত্ত রীতির দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সে দেখা ক্ষণিক দেখা মাত্র, স্থায়ী দেখা নয়। একমাত্র 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' রচনাটিতে কলাবৃত্ত রীতির অচঞ্চল রূপ দেখতে পাই। অন্য সর্বত্র যেন কলাবৃত্ত রীতির অরুণ কিরণ মিশ্ররীতির ছিন্ন মেঘের ফাঁকে মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে যায়। বস্তুতঃ 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' রচনাটিতে কলাবৃত্ত রীতি কেমন করে যে অচপল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেটাই একটা বিস্ময়ের বিষয়। মনে হয় সে সময় কবি অনুপ্রাসের নেশায় মেতে গানটিকে ধ্বনিস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ছন্দের হালটি অন্যমনস্কভাবে কানের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমন মত্ততা ও এমন স্খলন (?) তাঁর জীবনে আর দ্বিতীয়বার ঘটে নি। তাই তাঁর বিপুলসংখ্যক রচনার মধ্যে ওই রচনাটিই অস্খলিত কলাবৃত্ত রীতির অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করছে।

রামপ্রসাদ কিন্তু গান রচনার সময়ে জ্ঞানের চেয়ে কানের দ্বারাই বেশি চালিত হতেন। তাঁর সহজাত ছন্দোবোধও ছিল প্রখর। তাই তাঁর রচনায় কলাবৃত্ত রীতির দৃষ্টান্ত সংখ্যাতেও কম নয়, তার রূপবৈচিত্র্যও প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর কানের বোধ জ্ঞানের দৃঢ়ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাই তাঁর কলাবৃত্ত রীতির রচনায় স্খলনপতনও বিরল নয়। তাঁর এই ছন্দচ্যুতির কিছু পরোক্ষ কারণও ছিল। গানের সুর ও তালের আচ্ছাদনে ছন্দের ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক সময়েই ঢাকা পড়ে যেত, কবির কানে ধরা দিত না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের মতো ছাপাখানার সহায়তা পান নি। মুদ্রিত মূক রচনা যখন কণ্ঠযোগে পাঠকের কানে ধ্বনিত হয় তখন ওসব ত্রুটিবিচ্যুতি সহজেই ধরা পড়ে, কানে বেসুরো বাজতে থাকে। তাই কবিকে প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে হয়।

সাত কলামাত্রার পর্ব

আমরা দেখেছি রামপ্রসাদের রচনায় ছয়মাত্রা পর্বেরই প্রাধান্য। চারমাত্রা পর্বের প্রয়োগ কম, কিন্তু তার উৎকর্ষ সংশয়াতীত। পাঁচমাত্রার পর্ব তাঁর রচনায় পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে সাতমাত্রা পর্বের একাধিক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। সেগুলির গঠনসৌষ্ঠব অনিন্দনীয়। যেমন—

সদ্যোহতদিতি | -তনয়মস্তক | -'হা-র' লম্বিত | সুজঘনে।
কত রাজিত কটিতটে | নিকর নরকর, | কুণপশিশু শ্রব | -ণে ॥
অধর সুললিত বিম্ব লজ্জিত, কুন্দ বিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল কমলনিরমল, সাট্টহাস সঘ -নে ॥
সজল জলধর কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
শ্রীরাম -প্রসাদ ভণে মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয় -নে ॥

— মা কত নাচ গো রণে, 'কবিজীবনী', পৃ ৬৭

প্রথম পংক্তিতে 'হার' শব্দে স্বরের সংস্কৃত উচ্চারণ। অন্য সর্বত্র বাংলা উচ্চারণ। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পংক্তির শেষ পর্বে তিন মাত্রা কম আছে। অথচ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে দুটি অতিপর্ব ধরতে হয়েছে। পাঠভ্রান্তি এই অসাম্যের কারণ কি না জানি না। বিভিন্ন সংকলনে এই রচনাটির পাঠগত যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠই স্বীকৃত হল। কবির অভিপ্রেত মূলপাঠ কি ছিল তা নির্ণয় করার উপায় নেই। যা হক, এই রচনাটিতে সাতমাত্রা পর্বের যে সুগঠিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ এটি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গীতিরচনার (যেমন, 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর' কিংবা 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু') কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাতমাত্রা পর্বের আর-একটি দৃষ্টান্ত এই। —

'শঙ্কর'পদতলে, | মগনা রিপুদলে | বিগলিত 'কুন্তল' | জা- ল।
বিমল বিধুবর | বদন, তনুরুচি | বিজিত তরুণ ত | মা- ল॥
যো- গিনী- গণ সকল ভৈরব সমর করে ধরে তা- ল।
ক্রুদ্ধ মা- নস উর্ধ্বে শো- ণিত পিবতি নয়ন বি শা - ল॥

… … …

প্রসাদ কথয়তি শ্যা- মা সুন্দরি রক্ষ মম পরকা- ল।
দী- ন জন প্রতি কুরু কৃপা- লেশ বারয় কা- ল করা- ল॥

— শঙ্করপদতলে, 'কবিজীবনী', পৃ ৬৯

এখানেও অন্য পাঠের চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এটির প্রথম পংক্তিতে 'শঙ্কর' ও 'কুন্তল' শব্দের রুদ্ধদল-দুটির সংকুচিত একমাত্রক উচ্চারণ। অন্য সব রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক। এটিতে কোনো কোনো স্বরের উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুসারে দ্বিমাত্রক। সেগুলি হাইফেনচিহ্নযোগে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্য সব স্বরেরই বাংলা উচ্চারণ।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় সাতমাত্রা পর্বের প্রয়োগ আছে কিছু কিছু। কিন্তু সেগুলি সব মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) রীতিতে রচিত, সরল অর্থাৎ অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে নয়। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহার

দেখা গেল চার, ছয় ও সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব রচনায় রামপ্রসাদ ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। মনে প্রশ্ন জাগে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের এতগুলি কলাবৃত্ত রচনা সংকলন করলেন, তথাপি তিনি নিজে এই রীতির অনুসরণ করলেন না কেন? তার উত্তর সম্ভবতঃ এই। কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ হচ্ছে মূলতঃ গীতিরচনার বাহন। চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দ কাব্য তার প্রমাণ। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরাও এই ধারার অনুসরণ করেছেন। রামপ্রসাদ ছিলেন স্বভাবতঃ এবং প্রধানতঃ প্রথমশ্রেণীর গীতিকার ও সুরকার। সুতরাং এই ছন্দোরীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন তা বিচিত্র নয়। তাঁর উপরে ব্রজবুলি গীতিরচনার প্রভাবও কিছু পড়েছিল, তা পূর্বে বলা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা বোধ করি এই যে—গানরচনায় তিনি কানের নির্দেশ মেনেই

চলতেন, জ্ঞানের নির্দেশ নয়। কানের নির্দেশে চালিত হয়েই তিনি বাংলা কলাবৃত্ত রীতির সত্যরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কানের উপলব্ধিকে জ্ঞানের রূপ দিতে পারেন নি। অর্থাৎ তিনি কান ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারেন নি। দীর্ঘকাল পরে সে কাজ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই হিসাবে 'মানসী' কাব্যের ক্ষুদ্র 'ভূমিকা'টির (১৮৯০) ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। যা হক, কানের প্রেরণায় চালিত হয়ে রামপ্রসাদ কলাবৃত্ত রীতিকে ব্রজবুলি ভাষা ও আধা-জয়দেবী উচ্চারণের সংস্কারবন্ধন থেকে মুক্ত করলেন বটে, কিন্তু তিনি তাকে গীতিরচনার গণ্ডি থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ যে শুধু গীত কবিতার নয়, পঠিত কবিতারও চমৎকার বাহন হতে পারে, এ আবিষ্কারও রবীন্দ্রনাথের। 'মানসী' কাব্যই তার প্রথম নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক গান রচনা করেছেন, গাইতেও তিনি পারতেন, সুরতালের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁর। কিন্তু গানের ইতিহাসে গীতিকার বা সুরকার হিসাবে তাঁর কোনো স্থানই নেই। রামপ্রসাদের মতো কানের উপলব্ধি ও গানের অনুভূতি তাঁর মজ্জাগত ছিল না। তাই গীতিরচনার মুখ্য বাহন কলাবৃত্ত রীতির স্বরূপ তাঁর আয়ত্ত হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি চালিত হতেন জ্ঞানের দ্বারা। সে জ্ঞান প্রথাগত জ্ঞান। কিন্তু কানের নির্দেশের মধ্যেই যে ছন্দের মূলনীতি নিহিত থাকে, সেই আসল জ্ঞানটুকু তাঁর ছিল না। তারই ফলে কানের প্রখরতা থাকা সত্ত্বেও কলাবৃত্ত রীতির স্বরূপ আবিষ্কারে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দলবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক রীতির ছন্দের ক্ষেত্রে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ বলা চলে না। এখানে তিনি রামপ্রসাদের থেকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে রামপ্রসাদের চেয়ে তিনিই রবীন্দ্রনাথের বেশি কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেউ এ রীতির ছন্দকে তাঁর মতো করে আয়ত্ত করতে পারেন নি। এইজন্যই কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সুখ্যাত 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে বলেছেন—

"গুপ্তকবি 'আয় রোদ্দুর হেনে' বা 'ধিন্‌তা ধিনা' প্রভৃতি ছন্দে খাঁটি বাংলার ধাতটি প্রায় ধরে ফেলেছেন, বলা যেতে পারে ; কিন্তু বেশি দূর এগোন নি।"

— ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ১৪

পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে ওই দুই ছন্দের দুটি নমুনা দিচ্ছি। —

১। 'আয় রৌদ্র হেনে, ছাগ দেব মেনে' ছন্দ—

বুকে পিঠে দাঁড়্য়ে। দুই পায়ে মাড়্য়ে॥
দেশ থেকে তাড়্য়ে। দেব ভূত ঝাড়্য়ে॥
কোপ তোপ ছুঁড়্বে। গুলিগোলা জুড়্বে॥
ত্রিভুবন ফুঁড়্বে। ধূমে দিক্ মুড়্বে॥

২। 'ধিন্তাধিনা পাকালোনা' ছন্দ—

শক্র যদি আসে ঝুঁকে
থাব্‌ড়া কোসে মার্‌বো বুকে॥

জোম্‌কে আমি বস্‌বো যবে।
চোম্‌কে যাবে দেব্‌তা সবে ॥...
খেল্‌বো খেলা শক্র ঘেরে।
হেল্‌বো না তো ফেল্‌ব সেরে ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), পৃ ৩১ এবং ৩২

এই দুই ছন্দের আসল রূপটি যে কি, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না। এখানে শুধু বলতে চাই যে, 'গুপ্তকবি···খাঁটি বাংলার ধাতটি প্রায় ধরে ফেলেছিলেন', সত্যেন্দ্রনাথের এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

"এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস। ব্যঙ্গকবিতায় এ ভাষার জোর কত, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্‌টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি শিঙ-বাঁকানো
কেবল খাব খোলবিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না।
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব,
ঘুষি খেলে বাঁচব না ॥

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।"

— 'ছন্দ' (১৩৬৯), ছন্দের প্রকৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র 'খাঁটি বাংলার ধাতটি প্রায় ধরে ফেলেছিলেন' বলেই লৌকিক (দলবৃত্ত) রীতির ছন্দকেও আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন, তিনি কলাবৃত্তকে আয়ত্তে আনতে পারলেন না, অথচ দলবৃত্তকে পারলেন কেমন করে? তার উত্তর এই।— তিনি জানতেন সাধুসাহিত্যের বহির্ভূত এই ছন্দোরীতিটি কোনো পূর্বনির্দিষ্ট বিধিবিধানের অধীন নয়, তার গতি অবারিত। কানের প্রেরণা অর্থাৎ সহজাত ছন্দোবোধই তার একমাত্র নিয়ন্তা। তাই এ ক্ষেত্রে কোনো পূর্বাগত সংস্কার তাঁর স্বাধীন রচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। তাঁর কানের স্বাভাবিক প্রবণতাই তাঁকে অভ্রান্ত নির্দেশে ঠিক পথে চালিয়ে নিতে পেরেছিল। কলাবৃত্ত রীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অন্যরকম। সে রীতিকে তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী বলে মনে করতেন না। এখানে তিনি অক্ষরসংখ্যার সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই কানের প্রেরণা সংস্কারকে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে কলাবৃত্তের সীমার মধ্যে নিয়ে গেলেও পরক্ষণেই সচেতন হয়ে তাঁকে অক্ষরসংখ্যার সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসতে হয়েছে।

মোট কথা দাঁড়াল এই। রামপ্রসাদ কলাবৃত্ত রীতির ধাতটিকে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন। দলবৃত্ত (লৌকিক) রীতির রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব। কিন্তু তাঁর কলাবৃত্ত রীতির কৃতিত্বই বোধ করি অধিকতর প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় ধরে ফেলেছিলেন দলবৃত্ত রীতির ধাতটিকে। কলাবৃত্তের ক্ষেত্রে তাঁর 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' রচনাটি বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব বেশি নয়, তাঁর দানের পরিমাণও সামান্যই। কিন্তু দলবৃত্ত রীতির রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত ও অবিস্মরণীয়। রামপ্রসাদ বাংলা ভাষার শ্রুতধ্বনির চেয়ে গীতধ্বনির দ্বারাই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর, ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের টান ছিল শ্রুতধ্বনির প্রতি, গীতধ্বনির প্রতি নয়। তাই এক জনের প্রধান কৃতিত্ব কলাবৃত্ত রীতিতে, আর-এক জনের দলবৃত্ত রীতিতে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রতি কিছুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। তথাপি ঐ নাটকের 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' রচনাটির ছন্দোগত অভিনবত্ব কেমন করে তাঁর মতো সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, এটা একটা বিস্ময়ের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটিও কি তাঁর চোখে পড়ে নি? বোধেন্দুবিকাসের ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ কখনও আকৃষ্ট হয়েছিল কি না জানি না। তবে এটুকু জানি যে,—'ও কথা আর বলো না, আর বলো না, বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে' ইত্যাদি রচনাটি যে বোধেন্দুবিকাস (সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত) থেকে নেওয়া, এ কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জানা[৫] থাকলেও 'জীবনস্মৃতি' রচনার সময়েও (১৯১২) তা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। কিন্তু তিনি যে দলবৃত্ত রীতির রচনায় ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্বের বিষয়ে অবগত ছিলেন তার নিদর্শন একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধেও তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, তাঁর নানা উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কলাবৃত্ত রীতির ক্ষেত্রে রামপ্রসাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব, যদিও এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের কৃতিত্ব তাঁর প্রশংসা অর্জন করেছে। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে এবং তাঁর অভিমত জানা গেলে খুবই সুখের বিষয় হত। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' সম্বন্ধেও ওই এক কথাই বলতে হয়।

মিল

সর্বশেষে মিল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করব। কেননা, মিল ছন্দের অচ্ছেদ্য অঙ্গ না হলেও চর্যাগীতির আমল থেকেই বাংলা ছন্দের প্রায়-অপরিহার্য অঙ্গভূষণ বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। মধুসূদনপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষরবন্ধও তাকে তার রত্নাসন থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

মিল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের একটি উক্তি দিয়েই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক।—

"নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে,

৫ দ্রষ্টব্য: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় -প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬ ফাল্গুন), পৃ ৭১-৭২।

মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না। যথা, মান-দিন মন-প্রাণ ছিল-গেল ইত্যাদি। ফলে কেবল ৺ভারতচন্দ্র রায় ও কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পুরাতন প্রায় সমস্ত কবিদিগের প্রণীত কবিতায় এই প্রকার মিলের দোষ আছে। নিধুবাবুর এক-এক খান সুর 'খেয়ালের' অপেক্ষাও কৌশলকলাপ-পরিপূরিত ও অতি মধুর।··· যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে স্বোণার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদূর পর্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য হইত তাহা কথনীয় নহে।"

—'কবিজীবনী', পৃ ১১৫-১৬

ঈশ্বরচন্দ্রের এই উক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। তার তাৎপর্যও বহু রকম। এস্থলে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বরচন্দ্র কেবল যে মিলসচেতন ছিলেন তা নয়, মিলের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও অভ্রান্ত ছিল। দুই শব্দের শুধু শেষ 'অক্ষর'এর শ্রুতিসমতাই যে মিল নয়, তার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণটির শ্রুতিসমতাও যে মিলের পক্ষে অত্যাবশ্যক এ বোধ তাঁর ছিল। তিনি যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছেন তাতেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মান-দিন মন-প্রাণ ছিল-গেল, এগুলি মিলের দোষের দৃষ্টান্ত। মান-দান মন-ধন ছিল-দিল, এগুলি নির্দোষ মিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের মতে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের রচনায় উক্তপ্রকার মিলের দোষ নেই। বস্তুতঃ তাঁদের রচনাতে এ দোষ একেবারে নেই তা নয়। তবে অপেক্ষাকৃত কম। ভারতচন্দ্রের কথা এখানে ছেড়ে দিলাম। ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলিত রামপ্রসাদের গান থেকেই দুএকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

এই সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥··
ও মা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর
মা তুমি পাষাণের বেটী॥

—এই সংসার ধোকার টাটী, 'কবিজীবনী', পৃ ৬০

শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

—মন করো না দ্বেষাদ্বেষি, 'কবিজীবনী', পৃ ৯৫

টাটি-লুটি-বেটী এবং বাঁশী-অসি, এইজাতীয় মিল নির্দোষ নয়। কিন্তু রামপ্রসাদী রচনায় এজাতীয় সদোষ মিলের অভাব নেই।

মিলসচেতন ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এইজাতীয় ত্রুটি প্রায় নেই। তবু একেবারেই যে চোখে পড়ে না তা নয়। যেমন—

পেটের জ্বালায় জ্বলে বুঝি
বেচতে হল কোটা-ভিটে।···

রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদতে হবে বসে ঘাটে॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৌষড়ার গীত[৬]

ও ভাই তত দিন ত খেতে হবে
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন করে পেট চালাব
মরে গেলেম ভেবে ভেবে॥

—'কবিতাসংগ্রহ', দুর্ভিক্ষ, পৃ ১২৩

ভিটে-ঘাটে এবং রবে-ভেবে মিল 'চিত্তসুখকর' নয়, বলাই বাহুল্য। কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, রামপ্রসাদ তথা ঈশ্বরচন্দ্রের মিল দেবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, এমনকি বিস্ময়কর, অন্ততঃ তখনকার দিনের পক্ষে।

বাংলায় দুই মাত্রার মিলেরই প্রাধান্য। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও তাই। দুই মাত্রার মিল দেওয়া সহজ। তিন মাত্রার মিল দেওয়া তত সহজসাধ্য নয়। ত্রিমাত্রক মিলের নিখুঁত দৃষ্টান্ত খুব বিরল। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র নিখুঁত ত্রিমাত্রক মিল-প্রয়োগেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের রচনা থেকে পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই এরকম অনেক মিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তবু পূর্ণতার খাতিরে এখানে উভয়ের রচনা থেকে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমে রামপ্রসাদ—

কে রে নী- লকান্ত কান্তি নিতান্ত,
নখরনিকর তিমির নাশে।
কে রে রূপের ছটায় তড়িৎ ঘটায়,
ঘনঘোর রবে উঠে আকাশে॥

—ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদ ১৮৬

একি দেখি অসম্ভব,
আসন করেছে শব,
মূর্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি,
ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশিরাশি, গজগামিনী॥

—সদাশিব-শবে আরোহিণী, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদ ২০১

---

৬ বসুমতী-গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণে এই রচনাটির নাম 'পৌষড়ার গীত'। কিন্তু ১৩০৮ সালের সংস্করণে (১৩১৪ সালে পুনর্মুদ্রিত) এটির নাম ছিল 'পৌষপার্বণ গীত'। ১৩০৬ সালের সংস্করণে এটি ছিল না, ১৩০৮ সালেই প্রথম গৃহীত হয়। 'দুর্ভিক্ষ' রচনাটিও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'কবিতাসংগ্রহে' 'পৌষড়ার গীত' নেই, 'দুর্ভিক্ষ' আছে।

কান্ত-তান্ত, ছটায়-ঘটায়, ভামিনী-গামিনী, ত্রিমাত্রক মিলের এই তিনটি রূপই লক্ষণীয়। আঁখি-মুখী মিলের ত্রুটিটুকুও লক্ষিতব্য।

এবার ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

এই বনে আছে এক ভুবন-ভামিনী।
তার কাছে কোথা আছে কামের কামিনী॥
'বিদ্যা' নামে স্বরূপসী সুপথগামিনী।
হাসে ভাষে তমো নাশে, প্রকাশে দামিনী॥
স্বভাবে প্রসন্না বালা দিবস-যামিনী।
পরিণয় কর তারে, করহ স্বামিনী॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), তৃতীয় অঙ্ক, পৃ ৭৬

এরূপ যদ্যপি তুমি না কর স্বীকার।
নিশ্চয় তোমার তবে বুদ্ধির বিকার॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পিতা, পৃ ৬৭

তৃতীয় প্রকারের ত্রিমাত্রক মিল (যেমন উপরের 'কান্ত-তান্ত') সম্ভব হয় শুধু কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) রীতির ছন্দেই। পূর্বে দেখেছি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এ রীতির প্রয়োগ খুবই কম। তাঁর রচনা থেকে এ রকম প্রয়োগের ('কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' প্রভৃতি) যে-কয়টি দৃষ্টান্ত পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তাতেই ত্রিমাত্রক মিলের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাবে। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জয় নি- রঞ্জন বিশ্ববিমোহন
বেণু রবণকর কৃষ্ণ।
গোপীজনগণ মোহনকারণ,
তর্জিত জগদতি তৃষ্ণ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত), পঞ্চম অঙ্ক, পৃ ১৮২

এটি জয়দেবী কায়দার কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) রীতিতে রচিত। 'নিরঞ্জন' শব্দের 'নি' ধ্বনিটি দ্বিমাত্রক হয়েছে ছন্দের প্রয়োজনে। বলা বাহুল্য, এরকম প্রয়োগ ত্রুটি বলেই স্বীকার্য। 'কৃষ্ণ-তৃষ্ণ' মিলটা আপাততঃ ত্রিমাত্রক মনে হলেও কার্যতঃ চতুর্মাত্রক। সংস্কৃত রীতির ছন্দে পংক্তির শেষ হ্রস্বস্বরটি স্বভাবতঃই দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয়।

একটি খাঁটি বাংলা ত্রিমাত্রক মিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

চা- হ চকিতে চঞ্চল চারু চক্ষে,
ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৃ ৪০৪

এই পংক্তি-দুটির অপূর্ব ছন্দোমাধুর্য সকলকেই মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দুটি পংক্তি যে রচনাটিতে আকস্মিকভাবে স্থান পেয়েছে, সেটি ঈশ্বরচন্দ্রের কিনা এবং তার পাঠ ঠিক আছে কিনা জানি না। 'চাহ' তিন মাত্রা হয়েছে ছন্দের তথা গানের তালের প্রয়োজনে। বাংলা গীতিরচনায়

দীর্ঘস্বরের এরকম দ্বিমাত্রকতা সুপ্রচলিত। যা হক, এ স্থলে আমাদের পক্ষে বিবেচ্য বিষয় হল 'চক্ষে-কক্ষে' এই ত্রিমাত্রক মিলটা।

'রূপাসোনা-উপাসনা'র মতো চার মাত্রার মিল এবং 'পিঠে পুলি-ছিটেগুলি'র মতো দুই ধাপের (অর্থাৎ দ্বিতল বা দ্বিস্তর) মিল সম্বন্ধেও ঈশ্বরচন্দ্র সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করব না।

শুধু মিলের আয়তনভেদ নয়, মিলের প্রয়োগবৈচিত্র্যও বিচার্য বিষয়। মিল শুধু যে পংক্তিতে-পংক্তিতেই হয় তা নয়। পদে-পদে এবং পর্বে-পর্বেও নানাভাবে মিল দেওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা থেকে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাতেই মিলস্থাপনের এজাতীয় বৈচিত্র্যের নিদর্শন মিলবে। নূতন উদ্‌ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

রচয়িতার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখা যায় মিলের অপ্রত্যাশিত সমাবেশে। রব-সব, বীর-ধীর, মালা-ডালা, স্বভাব-প্রভাব, কামিনী-যামিনী, চন্দ্র-মন্দ্র প্রভৃতি অভ্যস্ত মিলের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু এসব অভ্যস্ত মিলে অপ্রত্যাশিতের চমৎকারিতা নেই, ফলে তাতে রচয়িতার কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। অনভ্যস্ত মিল ঘটানো যায় দুই উপায়ে। এক, অপ্রত্যাশিত শব্দের আমদানির দ্বারা। যেমন— শিশির-কৃষির, আমরা-কাম্‌রা, গুজবে-বুঝোবে। দুই, একাধিক শব্দের সমবায়ে নূতন ধ্বনিগুচ্ছ তৈরি করে মিল দেওয়া। যেমন— মেঠাই-সে ঠাঁই, কি আছে-দিয়াছে, আহ্নিকে-খান নি কে। মিল তৈরির এই দুই কৌশল সম্বন্ধে রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্র সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। এই কৌশল দেখা দেয় ঈশ্বরচন্দ্রের পরবর্তী কালে। তবু এঁদের উভয়ের রচনাতেই এসব মিলের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। মনে হয় এসব মিল কবির ইচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথমে রামপ্রসাদ—

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয়-পদে লবে বাসা॥···
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি-মাসা॥
প্রসাদের মন হও যদি মন কর্মে কেন হও রে চাসা।
ওরে মতন মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥

—মন করো না সুখের আশা, 'কবিজীবনী', পৃ ৫২-৫৩

'আশা-মাসা-খাসা', এরকম মিল সুপ্রচলিত বা অভ্যস্ত নয়।

এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা, হয়েছি জোর ফরিয়াদী।···
ও মা তোমার পুতে সতীন-সুতে জোর করে, কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥

—হয়েছি জোর ফরিয়াদী, 'কবিজীবনী', পৃ ৯৪

মিথ্যা'বাদী'-ফাঁদে 'পা দি' মিলটা সত্যই বিস্ময়কর, বিশেষতঃ সেকালের পক্ষে। দ্বিজেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে এজাতীয় মিল অভাবনীয়।

এবার ঈশ্বরচন্দ্র—

আলয়েতে আগমন মনের খুসিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে ॥…
শক্তিসহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস-মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥

—'কবিতাসংগ্রহ', বড়দিন (দ্বিতীয়), পৃ ৯৪

'খুসিতে-চুষিতে' এবং 'মাংসমদ-ব্রহ্মপদ' মিল-দুটি উপভোগ্য সন্দেহ নেই।

অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনা আর কাহারে স্মরিবে,
বল না কে আছে আর হে।
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি,…
কেমনে পাইব সার হে ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), তৃতীয় অঙ্ক, করুণার গীত, পৃ ৮৫

এখানে 'ব্যাপারী-না পারি' মিলটা লক্ষণীয়।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এসব কৌশলের নিদর্শন খুব কমই আছে। যা-কিছু পাওয়া যায় সেগুলি এসে গেছে সম্ভবতঃ সুপ্ত চেতনার প্রেরণায়, তাঁদের অলক্ষিতেই। তাঁদের আসল নজর ছিল মিলের প্রাচুর্যের দিকে, কৌশলের দিকে নয়। তাই দেখি তাঁদের রচনায় অনেক সময় ভূরি ভূরি মিল পুঞ্জীভূত হয়ে পাঠকের রসবোধকে পীড়িত করে। তাঁদের দুজনের রচনা থেকে দুটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথমে রামপ্রসাদ—

সুধাংশুসুধা কি শ্রমজ বিন্দু,
শ্রীমুখ এ- কি শরদ ইন্দু,
কমলবন্ধু বহ্নিসিন্ধু-
তনয় এ তিন-নয়নী।…
সর্বাঙ্গশোভিত শোণিতবৃন্তে
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণোপান্তে মন দুরন্তে
রাখ কৃতান্তদমনি ॥

—সমরে কে রে কালকামিনী, 'কবিজীবনী', পৃ ৭১

এবার ঈশ্বরচন্দ্র—

বাড়ী বাড়ী বাই বাই
ভেড়ুয়া নাচায় বাই
মনোগত রাগসুর ধোরে।

মৃদুতান ছেড়ে গান
বিবিজান নেচে যান
বাবুদের লবেজান কোরে॥

—'কবিতাসংগ্রহ', শরদ্বর্ণন, পৃ ১৮৬

শেষ পংক্তিটিতে মিলের আতিশয্য লক্ষণীয়। এরকম রাশীকৃত মিলের প্রতি আসক্তিই ছিল রামপ্রসাদ তথা ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটাই সেকালে পরম তৃপ্তি ও কৃতিত্বের বিষয় বলে গণ্য হত।

শেষ কথা

ছন্দশিল্পী হিসাবে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা এখানেই শেষ করা গেল। তবে তুলনার বিষয় বাদ দিয়ে ছন্দ রচনায় এঁদের প্রত্যেকেরই দানের পরিমাণ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা এখনও রইল। কেননা, ছন্দশিল্পী হিসাবে এঁরা দুজনই 'প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি' ও 'আপন সময়ের অগ্রবর্তী' ছিলেন।

উৎসনির্দেশ

এই প্রবন্ধ রচনায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সহায়তা গ্রহণ করেছি।—

রামপ্রসাদ

১। মাসিক সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত (১২৬০ পৌষ, মাঘ ও চৈত্র) ঈশ্বরচন্দ্রকৃত রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনাসংকলন। ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -রচিত কবিজীবনী' গ্রন্থে (১৯৫৮) পুনঃপ্রকাশিত। বর্তমান প্রবন্ধে 'কবিজীবনী' নামে উল্লিখিত।

২। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ষষ্ঠ সংস্করণ। তারিখ অনুল্লিখিত।

৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -প্রণীত 'সাধককবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (১৯৫৪) সংকলিত রামপ্রসাদের পদাবলী।

৪। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য -প্রণীত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (১৯৫৬) সংকলিত রামপ্রসাদের পদাবলী (প্রথম শ্রেণীর গান, পৃ ২৩৯-৩৭৪)।

ঈশ্বরচন্দ্রধৃত পাঠ সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়। রামপ্রসাদী পদাবলীর পাঠনির্ণয় গবেষণাসাপেক্ষ।

ঈশ্বরচন্দ্র

১। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' (১২৯২ আশ্বিন ১৫)। এই গ্রন্থের বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ভূমিকাটি মূল্যবান্।

২। রামচন্দ্র গুপ্ত -প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্রের 'বোধেন্দুবিকাস নাটক', প্রথম ভাগ: তিন অঙ্ক। ১২৭০ সাল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নি।

৩। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত -সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত সমগ্র 'বোধেন্দুবিকাস নাটক' (ছয় অঙ্ক)। ১৩০৮ সাল।

৪। 'কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী'— কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন -সম্পাদিত ও প্রকাশিত। বসুমতী আফিস: ১৫ই আশ্বিন ১৩০৬ সাল। পরবর্তী সংস্করণ: ১৫ই আশ্বিন ১৩০৮, পুনর্মুদ্রিত ১৩১৪ সালে। দুই সংস্করণে সংকলনগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু সম্পাদকের 'মুখবন্ধে' সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

৫। গ্রন্থাবলী (প্রচলিত বসুমতী-সংস্করণ)। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে। তারিখ অনুল্লিখিত।

৫ শ্রাবণ ১৩৭৩

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সম্প্রতি এমন আশাতীত রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমালোচকেরা অনেকেই বিষয়টির দিকে নতুন করে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন অনুভব করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরা গাঙে আবার এই রকম একটা জোয়ারের জন্যে অনেকেই বোধ করি প্রস্তুত ছিলেন না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের ইতিহাস-চেতনাতেও কি হঠাৎ কোনো নতুন জোয়ার এসেছে— অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বোধ বা উপলব্ধিতে কোনো নতুন বিপ্লব? তা যদি না এসে থাকে, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই সাম্প্রতিক জনসমাদরের কি অন্য কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে? এই রুচি-পরিবর্তনের মূল কতদূর গভীরে?

কেবল সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, বাংলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকেও এ প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি একটু অন্য দিকে, অন্য এক সংশ্লিষ্ট কিন্তু প্রাথমিক ধরণের প্রশ্নের দিকে। সাম্প্রতিক কালের এইসব ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসকে আমরা আদৌ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে' গ্রহণ করতে পারি কি? প্রশ্নটাকে অনায়াসে আর একটু পিছিয়ে দেওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার ওই-জাতীয় উপন্যাসগুলিকেই কি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে' আমরা অনায়াসে ঘোষণা করতে পারি? আরো গোড়ার প্রশ্ন: ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলব? কেন বলব?

ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা তত্ত্বগত দিকও আছে—সাহিত্যতত্ত্বগত দিক। সেই গোড়াকার প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থাকলে পরবর্তী অনেক জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক উত্তর মিলবে না। এখানে আমাদের দৃষ্টি সেই তত্ত্বের দিকে। সত্যিই কি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে' আলাদা-কিছু সম্ভব? যে উপন্যাস 'অনৈতিহাসিক', তার মধ্যেও কি যথার্থ ঐতিহাসিকতা থাকতে বাধ্য নয়?

ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি কি উপন্যাসের শ্রেণী বা গোত্রের চিহ্ন? এই শ্রেণীবিভাগ কি সাহিত্যগত বিভাগ? নামটি যখন বহুব্যবহৃত, তখন নিশ্চয়ই তার কোনো কার্যকারিতা আছে। সেই কার্যকারিতাকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু তা কি সাহিত্যিক কার্যকারিতা? 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি কি উপন্যাস-বিশেষের শিল্পরূপ বা রস-বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে' তোলে?

'ঐতিহাসিক' কথাটার মধ্যে কি মোটেই কোনো বিশিষ্ট ইস্থেটিক তাৎপর্য নেই? কেবল বিষয়-বস্তু, ঘটনা, পাত্রপাত্রীর গুণেই ঐতিহাসিক? কত উপন্যাসে কত রকম বিষয়, কত রকম গল্প থাকে। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'এর নায়ক কবিরাজ, বিষয়ের অনেকটা জুড়ে কবিরাজী। মনোজ বসুর 'নিশি-কুটুম্ব'র নায়ক চোর, বিষয় চুরি। কই, 'আরোগ্য-নিকেতন'কে তো বলি না কবিরাজী উপন্যাস? 'নিশি-কুটুম্ব'কে তো বলি না চোরাই উপন্যাস?

আরো কথা আছে। উপন্যাসের গল্পের মাঝখানে হঠাৎ যখন ইতিহাসকে সাক্ষী মানা হয়, তখন

সেটা কেমন ইতিহাস? সে কি ইতিহাস, না ইতিহাসের ভগ্নাংশ? এমন প্রসঙ্গ-বিচ্যুত ভগ্নাংশ, এমন সাক্ষ্যপ্রমাণহীন ভগ্নাংশ, এমন পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভগ্নাংশ, যে তাকে ইতিহাস বলতে আপত্তি হওয়া আশ্চর্য নয়। ঔপন্যাসিক কি ইতিহাস বলতে সেই জিনিসকেই বোঝেন, ঐতিহাসিকেরা নিজেরা যাকে ইতিহাস বলতে অকুণ্ঠিতচিত্তে সম্মত হবেন? কিংবা, আরো একটু গোড়ায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, ঐতিহাসিকেরাই কি ইতিহাস বলতে সকলে ঠিক ঠিক একই জিনিসকে বুঝে থাকেন? কার্লাইল যাকে ইতিহাস বলবেন, ঔপন্যাসিক টলস্টয় তাকে নিশ্চয়ই ইতিহাস বলবেন না, কিন্তু এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-ই কি তাকে ইতিহাস বলতে রাজি হবেন? টয়েন্‌বী যাকে ইতিহাস বলে মনে করেন, পিটার গেইল্‌ বা ট্রেভর-রোপার তাকে ইতিহাস বলতে সম্মত হবেন কি?

সম্মত হবেন না তা আমরা জানি। সুতরাং গোড়াতেই গোলমাল। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস কী' সে প্রশ্নের আগেই তাহলে 'ইতিহাস কী' এই প্রশ্নটাই এখন জরুরি হয়ে উঠছে।

প্রথমেই খটকা লাগে—উপন্যাসের মায়া-জগতে ইতিহাসের মতো কঠিন বাস্তব প্রবেশ করবে কোন পথ দিয়ে? এই দুই ভিন্ন জগতের মধ্যে যাতায়াতের সেতু কোথায়? এরিস্টটল বলেছিলেন, ইতিহাসের তথ্যগত সত্য হল বিশেষের সত্য। আর কাব্যাদির সত্য হল সম্ভাব্যতার সত্য—সাধারণ সত্য, দর্শন-জাতীয় সত্য। এরিস্টটলের মতে উপন্যাস-কাব্যাদির স্থান দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যবর্তী। ইতিহাস থেকে এদের জাত উঁচু। উঁচু হোক আর না হোক, জাত যে একেবারেই ইতিহাস তাতে সন্দেহ নেই। এত ভিন্ন যে তথ্যগত সত্যকেই যদি সত্য বলি, তাহলে একে যে কী বলব সে এক সমস্যা। অনেকেই একে সত্য নাম দিতে কুণ্ঠিত হবেন। এখন প্রশ্ন এই, যারা এতই ভিন্ন, তারা মিলবে কী উপায়ে? ইতিহাসের সেটা কী বস্তু, ঔপন্যাসিক যাকে নিতে পারেন? নিতে পারেন মাত্র পাঠক হিসেবে নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবে, আর্টিস্ট হিসেবে? অ-লৌকিকের স্রষ্টা হিসেবে? ঘটনার সুপ্রত্যক্ষ সত্যকে পরিত্যাগ করে, সম্ভাব্যতার স্বপ্নলোকে যিনি প্রতীকী সত্যের অনুসরণ করে' ফেরেন, ইতিহাস তাকে কীসের টানে টানবে? 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'—এই কথা বলে' যিনি অ-ঘটনের মায়া-জগতে পথে-বিপথে ঘুরে ফেরেন, ইতিহাসের কাছে তিনি কী পেতে পারেন?

ঘটে যা তা সব সত্য—ইতিহাস এই কথাই বলে। যা ঘটেছে তাই হল ইতিহাস। কথাটার ব্যুৎপত্তিও সেই অর্থেরই ইঙ্গিত করে, লোক-প্রসিদ্ধিও সেই কথাই বলে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ইতিহাসকে বলা হয়েছে—বেদ। এ কথার গুরুত্ব কম নয়। বেদই তো সব থেকে বড় জ্ঞান। বুঝতে পারি, ইতিহাস জিনিসটা যে জ্ঞানাত্মক, এটা সর্ববাদিসম্মত। ঐতিহাসিক হলেন জ্ঞান-তপস্বী। ইতিহাস-পাঠক সত্যসন্ধানী।

কিন্তু উপন্যাস? যা ঘটে নি, যা বানানো গল্প, উপন্যাস হল তাই। যা ছিল না, যা নেই, উপন্যাস তাই। দেশে কালে কখনো কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই তার নাম উপন্যাস—মিথ্যা। উপন্যাস কথাটার এ অর্থ সুচিরপ্রসিদ্ধ। মিথ্যা, কিন্তু সুন্দর মিথ্যা।

নাটকাদির কাজ যে আনন্দ দেওয়া আর ইতিহাসের কাজ যে উপদেশ দেওয়া, সাংসারিক জ্ঞান

উৎপন্ন করা, এ কথা আমাদের দেশেও নতুন নয়। দশরূপকের রচয়িতা ধনঞ্জয় কথাটি বেশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন। বলেছেন, নাটকাদির কাছে জ্ঞান চেয়ো না। তিনি অবশ্য উপন্যাস জিনিসটা দেখে যান নি। দেখলে নিশ্চয়ই বলতেন, উপন্যাসের মতো আনন্দ-নিষ্যন্দী জিনিসের কাছে আর যাই চাও না কেন, ইতিহাসের কাছে যা চাইবার তা চেয়ো না। যদি জ্ঞানই চাও তো উপন্যাসের কাছে যেয়ো না, ইতিহাসের কাছে যাও।

ঔপন্যাসিক মোটেই জ্ঞান-তপস্বী নন। তাঁর তপস্যা একেবারেই অন্যরকম। সত্য বলতে সাধারণত যা বুঝি, বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদির কাছে আমরা যা চাই এবং যা পাই, উপন্যাসের কাছে আমরা তা চাইও না, পাইও না। উপন্যাসের আসল লক্ষ্য আনন্দ। এমনও বলতে পারি যে, মিথ্যার আনন্দ।

ইতিহাস আর উপন্যাসের মিলন যেন সত্য আর মিথ্যার মিলন। এই রকম সত্য আর মিথ্যার মিলনেরই আর-এক নাম— অর্ধসত্য। অর্ধসত্য জিনিসটা কাজে যা-ই হোক না কেন, কথাটা কিন্তু শুনতে মোটেই ভাল নয়। তার কারণ, অর্ধসত্য কোনো কোনো সময় পরিপূর্ণ মিথ্যার থেকেও মারাত্মক। আমরা সব সময়ই তাকে বিপজ্জনক মনে করি।

কিন্তু সব সময় সব অর্ধসত্যই যে সমান বিপজ্জনক তা নয়। যখন আমরা সত্যকে খুঁজি এবং ভুল করে' অর্ধসত্যকে পূর্ণসত্য মনে করি, তখন অর্ধসত্য বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন সত্যকে খুঁজি না, কিংবা যখন মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই জানি তখন তার মধ্যে কোনো বিপদ নেই। যে-মিথ্যা সত্যের ভান নয়, ছলনা নয়, যার কাজ আনন্দ দেওয়া, সে কতটুকু সত্য আর কতখানি বা মিথ্যা সে জিজ্ঞাসাই অবান্তর। যে-অর্ধসত্য সত্যকে দেবার ভান করে তার সত্যতা অবশ্যই যাচাইযোগ্য। ইতিহাস আর উপন্যাসের মিলনে যে-অর্ধসত্য, তার কাছে আমরা কী চাই ?

ইতিহাসের কাছে আমরা প্রথমত ও প্রধানত সত্যকে চাই। উপন্যাসের কাছে আনন্দকে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাছে ? সত্য, না আনন্দ ? যদি সত্যকে চাই, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাস ছলনা। যদি আনন্দকে চাই ? তাহলে হয়তো তার ঐতিহাসিকতটাই একটা মায়া।

যদি বলি, ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাছে আমরা ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যাসের আনন্দ দুই-ই চাই ? এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ সত্যিই হয়তো সত্য এবং আনন্দ দুই-ই আমরা চাই। এমন ভাবে চাই যে, একের থেকে অপরকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু সে কি শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেলাতেই ? শুধু কি উপন্যাসেই, না সমস্ত সাহিত্যেই ? সেই যে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা বাঁশরি বলেছিল, "সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য," তার এ কথাটাকে যদি যথার্থ বলে' মানি, তাহলে একা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা মানব কেন, অন্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও মানব— সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই মানব।

বরং উল্টো একটা প্রশ্ন করব। ইতিহাসের সত্য রসাত্মক হওয়ার পরেও কি ঠিক ঠিক ইতিহাসের সত্যই থাকে ? যে সত্য কল্পনার সঙ্গে রফা করে— শুধু রফা নয়, যে সত্য কল্পনার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় সে আবার কেমন ইতিহাসের সত্য ?

ইতিহাস কী, এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অপেক্ষা করে আছে। প্রথমেই বলে রাখি, এখানে আমরা ইতিহাসের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করব না। আমরা শুধু প্রয়োগটাই দেখতে চাই। ইতিহাস কথাটি কোথায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কোন্ প্রয়োগের প্রসঙ্গ-ক্ষেত্র কী, এখানে এইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

কথাটির দুটো স্বতন্ত্র প্রয়োগকে প্রথমেই আলাদা করে নেওয়া দরকার। ইতিহাস কথাটার একটা অর্থ হল অতীত, বা অতীতের ঘটনা। অথবা বলি, অতীতের ঘটনাপ্রবাহ। যা কিছু ঘটে গিয়েছে তার মহাসমগ্রতা।

ইতিহাসের অপর অর্থ হল অতীতের জ্ঞান, অতীত-ঘটনার জ্ঞান— অতীতের স্মৃতি, অতীতের চিন্তা। অতীতের সম্পর্কে প্রশ্ন, অনুসন্ধান এবং সংবাদ সংগ্রহ। সাক্ষ্য-সংগ্রহ, প্রমাণ-প্রয়োগ, তথ্য-বিচার। নতুন তথ্যকে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত করা। অতীতের পুনর্গঠন। অতীতের পুনর্গঠিত চিত্রকে পুস্তকাকারে পরিবেশন। এই দ্বিতীয় অর্থে ইতিহাস হল— ইতিহাস-চিন্তা, ইতিবৃত্তকথা, ইতিহাসের বই। অর্থাৎ ইতিহাস-শাস্ত্র।

এই দুটো অর্থের কোনোটাই অসঙ্গত নয়। কিন্তু দুটোর প্রয়োগ-ক্ষেত্র যে পৃথক্ সে কথা স্মরণ রাখতে হবে। বস্তু এবং সেই বস্তুর সম্পর্কে ধারণা যেমন আলাদা, ঘটনা এবং সেই ঘটনার বর্ণনা যেমন আলাদা, প্রথম অর্থের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় অর্থের ইতিহাস তেমনি আলাদা।

প্রথম অর্থে যে ইতিহাস, সে যেন মহাকালেরই বিরাট প্রবাহ। আমাদের জীবন আমাদের মরণ সবই এই মহাপ্রবাহের অন্তর্গত : আমরা সকলেই ইতিহাস-সন্ততি। এ ইতিহাস নির্বিকার, অমোঘ এবং অনাদ্যন্ত। এ যেন সত্যেরই গতিশীল রূপ— রিয়ালিটিরই চলৎ-মূর্তি। একে সম্বোধন করেই কবি বলেছেন, 'হে বিরাট নদী'। বলেছেন, 'অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি'।

এই অর্থে যে ইতিহাস, তার থেকে ইতিহাসবিদ্যা বা ইতিহাস-শাস্ত্র অনেক দূরের বস্তু। শুধু দূরের নয়, আলাদা জাতের। প্রথমটা যদি হয় জ্যান্ত আগুন, তাহলে দ্বিতীয়টি হল শীতল ভস্ম-সংবাদ।

এই দ্বিতীয় অর্থের ইতিহাসই— অর্থাৎ ইতিহাসবিদ্যাই আমাদের প্রতিদিনের আলোচনার সচরাচর-ব্যবহৃত ইতিহাস কথাটির সাধারণ অর্থ। এ ইতিহাস আমাদের জ্ঞান-জগতের অঙ্গ। এ ইতিহাস প্রতিনিয়তই রচিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবর্ধিত হচ্ছে। এই অর্থকে যখন গ্রহণ করি, তখন আগের অর্থের ইতিহাস আর মোটেই যথার্থ ইতিহাস নয়, তা হল ইতিহাসের কাঁচা মাল। বলতে পারি, কাঁচা মালের আকর।

এই যে দ্বিতীয় অর্থের ইতিহাস, যার সঙ্গে আমরা মাঝে মাঝে উপন্যাসকে মিলতে দেখি, তা আর কিছুই নয়, তা হল সাক্ষ্যপ্রমাণসংবলিত নির্বাচিত তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ : সুগ্রথিত এবং সুগঠিত অতীত-সংবাদ। পরীক্ষিত এবং পরীক্ষণ-যোগ্য বাক্য দিয়ে, সুস্পষ্ট এবং বাচ্যার্থ-সর্বস্ব বাক্য দিয়ে রচিত নিরাবেগ, নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ। সেই যে কবি যাকে বলেছেন বিরাট নদী, রিয়ালিটির মহাপ্রবাহ, সেই মহাপ্রবাহের এক বিন্দু জলকণাও এর মধ্যে নেই। জলের আস্বাদও নেই। এ কেবল নির্বাচিত জলকণাসমূহ সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণসংবলিত বিশুষ্ক বিবৃতি।

ইতিহাসে মিলবে জলের তথ্য। সাহিত্যে উপন্যাসে জলের আস্বাদ। কথাটা হচ্ছে এই যে, ইতিহাস আর সাহিত্য দু'য়েরই উৎস এক জায়গায়। তার নাম রিয়ালিটি। ইচ্ছা করলে তাকে আমরা জীবনও বলতে পারি। ইতিহাসে তার সংবাদ, উপন্যাসে তার আস্বাদ। এর একটির লক্ষ্য জ্ঞান, অপরটির লক্ষ্য রস। ইতিহাসে আর উপন্যাসে যে যোগসূত্র সে হল জীবন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের এর থেকে বাড়তি আর কোনো যোগসূত্র আছে কি? তা নেই।

ইতিহাস কি কেবলই তথ্য? পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত— কিন্তু একান্তভাবেই অর্থহীন তথ্য? এমন তথ্য যার সম্বন্ধ-সমবায় নেই? যার কোনো পূর্বও নেই, পরও নেই? যা স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ? এমন তথ্য যা সম্পূর্ণভাবে গুরুলঘুভেদাভেদবর্জিত? এমন তথ্য যাকে মানবিক মূল্যবোধ আদৌ স্পর্শ করতে পারে না?

এ কথা অনেকেই স্বীকার করবেন না। বিশেষত যাঁরা ইতিহাস-ব্যাপারে একটু অনাধুনিক। তাঁরা বলবেন, ইতিহাসে তথ্য আছে বটে, কিন্তু তথ্যটাই তার সব নয়। ইতিহাস হল তথ্য এবং তার ব্যাখ্যা। কেউ কেউ হয়তো আর-একটু এগিয়ে গিয়ে বলবেন, তথ্যটা কাঁচা মাল, ব্যাখ্যাটাই আসল ইতিহাস।

কিন্তু ব্যাখ্যাকে একবার ইতিহাসে ঢুকতে দিলে সেই সূত্রে একাধিক গোলমালের পথ করে দেওয়া হয়। প্রথমত, ব্যাখ্যা জিনিসটা, অন্তত কিছু পরিমাণে, ব্যক্তিগত বিচার-সাপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত বিচার ব্যক্তিগত তাৎপর্যবোধ-সাপেক্ষ— অর্থাৎ মূল্যবোধ-সাপেক্ষ। ব্যাখ্যাকে ঢুকতে দেওয়া মানেই ফ্যাক্‌টের রাজ্যে ভ্যালু-কে ঢুকতে দেওয়া।

তা ছাড়া, ব্যাখ্যাকে একবার ঢুকতে দিলে থামানো কঠিন। কোন্‌খানে তার সীমানা? কোনো ব্যাখ্যাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ব্যাখ্যার অর্থই যেখানে সংযোগ, এবং সংযোগের যেখানে শেষ নেই, সেখানে ব্যাখ্যাকে স্বীকার করে নেবার অর্থই হল তথ্যের বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার না করা, তার সীমারেখাগুলিকে মুছে তাকে বৃহৎ একটা অখণ্ড ঐক্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এর স্বাভাবিক পরিণতি ইতিহাসকে মহা-ইতিহাস রূপে দেখা। বিশ্বইতিহাসতত্ত্বই তখন ইতিহাসের স্থান অধিকার করে বসে।

নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবীকে একটি সুবৃহৎ অর্থের সূত্রে গেঁথে নেওয়া, এর জন্যে যেরকম সরল বিশ্বাস এবং দুঃসাহসী কল্পনার প্রয়োজন হয়, আধুনিক কালে তা সহজলভ্য নয়। আধুনিক জীবনও বোধ করি এর অনুকূল নয়। বেশির ভাগ আধুনিক ঐতিহাসিক একে ঐতিহাসিকের কাজ বলে স্বীকার করবেন না। 'তাঁরা বলবেন, ইতিহাস তত্ত্বকথাও নয়, কল্পনার ঘোড়দৌড়ও নয়। ইতিহাসে ব্যাখ্যা যদি আদৌ স্থান পায় তো সে ব্যাখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বাস্তব-কার্যকারণের ব্যাখ্যা। ইতিহাসের অর্থ, ইতিহাসের অভিপ্রায়, তার গতির ছন্দ— এ সব আলোচনার স্থান ইতিহাসবিদ্যার অঙ্গন নয়। এর যথাযোগ্য স্থান হল ইতিহাসের দর্শন।' তাও আধুনিক অর্থে নয়। পুরানো অর্থে।

ইতিহাস-দর্শন কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। ইতিহাস কথাটির যেমন দুটো অর্থ, ইতিহাসের দর্শন বা ইতিহাস-দর্শন কথাটারও তাই। একটা প্রয়োগ পুরানো। ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহের

সামগ্রিক ভাবে কোনো অর্থ আছে কি না, তার গতিতে কোনো ছন্দ বা প্যাটার্ন আছে কি না, তার সামনে এমন কোনো লক্ষ্য আছে কি না যার অভিমুখে তার অগ্রগতি, অথবা তার পিছনে এমন কোনো ঠেলা আছে কি না যাকে ইতিহাসের কারয়িত্রী শক্তি বলে গণ্য করা যায়, এই সব অনুসন্ধানই এতাবৎ কাল ইতিহাসের দর্শন বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। ভিকো এবং কাণ্ট, হার্ডার এবং হেগেল, যাঁরাই সেকালে ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর এই একই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ইতিহাস-দর্শন কথাটার দ্বিতীয় অর্থ অনেক আধুনিক। ইতিহাস যদি হয় অতীত-সংবাদের অনুসন্ধান, অতীত সম্পর্কিত তথ্যের পরীক্ষণ ও প্রমাণ, অতীতের পুনর্গঠন, তাহলে ইতিহাসের দর্শন হল ইতিহাসে-ব্যবহৃত এই প্রতিক্রিয়াগুলির—এই অনুসন্ধান প্রমাণ পুনর্গঠন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা বিচার। এক কথায়, ইতিহাসের পদ্ধতি বা কর্ম-প্রণালীর বিশ্লেষণ ও বিচার। বিজ্ঞানের দর্শন যেমন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক নয়, বিজ্ঞানের সন্ধান-পদ্ধতির অনুসন্ধান—সন্ধান-পদ্ধতির বিচার, এও ঠিক তেমনি। এই ইতিহাস-দর্শন—যাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শন—এর কাজ ইতিহাসের সিদ্ধান্তের আলোচনা নয়, এর কাজ ইতিহাসবিদ্যার সন্ধান-পদ্ধতির—মেথডলজির সম্পর্কে অনুসন্ধান।

এ পর্যন্ত আমরা দু রকম ইতিহাসের সাক্ষাৎ পেলাম, অতীত আর অতীত-বিদ্যা। তেমনি দু রকম ইতিহাস-দর্শনেরও সাক্ষাৎ পেলাম, অতীতের অর্থ-নিরূপণ—যাকে বলা হয়েছে স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শন, আর অতীতবিদ্যার পদ্ধতি-সমীক্ষণ অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শন। এই বারে আমরা আবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে পারি। এই দুই ইতিহাস আর এই দুই ইতিহাস-দর্শন, এর কোন্‌টার সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস কী ভাবে যুক্ত।

উপন্যাস নিজেই তো ঘটনা-প্রবাহ নয়, নিজেই জীবন নয়, উপন্যাস হল জীবনের কল্পনাত্মক রূপায়ণ। তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাস হল অতীত ঘটনা-প্রবাহের—অতীত জীবনের কল্পনাত্মক রূপায়ণ। ঔপন্যাসিক যখন জীবনকে রূপায়িত করেন কল্পনার সাহায্যে, তখন তাঁর আদর্শকে তিনি কোথায় পান? বলা বাহুল্য, আপন অভিজ্ঞতায়, আপন উপলব্ধিতে, আপন জীবনদৃষ্টিতে। এক কথায় বলতে পারি, জীবনে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে? জীবনে, না ইতিহাসের পুঁথিপত্রে?

সাধারণত আমরা ধরে নিই যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতার অংশটুকুকে লেখক নিজের স্মৃতি বা নিজের অভিজ্ঞতাতে পান না, পান ইতিহাসে। অর্থাৎ ইতিহাসের গ্রন্থে। এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে খাটি ঐতিহাসিক সত্য যদি কিছু থাকে, তাহলে সেইটুকুর জন্যে লেখকের সাক্ষাৎ উত্তমর্ণ জীবন নয়, ইতিহাসের বই।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে খানিকটা আছে ঐতিহাসিক সত্য আর খানিকটা আছে কল্পনা। সাধারণ উপন্যাসে সবটাই কল্পনা—সবটাই লেখকের সাক্ষাৎ জীবন-উপলব্ধি। কিন্তু এ কথা যদি পুরোপুরি ঠিক হয়, তাহলে মানতেই হবে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থগত সত্যের লোভে জীবনগত সত্যের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে। এ কথা কতদূর ঠিক সেইটেই আসল প্রশ্ন।

কারণ এমন খুবই হতে পারে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস কয়েকটা নাম আর তারিখ ছাড়া ইতিহাসের কাছ থেকে আর কিছুই নেয় না। অন্তত যাকে আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলে জানি—তথ্যগত সত্য,

তা মোটেই নেয় না, নেওয়ার ভান করে মাত্র। ইতিহাসের কাছ থেকে কিছু-একটা হয়তো নেয়, কিন্তু তা এমন বস্তু যা কল্পনার সঙ্গে বেমালুম মিলে যায়, যা নিজেই কল্পনাপুষ্ট। যা লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে যায়। হয়তো তার নাম অর্থ, হয়তো তার নাম ভ্যালু।

ইতিহাস যদি তা না দিতে পারে? প্রচলিত অর্থে যে ইতিহাস সে যদি না দিতে পারে, অন্য কোনো ইতিহাস দেয়। কোনো ইতিহাসই যদি না দেয়, তো আর কেউ দেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপন্যাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, অন্য কিছু।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রোমান্সের কথাও উঠতে পারে। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার দিক থেকে এদের আমরা মোটামুটি অভিন্ন অর্থেই গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আর-একটা জিনিস আছে যা অনেক দিক থেকে ঐতিহাসিক রোমান্সের ঠিক উল্টো। তার কথাটা এখানে বলা দরকার। সে জিনিসটা হল, যাকে বলা হয়—'রোমান্টিক ইতিহাস'। ঐতিহাসিক উপন্যাস আসলে উপন্যাস, কিন্তু তার একটা বাড়্‌তি দাবিও আছে যে সে ইতিহাস-সমর্থিত। রোমান্টিক ইতিহাসের দাবি যে সে ইতিহাস। কিন্তু আসলে সে রোমান্স-স্বভাবসম্পন্ন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কী নয় তা ভালো করে বুঝতে হলে এই রোমান্স-স্বভাবী কিন্তু ইতিহাস-নামে-পরিচিত বস্তুটির সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া দরকার।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক কখনো কখনো সুলিখিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে—বিশেষ করে সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ইতিহাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ এবং আক্রোশ প্রকাশ করে থাকেন। এটা অবশ্য অক্ষমতাসঞ্জাত। ইতিহাসরচনায় সাহিত্যগুণের সঞ্চার দোষের কথা নয়, গুণেরই কথা। কিছু পরিমাণে এই গুণ ইতিহাস-রচনায় অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সীমা লঙ্ঘন করলে তা দোষ। বিশেষ করে সেই সীমা-লঙ্ঘন যদি কোনো গূঢ় প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘটে থাকে।

এই সীমার কথা স্মরণ করেই 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা আর কাল্পনিকতার মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ নির্দেশ করেছিলেন। কাল্পনিকতার পিছনে অনেক সময় গোপন কামনার প্রশ্রয় ক্রিয়া করে। রোমান্সধর্মী ইতিহাসে কাল্পনিকতার আকর্ষণ প্রবল।

ইতিহাসরচনায় প্রশংসনীয় কল্পনা-কুশলতা এবং নিন্দনীয় কাল্পনিকতা এ দুই বস্তু চরিত্রধর্মে প্রায় বিপরীত হলেও কোনো কোনো সময় পরস্পরের খুব কাছাকাছিই বিরাজ করে। গত শতাব্দীতে রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের রচনায় এই দুই বস্তুই—এই গুণ এবং এই দোষ দুই-ই—প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যাবে। অনেক সময় একই লেখকের রচনার মধ্যেও। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে আমরা কার্লাইলের কথা উল্লেখ করতে পারি। কার্লাইলের সাহিত্যগুণ সর্বজন-প্রশংসিত। তাঁর রচনায় আশ্চর্য কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। কিন্তু কাল্পনিকতার প্রশ্রয়ও সেখানে সম্পূর্ণ অলক্ষ্য নয়। মেকলে, যিনি বর্ণনাশক্তির গুণে 'ইতিহাসের রুবেন্স' আখ্যা অর্জন করেছেন, তাঁর সম্পর্কেও যে এ অভিযোগ একেবারে খাটে না তা নয়।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের সাফল্য অসামান্য। অষ্টাদশ শতকের তথ্য-দীন এবং কল্পনা-রিক্ত ইতিহাস-চেষ্টার পরে, এঁদের নানা দিক থেকে সার্থক ইতিহাস-

সাধনার দিকে আমাদের আরো বেশি করে দৃষ্টি পড়ে। আমাদের বর্তমান ইতিহাসমুখিতা যে অনেকখানি পরিমাণে রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের দান, এ কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই রোমান্টিকতার মধ্যেই যে একটা দুর্বলতার বীজ আছে তাও স্বীকার করে' নিতে হবে। তাছাড়া, অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসসাধনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার যে-প্রবণতা রোমান্টিসিস্ট ঐতিহাসিকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, তার মধ্যেও গুপ্ত ইচ্ছার তাড়না আছে। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র থেকে এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের পর্বকে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভল্‌তেয়ার, হিউম্‌ বা গিবনের যুগকে 'ইতিহাসবিমুখ যুগ' বলে আখ্যা দেওয়াটা যে নিরপেক্ষ মনের নির্দোষ সিদ্ধান্ত নয়, এ কথা মানতেই হবে।

আসলে, দুই যুগের ইতিহাস-চেতনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা লক্ষ করবার মতো। এই পার্থক্যের মধ্যেই রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের শক্তি, আবার এইখানেই তাঁদের দুর্বলতা। সকলের নয়, সব সময়ও নয়। কিন্তু দুর্বলতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এবং এইখানেই—এই দুর্বলতার মধ্যেই রোমান্সধর্মী ইতিহাসের উদ্‌ভব।

অষ্টাদশ শতকের এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের সমস্ত জ্ঞানচর্চার মধ্যেই একটা ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের জন্যেই ইতিহাস, ঠিক এই জাতীয় অনাসক্ত জিজ্ঞাসা সেকালের ইতিহাস-সাধকদের মনে স্থান পায় নি। সেদিনের জীবন-সাধকেরা ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ততটা অতীতের আকর্ষণে নয়, যতটা তাঁদের বর্তমানের প্রয়োজনে—বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশের অভিপ্রায়ে।[1]

অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস-সাধনায় যেমন শুষ্ক ব্যবহারিক বুদ্ধির আধিপত্য, রোমান্টিক যুগে তেমনি আর্দ্র আবেগের। অষ্টাদশ শতকের মনের কথা যেমন বর্তমানের জন্যে অতীত, উনবিংশ শতকের হল অতীতের জন্যেই অতীত—বর্তমানকে অস্বীকার করবার জন্যেই অতীত। অষ্টাদশ শতকের বিবেচনায় ইতিহাস হল বিশ্ব-ইতিহাস, ইতিহাসচর্চা হল সর্বমানবের কল্যাণ-সাধনা। আর উনবিংশ শতকের? সচেতন চেষ্টা আর অবচেতন উৎকণ্ঠায় তা এত জটিল যে এখানে তার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটি ভাবে এইটুকু আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের ইতিহাস-সাধনা সে যুগের বুদ্ধিবাদ ও মানবিকতার সাধনারই অঙ্গ—রেনেশাঁসের উত্তরাধিকার। আর রোমান্টিক ইতিহাস-সাধনা অনেক দিক থেকে তার পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি। বলতে পারি, ন্যাশানালিজম্‌-ভাবনার অঙ্গ।

উনবিংশ শতকের ইতিহাসচর্চার শক্তির দিকটাকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করব। আগের যুগের ইতিহাস-চিন্তার কল্পনা-বিমুখতা ও সংকীর্ণ বুদ্ধিবাদের[2] বিরুদ্ধে, তার আত্মতৃপ্ত অতি-নিশ্চয়তা ও যান্ত্রিকতার ভাবের বিরুদ্ধে রোমান্টিসিস্ট বিদ্রোহ যে একটি বাঞ্ছিত মুক্তির স্বাদ এনেছে তাতে সন্দেহ নেই।

---

১. মন্তব্যটি সাধারণ ভাবেই গ্রহণীয়। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও নজরে পড়বে। অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথম দিকেই ভিকো ইতিহাস চর্চায় এই রকম ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে—এই রেনেশাঁসী উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।

২. ১৮শ শতকের ঐতিহাসিকদের সকলেই যে সমপরিমাণে বুদ্ধিবাদী ছিলেন এমন বলা চলে না। এখানে মন্তেস্‌কিউ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি স্পষ্টতই বুদ্ধি সম্পর্কে সন্দিহান। হিউম্‌-ও বুদ্ধিবাদী নন। তাঁর আস্থা Common sense-এ।

অবহেলিত মধ্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রোমাণ্টিক ঐতিহাসিকেরা এই মুক্তিরই আর-একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। এইখানেই শেষ নয়। ইতিহাস-অনুসন্ধানে ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করা, লোকসংস্কৃতির মূল্য অনুধাবন করা, জাতীয় জীবনপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রতি মনোযোগী হওয়া, এর প্রত্যেকটিই ইতিহাসচিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

রোমাণ্টিক ইতিহাস-সাধনার এইসব মূল্যবান্ দানের কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করব। সেই সঙ্গে এই সত্যটাও স্বীকার করব যে, অধিকাংশ সময়ই এর প্রত্যেকটির মধ্যেই একটু বাড়াবাড়ির ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ঝোঁকটা অর্থপূর্ণ। একটু সুযোগ পেলেই তার চেহারা পালটে যায়। তখন বাঁধাবুলি মুখর হয়ে ওঠে, ফাঁকা কথার ধূম্রজাল ঘন হয়, ক্ষেত্র-বিশেষে মূঢ়তা প্রশ্রয় পেয়ে obscurantism-এর পথ মসৃণ করে দেয়। পরিণামের এই চেহারা দেখে সহজেই সন্দেহ হয় যে, রোমাণ্টিক ইতিহাস-চিন্তার বুকের মধ্যেই এমন একটা অন্ধকার শক্তি লুকানো আছে যার গতি রসাতলের দিকে।

৬

র‍্যাঙ্কে থেকে মম্‌সেন্, মেকলে থেকে অ্যাক্টন্, উনবিংশ শতকের সকল ঐতিহাসিককেই সমানভাবে অভিযুক্ত করা বা সকলকেই একই চিহ্নে সমভাবে চিহ্নিত করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য বিশেষভাবে সেই দুর্বলতাগুলি যা রোমান্স-ধর্মী ইতিহাসের বিশিষ্ট লক্ষণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিহাসচর্চা যেখানে জাতির গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনার ছদ্ম পরিতৃপ্তির অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতকীয় ইতিহাস-চিন্তায় প্রধান বিশেষত্বগুলির দিকে যদি স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তার মধ্যেই আমরা এই ইচ্ছাপূরণ-তন্ত্রের কলা-কৌশলের কিছু আভাস পেতে পারব। এগুলো যে সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে উপস্থিত তা নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতকের মেজাজের সঙ্গে এদের যোগ আছে। পূর্ণ তালিকার এখানে আবশ্যক নেই, নমুনা হিসেবে কয়েকটির উল্লেখ করছি মাত্র।

যেমন, প্রথমত, কল্পনাধিক্যের ফলে অতিরঞ্জনপ্রবণতা। দ্বিতীয়ত, ঘটনার চাকচিক্যের প্রতি, বর্ণাঢ্যতার প্রতি টানের ফলে বহিরঙ্গে মনোযোগ এবং বিরল-বর্ণ সত্যের প্রতি অবহেলা। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অপর এক লক্ষণ হল—নাটকীয়তার প্রতি আকর্ষণ, ইতিহাসকে নাট্যপরম্পরারূপে দেখার চেষ্টা। এর স্বাভাবিক ফল অগভীরতা। ব্যক্তিগত নাটকের উপর অতিরিক্ত জোর দিলে সমষ্টিগত নাটক—সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষের নাটক ঢাকা পড়ে যায়; বাইরের নাটক রঙীন হয়ে ফুটে ওঠে, ভিতরের নাটক হারিয়ে যায়। এইভাবে উপরের স্তরের হালকা তথ্যগত নাটকীয়তায় মুগ্ধ হয়ে রোমাণ্টিক ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় অর্থের নাটকীয়তাকে— গভীরতর নাটকীয়তাকে অবহেলা করেছেন।[৩]

৩. এই অগভীরতার প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে মেকলের কথা তুলতে পারি। উনবিংশ শতকের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক -বিষয়ক গ্রন্থে জি. পি. গুচ্ মেকলের রচনাশক্তির প্রভূত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শেষকথা যা বলেছেন তা মারাত্মক:

আর-একটা বড় বিশেষত্ব হল বিশিষ্টের প্রতি পক্ষপাত, সাধারণের অবহেলা। এই যে অসামান্যের প্রতি আকর্ষণ, ব্যতিক্রমের প্রতি পক্ষপাতে নিয়মের প্রতি অবহেলা, এর সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বিশেষত্বগুলির যোগ খুব সুদূর নয়। এই প্রবণতা থেকেই ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অতিরিক্ত গুরুত্ব পায়, ইতিহাস হয়ে ওঠে অসামান্যের শক্তিলীলা। এই অতিমানব বা মহানায়ক -ভিত্তিক ইতিহাসচিন্তাই ইতিহাসকে জীবনী-পরম্পরায় পরিণত করে এবং ইতিহাস শেষ পর্যন্ত জীবনী-সাহিত্যের রূপ পায়।

জাতি-বিশেষের স্বকীয়তার প্রতি— জাতীয় বিশেষত্বের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, তাকে চরম ও চূড়ান্ত জ্ঞান করা, এও উনবিংশ শতকীয় ইতিহাসচিন্তার অন্যতম প্রধান একটি বিশিষ্টতা। এ হল, 'জাতীয় আত্মা'র অনন্যতা ও নিত্যতায় বিশ্বাস এবং ইতিহাসকে সেই 'জাতীয় আত্মা'র রহস্যময় লীলারূপে গণ্য করা। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত— মনগড়া জাতিতত্ত্বে আস্থা, জাতিবিশেষের চিরন্তন শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস। এক কথায়, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।[৪]

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, এই বিশেষত্বগুলি, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এরা যতই নিরীহ-দর্শন হোক-না কেন, সীমা ছাড়ালে এর প্রত্যেকটি কোনো-না-কোনো রকম অতৃপ্ত ক্ষুধার অভিব্যক্তি, তা সে জাতিগতই হোক, গোষ্ঠীগতই হোক আর ব্যক্তিগতই হোক। স্বল্পতম প্রশ্রয়েই যে এরা সীমা ছাড়ায় তারও নিদর্শন আমরা কম দেখি নি। অতৃপ্ত কামনার ছদ্মবেশী গুপ্তচরেরা সুযোগ পেলেই যেমন করে স্বাভাবিক বাস্তববোধকে ঘুলিয়ে দেয়, অতৃপ্ত কামনার ছদ্মবেশী এই ইতিহাসও ঠিক তাই করে। এ'কে ইতিহাস-জাতীয় বস্তু না বলে 'মিথ্'-জাতীয় বস্তু বললে খুব ভুল হয় না।

এই যে রোমান্টিক বা রোমান্সধর্মী ইতিহাস, এর সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আপাতদৃষ্টিতে একটা বড় মিল নজরে পড়বে। দুয়ের মধ্যেই ঘটনা আর কল্পনার মাখামাখি, দুয়েতেই সত্য আর মিথ্যার মিশ্রণ। কিন্তু মৌলিক তফাতটাও লক্ষ করবার মতো। ঐতিহাসিক উপন্যাসে মিথ্যা যদি থেকে থাকে তো ছলনা করবার জন্যে নেই, সত্যের ভান করবার জন্যে নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে মিথ্যা আছে, সে মিথ্যা সব উপন্যাসেই আছে। এ হল সেই মিথ্যা যা আর্টের। সেই মিথ্যা যা সত্যকে আবৃত করে না, প্রকাশই করে। রোমান্সধর্মী ইতিহাসে এরকম মুক্ত মিথ্যার লীলা নেই। সেখানে যে মিথ্যা তা সত্যকে আবৃত করে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য যদি বলি মুক্তি, তাহলে তার লক্ষ্য বলব, সম্মোহন— বন্ধন।

উভয়ের মধ্যে এই যে মৌলিক পার্থক্য, এ'কে যদি একবার আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে এ সিদ্ধান্তও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের তথ্যগত সত্যগুলি কিছুমাত্র তথ্যগত সত্যতার অহংকার পোষণ করে না এবং পাঠকের কাছে যে দাবি নিয়ে তারা উপস্থিত হয় তা মোটেই তথ্যগত সত্যতার দাবি নয়। তাদের দাবির জোর তথ্যতায় নয়, অন্যত্র।

এই একই সিদ্ধান্তকে ঈষৎ অন্যরকম ভাষায় এ-ভাবেও বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস

"He is better at description than at explanation. No historian of the front rank has···made less effort to fathom the depths on which the pageantry of events floats like shining foam."

৪. এদের সাক্ষাৎ, বীজাকারে, হয়তো আগেও পাওয়া যাবে, কিন্তু এদের প্রত্যেকটিরই পূর্ণ পরিণতি উনবিংশ শতকে।

ইতিহাসের কাছে থেকে আর যা-ই ধার করে আনুক না কেন, তথ্য ধার করে আনে না। বিশুদ্ধ তথ্যে— স্থান-কালের ফ্রেমে আটকানো সুনির্দিষ্ট এবং সু-সীমান্বিত তথ্যে তার প্রয়োজন নেই। তেমন কঠিন নিরেট অনমনীয় তথ্য সে হজমও করতে পারে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যদি সত্যিই উপন্যাস হতে হয়— যদি সত্যিই আর্ট হতে হয়, তাহলে তাকে সত্যের ভান, অন্তত তথ্যগত সত্যের ভান সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে। অথবা বলি, ভান সে শুধু সেইটুকুই করতে পারবে যা আসলে ভান নয়, যা আসলে খেলারই অঙ্গ। যার আর-এক নাম আর্টের মায়া।

একই সিদ্ধান্তের অপর-পিঠটাকেও এখানে বলে রাখা দরকার। ঐতিহাসিক উপন্যাস যখন 'ঐতিহাসিক সত্য'কে পরিবেশন করবার অভিপ্রায় পোষণ করে তখন সে আর উপন্যাস থাকে না— সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও থাকে না। তখন সে রোমান্সধর্মী ইতিহাসের সমগোত্রীয়। কেননা তখন উভয়েরই কাজ প্রায় অভিন্ন : তথ্যের মুখোশপরা মিথ্যার পরিবেশন। উভয়েরই ধর্ম তখন ছলনা। যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্মোহিত করে মাটিতেই টেনে রাখতে জানে, অথবা বলি, মাটির তলার দিকে টানে— খোলা আকাশের মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না— যা ইতিহাসও নয়, আর্টও নয়, তা সর্বৈব ব্যর্থ।

আমরা সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় পেতে চাই বলেই রোমান্সধর্মী ইতিহাসের পরিচয়টা আগেভাগে সেরে রাখলাম। ঐতিহাসিক উপন্যাস কী নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা জেনে রাখা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনে রাখতে হবে যে, ছদ্ম রোমান্সধর্মিতাই ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সব থেকে সহজে স্বধর্মভ্রষ্ট করে ফেলে।

৭

উপন্যাস যেমন মানুষের কথা বলে, ইতিহাসও তেমনি মানুষেরই কথা। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে মানুষের দুই রকম পরিচয়— দুই দিককার পরিচয়। ইতিহাসের মানুষ বহির্জগতের মানুষ, প্রকাশ্য-পরিচয়ের মানুষ, যাকে বলা যায় 'পাবলিক' মানুষ। ইতিহাসের মানুষ প্রমাণিত তথ্যের-মাপে মাপ-করা মানুষ। ইতিহাস মানুষের অন্তর্জীবনের সন্ধান রাখে না। সন্ধান রাখে শুধু সেইটুকুরই যা ক্রিয়ার মধ্যে বাইরে ব্যক্ত হয়েছে। তারও সবটুকু নয়। মাত্র সেইটুকু যার দলিলগত প্রমাণ আছে।

উপন্যাসের কাজ অনেকটা এর বিপরীত। ইতিহাস যা দেয়, তা উপন্যাস দেয় না, দিতে চায় না। ইতিহাস যা দিতে পারে না সেইটে দেওয়াই উপন্যাসের অভিপ্রায়। যে মানুষ অন্তরময়, ইতিহাসের দলিলে তার প্রত্যক্ষ পবিচয় মিলবে না। সে মানুষ নিকটে থেকেও দুর্গম। অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। উপন্যাস মানুষের সেই অন্তরময় রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। সে রূপের কোনো দলিল নেই। তা কেবল মাত্র উপলব্ধির দ্বারাই সমর্থিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও মানুষের সেই অন্তরময় রূপটিই উদ্‌ঘাটিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও রচয়িতার আসল জোর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোর, উপলব্ধির জোর, সমবেদনার জোর, কল্পনার জোর। দলিলের জোর নয়। যার মধ্যে অন্তর মিশিয়ে দেওয়া যায় না, সেই রকম বোবা বধির বিরূপ তথ্য সাহিত্য-রচয়িতার পক্ষে অবাঞ্ছিত ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐতিহাসিক

উপন্যাসের কাছে মাত্র ফ্যাক্ট্ হিসেবে ফ্যাক্টের কোনো দাম নেই। যখন দাম হয় তখন আর তা ফ্যাক্ট্ নয়। তখন তা উপলব্ধি। কল্পনার সঙ্গে তার নিবিড় সখ্য।

ইতিহাস যদি তথ্য-সাধনা হয়, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে তার মর্মগত কোনো যোগ নেই—থাকতে পারে না, এ কথা স্পষ্ট। উভয়ের অতি-সান্নিধ্যে উভয়েরই ক্ষতি। তথ্য-অনুরাগী ঐতিহাসিকদের কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাস যে প্রায় সব সময়ই একটু সন্দেহভাজন, এটা নিতান্ত অকারণ নয়। ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য-সাধনার পাশে ঐতিহাসিক উপন্যাস এমন একটা মনোহরণ বিকল্প খাড়া করে যা ঐতিহাসিকের পক্ষে রীতিমত ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্কটের কথা উল্লেখ করা যায়। মেকলে থেকে আরম্ভ করে অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্কটের উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির' অনেক প্রশংসা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্কট সম্পর্কে ঐতিহাসিকের বিরূপতা খুব প্রচ্ছন্ন নেই। ফ্রীম্যান সাবধান করে দিয়েছেন, যদি ক্রুশেড'কে জানতে চাও, স্কটের 'আইভ্যান্‌হো' পড়ো না। তথ্যেরও যে একটা নিজস্ব আনন্দ আছে, ইতিহাস-পাঠককে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন এই কারণেই ঐতিহাসিকের পক্ষে জরুরি হয়ে ওঠে। এই তাগিদেই স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির প্রতি কটাক্ষ করে র‍্যাঙ্কে-কে বলতে হয়েছিল যে, ইতিহাসের সত্য সব সময়ই "far more beautiful and far more interesting than romantic fiction"। কার্লাইলের উক্তিও এ প্রসঙ্গে সমান তাৎপর্যপূর্ণ: "Let any one bethink him how impressive the smallest historical *fact* may become as contrasted with the grandest *fictitious event*"।

কিন্তু ইতিহাসকে যে এই রকমই তথ্য-সর্বস্ব এবং তথ্য-অন্তপ্রাণ হতে হবে এমন কী বাধ্যবাধকতা আছে? ইতিহাস কি তথ্যের অতিরিক্ত কিছুতেই হতে পারে না? এমন যা মাত্র ফ্যাক্ট্ নয়, ফ্যাক্ট্ এবং ভ্যালু? এমন যা রোমান্সধর্মী ইচ্ছা-পূরণে অনিচ্ছুক, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে সখ্যে আপত্তি করে না?

প্রশ্নটা প্রত্যেক ইতিহাস-প্রেমিকেরই, কিন্তু বিশেষ ভাবে ইতিহাসতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর। ইতিহাস শাস্ত্রটা কোন্ জাতীয়? বিজ্ঞান, না আর্ট, না অন্য-কিছু? বিষয়টি ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শনের বহু-বিতর্কিত প্রসঙ্গসমূহের অন্যতম। ইতিহাসে কল্পনার স্থান কতটুকু? ঐতিহাসিক কল্পনা কোন্ জাতের কল্পনা? ইতিহাসের অনুসন্ধান-পদ্ধতি, প্রমাণরীতি—এসব কি স্বতন্ত্র, না পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের অনুসন্ধান-পদ্ধতি ও প্রমাণরীতির সমগোত্রের?

ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শনের এই সব দুরূহ বিতর্কের এইখানেই আমরা সমাধান করে ফেলব, এমন নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা যায় না। আপাতত তেমন কোনো নির্দিষ্ট সমাধানে পৌছনো আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকও নয়। আমাদের প্রয়োজন সমস্যাটাকে বোঝা এবং বিকল্প সমাধানগুলোর কোন্‌টা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় সম্পর্কে কী ইঙ্গিতে দেয় তা লক্ষ করা। এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মতগুলোকে পাশাপাশি রাখলেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

আসল প্রশ্নটা ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে। ইতিহাস কোন্ চরিত্রের শাস্ত্র? ছোটখাট পার্থক্যকে বাদ দিলে এক্ষেত্রে আমরা প্রধান দাবিদার হিসেবে সাক্ষাৎ পাচ্ছি তিনটি বিশিষ্ট মতবাদের। এর একটি

পজিটিভিজম্। আর একটিকে বলতে পারি আইডিয়ালিজম্। তৃতীয়টির কী নাম দেওয়া যায় জানি না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না, থাকলে সে সম্পর্ক কী —এই প্রশ্নে উক্ত তিন মতবাদীর এক-এক জনের উত্তর এক-এক রকমের। কিন্তু তার আগে এদের পরিচয়টা একটু জেনে রাখা দরকার।

প্রথমে পজিটিভিস্টদের কথা ধরা যাক। পজিটিভিস্টরা সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদ ও রহস্যবাদের বিরোধী, ষোলো আনা প্রত্যক্ষবাদী। আধুনিক পজিটিভিস্ট মতবাদে দু'দিক থেকে দুটো ধারা এসে একত্র মিশেছে। এক হল বিজ্ঞানপ্রীতির ধারা। দুই বলা যেতে পারে তথ্য-প্রেমের ধারা। বলা বাহুল্য পজিটিভিস্ট ঐতিহাসিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর কল্পনা-বিমুখ, সকলেই অল্পবিস্তর ব্যাখ্যা-কুণ্ঠিত।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কঁৎ নিজে— কিংবা ত্যান্, বাক্‌ল্ প্রভৃতি প্রথম দিকের পজিটিভিস্টরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে ইচ্ছুক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা আধুনিকদের মতো ব্যাখ্যাতে অনাগ্রহী ছিলেন না। বরং 'বিশ্ব-ইতিহাস' 'সামাজিক ব্যাখ্যা' প্রভৃতি সন্দেহজনক ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। আধুনিকেরা এসব ব্যাপারে অনেক বেশি সাবধানী। এত বেশি যে কারো কারো সেইটেই সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে।

এইবারে তথ্যের কথা। তথ্যপ্রীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ঐতিহাসিকের অত্যাবশ্যক গুণ, মোটেই দোষ নয়। অষ্টাদশ শতকের উপদেশাত্মক এবং নীতিবাদী ইতিহাসচিন্তার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে র‍্যাঙ্কে যখন তাঁর সেই বিখ্যাত সূত্রটি ঘোষণা করেন—'ঐতিহাসিকের কাজ আর কিছুই নয়, শুধু ঠিক কী ঘটেছিল, কেমন করে ঘটেছিল, সেইটুকু দেখানো', তখন তাঁর এই সূত্রের মধ্যে তথ্য-ভিত্তিক অনুসন্ধানের সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু উপদেশ বা নৈতিক বিচার এক জিনিস, ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র জিনিস। তথ্য-প্রীতি যখন তথ্যপূজায় পরিণত হয়, ঐতিহাসিক যখন তথ্য-সর্বস্ব হয়ে ওঠেন, যখন তিনি শুধু ব্যাখ্যা-বিমুখই নন, যখন তাঁকে প্রায় সিদ্ধান্ত-বিমুখ বলেই সন্দেহ হবে, তখনই তিনি যথার্থ পজিটিভিস্ট বলে গণ্য হবেন।

সাদা কথায়, পজিটিভিস্ট মতে, ইতিহাস তথ্যের কারবারী। ইতিহাস কখনো সুস্পষ্ট ও সুপরীক্ষিত তথ্যের বাইরে যাবে না। ইতিহাস ভ্যালুর কারবারী নয়। যে ব্যাখ্যায় মূল্যবোধের স্পর্শ থাকে সে ব্যাখ্যা ইতিহাসের নয়। ইতিহাসের প্রমাণ-পদ্ধতি ষোলো আনা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-পদ্ধতি। ইতিহাস খাঁটি বিজ্ঞান, ঠিক যেমন পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়ন।

আইডিয়ালিস্টরা মনে করেন যে, ইতিহাস আর বিজ্ঞান দুয়ের মধ্যে কোনো খানে কোনো সমধর্মিতা নেই— ইতিহাসকে কোনো ক্রমেই বিজ্ঞান বলা যায় না। ইতিহাসের তথ্যও তদ্‌গত বা নৈর্ব্যক্তিক নয়, তার প্রমাণ-পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক নয়। ইতিহাসের প্রমাণ অঙ্কের মতো অবরোহীও নয়, পদার্থ-বিদ্যার মতো আরোহীও নয়। ইতিহাস বিশেষ থেকে সাধারণে যায় না, কোনো নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে না, কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না।

আইডিয়ালিস্ট মতে, ইতিহাসের সব প্রমাণই শেষ পর্যন্ত পারম্পরিক সঙ্গতির প্রমাণ। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এটা হল সামগ্রিক শৃঙ্খলার প্রমাণ। অর্থাৎ ঐক্য এবং সুষমার প্রমাণ। কল্পনার ক্ষেত্রে— আর্টের ক্ষেত্রে যে প্রমাণ, উপন্যাসের ভাল-মন্দর যে প্রমাণ, অনেকটা সেই প্রমাণ।

আইডিয়ালিস্ট মতে তথ্য এবং ভ্যালু অভিন্ন। ভ্যালুই তথ্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। তথ্য যেন খোলস মাত্র, ভ্যালুটাই চরম। তারই নাম সত্য। তদ্গত তথ্য বলে কিছু নেই। অতীত কখনোই তথ্যরূপে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় না। অতীত আমাদের কাছে আসে স্মৃতিরূপে, চিন্তারূপে, হয়তো বা কল্পনারূপেও। স্মৃতি-কল্পনা-চিন্তার যে মানসলোক, ঐতিহাসিকের তার বাইরে যাবার জো নেই। হয়তো যাবার প্রয়োজনও নেই। কারণ যাবার জায়গাও নেই। ইতিহাস তো বস্তুর ইতিহাস নয়, ইতিহাস হল চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ।

আইডিয়ালিস্টদের কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, ইতিহাস যখন ঐতিহাসিকের চিন্তা মাত্র, এবং চিন্তাটা যখন বর্তমান— বর্তমান চিন্তাতেই যখন অতীত অনুপ্রবিষ্ট, তখন বলা যায় যে, সমস্ত ইতিহাসই বর্তমান ইতিহাস। ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিকের অতীত-কল্পনা, বর্তমানে সংঘটিত। ইতিহাস নিত্য-বর্তমান। একই সঙ্গে কালিক এবং কালাতীত।

আইডিয়ালিস্ট মতবাদ প্রসঙ্গে অনেকেরই নাম মনে হতে পারে। বিশেষ করে জার্মান ব্রহ্মবাদীদের প্রায় সকলেরই নাম। তবু আলাদা করে হেগেল আর ডিল্‌থের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তা হলেও এখানে কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের কথাই বেশি করে স্মরণ করছি। যেমন ক্রোচেকে, কিংবা কলিংউড্‌-কে।

আমরা দেখতে পেলাম, প্রথম মতে ইতিহাস খাঁটি বিজ্ঞান। যে-কোনো এম্‌পিরিক্যাল অনুসন্ধানের সঙ্গে ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। যে-কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্র যে পরিমাণ নিয়মশাসিত, ইতিহাসের ঘটনাও তাই। যে-কোনো বস্তু-চর্চায় প্রকল্প গঠনের জন্যে যতটা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন ইতিহাসেও তাই। তার বেশিও নয়, কমও নয়। দ্বিতীয় মতে দেখলাম— ইতিহাস চৈতন্যের অভিব্যক্তি। মহাবিশ্বচৈতন্যেরই হোক আর ঐতিহাসিকের খণ্ড-চৈতন্যেরই হোক— চৈতন্যের বাইরে ইতিহাস নেই। চৈতন্যের বাইরে— স্মৃতি-কল্পনা-চিন্তার বাইরে— ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ নেই। সমবেদনার মধ্যে দিয়ে, কল্পনার মধ্যে দিয়ে, হয়তো বলতে পারি আত্মচৈতন্যের উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়ে, ঐতিহাসিক একই সঙ্গে কাল এবং কালাতীতের সাক্ষী হন।

তৃতীয় মতটি অনেক দিক থেকে এই দুই চরমের মধ্যগামী। হয়তো বা এই দুই বিপরীতের সমন্বয়-সাধক। সমন্বয় ঘটুক আর না ঘটুক, সমস্ত মধ্যগামী মতবাদের মতোই এর প্রাঙ্গণেও আমরা বিচিত্র জন-সমাবেশ দেখতে পাই। তার কোনোটাকে পজিটিভিজ্‌মের কোল-ঘেঁষা, কোনোটাকে বর্ণচোরা আইডিয়ালিজ্‌ম্ বলে সন্দেহ হয়। এই তৃতীয় মতবাদের প্রাঙ্গণে যে বিভিন্ন ধরণের ইতিহাস-তত্ত্বের ভীড়, তাদের মধ্যে সাধারণ-লক্ষণ শুধু এইটুকু যে, সকল মতেই ইতিহাস তথ্যাতিরিক্ত— তথ্যাশ্রয়ী হয়েও।

অর্থাৎ সমন্বয়পন্থীরা পজিটিভিস্টদের মতো তদ্গত তথ্যবাদীও নন, আইডিয়ালিস্টদের মতো বিশুদ্ধ চৈতন্যলোকবিহারীও নন, আত্মগত কল্পনাবাদীও নন। এঁরা তথ্যও মানেন ব্যাখ্যাও মানেন। ঘটনাও মানেন, অর্থও মানেন। নিরেট কঠিন বস্তুপিণ্ডকেও মানেন, আবার কল্পনাকেও অস্বীকার করেন না।

এঁদের মতে ইতিহাসের সব তথ্যই নির্বাচিত তথ্য। নির্বাচন সব সময়ই ব্যক্তিমনের তাৎপর্যবোধসাপেক্ষ। তাৎপর্যবোধ মূল্যমানের সঙ্গে জড়িত। মূল্যবোধ-বর্জিত ইতিহাস অসম্ভব। ইতিহাসচেতনা একদিক থেকে জীবনচেতনারই অন্যতম অভিব্যক্তি। সুতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ তদ্‌গত ইতিহাস সম্পূর্ণই অবাস্তব। কিন্তু তথ্য-নির্বাচন কেবলই বোধসাপেক্ষই নয়, বলা বাহুল্য, তথ্য-সাপেক্ষও বটে। নির্বাচন শূন্যের নয়, বিষয়ের। বিষয়শূন্য মনোভূমিতে আকাশকুসুমের মতো আপনাতে আপনি ফুটে ওঠে নি। বিষয়ের একটা আপন ভূমি আছে, সেখানে তার শিকড় আছে, ডালপালা আছে। সেই জগতের নাম বহির্জগৎ। ইতিহাসের 'বিষয়' দুই জগতেরই অধিবাসী। কোনো তথ্যই নিছক মানসিক নয়, নিছক কল্পনা নয়। তথ্য বাস্তব, কিন্তু কেবল বাস্তবই নয়। তথ্য আর তার বোধ— অন্তত আমাদের কাছে— অবিভাজ্য। ফ্যাক্‌ট্‌ আর তার ভ্যালু— অন্তত আমাদের কাছে— অচ্ছেদ্য। এই কারণেই, ইতিহাস ফ্যাক্‌ট-ভিত্তিক, কিন্তু ভ্যালু-নিরপেক্ষ নয়।

ইতিহাস কি বিজ্ঞান? এ সম্পর্কে তৃতীয়পন্থীদের ব্যক্তব্য কী? একটা কথা মনে রাখতে হবে। এমন এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞান না হওয়াই ছিল আভিজাত্য। এখন দিন পাল্‌টে গেছে। এখন বিজ্ঞান বলে পরিচিত হতে পারলেই গৌরব। যাঁদের মনে পুরানো আভিজাত্যের স্মৃতি প্রবল, তাঁরা ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই তাকে বিজ্ঞান বলে মানতে কুণ্ঠিত হন। উল্টো প্রবণতার সঙ্গে একালে আমরা সকলেই পরিচিত। ইতিহাসের গৌরব-রক্ষার মানসেই তাকে বিজ্ঞান বলে ঘোষণা করা, এটা তো যুগেরই হাওয়া।

তৃতীয়পন্থীদেরও কেউ কেউ হয়তো ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলতে আপত্তি করবেন। কিন্তু অনেকেই করবেন না। এটা মাত্র নাম নিয়ে মতবিরোধ। ইতিহাসের অনুসন্ধান-প্রণালী খুব স্বতন্ত্র নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গীও বিজ্ঞানের মতোই। তার লক্ষ্য বিশিষ্ট জ্ঞান, সে দিক থেকেও সে বিজ্ঞানধর্মী। কিন্তু তার প্রমাণ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেখানে কল্পনার অবকাশ বেশি। সঙ্গতি এবং ঐক্যের প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর নয়। সেখানে ঐতিহাসিকের জীবনবোধ নিজেই অন্যতম প্রধান প্রমাণ। এ দিক থেকে আর্টের সঙ্গে ইতিহাসের সূক্ষ্ম একটা আত্মীয়তাও আছে। যদি পদার্থবিদ্যাকেই বিজ্ঞানের আদর্শ ধরি, তাহলে ইতিহাস বিজ্ঞান নয়। যদি দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য এবং চেষ্টাকে প্রাধান্য দিই, তাহলে— তৃতীয়পন্থী মতে— ইতিহাস অবশ্যই বিজ্ঞান।

এতক্ষণে, এই তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পরিচয়ের পরে, আবার আমরা আমাদের মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সুযোগ পেলাম— ইতিহাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্পর্কের প্রশ্ন।

পজিটিভিস্ট মত গ্রহণ করলে এ কথা মানতেই হবে যে, ইতিহাস আর উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী। দুটো জগৎ পরস্পরকে কোথাও স্পর্শ করে না। এদের একের ভাণ্ডারে এমন কিছু নেই যা অপরে নিতে পারে, বা নিয়ে কোনোরকম বিকৃতি না ঘটিয়ে তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। যেমন রাসায়নিক বা গাণিতিক উপন্যাস অসম্ভব, যেমন দেহক্রিয়াতত্ত্বঘটিত বা ভাষাতত্ত্বঘটিত উপন্যাস অসম্ভব, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসও অসম্ভব— মাত্র কথার কথা।[৫]

---

৫ মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাস সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

আইডিয়ালিস্ট মত গ্রহণ করলে, চৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে আর্ট এবং ইতিহাস— এ দুয়ের ভেদ সম্পর্কেই মনে সংশয় জাগবে। ইতিহাস আর উপন্যাসের সীমারেখা কোথায়? যদি কোনো সীমানা থাকেও, তা স্থির নয়, সতত-পরিবর্তনশীল। তাছাড়া, কে কার উত্তমর্ণ? ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস থেকে নেয়, না ইতিহাসই উপন্যাস থেকে নেয়? ইতিহাসের প্রমাণ, সে তো সমগ্রতাবোধ সুষমাবোধ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এ সব বোধ ঐতিহাসিক ইতিহাস থেকে আহরণ করেন না, আহরণ করেন জীবন থেকে। সমগ্রতার বোধই হোক আর জীবনবোধই হোক, এ তো সব থেকে স্পষ্ট অভিব্যক্তি পায় সাহিত্যেই। এ বোধের সংগঠনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দান যেমন আছে, তেমনি এর মধ্যে সাহিত্যের দান— কবিতা উপন্যাস নাটক মহাকাব্য— এদের দানও অবশ্য-স্বীকার্য। কে বলতে পারে সেকালের গ্রীক ঐতিহাসিকেরা হোমারের কাছে কী সূত্রে কতখানি ঋণী? এ ক্ষেত্রে, জীবনবোধের বাবদে, ইতিহাসকেই তো বরং উপন্যাসের কাছে ঋণী বলে মনে হয়।

এও বাহ্য। ইতিহাস আর উপন্যাস দুইই বিষয়ীর মানস-ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত। দুয়েরই অবলম্বন সমবেদনা। দুয়েরই বাহন কল্পনা। ফ্রুড্ থেকে কলিংউড্, নানা কালের নানা গোত্রের লেখক ঐতিহাসিকের সমবেদনা ও কল্পনাশক্তির উপর জোর দিয়েছেন। অতীতের মানুষকে জানতে হলে ঐতিহাসিককে মনে-মনে অতীতের মানুষ হয়ে যেতে হবে। আওরঙ্জেবের ইতিহাস লিখতে হলে মনে-মনে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তাঁর ভাবনা-কল্পনা-সাধনাকে নিজের বলে জ্ঞান করতে হবে। এই যে এক-হয়ে-যাওয়া, এইটেই তো আর্টের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তা যদি হয়, তাহলে ঐতিহাসিকে আর ঔপন্যাসিকে তফাত কোথায়?[৬] ঐতিহাসিক উপন্যাসই বা ইতিহাস থেকে ভিন্ন কীসে? ভিন্নই যদি না হয়, তাহলে আর তর্ক কী নিয়ে। সে ক্ষেত্রে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস নামে স্বতন্ত্র কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

একমাত্র তৃতীয় মতটিকে গ্রহণ করলে তবেই ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অর্থ তাৎপর্যবোধ ভ্যালু ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে এই তৃতীয় মতটি আমাদের যে পথের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, অনেকের মতেই তা বিশুদ্ধ ইতিহাসের পথ নয়। যদি ইতিহাসের হয়ও, তা হলেও শুধু ইতিহাসের নয়। হয়তো তা স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শনেরও পথ।

ইতিহাস-জিজ্ঞাসু হিসেবে আপন বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী আমরা উক্ত তিনটি মতের যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারি, যে-কোনো দুটিকে বর্জন করতে পারি। কিন্তু সাহিত্যিক— যিনি ঘটনাকে

---

৬. আইডিয়ালিস্ট কলিংউড্ ইতিহাস আর উপন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন যে, উপন্যাস জিনিসটা কল্পনার দ্বারা শাসিত, আর ইতিহাস জ্ঞাত তথ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কথাটার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, কল্পনার জগৎ অনেক এবং তারা পরস্পর-অসংপৃক্ত। কিন্তু ইতিহাসের জগৎ তা নয়। সে জগৎ এক। সে জগৎ দেশে-কালে অধিষ্ঠিত এবং অখণ্ড। বলা অনাবশ্যক যে, কলিংউডের এই বক্তব্য আইডিয়ালিস্ট ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে মিলবে না। এবং তাঁর রিয়ালিস্ট প্রতিপক্ষেরা এর প্রায় প্রত্যেকটি কথাই সানন্দে সমর্থন করবেন। কারণ দেশে-কালে অধিষ্ঠিত বহির্বাস্তবকে একবার মানলে, আইডিয়ার একচ্ছত্র অধিকারকে খর্ব করতেই হবে।

সব সময় উপলব্ধির মধ্যে গ্রহণ করেন, তিনি তা পারেন না। অন্তত যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশ্বাস করেন, তিনি তা পারেন না। তাঁর কাছে তিনটে বিকল্পই তুল্যমূল্য নয়। একটি মতের দরজাই তাঁর কাছে খোলা— সেই যাকে বলা হয়েছে তৃতীয় মত।

তার কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের কতকগুলি পূর্ব-স্বীকৃতি আছে, কতকগুলি সুস্পষ্ট শর্ত আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্ভব, এই কথাটুকু মেনে নিলেই, সেই শর্তকে মেনে নেওয়া হয়। এতক্ষণ আমরা ইতিহাসের দিক থেকেই ইতিহাসের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। এইবারে আমরা সাহিত্যের দিক থেকে— ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ব-স্বীকৃতিগুলির দিক থেকে ইতিহাসকে দেখতে চেষ্টা করব।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটা যদি নিতান্তই ফাঁকা কথা না হয়, তার যদি সত্যিই কোনো বিশিষ্টতা থাকে, সেই বিশিষ্টতার যদি কোনো রসগত তাৎপর্য থাকে, তাহলে তার ঐতিহাসিকতাটাও সত্য, এবং সেই ঐতিহাসিকতারও তাহলে নিশ্চয়ই একটা রসগত তাৎপর্য আছে। এই রসগত তাৎপর্যের দাবির মধ্যেই আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ব-শর্তগুলির সন্ধান পাব।

প্রথমত মানতে হবে যে, পরিবর্তন জিনিসটা সত্য, নিয়ত এবং নিত্য। এ পরিবর্তন সর্বাত্মক। জীবন এবং জীবন-পরিবেশ— সব-কিছুর। মানব-উপলব্ধিতে এ পরিবর্তনের যে বিশেষ রূপটি ফুটে ওঠে, যাকে বলতে পারি জীবনের চলৎরূপ, তা অর্থহীন কার্যকারণ-শৃঙ্খলাবিহীন নিরাকার নিরবয়ব পিণ্ড নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব কার্য-কারণে এবং কার্য-কারণের পারম্পর্যে বিশ্বাসী। প্রকাশ-রীতিতে হোক আর না-হোক, চরিত্র-ধর্মে সে ঘোর বাস্তববাদী। যে-কারণে তাকে বাস্তববাদী বলছি, ঠিক সেই কারণেই বলতে পারি যে, সমস্ত বাস্তববাদী উপন্যাসই ভিতরে-ভিতরে ঐতিহাসিক উপন্যাস— তা সে অতীতচারী হোক আর না-ই হোক। কথাটা পরে আসছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সত্য বলে স্বীকার করলে, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, আবার পর্বে পর্বে সার্থক নতুনত্ব— এই দুইকেই আমাদের সত্য বলে মেনে নিতে হবে। নতুনত্ব যখন অর্থবান্, তখন তার কারণও মানববোধের অগম্য নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস এই অর্থবান্ নতুনত্বের রূপ ও রহস্যকে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস যদি সম্ভব বলে মানি, তাহলে এও মানতে হবে যে, মানুষ যথার্থই ইতিহাস-সন্ততি। ইতিহাসের প্রত্যেক পর্বের অভিনবত্ব মানুষের জীবনের মধ্যে, মানুষের মানবিক মর্মসত্যের মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষের মর্মসত্যের কোনো নিত্য রূপ নেই। তার রূপ তার সত্য সবই ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত।

সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হবে যে, ইতিহাস পর্বে পর্বে যে নতুনত্বের সৃষ্টি করে তার মধ্যে দিয়ে নতুন ভ্যালুরও জন্ম হয়। সেই ভ্যালুর সাধনাই মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকা। এই ভূমিকার গুণেই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যথার্থ ঐতিহাসিকতা অর্জন করতে পারে— উপন্যাস যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। 'গোরা' যে-অর্থে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস, তা হল এই। গোরা ইতিহাসের বই থেকে

নেমে এসেছে কি না প্রশ্ন সেটা নয়, গোরা যে প্রকৃত ঐতিহাসিকতা অর্জন করেছে, আসল কথা হল সেইটে। এই অর্থে অনেক সার্থক উপন্যাস 'অতীতের' না হয়েও ঐতিহাসিক হয়ে উঠতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে, ভ্যালু-সচেতন ইতিহাসগত মানুষের চাওয়া এবং পাওয়া— না-পাওয়া এবং পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম, এর মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের যে রূপবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, যে রূপ অগভীর ত্বকের নয়, গভীর মর্মের, ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই রূপকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অন্য উপন্যাস যদি তাই করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে অন্য জাতীয় নয়, সেও ঐতিহাসিক। সেই অর্থে সমস্ত সার্থক উপন্যাসই অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক— সজ্ঞানে অথবা অলক্ষ্যে।

দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস আর ইতিহাস-দর্শনকে মিলিয়ে দেখাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংস্কার। এ সংস্কার বোধকরি সাধারণ বুদ্ধিরও। সাধারণ বুদ্ধিও ইতিহাসের একটা সামগ্রিক রূপ দেখতে চায়, ইতিহাসের মধ্যেই তার অর্থকে পাবার প্রত্যাশা করে।

সাধারণবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা ইতিহাসের তিনটি স্বতন্ত্র অঙ্গ বা ধাপকে পরিষ্কার চিহ্নিত করে নিতে পারি। এই ধাপের এক-একটিতে ইতিহাসের এক-এক রকম দায়িত্ব— এক-এক রকম ভূমিকা। প্রথম ধাপে সন্ধান ও সংগ্রহ। দ্বিতীয় ধাপে সংশ্লেষণ ও সংগঠন। তৃতীয় ধাপে সংরচন।

প্রথম ধাপটি প্রধানত বিজ্ঞানধর্মী। দ্বিতীয় ধাপ চিন্তা-প্রধান। তবে মাত্র চিন্তা নয়, কল্পনা, সমবেদনা, সামগ্রিক জীবনবোধ সবই এর মধ্যে ক্রিয়াশীল। তৃতীয়, অর্থাৎ সংরচনের ধাপটি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সাহিত্যধর্মী।

এই তিন ধাপের কোন্‌টির গুরুত্ব কার কাছে বেশি, তারই উপর নির্ভর করে ইতিহাসকে কে কোন্ মূর্তিতে দেখছেন। প্রথম ধাপটিকে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে আমরা বিউরি-র সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলব, "…Though she [ইতিহাস] may supply material for literary art or philosophical speculation, she is herself simply a science, no less and no more"। তৃতীয় ধাপের গুরুত্বের কথা মেকলে থেকে ট্রেভেলিয়ান অনেকেই বার বার আমাদের শুনিয়েছেন, এবং শোনাবার প্রয়োজন এখনো শেষ হয় নি। যে গুণে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে, যে গুণের জন্যে ইতিহাস 'ক্লিও'-নামে মিউজ'দের একজন, সে এই তৃতীয় অঙ্গের গুণ। আর দ্বিতীয় ধাপ? তার কথায় পরে আসছি।

শুধু সাধারণ বুদ্ধি নয়, ঐতিহাসিকেরাও অনেকে এ বিভাগ সমর্থন করবেন। যেমন ট্রেভেলিয়ান। তিনিও ইতিহাসের এই রকম তিন অঙ্গের ভাগের কথা বলেছেন।[৭] প্রথম অঙ্গকে তিনি বলেছেন— বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়টিকে বলেছেন— কল্পনাত্মক বা চিন্তামূলক (imaginative or speculative)। তৃতীয় অঙ্গ সাহিত্যিক। যদিও ইতিহাসকে তিনি আর্ট বলে মনে করেন, তবু তিনি এই তিন অঙ্গের কোনোটিকেই লঘু করে দেখেন নি। তাঁর মতে এর কোনোটিই গৌণ নয়।

ট্রেভেলিয়ান ঐতিহাসিক, সুলেখক এবং সুপণ্ডিত। তাঁর কাছে তিন অঙ্গেরই গুরুত্ব সমান হওয়া আশ্চর্য নয়। যে-কোনো একটিকে মুখ্য করে অপর দুটিকে গৌণ করলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

---

৭. *Clio, A Muse*-গ্রন্থে 'Clio Rediscovered' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিকেরই দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের প্রশ্ন সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সাহিত্য ইতিহাসকে কোন্ দৃষ্টি দিয়ে কী মূর্তিতে দেখে ?

ইতিহাসের সন্ধান সংগ্রহ সাক্ষ্য দলিল ইত্যাদির সম্পর্কে— ইতিহাসের খাঁটি বিজ্ঞানধর্মী দিকটির সম্পর্কে— সাহিত্যের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ইতিহাসের বিজ্ঞান-মূর্তিকে সাহিত্য শ্রদ্ধা করতে পারে, কিন্তু দূর থেকেই। ইতিহাস-রচনার সাহিত্যগুণ, সেখানে তো ইতিহাসই বরং অধমর্ণ, ইতিহাসের এই আংশিক সাহিত্য-মূর্তির প্রতিও সাহিত্যের স্বতন্ত্র কোনো আকর্ষণ নেই। সে-ইতিহাসেরও সাহিত্যকে দেবার কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্গ তা নয়। কেননা সেই খানেই জীবনের সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি, সেই খানেই জীবনের সমগ্রতা।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্ভবপরতার দিক থেকে ইতিহাসের এই ভাবগ্রাহী, চিন্তাশীল, দ্রষ্টা-মূর্তিটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই খানেই প্রথম ধাপ আর তৃতীয় ধাপের মিলন। এই খানেই ইতিহাসের হয়ে-ওঠা। এই খানে বিজ্ঞান আর্ট এবং দর্শন পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত। এইখানে ইতিহাস আর জীবনদর্শন পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পুষ্ট হয়, ইতিহাস-দর্শন ইতিহাসের সঙ্গে মিলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইতিহাস রস', এইখানেই তার উৎস।

১০

স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শনের প্রতি আধুনিক ঐতিহাসিকের বিরূপতার কারণ একাধিক। একালের হেগেল-বিরোধী মনোভাব এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে পরাবিদ্যার অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া যে এই বিরূপতার অন্যতম প্রধান হেতু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিস্থিতিকে আসলে সংকটময় করে তুলেছে মার্কসের সংগ্রামী ইতিহাসতত্ত্ব। ইতিহাস-দর্শন আজ আর নিরুপদ্রব গ্রন্থলোকবিহারীদের নিরাসক্ত শাস্ত্রালোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তা এখন বহু-বিরোধ ও বহু-সমর্থনে প্রবলভাবে দ্বন্দ্ব-মুখর। ফলে স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শন আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে এখন বিপজ্জনক নিষিদ্ধ এলাকা। পাছে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এই সংকটাকীর্ণ এলাকায় পদক্ষেপ ঘটে যায়, সেই আশঙ্কায় ঐতিহাসিকেরা এখন সমস্ত রকম অর্থগর্ভ সিদ্ধান্ত, সমস্ত রকম ব্যাপকতা-সম্পন্ন ব্যাখ্যা এবং সমস্ত রকমের ভ্যালু-সংক্রান্ত মন্তব্য সযত্নে এড়িয়ে চলেন।

এই 'নিরাপত্তা-নীতি'কে কেউ কেউ ঐতিহাসিকের কূর্মবৃত্তি বলতে পারেন, এক ধরণের এস্‌কেপিজম্ বলে নিন্দা করতে পারেন। এ নিন্দা কতদূর সঙ্গত— এই নিরাপত্তা-নীতি সত্যিই ঐতিহাসিককে জীবন-বিমুখ করে তোলে কি না, সে আলোচনা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ইতিহাস যদি ইতিহাসের মধ্যেই তার অর্থকে খুঁজে বার করতে না পারে, ইতিহাসের নিজের সীমানার মধ্যেই যদি ফ্যাক্ট্ এবং ভ্যালু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, তবে সে ইতিহাস যতই খাঁটি নিরাপদ এবং নিশ্চিত হোক না কেন, সাহিত্য কোনো কারণেই তার দ্বারস্থ হবে না। তার ভাণ্ডার ধনরত্নে পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকে দেবার মতো কিছুই যে সে ভাণ্ডারে নেই এ কথা নিশ্চিত জানব।

সাহিত্য জীবনকে বুঝে নেবার জন্যেই কালের প্রবাহকে বুঝে নিতে চায়। ঠিক সেই কারণেই—

জীবনকে কালস্রোতের মাঝখানে চলমান রূপে দেখবার আশাতেই সাহিত্য ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়। ইতিহাসের কাছে সে তথ্যগত সত্য চায় না, চায় ঐতিহাসিক মানুষের মর্মগত সত্য।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নামিয়ার বলেছেন, ঐতিহাসিকেরা "imagine the past and remember the future"। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কী রহস্যে পরস্পর পরস্পরে সঙ্গত থাকে, সাহিত্যিক ঐতিহাসিকের কাছে তারই সন্ধান পেতে চায়। অতীতকে কল্পনায়, ভবিষ্যৎকে স্মৃতিতে ধরতে চায়। অতীতের মধ্যে বর্তমানকে, বর্তমানের মধ্যে অতীতকে এবং এই দু'য়ের মধ্যে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়। ইতিহাস যদি ত্রিকালদ্রষ্টার ভূমিকায় নামতে ভয় পায়, তাকে দিয়ে সাহিত্যের কাজ নেই। ত্রিকালের প্রতিই সাহিত্যের বিশেষ লোভ। সেইখানেই জীবনের চলৎ-রূপের রহস্য। তারই আশায় উপন্যাস ইতিহাসের সামনে অঞ্জলি মেলে দাঁড়ায়। কিন্তু সে অঞ্জলি মূষিকের অঞ্জলি নয়। কুণ্ঠিত হাতের মুষ্টিভিক্ষায় তার আগ্রহ নেই।

তথ্য-সর্বস্ব অর্থবিমুখ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আপন মহিমায় স্বস্থানে বিরাজ করুক। তার শ্রীবৃদ্ধিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি। তাতে সাহিত্যের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কিন্তু আরো অন্য এক-রকমের ইতিহাস থাকুক—তার নাম যদি ইতিহাস না হয় তো না-ই হল—কিন্তু একটা-কিছু থাকুক যেখানে আমরা জীবনের ফ্যাক্ট্‌গুলোকে শ্রেয় এবং সুন্দরের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারব।

সাহিত্যের প্রয়োজনে ইতিহাস নিজেকে বদলাবে না তা জানি। সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষার টানে নতুন ইতিহাস রচিত হবে না এও জানি। কিন্তু প্রয়োজনটা তো শুধু সাহিত্যেরই নয়। প্রয়োজনটা জীবনের। যে ইতিহাস সাহিত্যের পক্ষে নিষ্ফলা, খুব সম্ভব সে জীবনের পক্ষেও নিষ্ফলা। যে ইতিহাসকে জীবনের সত্যিই প্রয়োজন, সে ইতিহাস অবশ্যই আছে, অবশ্যই থাকবে। ভীড়ের মধ্যে তাকে চিনে নেবার দায়িত্ব আছে সে কথা অস্বীকার করি না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের যা-কিছু অন্তরের যোগ, তা শুধু সেই ইতিহাসের সঙ্গেই। এবং শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসের নয়, কম-বেশি সব উপন্যাসেরই। সেই ইতিহাসের সত্যকেই উপন্যাস তার নিজের মতো করে প্রকাশ করে। সে সত্য কেবল তথ্য নয়, তথ্যের অন্তরের মর্মসত্য—একদিকে তথ্যের থেকে কম, অন্যদিকে তথ্যের থেকে অনেক বেশি। ইতিহাস আর উপন্যাসের মর্মকথাটা একই। তার নাম মানবসত্য। একই মানবপরিচয়, কেবল উভয়ের উপলব্ধির ধরণটা ভিন্ন, প্রকাশটা স্বতন্ত্র। উপন্যাসে যে মানবপরিচয় তার প্রকাশ ঘটে কল্পনার জগতে। সে প্রকাশ রূপের ভাষায়, প্রতীকী বিগ্রহের সাংকেতিকতায়।

এই মানবপরিচয়-মূলক ইতিহাস হয়তো স্পেকুলেটিভ ইতিহাসদর্শনের সঙ্গে হরিহরাত্মা। 'ইতিহাস-বিজ্ঞানী' হয়তো এর প্রতি অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করবেন। তা করুন, উপন্যাসের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। উপন্যাস নিজেও তো কম স্পেকুলেশনধর্মী নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরবঙ্গ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আকস্মিক ঘটনা জীবনের উপর অনেক সময় গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, এমনকি জীবনকে নূতন পথেও পরিচালিত করে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের একটি আকস্মিক শোকাবহ ঘটনা পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মহর্ষি তাঁর জমিদারির ভালোরকম তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রীতিমত অবহিত ছিলেন। কারণ পৈতৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কার-টেগোর কোম্পানির পতনের পর তার উপরেই দ্বারকানাথের উত্তরপুরুষের ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করতে হত। কিন্তু মহর্ষির পক্ষে তত্ত্বাবধানের ভার নিজে নেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও নিজ আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর তিনি বেশির ভাগ সময় উত্তর-পশ্চিমে হিমালয় অঞ্চলে সাধন ও উপাসনায় কাটিয়ে দিতেন। দীর্ঘ সময় পরে মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন। শেষের দিকে পৈতৃক বাড়িতে আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এমনকি বার্ধক্যহেতু তাঁর পক্ষে বিদেশে বাস যখন আর সম্ভব হল না, তখনও তিনি পরিবার হতে দূরে থাকতেন। প্রথমে এই ভাবে তিনি কিছুকাল চুঁচুড়ায় কাটান এবং পরে দীর্ঘকাল পার্ক স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়িতে থাকেন। কেবল জীবনের শেষের কয় বৎসর তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরে এসে বাস করেন।

সৌভাগ্যক্রমে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার নেবার উপযুক্ত মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যেই পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ ক'রে মহর্ষি এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলেন; কিন্তু আকস্মিকভাবে সারদাপ্রসাদ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে মারা যান। সুতরাং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়।

এই কাজের জন্য মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকেই নির্বাচন করেন। তবে মনে হয় প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। কোন্ সময় হতে তিনি সম্পূর্ণভাবে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা নিশ্চিতভাবে ঠিক করা শক্ত। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের শেষে তিনি তাঁর সিভিলিয়ান বন্ধু লোকেন পালিত ও মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েক মাসের জন্য বিলাত যান। মনে হয় সম্ভবত তার পূর্বেই তিনি জমিদারির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার সুবিধার জন্য জমিদারির ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই পৈতৃক জমিদারি চারটি তহশীলে বিভক্ত ছিল; বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম, সাহাজাদপুর এবং পাণ্ডুয়া। এদের মধ্যে পাণ্ডুয়া তহশীলের জমিগুলি ছিল উড়িষ্যার কটক জেলায় অবস্থিত। তা ছিল আকারে সব থেকে ছোট। বাকি তিনটি তহশীল উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। এদের মধ্যে সাহাজাদপুর তহশীল পাবনা জেলার, কালীগ্রাম তহশীল রাজসাহী জেলার এবং বিরাহিমপুর তহশীল নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট নীট আয় ছিল ২,৩৪,৩০০৲ এবং তার মধ্যে পাণ্ডুয়া তহশীলের আয় ছিল মাত্র ১৮,০০০৲।

'পদ্মা' : উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত বোট

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে জমিদারির মূল অংশ উত্তরবঙ্গেই ছিল। সেই কারণে কেন্দ্রীয় কাছারিটি অবস্থিত ছিল শিলাইদহে, পদ্মার দক্ষিণ তীরে। কুষ্টিয়া নগর হতে তার দূরত্ব ছিল কয়েক মাইল মাত্র। সাহাজাদপুর তহশীলের কাছারি ছিল সাহাজাদপুরে। আত্রাই নদীর সঙ্গে তা একটি ছোট খাল দ্বারা সংযুক্ত। আর কালীগ্রাম তহশীলের কাছারি অবস্থিত ছিল পতিসরে। তা নাগর নামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর পাশে অবস্থিত। তা আত্রাই নদীর এক উপনদী। আবার আত্রাই যমুনার এক উপনদী।

সুতরাং জমিদারি কার্য তত্ত্বাবধানের জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে থাকতে হত এবং অন্য তহশীলের কাজ পরিদর্শনের জন্য বড় হাউস-বোটে ক'রে জলপথে সাহাজাদপুর, পতিসর ও কালীগ্রামে যেতে হত। এই পথে পদ্মা ও যমুনাই ছিল প্রধান যোগসূত্র। পতিসরে যেতে পথে চলন বিল পার হতে হত।

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ একাই জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্য উত্তরবঙ্গে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতেই বাস করতেন। তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় ফিরে আসতেন। বাড়িতে তখন 'খামখেয়ালী' সভা নামে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের উৎসাহে গড়ে উঠেছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁদের উৎসাহিত করতে সেই সভায় তাঁর যোগ দিতে হত।

এই ব্যবস্থা অনেক দিন ধরে চলেছিল। পরে ছেলে মেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের পড়াশোনার ভার নিজে গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবস্থা ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ হতে প্রবর্তিত হয়। তবে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। কয়েক বছর পরে রথীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পুত্রকে গতানুগতিক পথে মামুলী বিদ্যালয়ে পাঠাতে মন চাইল না। পরে তিনি বোলপুরে তপোবনের আদর্শে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ১৯০১ খৃস্টাব্দ হতে শিলাইদহের জীবনের উপর যবনিকা পাত হল।

এখন আমাদের পূর্বের প্রশ্নে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। প্রশ্ন হল তিনি ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বিলাত যাবার পূর্বেই জমিদারি তত্ত্বাবধানের পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন কি না। তিনি যে তাই করেছিলেন তার সপক্ষে একাধিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সময় পারিবারিক 'খামখেয়ালী' সভার সভ্যগণ কর্তৃক অভিনয়ের জন্য একটি নাটকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক রচনার ভার নেন। এই সূত্রেই 'রাজর্ষি' কাহিনীর 'বিসর্জন' নামে নাট্যে রূপান্তর ঘটে। এই নাটকটি নাকি তিনি সাহাজাদপুরের কাছারিবাড়িতে বসে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে লেখেন।

আমরা দেখি তিনি ১৮৯০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সাহাজাদপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং তার পরিদর্শন-পুস্তকে ইংরেজিতে একটি মন্তব্যও লিপিবদ্ধ ক'রে এসেছেন। এর আলোকচিত্র রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে।

সব থেকে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় 'ছিন্নপত্রাবলী' হতে। এই সময় তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখতেন তারই সংগ্রহ হল 'ছিন্নপত্রাবলী'। তার ৩ সংখ্যক চিঠি শিলাইদহ হতে

১৮৮৮ খৃস্টাব্দে লেখা। তার ৫ সংখ্যক চিঠি সাহাজাদপুর কাছারিবাড়ি হতে ১৮৯০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লেখা। তার ৬ সংখ্যক চিঠিও এই সময় লেখা। এই শেষের চিঠিতে যে বিবরণ পাই তা পড়ে মনে হয় তিনি তখন জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি নিজেকে জমিদারবাবু বলে বর্ণনা করেছেন। জেলার কালেকটারকে দুর্যোগের দিনে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই সকল তথ্যকে ভিত্তি ক'রে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সম্ভবত ১৮৮৯ খৃস্টাব্দ হতে তিনি উত্তরবঙ্গকে স্থায়ীভাবে নিজের কর্মস্থান হিসাবে নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন।

সুতরাং এই ভাবে প্রথমজীবনে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গে প্রধানত পদ্মার মনোরম পরিবেশে। দেখা যায় এক আকস্মিক ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের আবাস ক্ষেত্রের বিপর্যয়কর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ ক'রে কলিকাতার বদ্ধ পরিবেশে মানুষ, তিনি এক নূতন জায়গায় স্থাপিত হলেন। প্রকৃতির হস্তে রচিত শান্তিকুঞ্জ তাঁর মূল আবাসকেন্দ্র। জলপথে বিরাট নদীর বক্ষে কর্ম উপলক্ষ্যে ভ্রমণের সময় প্রকৃতির সহিত নিত্য নূতন পরিবেশে নূতন পরিচয়। যিনি কলিকাতায় বাসকালে প্রকৃতির এতটুকু স্পর্শ পাবার জন্য আকুল হতেন, তিনি প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজ্যের মাঝখানটিতে আশ্রয় পেলেন।

অপর পক্ষে যিনি মহানগরীর বিত্তবান সমাজের মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত তিনি নগরজীবনের স্পর্শ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত অকৃত্রিম জীবনে অভ্যস্ত গ্রামের মানুষের নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ পেলেন। গ্রামের পোস্টমাস্টার, মফস্বলের সরকারী কর্মচারী, জমিদারির নায়েব গোমস্তা আমিন চাষী প্রজা— এরাই তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী হল। অতিরিক্তভাবে কর্ম উপলক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তীরে অবস্থিত পল্লীগুলির মানুষের সঙ্গে নানা সূত্রে পরিচয় লাভ ক'রে পল্লীজীবন সম্বন্ধে তিনি নিবিড় অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভ করলেন।

এইভাবে প্রকৃতির স্পর্শবর্জিত নগরজীবন ও শহরবাসী মানুষের পরিবর্তে প্রকৃতি ও পল্লীসমাজের মাঝখানে তিনি স্থাপিত হলেন। এক দিকে পল্লীর মানুষের সহজ সরল জীবনপ্রবাহ, অপর দিকে অবারিত প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শ। এই যুগল ধারার প্রভাবে তাঁর জীবন-প্রবাহিণী নূতন পথে প্রবাহিত হল। এই নূতন জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে কত তীব্র ছিল, তা তাঁর নীচের উক্তি হতে বোঝা যাবে :

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খর-রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে কিছু বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি।"

—সোনার তরী। সূচনা

প্রকৃতির ক্রীড়াভূমিস্বরূপ এই বিস্তারিত অঞ্চলে তাঁর বাস পূর্বের জীবনযাত্রাপ্রণালী হতে এমন আকাশ-পাতাল পৃথক যে তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত না ক'রে পারে নি। সে প্রভাব তাঁর জীবনকে মূলত দুইভাবে রূপান্তরিত করেছিল। তাঁর সাহিত্যিক রচনা প্রথমত তার প্রভাবে নূতন পথে প্রবাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত পল্লীর মানুষের সহিত নিবিড় পরিচয়ের ফলে পল্লী-উন্নয়নের কাজে

তাঁকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। তবে যিনি মূলত কবি, তাঁর কাব্যপ্রবাহিনী একেবারে থেমে যেতে পারে না এবং থেমে যায়ও নি। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত এ সম্পর্কে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁর কাব্যেও নূতন পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। আমাদের এই তিনটি প্রতিপাদ্যকে এর পর আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রস্তাব করি।

তাঁর সাহিত্যিক রচনার নূতন রূপ আমরা পাই তাঁর লেখনী-নিঃসৃত এই যুগের গল্পধারার মধ্যে। একটু আগে যে বলা হল তাঁর কাব্যপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তারও এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে কাব্যলক্ষ্মী বাল্য হতেই তাঁর বাগদত্তা এবং আজন্ম সাধনধন, তাঁর আবির্ভাব এ যুগে অনবছিন্ন ধারায় ঘটে নি। এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে তিনি যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করেন, তারা সংখ্যায় মাত্র ছয়টি— 'সোনারতরী' 'চিত্রা' 'চৈতালি' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা' ও 'নৈবেদ্য'। এদের মধ্যে 'চৈতালি' আবার একান্তই এই নদীমাতৃক দেশের দৃশ্যাবলী দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। অপর পক্ষে আমরা দেখি এই যুগে তাঁর গল্পগুচ্ছের নব্বইখানি গল্পের মধ্যে পঞ্চাশখানি রচিত হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে।

অবশ্য রচনার এই রূপপরিবর্তনের জন্য বাহিরের তাগিদ যে একেবারেই ছিল না তা নয়। মাঝে মাঝে সাহিত্যিক পত্রিকা চালাবার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ায় গল্পের চাহিদা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৯১ খৃস্টাব্দের মে মাসে হিতবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সম্পর্কে নিজের দায়িত্ব সম্পাদনের তাগিদে তিনি পাঁচটি গল্পরচনা ক'রে তাতে প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে 'পোস্টমাস্টার' অন্যতম।

১৮৯১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর হতে ঠাকুরবাড়িতে 'সাধনা' নামে একটি নূতন পারিবারিক পত্রিকা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ; পরে সম্পাদনার ভার তাঁর নিজের উপর বর্তায়। উভয়ক্ষেত্রেই গল্পের জন্য পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের উপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি মোট সাঁইত্রিশটি গল্প লেখেন। তাদের মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'কাবুলিওয়ালা' ও 'অতিথি' অন্যতম। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দ হতে পুরাতন পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার তাঁর উপর বর্তায়। সুতরাং তার তাগিদেও তিনি গল্প লিখতে বাধ্য হন। এই পত্রিকার জন্য তিনি আটটি গল্প লেখেন। তাদের মধ্যে ছিল 'মণিহারা' ও 'দৃষ্টিদান'।

কিন্তু এই রূপপরিবর্তনের মূল কারণ ছিল বিভিন্ন। তা হল এই নূতন পরিবেশের প্রভাব এবং তা হতে সঞ্চারিত প্রেরণা। পল্লীর বুকে বসে জমিদারি কার্য সম্পাদন করতে গ্রামের সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। বিভিন্ন কাছারিতে নৌকাযোগে যাতায়ত করতে গ্রাম্যজীবনের কত দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিপথে এসে তাঁর মনের মধ্যে রেখাপাত করেছিল। এই নূতন অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পী মনকে শুধু নূতন ফসলের জন্য কর্ষণ করে নি, নূতন শ্রেণীর ফসলের বীজও তাঁর মনে বপন করেছিল। সে বিষয় তিনি নিজে কতখানি অবহিত ছিলেন তা ভালো হৃদয়ঙ্গম হয় তাঁর নীচে উদ্ধৃত উক্তি হতে :

"বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে

সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের-ছাদওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট, কত ভাঙনধরা তট. কত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ-বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উঁচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙ-শালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।"

—প্রবাসী ১৩৪৪ বৈশাখ

এই নূতন পরিবেশের নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে তাঁর গল্পধারার একটি নাড়ির সংযোগ ছিল তা খুবই সত্য। কারণ, দেখা যায় যে এই পরিবেশ ত্যাগ ক'রে শিক্ষাব্রতী হিসাবে নূতন ক্ষেত্রে সাধনার জন্য তিনি যখন শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন হতেই এই গল্পের ধারা একেবারে থেমে না যাক স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়েও যে তিনি নিজে অবহিত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় তাঁর এই উক্তি হতে :

"সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোট গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।" —সোনার তরী। সূচনা

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি অনুসারে পদ্মা-যমুনার সঙ্গম ক্ষেত্রের এই নদীমাতৃক ভূমির সহিত সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্গে তাঁর গল্পধারার একটি প্রাণের যোগ ছিল। তাঁর উক্তি হতে এই সমর্থন অনেককে হয়ত আশ্চর্য ক'রে দেবে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কারণ, এখানকার জীবন যেমন তাঁর পল্লীসমাজের সঙ্গে পরিচয়ের অবাধ সুযোগ এনে দিত, তেমন এখানকার নিঃসঙ্গ জীবনে গল্পরচনার কাজ তাঁকে সঙ্গ দান ক'রে তৃপ্ত করত। প্রথমে যখন একা থাকতেন তখন তো তাঁর অষ্টপ্রহরই একা কাটত। পরে যখন সপরিবারে বাস করতেন তখনও নদীপথে ভ্রমণের সময় তাঁর নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটত। গল্পরচনা করতে গিয়ে তিনি যে চরিত্রগুলির অবতারণা করতেন তারাই তাঁর সঙ্গী হয়ে তাঁর একক জীবনকে সহনীয় ক'রে তুলত। প্রবন্ধ রচনায় সেটা সম্ভব নয়, এমন-কি কাব্যরচনায়ও তা সম্ভব নয়।

এই কারণটি তিনি নিজেই এই সময় ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্‌ধৃত হল :

"সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতির পথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছিনে, এবং পেরেও উঠছিনে। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।" —ছিন্নপত্রাবলী, ১২৩ সংখ্যক চিঠি, তারিখ ২৭।৬।১৮৯৪

বলা বাহুল্য, গিরিবালা হলেন তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের নায়িকা।

এই সময় লিখিত গল্পগুলির কাহিনী যে শুধু পল্লীজীবনকে অবলম্বন ক'রে প্রধানত রচিত হয়েছে তাই

নয়, তার পরিবেশ এই রমণীয় নদীমাতৃক দেশ হতে সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে প্রসঙ্গত দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথম পোস্ট্‌মাস্টারের কাহিনীই ধরা যাক। এর যিনি নায়ক তাঁর মডেল রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি-মতে সাহাজাদপুরের পোস্ট-আপিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'র দুখানি চিঠিতে এঁর সম্পর্কে উল্লেখ আছে। একটির তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ এবং অপরটির তারিখ ২৯শে জুন ১৮৯২। দুখানি চিঠিই সাহাজাদপুর হতে লেখা। দ্বিতীয় চিঠি হতে প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত হল :

"এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক-তলাতেই পোস্ট্‌ অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্‌মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।"

প্রসঙ্গত এই চিঠিতেই স্থানীয় এক মুন্সেফবাবুর কথার উল্লেখ আছে। এমনও হতে পারে তাঁকে অবলম্বন ক'রে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির মুন্সেফের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

কাহিনীগুলির পরিবেশ যে এই অঞ্চল হতেই সংগৃহীত হয়েছিল তারও সুন্দর উদাহরণ এই দুটি গল্প হতেই সংগ্রহ করা যায়।

'পোস্ট্‌মাস্টার' গল্পে বর্ষার যে মনোরম বর্ণনা আছে তা এই অঞ্চলেরই বর্ষাকালের দৃশ্য। এটা খাল-বিলের দেশ। পাকা রাস্তা বড় একটা নেই। জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই সাধারণ রীতি। সুতরাং বর্ষার প্লাবনে গ্রামের অভ্যন্তরেও নৌকাযোগেই যাতায়াত করতে হয়। এই প্রসঙ্গে এই গল্প হতে দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচে উদ্ধৃত অংশটি দেখা যেতে পারে :

"শ্রাবণ মাসে বর্ষার অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ। নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।"

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর কাহিনীটির পটভূমি যে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল তাও এই গল্পের মধ্যেই উল্লেখ আছে। রাইচরণ যখন খোকাবাবুকে খুশি করতে তাকে গাড়ি হতে নামতে বারণ ক'রে কদম ফুল পাড়তে চলল, তখন খোকাবাবু কাদের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হল, তার একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। বর্ষার ভরা পদ্মার অসংখ্য স্রোতের সহিত সেখানে চঞ্চলমতি শিশুদের তুলনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"দেখিল জল খল খল ছল ছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।"

জমিদারি তত্ত্বাবধানকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর পল্লীজীবনের সহিত যে নিবিড় পরিচয় হয় তাও তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই হল আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য। এর সমর্থনে প্রমাণ আমরা তাঁর নিজের উক্তি, আচরণ এমনকি কবিতার বাণীর মধ্যেও খুঁজে পাই। যিনি ছিলেন খাস কলিকাতা মহানগরীর সন্তান, যাঁর বাল্যে গ্রাম্য পরিবেশের কচিৎ পরিচয় ঘটেছে, তিনি কর্ম উপলক্ষ্যে স্থাপিত হলেন একেবারে পল্লীর মাঝখানটিতে। সেখানে গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর নিত্য সংযোগ।

যারা তাঁর প্রজা তারা খাজনা দিতে আসে, বা তাঁর কাছে জমি বন্দোবস্ত নিতে আসে বা জমি হস্তান্তর হলে নাম খারিজ করতে আসে। তারা গ্রামেই বাস করে। তারা প্রধানতই চাষী শ্রেণীর লোক; কিছু কারিগর শ্রেণীর লোকও আছে; আবার কিছু মধ্যবিত্ত গৃহস্থও আছে। জমিদারি পরিদর্শনের সময় নানা কর্ম সম্পর্কে তাদের গ্রামে তাঁর যেতে হয়, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতে হয়, তারা কি দুরবস্থার মধ্যে বাস করে তা চোখে দেখতে হয়। এই ভাবে এইখানেই যে পল্লীর মানুষের সহিত প্রথম নিবিড় পরিচয় হয়েছিল, তার উল্লেখ তিনি নানা ভাষণে ও নানা রচনায় করেছেন। তার একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

"কর্ম উপলক্ষে বাংলার পল্লীগ্রামের নিকট পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত আরোগ্যে দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন দিয়ে তারা পদে পদে কি রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে, তার প্রমাণ বারবার পেয়েছি।" —শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের উদ্বোধন-অভিভাষণ

তাদের এই চূড়ান্ত দুর্দশা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে রীতিমত বিচলিত করেছিল। এমনকি তার জন্য তিনি কবিজীবনের প্রতিও এত গভীর ভাবে ধিক্কার বোধ করেছিলেন যে সমাজসেবামূলক কাজ নেবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। এই ধিক্কারবোধই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'র প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে মনে হয়। তার প্রথম স্তবক হতেই তা পরিস্ফুট হবে :

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।

যাদের দৈন্যদশা তাঁকে এমনভাবে কশাঘাত করেছিল তারা 'নতশির মূক সবে' 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া'। তাই এই পল্লীবাসী অবহেলিত পদদলিত মানুষগুলির প্রতি তাঁর মনে একটি বিশেষ কর্তব্যবোধ জেগেছিল। তাই নিজেকে সম্বোধন ক'রে এই কর্তব্যের কথা শুনিয়েছিলেন,

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;

শুধু কাব্যজীবন নয়, এই কর্তব্যবোধের নিপীড়নে তাঁর সাধনজীবনও বিঘ্নিত হয়েছিল। নির্জনে ধ্যান বা একাকী বসে উপাসনা, তাঁর কাছে এর পর অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে একটা ধারণা জেগেছিল ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা ত্যাগ ক'রে দরিদ্র ও নিপীড়িতের সেবার মধ্যেই তাঁর মুক্তি। এই বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগের প্রেরণা হতেই তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের রূপ কেমন হবে, তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। সর্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের আকর্ষণ তিনি অনুভব করেছিলেন। তারই ফলে তাঁর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম এবং শ্রীনিকেতনের পল্লীউন্নয়নের যুগ্মপরিকল্পনা জন্মগ্রহণ করে।

তাঁর *The Religion of Man* গ্রন্থে এ বিষয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে। সে উক্তিটির বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায় :

'নির্জনে অসীমের ধ্যান আর আমাকে আনন্দ দিত না এবং আমার নীরব উপাসনার জন্য যে বাণী আমি ব্যবহার করতাম, তা আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে আর প্রেরণা দিত না। আমি এ বিষয় নিশ্চিত যে আমি অস্পষ্টভাবে বোধ করতাম যে, আমার যা প্রয়োজন তা হল পরার্থপ্রণোদিত কর্ম দিয়ে মানুষের সেবা ক'রে আত্মিক সিদ্ধিলাভ।'

এই কারণে জীবনের এই অধ্যায়ের মধ্যেই তিনি জমিদারির অন্তর্ভুক্ত পল্লীগুলিতে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু তাই ক'রে তাঁর তৃপ্তি হয় নি। এ বিষয় তিনি আরও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে পল্লীর উন্নয়ন কৃষির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই কারণে উন্নত প্রথায় কৃষির ব্যবস্থা না হলে পল্লী অঞ্চলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিষয় ভবিষ্যতে পরীক্ষামূলক কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশ হতে উন্নত কৃষিবিদ্যা সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই তিনি তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃষি শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠান। পরে এক সঙ্গে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদারকে কৃষিশিক্ষার জন্য ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান।

পরে রথীন্দ্রনাথ যখন শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে দেশে ফিরে আসেন, তিনি তাঁকে শিলাইদহকে কেন্দ্র ক'রে কৃষিউন্নয়নের কাজে এবং জমিদারির মধ্যে পল্লীউন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করেন। এর জন্য শিলাইদহের খাস জমিতে একটি বড় খামার স্থাপিত হয়। এ বিষয় যা কাজ হয়েছিল তার কথা রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন। তার পর শান্তিনিকেতনের কাজ যখন এত বৃদ্ধি পেল যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একা তার দায়িত্ব বহন করা সম্ভব হল না, তিনি রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে নিলেন। এই ভাবে জমিদারি অঞ্চলে পল্লীউন্নয়নের কাজের সমাপ্তি ঘটে।

এখানকার পরীক্ষামূলক কাজ কিন্তু বৃথা যায় নি। সেখানে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন ক'রে শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং নূতন উদ্যমে কাজ শুরু হয়। এবার তত্ত্বাবধানের জন্য এলেন লেনার্ড এলমহার্স্ট। এই নূতন পরিকল্পনায় কোনো নির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগ না হলেও কতকগুলি মৌলিক নীতি রবীন্দ্রনাথ বেঁধে দিয়েছিলেন। যেমন গ্রামবাসীকে বাহির হতে সাহায্য করা হবে না, তার শক্তির উৎস নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করতে হবে, সমবায় শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে ইত্যাদি। এই নীতিগুলি উত্তরবঙ্গে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপরই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং শ্রীনিকেতনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে সমাজসেবামূলক কাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

উত্তরবঙ্গের নূতন পরিবেশ এবং নূতন মানুষের সহিত পরিচয় এইভাবে তাঁর সাহিত্যরীতি ও কর্মজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে, জীবনের এই অধ্যায়ে এক দিকে সাহিত্য রচনার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল গল্পধারা। অপর দিকে গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর মধ্যে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগের একটি প্রবল আকুতি জাগিয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিণতিতে তাই শ্রীনিকেতনের পল্লীউন্নয়নের কাজে তাঁকে ব্রতী করেছিল। আনুষঙ্গিক ভাবে এ কথাও স্বীকার্য যে এই সময় রচিত তাঁর কাব্যরচনার মধ্যেও এই নূতন পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এইভাবে মানুষ ও প্রকৃতির সহিত নিবিড় সংযোগ তাঁর কাব্যশক্তিকে দিয়েছিল নূতন পথে বিচিত্র প্রেরণা। সে সময়ে রচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তার প্রমাণ নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। মূলত কাব্যরচনায় বৈচিত্র্য এসেছিল দুই ভাবে। প্রথমত, নূতন ধরণের ভাব তাঁর কাব্যে এর ফলে আত্মপ্রকাশ করেছিল, দ্বিতীয়ত, কাব্যের মধ্যে নানা দৃশ্যের বর্ণনায় এই নদীমাতৃক দেশের ছবিখানি সুস্পষ্টভাবে রূপ নিয়েছিল। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে আমরা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির বিষয় আবার উল্লেখ করতে পারি। সাহিত্যের আসর ছেড়ে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা সেখানে প্রবলরূপে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'জীবনদেবতা'-তত্ত্বের প্রথম আবির্ভাব তাঁর এই যুগে রচিত 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে প্রথম ঘটেছিল, সে কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের দৃশ্যাবলী নানাসূত্রে যে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা প্রমাণ করতে খুব কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের কথাই ধরা যাক না কেন। তার কবিতার মধ্যে মাঝে-মাঝে পদ্মা ও তার উপনদীগুলির মুখখানি যেন উঁকি মারছে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যা' নামে একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না ; শূন্য মাঠ জনহীন ;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
কুটির-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মধ্যে 'উর্বশী' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ঠিক বলতে নারীর উন্মাদিনী রূপের এমন সুন্দর প্রশস্তি সম্ভবত আর রচিত হয় নি। কতকগুলি কারণে মনে হয় যে সম্ভবত পদ্মার তরঙ্গমালা এবং তীরভূমিতে ধানক্ষেতের অনন্তবিস্তারের মধ্যে বাতাসের সঞ্চরণ তাঁর মনে যে অনুভূতি জাগিয়েছিল, তা হতেই মনোরম কবিতাখানির পরিকল্পনাটি তাঁর মনে ফুটে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

'উর্বশী' রচিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। তখন কবি জলপথে নৌকাযোগে শিলাইদহ অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পদ্মার দুইতীরে ধানক্ষেতগুলিতে তখন ধানগাছ বেশ বড় হয়ে উঠে থাকবে, সম্ভবত কোথাও কোথাও ধানের শিষও দেখা দিয়ে থাকবে। তখন হেমন্ত কাল। কাজেই সম্ভবত উত্তরে বাতাস ধীরে বইতে শুরু ক'রে থাকবে। তার স্পর্শে ধানের মাথাগুলি মৃদুভাবে আন্দোলিত হওয়া সম্ভব। সেই মৃদু আন্দোলন শিহরণের সহিত তুলনীয়। ধরণীর আঁচলখানি যেন শিহরিত হয়ে উঠছে এ কল্পনা জাগা স্বাভাবিক। কবির মনের রহস্য কে ভেদ করবে? মনের অন্দরমহলে কি ভাবে কোন্ কবিতার আবির্ভাব হয় বলা শক্ত। তবে এমন প্রশ্ন তোলা অসঙ্গত হবে

না যে সেই দোলায়িত অঞ্চলের শোভাই কি সুরসভাতলে নৃত্যরত উর্বশীর তনুদেহের লীলায়িত সুষমার কল্পনা তাঁর মনে জাগিয়েছিল? তারই আবেশে কি তিনি লিখেছিলেন,

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।

জীবনের এই অধ্যায়ে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'চৈতালি' অন্যতম। তা আকারে ক্ষুদ্র হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যদ্বারা চিহ্নিত; তার একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এখানে যা আছে তার মধ্যে অনুভূতির উচ্ছ্বাস পাই না, ঘটনা পাই না, তাতে পাই ছবি। এই নদীমাতৃক দেশে নৌকাযোগে ঘুরতে তাঁর চোখের সামনে যে ছবিগুলি ফুটে উঠেছিল তা সহজ সরল ভাষায় তিনি কবিতাগুলির মধ্যে ধরে রেখেছেন। এ যেন কবিতায় লেখা ছবির বই। ঠিক বলতে কি, পতিসরের কাছে নৌকা নোঙর ক'রে বসে তিনি এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। সে কথা এই গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলেছেন এই ভাবে:

"পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়াল ঘর, ধানের মরাই, বিচালীর স্তূপ, অন্যতীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যক্ষেত শুধু ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মত অবস্থা নয়। বোটের বাইরের জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রেখেছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়।"

এই নিরলংকৃত ভাষায় আঁকা একখানি ছবি এখানে উদ্ধৃত ক'রে আমাদের বর্তমান আলোচনা শেষ করতে পারি। নাগর নদীর ঘাটে দ্বিপ্রহরের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এই ভাবে:

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্যঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি।

মনে হয়, তুলি দিয়ে এর থেকে ভালো ছবি আঁকা যেত না।

বাঙ্‌লা অপিনিহিতি-তত্ত্ব

সুধীরকুমার করণ

অপিনিহিতির বেড়া ডিঙিয়ে যেতে না পারলে অভিশ্রুতির রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব— বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের জগতে এটি প্রায় অবধারিত সত্য। বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ছাত্র-অধ্যাপক সকলের কাছেই এর সত্যতা প্রায় গাণিতিক। দুটি একের যোগফল যেমন দুই, কিছুতেই তিন নয়— তেমনি অপিনিহিতির রাঢ়ীয় পরিণাম অভিশ্রুতি ছাড়া অন্য কিছু নয়, এ ধরণের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসও আমাদের আছে।

গ্রীক এপেনথেসিস-উমলাউট তত্ত্বের অনুসরণে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের উদ্ভাবিত বাঙ্‌লা অপিনিহিতি অভিশ্রুতি তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত নয় এবং এও প্রায় সর্বজনগৃহীত যে রাঢ়ী উপভাষায়— (সাধারণ চলিত বাঙ্‌লা ভাষা) ক'রে, ধ'রে, ব'লে, চ'লে প্রভৃতি সংকুচিত শব্দ অপিনিহিতির পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তনের ফলশ্রুতি মাত্র। আরো বিশদ্ ক'রে বলা যায়, বাঙ্‌লা 'করিয়া' (ক্+অ+র্+ই+আ) শব্দটি প্রথমে 'কইর‍্যা' (কইরা)-তে বিবর্তিত হওয়ার পরে অভিশ্রুতিতে 'ক'রে (কোরে) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য অপিনিহিতির পরবর্তী ধ্বনি-পরিবর্তনের আরও কয়েকটি আনুমানিক স্তরকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যার ফলে, করিয়া > কইর‍্যা (কইরা) > কইর‍্যে (কইরে) > কর‍্যে > ক'রে (কোরে)।

এ বিষয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেনের একটি ইঙ্গিত অবলম্বন ক'রে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রাঢ়ী উপভাষায় অপিনিহিতির চিহ্ন ছিল না ব'লে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন।[১]

বাঙ্‌লাভাষার আদি-মধ্যযুগে রাঢ়ের আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রক্ষণশীল ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করেও বোঝা যায়, তাতে অপিনিহিতির সামান্য প্রভাবও নেই। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ের রচনা থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় রক্ষিত কইরা, ধইরা প্রভৃতি অপিনিহিত শব্দের অনুরূপ কোনো শব্দ পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনোদিন স্পষ্টতঃ প্রচলিত ছিল না।

ধ্বনি-পরিবর্তনের যে সূত্রের মাধ্যমে আমরা চলিত বাঙ্‌লার অভিশ্রুতি-তত্ত্বে এসে পৌছতে পেরেছি সেই সূত্রটি পুরোপুরি পূর্ববঙ্গীয় ভাষা-রীতিতে প্রযুক্ত হ'তে পারছে না কেন, এ কথাও ভেবে দেখার মত এবং প্রসঙ্গতঃ একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগরিত হয় যে, যে রীতিতে পশ্চিমবঙ্গে অভিশ্রুতির পথ প্রশস্ত হল, সেই রীতিতে পূর্ববঙ্গের উপভাষা এতখানি পশ্চাদপসরণ ক'রে থাকল কি ক'রে।

এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তবে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। ধরা যাক্— রাঢ়ী উপভাষায় কোনোদিনই যথাযথ ভাবে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মত অপিনিহিত উচ্চারণ ছিল না, যাতে শব্দের— বিশেষ করে অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক শব্দের অন্তর্গত 'ই'-কার বা 'উ'-কার যথাস্থানে উচ্চারিত না হয়ে পূর্ববর্তী স্বরের স্থানটি বে-দখল করে বসে। অবশ্য এর নজীর পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাতে যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তা 'বর্ণবিপর্যয়' অভিধায় উক্ত হতে পারে।

---

১ ভাষার ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য

এবারে আমরা পূর্বমগধীয় ভাষাবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেও এই প্রশ্নের উত্তর-সহায়ক নিদর্শন অনুসন্ধান করতে পারি। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার নিজেই বলেছেন, মৈথিলী মগহী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার মধ্যে অপিনিহিতির কোনো স্পষ্ট চিহ্ন নেই। সামান্য কিছু যা পাওয়া যায় তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়—

"In Magadhi Apabhramsa it does not seem to have occured. It is found only to a very limited extent in 'Bihari'; and although it is a common characteristic of the Eastern Magadhan group, it cannot be said to have come into force in the Magadha dialects or languages before the N. I. A. period. The O. B. (old Bengali) remains in the Charyas and in Sarvananda, as well as in the names in the inscriptions, do not give any trace of epenthesis."[২]

এ'তে যদিও বা 'বিহারী' উপভাষাগুলিতে অপিনিহিতির কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় বলে বলা হয়েছে, চর্যাপদে সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে কিংবা প্রাচীন বাঙ্‌লা তাম্রলিপি বা শিলালিপিতে অপিনিহিতির কোনো নিদর্শনই আবিষ্কৃত হয় নি। তা ছাড়া 'বিহারী' উপভাষাগুলিতে অপিনিহিতির যেসব চিহ্ন এখনও বর্তমান সেগুলিও বর্ণবিপর্যয়ের কুক্ষীভূক্ত হতে পারে।

যাই হোক, আপাততঃ দেখা যাক— অপিনিহিতি ছাড়াও অভিশ্রুতিতে পৌছনো যায় কি না। পূর্ববঙ্গীয় অপিনিহিতি যখন যথাপূর্বং রূপেই স্থিত, তখন পশ্চিমবঙ্গীয় অভিশ্রুতি হয়তো-বা অন্যপথে আগমন করেছে। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাকে যদি রক্ষণশীলতার অপবাদ দেওয়া যায়, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক রক্ষণপন্থী কোনো কোনো উপভাষার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কিন্তু এইসব আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যেও পূর্ববঙ্গীয় রীতির অপিনিহিতির অস্তিত্ব নেই।

পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই অপিনিহিতির প্রাধান্য। স্বরসংগতির প্রত্যক্ষ প্রভাব সেখানে অল্প। রাঢ়ীয় উপভাষায় স্বরসংগতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকৃত। পূর্ববঙ্গীয় কইরা ধইরা বইলা চইলা হাউট্টা মাউট্‌ঠা কাউট্‌ঠা প্রভৃতি সাধারণ চলিত বাঙ্‌লার উচ্চারণে হয়, কোরে ধোরে বোলে চোলে হেটো মেঠো কেঠো। স্বরসংগতির দ্বারা সৃষ্ট চলিত বাঙ্‌লার পূজো ধুনো তুলো কুলো এসো বসো প্রভৃতি শব্দের অনুরূপ কোনো নিদর্শন পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় রক্ষিত নেই। এর থেকে অন্ততপক্ষে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্ববঙ্গের উপভাষায় অপিনিহিতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও স্বরসংগতির প্রাধান্য নেই এবং চলিত বাঙ্‌লাভাষায় তার বৈপরীত্য। পশ্চিমবঙ্গের ভাষারীতিতে স্বরসংগতির প্রাধান্য দেখে মনে হয়, স্বরসংগতির মাধ্যমেই অভিশ্রুতির জন্ম। অপিনিহিতির ঘুরপথ দিয়ে তাকে আসতে হয় নি।

'কোরে' শব্দটির সংস্কৃতমূলকতায় না গিয়ে, বাঙ্‌লাভাষায় 'সাধু'রূপে পরিচিত 'করিয়া' শব্দ থেকেই 'কোরে' শব্দের উদ্ভব ও বিবর্তনের বৈয়াকরণিক রূপরেখার দিকে তাকিয়ে এভাবেও উক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায়। এই পন্থায় 'করিয়া' (ক্+অ+র্+ই+আ) থেকে 'কর্‌যা' (দ্রুত উচ্চারণে

২ *Origin and Development of the Bengali Language*

সংকুচিত), করা্যা থেকে স্বরসংগতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে করো্য (ক্+অ+র্+ই+এ) এবং 'করো্য' থেকে 'ক'রে' (কোরে) হয়। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে স্বরাঘাত হয়। এই স্বরাঘাতের ফলেই শব্দ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা উপভাষায় (দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষায়) এবং সীমান্তরাঢ় বাঙ্‌লায় (মানভূম-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম-পশ্চিমবাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল) এখনো এর জীবিত প্রমাণ আছে।

জিহ্বার উত্থানপতনের দিকে সজাগ মনোনিবেশ ক'রে, বাঙ্‌লা মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থানে তাকিয়ে, উপরি উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শু'নে বু'নে চ'লে ব'লে হেটো মেঠো ভেবে রেগে এসে প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যাখ্যা করতে পারা যায় এবং এর জন্য কোনো কারণেই শুইন্যা (শুইনা), বুইন্যা (বুইনা), চইল্যা (চইলা), হাউট্‌টা (হাউটা), মাউঠ্‌ঠা (মাউঠা) প্রভৃতি শব্দের গণ্ডী অতিক্রম করার প্রয়োজন হয় না।

দ্রুত ধ্বনি পরিবর্তনের পক্ষে স্বরসংগতি খুব বেশি সহায়ক এবং জিহ্বার অবস্থিতির স্থান সামান্য পরিবর্তিত হলেই ধ্বনির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কেন ক্যান্ ক্যানো দেশ কেশ খেলা প্রভৃতি শব্দের এ'কার কিভাবে পরিবর্তিত রূপে দেখা দেয়, তা সহজেই অনুমেয়। এই স্বরসংগতির মাধ্যমেই 'করিয়া'র দ্রুত রূপান্তরণ সম্ভব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান কালের কোনো কোনো আঞ্চলিক উপভাষার উচ্চারণপদ্ধতির দিকে লক্ষ্য রেখে দেখা যায় যে অপিনিহিতির মাধ্যমে না এসেও, অনেক শব্দ স্বরসংগতির রাস্তা ধ'রে অভিশ্রুতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি প্রচলিত বাঙ্‌লার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। অর্থাৎ— করো্য (করিয়ে), ধরো্য (ধরিয়ে), ভেবো্য (ভেবিয়ে), মাখো্য (মাখিয়ে), রাখো্য (রাখিয়ে) পর্যন্তই তার অগ্রগমন সম্ভব হয়েছে এবং অন্তিক 'ইয়ে' ধ্বনি-র 'ই' হ্রস্ব উচ্চারিত হতে হতে প্রায় বিলুপ্তির আভাস জ্ঞাপন করছে।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় রচিত মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। এই জেলার ভাষা প্রচলিত বাঙ্‌লা। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর এই গ্রন্থে অপিনিহিতির কোনো নিদর্শন নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় অবশ্য গ্রন্থের ভূমিকায় অসংখ্য অপিনিহিত শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। আসলে কিন্তু শব্দগুলি সুনীতিকুমার-কথিত অপিনিহিতির উদাহরণ নয়, মূল শব্দের স্বাভাবিক সংকুচিত রূপ মাত্র। মাণিকরাম-কর্তৃক ব্যবহৃত পড়্যা (<পড়িয়া), খুঁজ্যা (<খুঁজিয়া), নাট্যা (<নাটুয়া), বেছ্যা (<বাছিয়া), কেট্যা (<কাটিয়া), রেখ্যা (<রাখিয়া), বেন্যা, এন্যা, পেড়্যা, বেন্যা, এস্যা, শুন্যাচি, কর্যাচ, সের্যা, চেপ্যা, ছেল্যা, লেখ্যা, থেক্যা, হেত্যার, মেট্যা, জেন্যা, মেন্যা, শুনিএ, গিয়ে, আস্য আস্য (<আসিহ আসিহ), বস্য বস্য(বসিহ বসিহ), করো্য, রেঁধ্যা, বেড়্যা, হেস্যা, হেসিএ প্রভৃতি শব্দ হয় মূলশব্দের হ্রস্বীকৃত রূপ অথবা স্বরসংগতির প্রভাবজাত বিবর্তিত রূপ।

স্বরসংগতির মূল সূত্র প্রয়োগে উপরি উক্ত শব্দগুলির স্বরূপ অনায়াসেই বোঝা যায় এবং উক্ত শব্দগুলি পরবর্তী শতাব্দীতে কিংবা তারও পরে দ্রুত পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমান কালের— পড়ে খুঁজে

নেটো বেছে কেটে রেখে বেনে এনে ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হচ্ছে। এখানেই এদের অগ্রগমনের পথ সম্ভবতঃ রুদ্ধ হল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের রচিত কোনো পুঁথিতে, পইড়া কাঁইদা থুঁইজ্যা নাউট্টা বাইছ্যা (বেইছ্যা) শুইনাচি ইত্যাদি অলভ্য এবং আমাদের সমকালে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলীয় উচ্চারণ অন্ততপক্ষে বাঙ্‌লাদেশের পশ্চিম সীমান্তভূমিতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষায় সংরক্ষিত।

সীমান্তরাঢ়ী উপভাষাতে অভিশ্রুতি নেই, এমনকি অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র স্বরসংগতির প্রাধান্য অল্প। সীমান্তরাঢ়ীতে করিয়া ধরিয়া চলিয়া বলিয়া রাখিয়া মাখিয়া প্রভৃতি শব্দ কর্যে (=করিয়ে-র দ্রুত উচ্চারণ), ধর্যে চল্যে বল্যে, রাখ্যে মাখ্যে রূপে উচ্চারিত হয় এবং উচ্চারণে জলুয়া মাঠুয়া হাটুয়া প্রভৃতি শব্দের অন্তিক-আ হ্রস্ব-আ'র রূপ ধারণ করে। এই হ্রস্ব-আ আবার যদি ভবিষ্যতে স্বল্প স্বরাঘাতযুক্ত হয়, তাহলে কর্যে, ক'রে -তে পর্যবসিত হতে পারে। প্রচলিত বাঙ্‌লায় তা ঘটেছে এবং ঐ কারণেই আদিবর্ণের অ-কার (ব্যঞ্জন সংযুক্ত) ও-কার-ত্ব প্রাপ্ত হয়ে 'কোরে' হয়েছে।

সীমান্তরাঢ়ী উপভাষার অঞ্চল বিশেষে, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা ভাষার অঞ্চলবিশেষে 'কর্যে' শব্দের অন্ত-এ' কার বিলুপ্তির ফলে, শেষ পর্যন্ত তা 'করি'তেও রূপান্তরিত হয়েছে। সীমান্তরাঢ়ীতে কর্যেছিলি (=কোরেছিলুম) করিছিলি, ধর্যেছিলি ধরিছিলি উভয় ধরণের উচ্চারণই শোনা যায়। কিন্তু যে শব্দের আদি অক্ষর আ-কার যুক্ত, সে শব্দের শেষাংশে স্বরসংগতির প্রভাব লক্ষিত হলেও আদিতে তার কোনো আভাস নেই। মাখিয়া, রাখিয়া প্রভৃতি শব্দ এখনও মাখ্যে, রাখ্যে রূপে উচ্চারিত হচ্ছে। এদের মেখ্যে, রেখ্যে-র দিকে প্রবণতা একেবারেই নেই, এবং ক্রমশঃ মাখে (=মেখে) রাখে (=রেখে), রূপেই উচ্চারিত হচ্ছে, বিশেষ করে এগুলি যখন অতীতকালে প্রযুক্ত হচ্ছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রচলিত দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা উপভাষার কোনো কোনো অঞ্চলে এইসব লক্ষণ বর্তমান। ঐসব অঞ্চলে কর‍্যা ধর‍্যা মাখ্যা যায়্যা প্রভৃতির সংকুচিত উচ্চারণই লক্ষণীয়।

এ ক্ষেত্রেও অপিনিহিতির সামান্য লক্ষণ অবর্তিত।

তমলুক অঞ্চলের উপভাষায় শব্দের আদিতেই স্বরসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য এই যে, সেখানে আঁড়িয়া হয় এঁড়্যা, গাড়িয়া হয় গেড়্যা, রাখিয়া হয় রেখ্যা, জাগিয়া হয় জেগ্যা। অথচ কোনোরূপ অপিনিহিতির সীমারেখা অতিক্রম না করেই তা হয়েছে এবং স্বরসংগতির স্বচ্ছ প্রভাবেই 'আ'— রূপান্তরিত হয়েছে 'এ'-তে। ভবিষ্যৎ উচ্চারণে এঁড়্যা শব্দের ক্রমবিবর্তিত রূপ হবে— এঁড়্যে থেকে এঁড়ে। রেখ্যা হবে রেখ্যে, তার পরে রেখে।

বৈয়াকরণিক সূত্র অনুসারে আ+ই=এ; কিন্তু উপরিউক্ত ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আ এবং ই একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি অবস্থান না করেও এবং ব্যঞ্জনের সান্নিধ্য হেতু ঈষৎ দূরত্বে থেকেও সংগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। এই কারণেই বাড়িয়া হয়েছে বেড়িয়া (<সংস্কৃত বাটিকা); যথা মুগবাড়িয়া>মুগবেড়িয়া, কলাবাড়িয়া>কলাবেড়িয়া; অনুরূপ উলুবেড়িয়া। কিংবা গাছিয়া হয়েছে গেছিয়া। যথা— কুলগাছিয়া>কুলগেছিয়া, বড়গাছিয়া>বড়্‌গেছিয়া এসব ক্ষেত্রে উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনিকে উচ্চ পর্যায়ে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সীমান্তরাঢ়ীতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লায় উ-কারেরও অপিনিহিতি প্রবণতা নেই। যদুয়া মধুয়া হাটুয়া মাধুয়া কাঠুয়া (প্রচলিত বাঙ্‌লা যদো মধো হেটো মেঠো কেঠো) উচ্চারণের দ্রুততার জন্য সংকুচিত হয়ে পড়ে মাত্র। যদুয়া এবং মধুয়া থেকে "যদুও" এবং "মধুও" স্বরসংগতির মাধ্যমে এসে শেষে যোদো-মোধো' তে অনায়াসে রূপান্তরিত হতে পারে। এর জন্য যউদ্যা-মউধ্যার কোনো প্রয়োজন-ই হয় না।

এইভাবেই কাঠুয়া>কেঠুয়া>কেঠুও>কেঠো। হেটো মেঠো এইভাবেই আসতে পারে। এইরূপেই জালিয়া>জেলিয়া>জেলিএ>জেলে। কিন্তু কেঠো-মেঠোর ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কাঠুয়া শব্দের প্রথম আ স্বরসংগতির নিয়ম অনুসারে এ-তে রূপান্তরিত হয় কি করে? আসলে এগুলি, হয় যথেচ্ছ, নয়, স্বর-অসংগতির পরিণাম।

সেধ (সেধের ঝি=সাধুর ঝি), চেল (চেলের দাম=চালের দাম), ডেল (=ডাল), প্রভৃতি শব্দ সাউধ-সাইধ, চাউল-চাইল (?), ডাউল-ডাইল থেকে উদ্ভূত এবং এগুলিকেও অপিনিহিতির বেষ্টনী অতিক্রম করতে হয়েছে বলে একটি ধারণা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ শব্দগুলি কিন্তু একমাত্র সম্বন্ধ কারকের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে কোথাও এককভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং বলা যেতে পারে চাল কোনোদিন চেল হয় না চালের দামই চেলের দামে রূপান্তরিত হয়। মূলশব্দ চাউল এবং ডাউলের 'উ' অপিনি-হিতির 'উ' কিনা সুধীজনের বিচার্য—তবে সাউধ শব্দের 'উ' বর্ণবিপর্যয়ের পর্যায়ভুক্ত। চাউল এবং ডাউলের 'উ' অনায়াসে পরিত্যক্ত হতে পারে এবং হয়তো-বা সেই নজীরে সাউধের 'উ'ও পরিত্যক্ত।

অবশ্য ভাষাতত্ত্বের জগতে অনিয়ম অনেক আছে। তাই কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে গ্রাম্য-ভাষায় বাঁড়ুয্যে হয়েছে বেঁড়ুয্যে; আসবার>এসবের; হারিয়ে>হেরিয়ে।

হাওড়া-হুগলী জেলার গ্রাম্য ভাষার উচ্চারণে হাইরে (=হারিয়ে), পাইলে (=পালিয়ে) তাইড়ে (=তাড়িয়ে) প্রভৃতি শব্দকে অনেকে অপিনিহিতির নিদর্শনরূপে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু মূল বাঙ্‌লা শব্দ হারাইয়া>হারিয়া (হ্‌+আ+র্‌+(বিলুপ্ত আ)+ই+আ>হারিয়ে>হাইরে)। এইখানেই এদের পথচলার শেষ। এ-শব্দগুলির হেরে পেলে কিংবা তেড়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে বর্ধমান অঞ্চলে—'তেড়ে'-র ব্যবহার পাওয়া যায় (যথা, গোরুটাকে তেড়ে দে)। এক্ষেত্রে 'তাড়াইয়া' থেকে 'তাড়িয়া' হয়ে তারপর 'তেড়িয়া' 'তেড়িয়ে' পেরিয়ে 'তেড়ে' হয়েছে। একে শব্দসাদৃশ্য বা অ্যানালজির পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। উচ্চারণের দ্রুতি-প্রবণতার ফলেও হারাইয়া>হারাইয়ে>হার্‌ (আ) ইয়ে (=হারিয়ে)>হাইরে (বর্ণবিপর্যয়) হয় এবং প্রাথমিক ভাবে স্বরসংগতিই এইসব ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। হাইরে'র ই বিশুদ্ধ বর্ণবিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ধরণের ব্যাপার কিন্তু একাক্ষর ধাতুতে ঘটে নি। হার্‌ ধাতুর সঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হারিয়া হয়েছে এবং তা'ও হারিয়ে, হেরিয়ে (হের্যো) হয়ে 'হেরে' হয়েছে (হেরে যাওয়া ইত্যাদি)। দ্বি-অক্ষর ধাতু হারা'র সঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এসেছে হারাইয়া। যা'র থেকে প্রচলিত বাঙ্‌লা 'হারিয়ে'র উদ্ভব।

সীমান্তরাঢ়ীতে করতে ধরতে প্রভৃতি শব্দ কোনো কোনো সময় কইর্‌তে ধইর্‌তে রূপে উচ্চারিত
ই ই
হয়। 'ই'-কার স্পষ্টতঃ অতিহ্রস্ব থাকে এবং তার রূপ হয় কত্তে, ধত্তে ইত্যাদি। এগুলিকে অপিনিহিতির উদাহরণ রূপে গ্রহণ করার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কোনো

কোনো বাঙ্‌লা গ্রন্থের মধ্যে লিখিত কত্যে খেত্যে ধত্যে প্রভৃতি শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, সীমান্ত-রাঢ়ীর ঐ অপিনিহিতি প্রবণতাও বর্ণবিপর্যয়ের ফলশ্রুতি, যা'তে করিতে>কর্‌তিয়ে (কত্যে) >কইত্তে। প্রমাণ স্বরূপ দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা উপভাষার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আশ্বস্ত হওয়া যায় যে করিতে ধরিতে শব্দের 'ই' পরিত্যক্ত হয়ে উচ্চারণে কর্‌তে ধর্‌তে (কত্তে, ধত্তে) হয় (প্রচলিত বাঙলা কোত্তে ধোত্তে নয়) এবং করিব ধরিব প্রভৃতি শব্দেরও 'ই' পরিত্যক্ত হয়ে উচ্চারণে কর্‌ব (কোরবো নয়) ধর্‌ব (ধোরবো নয়) হয়েছে। লক্ষণীয় সীমান্তরাঢ়ীতে অসমাপিকা কিন্তু কইরে ধইরে রূপে উচ্চারিত হয় অল্পই এবং উক্ত উপভাষার যেসব অঞ্চলে 'ই' বিলুপ্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রের করে ধরে—(কোরে, ধোরে নয়) শ্রুত হচ্ছে। অবশ্য কর্যে ধর্যে-র দিকেই প্রবণতা বেশি।

যশোহর-খুলনার ভাষায় পাবনা এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় অপিনিহিতির উচ্চারণ শোনা যায় না। মধুসূদন তাঁর নাটকে কর্যে আন্যে টান্যে নাড়্যে (<নাড়িয়া=নেড়ে) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন।

সীমান্তরাঢ়ীতে য়-ফলার (য-ফলা) উচ্চারণ 'ইঅ' ধ্বনিকেই প্রশ্রয় দেয়। ফলে 'কাব্য' উচ্চারিত হয় কাব্‌বিয়, সত্য হয় সত্তিয়, কন্যা হয় কন্‌নিয়া। অবশ্য এসকলের ক্ষেত্রেও বর্ণবিপর্যয়ের প্রভাব যে একবারে পরিলক্ষিত হয় না তা নয়।

আসলে সীমান্তরাঢ়ীতে ও দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লা ভাষায়, অসমাপিকা ক্রিয়ার শব্দে অপিনিহিতির চিহ্ন পাওয়া দুষ্কর। সংকোচনের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙ্‌লার— ধর্যা বস্যা (বুস্যা) কয়্যা (কয়া) ধায়্যা মার্যা খায়্যা প্রভৃতির রূপ হয় ধর্যে বস্যে কয়্যে ধায়্যে, মার্যে এবং খায়্যে।

সম্ভবতঃ, সীমান্তরাঢ়ীয় উচ্চারণের চায়্‌র, আয়্‌জ কায়্‌ল (চার, আজ কাল) প্রাথমিক ভাবে চাইর, আইজ, কাইল-ই ছিল (<চারি<আজ্জি<কালি)। এগুলিকেও বর্ণবিপর্যয়ের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যায় কিনা, তা বিচার্য। অবশ্য অপিনিহিতির মাধ্যমে এদের অভিশ্রুত রূপ, চের এজ কেল যদি পাওয়াও যায় তা হলে এগুলি যথেচ্ছ অথবা অন্য কোনো অ্যানালজিতে ফেলা যায় কিনা তাও বিচার্য।

আসলে অপিনিহিতি-তত্ত্ব এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। অসমাপিকার উপরেই তার ভিত্তি। পূর্ববঙ্গীয় কইর্যা ধইর্যা-কেও বর্ণবিপর্যয়ের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করলে একমাত্র স্বরসংগতির সূত্র অনুসারেই বর্তমানের অভিশ্রুত শব্দে উত্তরণ অসম্ভব নয়।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ১৮৬৬-১৯৪৬

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জনপ্রিয়তার দিক থেকে ওয়েল্‌স্ এ যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এই জনপ্রিয়তার কারণ, তাঁর সাহিত্য-সাম্রাজ্যটি সম্ভবে-অসম্ভবে বাস্তবে-অবাস্তবে মিলে বর্ণাঢ্য ও রহস্যময়। সেখানে প্রকৃত জীবন যেমন, জীবনের বিকৃতিও তেমনি চোখে পড়ে। সেখানে যুক্তি এসে সব-কিছুর উপর সব সময় খবরদারি করে না। ফলে সে রাজ্যের রসের নদীটা কৈফিয়তের পাষাণস্তূপে বাধা পায় নি কখনও।

বলা বাহুল্য, রহস্য-কাহিনীকার হারবার্ট জর্জ ওয়েল্‌স্ প্রসঙ্গেই এ কথা খাটে; ঐতিহাসিক প্রবন্ধকার বা জীবনভিত্তিক কথাশিল্পী ওয়েল্‌স্ প্রসঙ্গে নয়। আর যেহেতু আমাদের এই লেখকের সবচেয়ে বড় পরিচয় বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনীকার হিসেবে, অতএব এ কথাই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা।

ওয়েল্‌স্ যেখানে ঐতিহাসিক, রসের নদীটি সেখানে সাগরে গিয়ে পৌঁছল। আদ্যিকাল কথা কয়ে উঠল সেখানে। শতশতাব্দীর মানবসভ্যতা মহাসমুদ্রের মতোই এক অখণ্ড মূর্তি ধরে দেখা দিল।

অবশ্য, সাহিত্যসাধনার গোড়ার দিকে ওয়েল্‌স্ ঘরে বসে দূরের স্বপ্ন দেখবার বাসনা করেছিলেন। ওয়েল্‌স্‌এর অনুরাগীরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এ কথা। 'দি টাইম্ মেশিন' (১৮৯৫) প্রথমেই তাঁদের চোখে পড়বে। তাঁরা স্বীকার করবেন হয়তো, ওয়েল্‌স্‌এর সাহিত্য-সাম্রাজ্যে চলতে চলতে নিজেদের অজানতেই সে মেশিনে পা দিয়েছি; এবং তার পর কখন যে ভবিষ্যতের বুক চিরে হাজার হাজার বছর ঘুরে এসেছি তা জানতেও পারি নি।

বলতে কি, আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিকে হঠাৎ অস্বাভাবিকরকম স্ফীত করে দেন বলেই ওয়েল্‌স্ আমাদের কাছে স্মরণীয়। তাঁর গল্প পড়তে বসে সম্ভব থেকে অসম্ভবের দেশে, বাস্তব থেকে অবাস্তবের রাজ্যে অভিসার করি, কিন্তু কখন সে সম্ভব-অসম্ভব বা বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখাটি পেরিয়ে গেছি তা ঠাওর করতে পারি না। এইখানেই ওয়েল্‌স্‌এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। গল্প বলতে বসে তিনি আমাদের এমন করে ভুলিয়ে রাখেন যে অতি বড় অবিশ্বাস্য ঘটনা পড়তে বসেও ঘটনাটিকে হেসে উড়িয়ে দেবার সাহস আমরা হারিয়ে ফেলি। আমাদের মনে হয়, 'দি ওয়াণ্ডারফুল ভিজিট'এর (১৮৯৫) দেবদূত সত্যি এসেছিল পৃথিবীতে। 'দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো'তে (১৮৯৬) জীববিজ্ঞানী ডক্টর মোরোর পশুকে মানুষে রূপান্তরের সাধনা সত্যি হয়েছিল। এ ছাড়া 'দি ইনভিজিব্‌ল্ ম্যান'এ (১৮৯৭) অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানী গ্রিফিন এবং 'দি ওআর অব্ দি ওআরলড্‌স্'এ (১৮৯৮) পৃথিবীর উপর মঙ্গলবাসীদের আক্রমণ অবিশ্বাস্য কিছু নয়। আর 'দি ফার্স্ট মেন ইন্ দি মুন'এ (১৯০১) নিজেরাই চন্দ্রলোকে অভিযান করি আমরা, 'দি ফুড অব দি গড্‌স্'এ (১৯০৪) পৃথিবীকে দেখি বিরাট একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। এই যে দেখাবার বিশিষ্টতা, গল্প বলতে বলতে এই যে অপরিচয়ের মায়ালোকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা, এরই জন্যে ওয়েল্‌স্ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এ ছাড়া দূরদর্শিতার
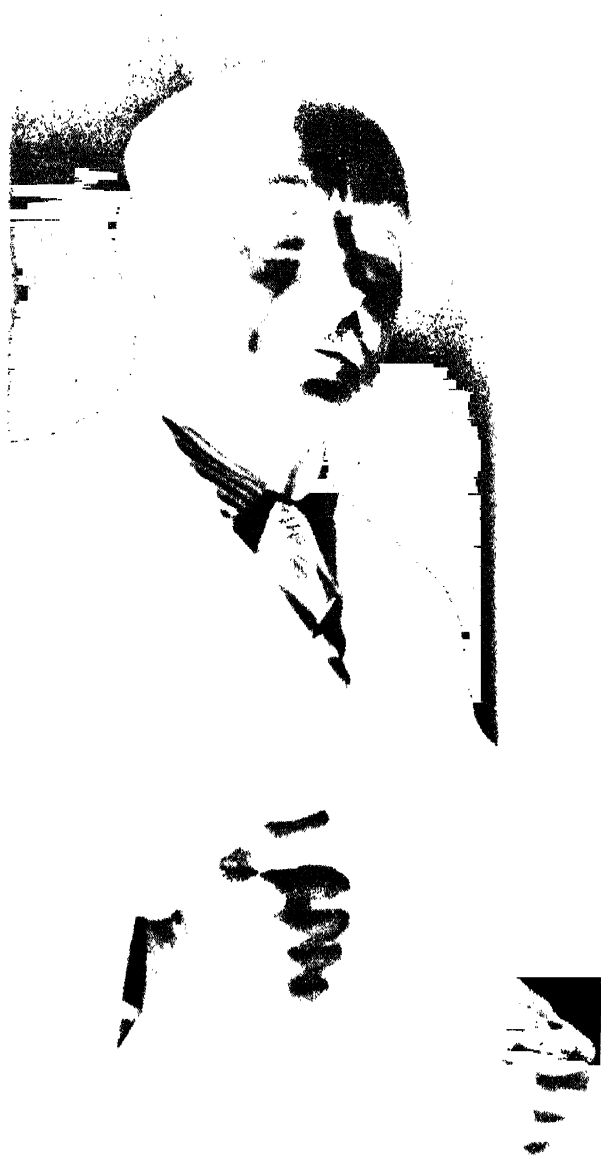
এইচ. জি. ওয়েলস্‌

১৮৬৬-১৯৪৬

জন্যেও পাঠকদের অকুণ্ঠিত সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। 'দি ওআরল্‌ড্ সেট্ ফ্রী'তে (১৯১৪) যে ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের কথা তিনি বলেছেন, হিরোশিমা ও নাগাশাকির মারণ-যজ্ঞের মধ্য দিয়ে তার খানিকটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বাকীটা হয়তো কোনোদিন সত্যি হয়ে উঠতে পারে, পারমাণবিক অস্ত্রউৎপাদন নিয়ে রেষারেষি এরই মধ্যে পুরো দমে শুরু হয়েছে। অবশ্য, ভবিষ্যদ্বাণী সফল হোক, ওয়েল্‌স্ তা চান নি। বরং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যত মিথ্যে প্রমাণিত হবে, তিনি ততই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠবেন। ততই বিজ্ঞানের আলোকে একদিন যে পথকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, অজ্ঞানরা সেই পথেই মুক্তি ও কল্যাণের নিশানা পাবে।

তাই বলে পথ দেখানো সাহিত্যিকের প্রধান কাজ নয়। ওটা উপরি-পাওনা। আসলে পাওনা রস। বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনীর বেলায় এই রসসৃষ্টিতে ওয়েল্‌স্‌এর সাফল্য যে বিস্ময়কর তা আমরা দেখলাম।

এবার তাঁর অন্যান্য রচনার প্রসঙ্গে আসা যাক। সেখানে দেখি, ওয়েল্‌স্ বৈজ্ঞানিক রহস্য থেকে সমাজের গলদের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। কিছুটা যেন প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছেন। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কি বোঝায় এবং শান্তি কিভাবে আসতে পারে, তা যেন শিক্ষকের আসনে বসে ব্যাখ্যা করছেন। অথচ এ ধরণের ব্যাখ্যার দরকার ছিল না। কেননা মানুষ শান্তি চায় না, তা তো নয়। শান্তি সকলেই চায়; চায় না শুধু শান্তির পরিপন্থী হিংসা ও লোভকে ছাড়তে।

ওয়েল্‌স্ কিন্তু অন্যরকম ভাবলেন। তাঁর ধারণা হল, সামাজিক ন্যায়বিচার ও শান্তির কথা মানুষের মনে যদি বদ্ধমূল করে দেওয়া যায়, তবে একদিন-না-একদিন বিশ্বরাষ্ট্র বা 'ওআরল্‌ড্ স্টেট্' নিশ্চয়ই স্থাপিত হবে। তাই তিনি লিখতে শুরু করলেন এমন-সব বিষয় নিয়ে যাদের থেকে সমাজের অন্যায়-অবিচারের কথা ধরা পড়ে। রচনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবেন বলে নিজের জীবন থেকে ঘটনা-নির্বাচন করলেন; শৈশব ও কৈশোরের অশান্তি ও দারিদ্র্যঘেরা দিনগুলোর দিকে তাকালেন বারবার। ছেলে-বেলার সেই জামাকাপড়ের দোকানের কথা মনে পড়ল তাঁর। মনে পড়ল, একদিন শিক্ষানবিশ হিসেবে ওখানে অনেক লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা সহ্য তাঁকে করতে হয়েছিল। ওয়েল্‌স্‌এর সামাজিক উপন্যাস 'দি হুইল্‌স্ অব্ চান্‌স্' (১৮৯৬), 'লাভ্ অ্যাণ্ড্ মি. লেউইসাম্' (১৯০০), 'কিপ্‌স্' (১৯০৫) ও 'দি হিস্ট্রি অব্ মি. পলি' (১৯১০) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের লেখক মূলতঃ যেন লেউইসাম্, কিপ্‌স্ ও পলিকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধটি তুলে ধরেছেন। যেন দেখাতে চেয়েছেন, সমাজ এদের উপর অন্যায়ভাবে অনেক কিছু দাবি করল; কিন্তু প্রতিদানে যা দিল তা অতি তুচ্ছ। তাই জীবনযুদ্ধে সফল হল না এদের কেউ। সমাজে কেউই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারল না।

ওয়েল্‌স্ এবার চাইলেন এমন-একটি সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে লেউইসাম্, কিপ্‌স্ ও পলিরা প্রতিষ্ঠা পাবে। এই সমাজই হল তাঁর কল্পিত বিশ্বরাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রে যুদ্ধ ও অশান্তি থাকবে না, স্বেচ্ছাচার ও জুলুমবাজী সেখান থেকে চিরকালের মত লোপ পাবে। এই স্বপ্নরাজ্যকে সম্ভব করবার আশায় আমাদের লেখক এবার থেকে যেন প্রচারকের ভূমিকা নিলেন। লাঞ্ছিতের দাবিকে যুক্তিতর্ক ও নীতিকথার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই তাঁর অনেক রচনাতেই কল্পনার স্থলে তত্ত্ব প্রাধান্য পেল।

অবশ্য, এই প্রাধান্যের কারণ এই নয় যে, ওয়েল্‌স্‌এর কল্পনাশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। বরং বলা চলে,

হ্রাস পেয়েছিল তাঁর রসসাহিত্য-রচনার আগ্রহ। ইচ্ছে করেই রচনার শিল্পমূল্যের চেয়ে তত্ত্বমূল্যকে বেশি গুরুত্ব দিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষক ওয়েল্‌স্‌ শিল্পী ওয়েল্‌স্‌কে সর্বত্র আচ্ছন্ন করতে পারলেন না। এ পর্বেও এমন-কিছু রচনা আমরা পেলাম যেখানে উপন্যাসের ধর্ম প্রায় অটুট আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'অ্যান ভেরোনিকা' (১৯০৯), 'দি নিউ ম্যাকিয়াভেলী' (১৯১১), 'ম্যারেজ' (১৯১২) ইত্যাদি।

এর অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক ছোটগল্পের মধ্যে আমরা আমাদের এই রহস্যসন্ধানী লেখককে মাঝে মাঝে খুঁজে পাই। আমাদের মনে হয়, ছোটগল্পকার হিসেবেও ওয়েল্‌স্‌ অবিস্মরণীয়। শুধুমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক ছোটগল্পই তিনি লেখেন নি; অলীক কল্পনা, ভৌতিক কাহিনী ও স্বপ্নজগৎকে নিয়ে গল্প-রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। কখনও সম্ভাব্য আবিষ্কার ও অভিযানকে নিয়ে লিখেছেন তিনি; কখনও আবার অসম্ভবের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। জীবনকে নিয়ে মর্মস্পর্শী গল্প লিখেছেন কখনও; কখনও আবার লিখেছেন হাসির গল্প। বিরাট তাঁর গল্পের পরিধি; বিচিত্র তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু। তবে সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয়, 'দি কান্‌ট্রি অব্‌ দি ব্লাইণ্ড' বা অন্ধের দেশ'ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

জীবনের শেষ প্রায় পঁচিশ বছর ওয়েল্‌স্‌ ছোটগল্প খুব বেশি লেখেন নি। তখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশ্বরাষ্ট্রের দিকে। এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'দি আউট্‌লাইন অব দি হিস্ট্রি' (১৯২০), 'দি সায়ান্স্‌ অব লাইফ্‌' (১৯৩১) এবং 'দি ওয়ার্ক, ওয়েল্‌থ্‌ অ্যাণ্ড হ্যাপীনেস্‌ অব ম্যানকাইণ্ড্‌' (১৯৩২)। এই গ্রন্থগুলি আলোচনা করলে ওয়েল্‌স্‌এর একটি বিশেষ মতবাদকে খুঁজে পাওয়া যায়। মতবাদটি হল এই যে, মানুষকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে এক অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবেই বাঁচতে হবে। ওয়েল্‌স্‌এর এই ধারণার মূলে ছিল জীববিজ্ঞান এবং প্রধানত: ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ক্রমবিবর্তনের ফলেই মানুষ আবির্ভূত হয়েছে। অতএব এই পৃথিবীর গাছপালা জীবজন্তু মাটি-পাথর— সব-কিছুর সঙ্গেই তার রয়েছে নাড়ীর যোগ। মানুষ এ পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব মানুষে মানুষে বিভেদ অন্যায় ও অযৌক্তিক। কিন্তু তবু সংশয় ছিল ওয়েল্‌স্‌এর। তাঁর ভয় ছিল, অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত, মানুষ শেষ অবধি হয়তো তা উপলব্ধি করতে পারবে না। এই ভয় ও সংশয় থেকেই 'ইউ কান্‌ট্‌ বি টু কেয়ারফুল' (১৯৪১) এবং 'মাইণ্ড অ্যাট্‌ দি এণ্ড্‌ অব্‌ ইট্‌স্‌ টেথার'এর (১৯৪৫) জন্ম।

যে বিজ্ঞানবিদ্যা একদিন নবীন ওয়েল্‌স্‌কে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, প্রবীণ ওয়েল্‌স্‌ও সেই একই বিদ্যার মধ্য দিয়ে মুক্তিকে খুঁজেছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের কেন্টে জন্ম নেওয়া শিশুটি শিশুর কৌতূহল নিয়েই বিজ্ঞানবিদ্যার রাজদরবারে তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছিলেন। সব জিজ্ঞাসার জবাব তিনি হয়তো পান নি। কিন্তু তবু অনেক দূর অবধি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তাই ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট যখন তাঁর মৃত্যু হল, তখন অনুরাগীদের অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছিল, অজ্ঞানে-ভরা বিরাট এক 'অন্ধের দেশ' থেকে বিজ্ঞানের এক সত্যদ্রষ্টা চলে গেলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬। দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে নির্বাচিত দুই শত পদের সংকলন এবং সেগুলির আধুনিক বাংলা অনুবাদ। মূল এবং অনুবাদ ছাড়া, প্রথমে আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা (১-১০১ পৃ) এবং পরে আছে 'ভাষাতাত্ত্বিক টীকাটিপ্পনী' (৩৪৫-৩৫৩ পৃ) ও 'পৌরাণিক প্রসঙ্গ পরিচিতি' (৩৫৪-৩৬২ পৃ)। পরিশিষ্টে আছে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয়' (২৬৫-৩৭৬ পৃ)।

আলোচনা অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কিত আঠারোটি প্রসঙ্গে বিন্যস্ত। এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে যে-সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার আধারেই এই আঠারোটি প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে পূর্বমত বিচার ও সংশোধনের চেষ্টা গ্রন্থকার করেন নি, সম্ভবত তা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও ছিল না। তিনি সংকলিত দুই শতটি পদ এবং তাদের আধুনিক বঙ্গানুবাদ সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। কিছু পূর্বজ্ঞান না থাকলে পদগুলির আস্বাদনে বাধা জন্মাতে পারে এই আশঙ্কায় বোধহয় বাধা অপসারণের জন্যই গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই আলোচনায় কয়েকটি নূতন প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোক' 'প্রবাদ ও প্রবচন' 'উপমা' প্রভৃতি। এগুলিতেও লেখক যেন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, উপকরণ সংগ্রহ করে, কেবলমাত্র আভাসটুকু দিয়ে গেছেন। গভীরে প্রবেশ করেন নি। এতেই অনুমান হয় পুরোপুরি গবেষণাগ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ছিল না। সেই কারণে প্রতিটি মন্তব্যের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্যযুক্তিও উপস্থাপিত হয় নি। এখানে লেখকের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করি।

"জন্ম খণ্ডে বড়ু পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত প্রভৃতিকে কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন করেন নাই। তবে বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে ভাগবতকেই কবি এই অংশে বিশেষভাবে অনুসরণ করেন।" এ মন্তব্য সত্য হতে পারে, সত্য নাও হতে পারে। লেখক তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে তথ্যাদি উপস্থাপিত করেন নি। সাধারণভাবে অনুসন্ধান করে আমার ধারণা হয়েছে জন্মখণ্ডে কবি ভাগবতের অনুসরণ করেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য। জন্মখণ্ড আকারে ছোট বটে, কিন্তু এতে কৃষ্ণ-বিষয়ক বহু কথা আছে। সেগুলি খুঁটিয়ে তালিকাবদ্ধ করে ভাগবত হরিবংশ পদ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার তা করেন নি, করলে এতগুলি প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্ভব হত। পাঁচটি প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনার চেয়ে আঠারোটি প্রসঙ্গের সাধারণ আলোচনায় সাধারণ পাঠক বেশি উপকৃত হবেন।

গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে আলোচনা অংশের বস্তুবিন্যাস সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচ্ছন্ন। গানগুলি সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত, কাহিনীর সূত্রটি গানগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে টেনে রাখা রয়েছে। কেবলমাত্র তাম্বূলখণ্ডের "কদমের তলে বসী যমুনার তীরে দান ছলে রাখিবোঁ রাধারে" পদটি কেন বাদ পড়ল বুঝলাম না। গ্রন্থের বস্তুনির্দেশ বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তা এই গানটিতে। সুতরাং এটি বাদ পড়ায় আশ্চর্য হয়েছি। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ, বাক্যগঠন সরল, মূলের অর্থ অনুবাদের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করা

সহজ নয়—এ কথায় যদি কারও সংশয় থাকে, তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এই দুরূহ কাজে গ্রন্থকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রূপান্তরের চেষ্টা এই প্রথম নয়। সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রায় দুইশত লাইনের অনুবাদ আছে। তবে গ্রন্থাকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধুনিক বাংলায় অনুবাদ এই প্রথম। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

২

গ্রন্থকার মহৎ উদ্দেশ্যে আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন। তবে আমার মতে পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করলে উদ্দেশ্য মহত্তর হত। যে পাঠকসমাজকে সামনে রেখে গ্রন্থকার গ্রন্থরচনা করেছেন সে পাঠকসমাজ কি প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে কৌতূহলী? এবং যদি কৌতূহলী না হয় তাহলে পাঠকসমাজেরই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি, বড়ু চণ্ডীদাসেরই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি? অস্বীকার করবার উপায় নেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এখন গবেষণার সামগ্রী, তা যদি সাধারণের উপভোগের সামগ্রী না হয় তাতে ক্ষোভ করে লাভ নেই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে গবেষণার সামগ্রী বলে মেনে নিয়েই যদি গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হত তাহলে অনেকদিক থেকে সুবিধে হত। এবং গ্রন্থকারকে কোনো কোনো বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হত। উদাহরণ দিই।

সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চতুর্থ সংস্করণে (১৩৫৬) জন্মখণ্ডের "আয়িলা দেবের সুমতি শুনী।" পদটির শেষে ৩ সংখ্যাটি আছে। "নারদের মুখে শুনী কংস মহাবীর।" পদটির শেষে ৫ সংখ্যাটি আছে। এবং জন্মখণ্ডের একেবারে শেষে সংস্কৃত শ্লোকটির পরে ৯ সংখ্যাটি আছে। পুথির সঙ্গে মেলালে দেখা যায় "কোন সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।" গানটির শেষে ৪ সংখ্যাটি পুথিতে ছিল, সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় অনবধানবশত সেটি বাদ দিয়েছেন। এই সংখ্যাগুলি জন্মখণ্ডান্তর্গত গানের সংখ্যা। লিপিকর কতকগুলি গানকে সংখ্যাত করেছেন, যেমন ৩।৪।৫।৯ আবার কতকগুলিকে সংখ্যাত করেন নি, যেমন ১।২।৬।৭।৮। অমিত্রসূদন তাঁর সংকলন থেকে এই সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে অন্যায় করেছেন। অবশ্য বলা যায়, এই সংখ্যাগুলির কি বা এমন মূল্য! কিন্তু সেটা অর্বাচীনের মত কথা হবে। পুথিতে যা আছে তার সবটুকুই মূল্যবান এবং সে পুথি যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হয় তাহলে ত মহামূল্যবান। এখানে গানের এই সংখ্যাগুলির একটা মূল্যের কথা বলছি।

পুথিতে জন্মখণ্ডের তিনটি পাতা আছে, ৩ক/৩, ৪ক/৪, ৫ক/৫; বাকি (১ক/১, ২ক/২) দুটি পাতা লুপ্ত। প্রতি পাতার এপিঠ ওপিঠ ১৬টি করে লাইন। সুতরাং লুপ্ত দুটি পাতায় ৩২টি লাইন ছিল। এই ৩২টি লাইনের মধ্যে ৪টি লাইনে ছিল প্রাপ্ত খণ্ডিত গানটির পূর্বার্ধ। বাকি ২৮টি লাইনে কি ছিল? ২৮ লাইনের বস্তু কিছু কম নয়, প্রাপ্ত জন্মখণ্ডের বস্তুর অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি। সেই লুপ্ত ২৮ লাইনে যে নূতন কোনো গান ছিল না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ; কারণ, সূচনার খণ্ডিত গানটিই যে পুথির প্রথম গান তার প্রমাণ পাচ্ছি গানগুলির সংখ্যা দেখে। সংখ্যাগুলিকে অগ্রাহ্য করলে এই প্রমাণটিকেও অগ্রাহ্য করতে হত। সুতরাং এখন লুপ্ত ২৮ লাইনের বস্তু সম্পর্কে যত জল্পনা-কল্পনাই করি না কেন তা থেকে গান বাদ দিতে হচ্ছে। তাহলে কি ছিল? সাদা পাতা, সংস্কৃত শ্লোক, কবির ব্যক্তি-পরিচয়, দেব-বন্দনা? যাই থাক, গান ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গোড়ার লুপ্ত পাতা দুটিতে গান ছাড়া অন্য কিছু যে থাকতে পারে তা কেউ ভাবেন নি। সেই কারণে কে যেন একজন বলেছিলেন কৃষ্ণকথার এতবড়

কাব্য কিন্তু গোড়ায় দেববন্দনা নেই। দেববন্দনা যে ছিল না সেসম্বন্ধে নিশ্চিত হই কি করে? বরং ছিল এই অনুমানই ত সত্য হয়ে পড়ছে এবং সে-অনুমানের একমাত্র যুক্তি গানগুলির সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি কিছুদিন আগে পর্যন্তও চাক্ষুষ করা সহজ ছিল না। এখন সে সুযোগ হয়েছে। অমিত্রসূদন মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুথিখানি মিলিয়ে দেখতে পারতেন। বড় রকমের পাঠের গোলমাল অবশ্যই ধরা পড়ত না, তবে ছোটখাটো কোনো সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি সম্পর্কে অতি তুচ্ছ সংবাদও অতিশয় মূল্যবান। আর মিলিয়ে যদি কিছুই না পাওয়া যায় তাহলেও একটা বড় পাওয়া হল। তখন চোখ বুজে মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করা যায়। তবে পুথির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ তুলনা করলে কিছু বৈষম্য বা কিছু সংবাদ (যা বসন্তরঞ্জন রায় বা অন্য কেউ লিপিবদ্ধ করেন নি) পাওয়া যাবে না, এ কথা অবিশ্বাস্য। সাধারণভাবে চোখ বুলিয়ে দু-একটা বিষয় আমার চোখেই ধরা পড়েছে।

জন্মখণ্ডের "নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ" পদটির তৃতীয় লাইনে আছে "দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥" আমার কাছে পুথির যে ছবি আছে তাতে এই লাইনটিতে কিছু ফাঁক আছে। "দুঈ পা· ·" পর্যন্ত পড়া যায়, তার পরে কয়েকটি অক্ষর উঠে গেছে (মূল পুথির কি অবস্থা দেখা দরকার)। আনুমানিক ৫টি অক্ষরের মত জায়গা ফাঁকা আছে। "দুঈ পা· ·"র পরে একটি অক্ষরের কিছু অংশ আছে। তার সবটুকু নেই বলে পড়া যায় না, তবে অনুমান করা যায় অক্ষরটি 'শ' বা 'শে'। কিন্তু তারপরে আরও একটি অক্ষর প্রায় অবলুপ্ত, তবে তার মাথায় কাটার দাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। অর্থাৎ অক্ষরটিকে লিপিকর কেটে দিয়েছিলেন। তারপরে যে অংশের পাঠোদ্ধার করা যায় তা "তন্নত বিশালে"। সম্পাদক পাঠ ধরেছেন "উন্নত বিশালে"। ন্ন/ন্ন লিপির দিক থেকে অভিন্ন; সুতরাং "তন্নত"তে আপত্তি নেই। কিন্তু "উন্নত" অসম্ভব, অন্তত পুথিতে "উ" নেই, "ত" আছে। "উন্নত" খাঁটি পাঠ হতে পারে তবে তা পুথির পাঠ নয়। সম্পাদকের গঠিত পাঠ অর্থাৎ "[উ]ন্নত"।

লিপিকর পুথিতে যে বিরামচিহ্ন দিয়েছেন বসন্তরঞ্জন রায় সব ক্ষেত্রে তা স্বীকার করেন নি। যেখানে তিনি পরিবর্তন করেছেন সেখানেও পুথিতে কি বিরামচিহ্ন ছিল তা জানান নি এবং কোন্ যুক্তিতে তার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়েছে সে কথাও জানান নি। উদাহরণস্বরূপ তাম্বুলখণ্ডের "কথা খানি খানি" পদটির কথা ধরা যাক। এই পদটিতে অমিত্রসূদন বসন্তরঞ্জন রায়ের অনুসরণে এক দাঁড়ি এবং দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পুথিতে এই পদে শুধু দুই দাঁড়িরই ব্যবহার আছে। পুথির অনুসরণে এই পদের বিন্যাস নিম্নরূপ হবে—

কথা খানি খানি
কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে॥
কর্পূর তাম্বুল
দিয়া রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে॥ ১॥

অবশ্য এ কথা মনে করা অনুচিত হবে যে লিপিকর নিতান্ত খেয়াল-খুশি বশে একটি দাঁড়ির ব্যবহার বর্জন করেছেন। "কথা খানি খানি" পদটি "লগণী প্রকীর্ণক", অনুরূপ আর একটি "লগণী প্রকীর্ণক" পদেও দেখি লিপিকর শুধু দুই দাঁড়িই ব্যবহার করেছেন। সেটি দানখণ্ডের প্রথম পদটি।

যমুনার ঘাটে
নিকটে রহিআঁ
পথে বিরোধে কাহ্নাঞি ॥
এ সব গোপ
বধূজন লআঁ
কথা না যাসি বড়ায়ি ॥ ১ ॥

এই পদেও বসন্তরঞ্জন রায় এবং তাঁর অনুসরণে অমিত্রসূদন লিপিকরের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। লিপিকর কেন এই দুটি পদে শুধু মাত্রই দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন তার একটি সূত্র এখানেই পাওয়া যাচ্ছে। "প্রকীর্ণক লগণী"র সঙ্গে এক ধরণের বিরামচিহ্ন ব্যবহারের সম্পর্ক। এই রীতি পুথির সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে কি না তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান সম্পর্কে অমিত্রসূদন কিছু বলেন নি। এক জন্মখণ্ডেই 'মাইল'/'মায়িল', 'দুই'/'দুয়ি', 'পাঠাইল'/'পাঠায়িল', 'পহুরী'/'পহরী', 'বুলিল' /'বুয়িল' প্রভৃতি বানান একটু বিচিত্র নয় কি? লিপিকরের প্রকৃতি অনুধাবন করতে গেলে এই কথাগুলি ভেবে দেখা দরকার।

১. পুথি নকল করতে গিয়ে শুরুতেই তিনি যথেচ্ছা বানান লিখেছেন। যদি ধরা যায়, বানানের কোনো নিয়ম তখনও গড়ে ওঠে নি, তাহলেও অনুমান করতে বাধা নেই যে কোনো একটি নিয়মেই লিপিকর অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা যাচ্ছে নিয়ম রক্ষা করা লিপিকরের স্বভাব নয়।
২. অক্ষরের গঠনের দিকে থেকেও লিপিকর কোনো নিয়ম মানেন নি। 'ন' / 'ল' অক্ষরের স্বতন্ত্র রূপ আছে। তথাপি একই পাতায় লিপিকর এদের যথেচ্ছা ব্যবহার করেছেন। 'জ'এর অর্ধবাহু এবং পূর্ণবাহু রূপ একই গানের মধ্যে পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে।
৩. লিপিকর জন্মখণ্ডের কতকগুলি গানকে সংখ্যাত করেছেন কতকগুলিকে করেন নি।
৪. জন্মখণ্ডের অধিকাংশ অতীতকালের ক্রিয়ার রূপ 'ইল্'যুক্ত, যেমন 'রহিলা' 'বায়িলা', 'বুলিলা', কিন্তু একটি ক্রিয়াপদ '-অল্'যুক্ত, যথা 'ধরল'। আবার, 'আপনে রহিলা', 'বসুল চলিলা' কিন্তু 'বসুল চলিল'।

বিরাট পুথি লিখতে বসে সূচনাতেই লিপিকর এরকম লিখছেন কেন? তাহলে লিপিকরের মূলেই এরকম ছিল বা এটা লিপিকরের নিজস্ব স্বভাব। পুথি পড়লে একথাগুলি অমিত্রসূদনের মনে জাগত এবং তার একটা সন্তোষজনক উত্তরও তিনি ভেবে বের করতে পারতেন। তাই অমিত্রসূদনের দৃষ্টি যদি panoramic না হয়ে microscopic হত তাহলে সাধারণ পাঠক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রসের ভোজ থেকে বঞ্চিত হতেন (তাতে কিছু ক্ষতি হত না) সত্য, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে কৌতূহলী স্বল্প কয়েকজনের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতেন।

৩

আগেই বলেছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করা সহজ নয়। প্রত্যেকটি শব্দের রূপ এবং বাক্যের গঠন জানতে হবে। এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ব্যাকরণে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে অনুবাদ-কর্ম আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।

আলোচ্য গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশ থেকে জানতে পারি যে গ্রন্থকার মূলকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। মূলকে অবিকৃত রাখা যায় দুই উপায়ে, এক, ভাবকে অবিকৃত রেখে, দুই, ভাষাকে অবিকৃত রেখে। কোন্ অনুবাদক কোন্‌টিকে বাঁচাবেন তা নির্ভর করে অনুবাদকের নিজের ইচ্ছার উপর। সাধারণত, প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক রূপান্তর করতে গিয়ে ভাব-ভাষা দুইটিকেই যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টাই বিধেয়। তবে যদি সাধারণ পাঠকসমাজই অনুবাদকের লক্ষ্য হয় তাহলে ভাবের দিকটিই অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়, মূলের ভাষার ইঙ্গিতটুকু অনুবাদের মধ্যে যদি ধরা না পড়ে তাহলে তেমন দোষের হয় না। কারণ, ভাবটাই সেখানে লক্ষ্য, ভাষা উপলক্ষ মাত্র। আবার মূলের ভাবটি যে-পাঠকসমাজের কাছে উপলক্ষ, পুরনো ভাষাকে নতুন কাঠামে নতুন করে গড়লে তার চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় এইটি দেখবার জন্য যাঁরা উৎসুক তাঁদের জন্য যে অনুবাদ করা হয় তাতে মূলের ভাষাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ মূলে যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, যেখানে প্রথম পুরুষের ব্যবহার, অনুবাদেও সেখানে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং প্রথম পুরুষের ব্যবহার করা বিধেয়। সবক্ষেত্রে এভাবে প্রাচীন ভাষার মূলকে আধুনিক ভাষার অনুবাদের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে এই মিলন সংঘটনের দিকেই অনুবাদকের চেষ্টা নিয়োজিত থাকে। যিনি যতখানি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে এই মিলন ঘটাতে পারেন তাঁর অনুবাদ ততখানি সার্থক। যেখানে প্রাচীন ভাষাকে আধুনিক রূপান্তরের মধ্যে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না সে রকম জায়গায় আধুনিক রূপান্তর যদি কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়েও পড়ে, মূলের প্রতি আনুগত্যবশত সে কৃত্রিমতাটুকু সহনীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলে নেই এমন নূতন শব্দ আমদানীর প্রয়োজন যদি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে সে শব্দগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা সঙ্গত। বন্ধনীর ইঙ্গিতে পাঠককে জ্ঞাত করান হয় যে সেই শব্দটি মূলে নেই ; অনুবাদের বাক্যবিন্যাসে স্বাভাবিকতা আনবার জন্যই অনুবাদক সে শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অমিত্রসূদনের অনুবাদ দেখে মনে হয় তাঁর লক্ষ্য সাধারণ পাঠক, মূলের ভাবকেই তিনি অবিকৃত রাখতে চেয়েছেন, ভাষাকে নয়। যেখানে মূলের ভাষাকে অবিকৃত রাখলেও রূপান্তর অস্বাভাবিক হত না, সেখানেও তাঁর অনুবাদ মূলানুগ নয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

পৃ. ৩২৩ "তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।"

অমিত্রসূদনের অনুবাদ : "তুমি ভিন্ন আমার কোনো আশ্রয় নাই।"

এখানে 'তোহ্মাক'-কে 'তুমি' (বিভক্তির পরিবর্তন), 'ছাড়িঞাঁ'-কে 'ভিন্ন' (শব্দের পরিবর্তন), 'গতী'-কে 'আশ্রয়' (শব্দের পরিবর্তন) করা হয়েছে। মূলের 'আন' শব্দটির পরিবর্তে 'কোনো' ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, মূলের 'মোর' এবং 'নাহি' ছাড়া আর কোনো শব্দের রূপান্তর অনুবাদের মধ্যে পাওয়া গেল না। মূলের অর্থ অনুবাদে অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু ভাষা পৃথক হয়ে গিয়েছে। এখানে ভাষাকে এভাবে পরিবর্তিত করা যে একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তা নয়। এই লাইনটি যদি এইভাবে

রূপান্তরিত করা যায়—"তোমাকে ছাড়া আমার অন্য গতি নাই"—তাহলে অর্থবোধে ব্যাঘাত হয় না। মূলের ভাষাকেও আমূল পরিবর্তন করতে হয় না। অমিত্রসূদন যে মূলের ভাষাকে অপরিবর্তিত রাখবার চেষ্টা করেন নি (চেষ্টা করলে অবশ্যই করতে পারতেন) তাতেই আমার মনে হয়েছে যে তাঁর লক্ষ্য সাধারণ পাঠক। এবং সেখানেই আমার আপত্তি। অমিত্রসূদন যদি সাধারণ পাঠকসমাজের দিকে লক্ষ্য না রেখে মূলের ভাষার স্বাদ অনুবাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন (সুকুমার সেন তাঁর অনুবাদে যা করেছেন) তাহলে আমার মতে তাঁর গ্রন্থের গৌরব বাড়ত। অমিত্রসূদন যদি কল্পনা করে নিতেন অনুবাদের পাশাপাশি মূলটিও পাঠকের সামনে ধরে দেওয়া হচ্ছে না, অনুবাদের ভাষা দেখে পাঠক মূলের ভাষা পুনর্গঠিত করে নেবে তাহলে অনুবাদের মধ্যে এতখানি স্বাধীনতার প্রশ্রয় তিনি নিতেন কিনা সন্দেহ।

উপরে যা বললুম তা অনুবাদের রীতি নিয়ে। আমি এক রীতির কথা বললুম, অমিত্রসূদন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করেছেন। রীতির কথা ছেড়ে দিলে অমিত্রসূদনের অনুবাদ প্রশংসনীয়। তবে জায়গায় জায়গায় অনুবাদে অসতর্কতাও লক্ষ্য করা যায়। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

পৃ. ৩২৭ "এবেঁ কথা পাইব গোপালে॥"

অনুবাদ : "সেই বালগোপালকে কোথায় পাইব॥"

'এবেঁ'-র অর্থ 'সেই' নয়, 'এখন'।

পৃ. ৩২৭ "এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা

শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে॥"

অনুবাদ : "আর তুমি এমন ঘুমই ঘুমাইলে যে শিয়র হইতে তিনি চলিয়া গেলেন আর তুমি টের পাইলে না॥"

অনুবাদে "আজি" বাদ পড়েছে। এবং "শিয়র হইতে তিনি চলিয়া গেলেন" নয়, "শিয়র থেকে [তুমি] কৃষ্ণকে হারাইলে!" "আর তুমি টের পাইলে না" এটুকু অনুবাদকের অপ্রয়োজনীয় সংযোজন।

পৃ. ৩২৭ "বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী

নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে।"

অনুবাদ : "পুরুষজাতি বড় ভয়ানক, তাহাদের মন কপটতায় পূর্ণ।" "নানা বোলে তিরিক রঙ্গে" এই লাইনটি অনুবাদে বাদ পড়েছে।

পৃ. ৩২৮ "আপনার দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ॥"

অনুবাদ : "এখন আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম।" মূলে 'এখন' নেই, সুতরাং অবান্তর। 'আপনার' অর্থ 'আমার' নয় 'নিজের'।

পৃ. ৩২৮ "কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞি রতিসুখ ভুঞ্জে।"

অনুবাদ : "শ্রীকৃষ্ণ অন্য কাহাকে লইয়া বিলাস করিতেছেন।" 'অন্য' অবান্তর, মূলের 'কথা' অনুবাদে বাদ পড়েছে।

পৃ. ৩৩৬ "আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ"

অনুবাদ : "আষাঢ় মাসে নব মেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে।" 'শোনা যাইতেছে' মূলে নেই। "আষাঢ় মাসে নব মেঘ গর্জন করে বা করিতেছে", কিন্তু কিছুতেই "শোনা যাইতেছে" নয়।

পৃ. ৩৩৬ "মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ"

অনুবাদ : "মদন জ্বালায় আমি অশ্রু বর্ষণ করিতেছি।" এইখানে অনুবাদকের সমস্যা। অনুবাদক চেষ্টা করবেন "মোর"-কে "আমার" রাখতে। "নয়ন ঝুরএ" নিয়ে গোলমাল বাধবে, কারণ আধুনিক বাংলায় 'নয়ন ঝরে' না, 'অশ্রু ঝরে'। সুতরাং 'নয়ন'-কে পরিবর্তন না করে উপায় নেই; অগত্যা 'অশ্রু'। রূপান্তর দাঁড়াবে : "মদন জ্বালায় আমার অশ্রু ঝরিতেছে"।

পৃ. ১১১ "দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জানী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥"

অনুবাদ : "কৃষ্ণের মনোভিলাষ জানিয়া দেবগণ তাঁহাকে নপুংসক আইহনের পত্নী করিলেন।" দ্বিতীয় লাইনের অনুবাদে আপত্তি নেই। কিন্তু প্রথম লাইনের অনুবাদ নিশ্চয়ই "কৃষ্ণকে মনে ভেবে" করতে হবে। "কাহ্নু" এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি (যদিও বিভক্তিযুক্ত নয়); "কৃষ্ণের কথা মনে ভেবে" পর্যন্ত চলতে পারে; কিন্তু "কৃষ্ণের মনোভিলাষ" কিছুতেই সম্ভব নয়। কৃষ্ণের মনোভিলাষের কথা এখানে নেই। কি মনোভিলাষ তাও আমরা জানি না, কবিও জানতে দেন নি। এখানে কৃষ্ণের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে, ব্যবস্থা করছেন দেবতারা। "জানী" অর্থে "জানিয়া নয়"। "জানী" এবং পরের গানটির "গুণী" শব্দটি সমার্থক। "মনে জানী" এবং "গুণী মনে" অর্থে "মনে ভেবে" অথবা "ভেবে"।

পৃ. ১১৯ "তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।"

অনুবাদ : "তোমার জন্য নিশ্চয় তাহার মন পাইতে চেষ্টা করিব।" এখানে অমিত্রসূদন আর-একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আশা করেছিলাম অনুবাদকের এই সমস্যার কথা তিনি সবিস্তারে বলবেন। "করিবোঁ শকতী"-কে অনুবাদ করা হয়েছে "মন পাইতে চেষ্টা করিব"। এই অনুবাদের সমর্থন কোথায়? "করিবোঁ শকতী" আধুনিক বাংলায় "শক্তি করিব"; কিন্তু আধুনিক বাংলায় এর প্রয়োগ নেই, যেমন নেই "মনে গুণী"র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন অনেক শব্দ এবং প্রয়োগ আছে আধুনিক বাংলায় যা চালু নেই। সেগুলি অনুবাদক কিভাবে রূপান্তরিত করবেন তা পাঠককে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য। তাছাড়া, যে প্রয়োগ আধুনিক বাংলা পর্যন্ত চলে আসে নি তা পুরনো বাংলায় অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে কিনা খুঁজে দেখা দরকার। পুরনো বাংলায় অন্তত আর পাঁচটি জায়গায় এই লুপ্ত প্রয়োগের নিদর্শন পেলে সেই আধারে আধুনিক বাংলায় একটা বিবরণাত্মক অর্থ দাঁড় করান যায়। কিন্তু এই নিদর্শন না পেলে অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে "শকতী"র সঙ্গে "মন পাইতে চেষ্টা করিব"-র সম্পর্ক কি?

পৃ. ১২০ "আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।"

অনুবাদ : "তবে তোমাকে বলি শোন। কৃষ্ণ বিরহ জ্বালায় বড়ই কাতর।" উপরে যেমন "করিবোঁ শকতী" আধুনিক বাংলায় চলে আসে নি, তেমনি এই লাইনের "পাঁচ আবথা"। তবে "পাঁচ আবথা" এবং "সাত অবস্থা" কোনো কোনো উপভাষায় এখনও শোনা যায়। "পাঁচ আবথা"র অর্থ ধরা হয়েছে "বিরহ জ্বালায় বড়ই কাতর"। তা কি ঠিক? বসন্তরঞ্জন অর্থ দিয়েছেন "নানা দুর্দশা"।

পৃ. ১২২ "আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।"

অনুবাদ : "ভাল চাও তো কৃষ্ণের কাছে একলাই ফিরিয়া যাও।"

"আপনাক চিহ্নিআঁ" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর একটি প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় যা অপ্রচলিত। "আপনাক চিহ্নিআঁ"র আধুনিক রূপান্তর "নিজেকে চিনে", কিন্তু অর্থ কি? জানি না। অমিত্রসূদন তাঁর অর্থের কোনো সমর্থন দেন নি সুতরাং তাঁর অর্থই বা ঠিক বলে স্বীকার করি কি করে?

পৃ. ১২৩ "তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী"

অনুবাদ : "তখন রাধা হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।" প্রস্তুত হওয়ার কথা মূলে নেই। অনুবাদক বড় তাড়াতাড়ি রাধাকে হাটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আসলে রাধা প্রস্তুত হয়েছে পরের পদে; এ পদে "তখন হাটে যাইতে রাধার মত হইল"। আগে "মত হবে" তারপরে "প্রস্তুত হবে"।

পৃ. ১২১ "দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ"

অনুবাদ : "তোমার একটুও লজ্জা নাই"

রাধার গালাগালিতে ঝাঁজ অনেক বেশি ছিল। অনুবাদক ঝাঁজ কমিয়ে গালাগালিটাকে ভদ্র এবং মোলায়েম করে ফেলেছেন।

উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই। গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং অনুবাদের রীতি সম্পর্কে আমি গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত না হলেও আলোচ্য গ্রন্থের গুরুত্ব স্বীকার করি এবং গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। অমিত্রসূদনের গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তাতে আশান্বিত এবং উৎসাহিত হয়েই এই দীর্ঘ সমালোচনা লিখবার প্রয়োজন বোধ করেছি। অমিত্রসূদনের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

মধুর আমি নারী : টমাস মান। অনুবাদ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক রূপা, কলিকাতা ১২। তিন টাকা।

বিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন সাহিত্যিক বিপুলাপৃথ্বীর বহুমান লাভ করিয়াছেন এবং এই শতাব্দীর যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকগণ নিরবধি কালের স্বীকৃতি লাভ করিবেন বলিয়া ভরসা করা যাইতে পারে টমাস মান তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৯২৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু খুব কম নোবেল পুরস্কার বিজয়ীই মানের সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন। নাৎসী জার্মানীর অত্যাচারে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, কিছুকাল তিনি আমেরিকায় ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকায়ও তাঁহার ভালো লাগে নাই। জীবনের শেষাংশ কাটাইয়াছিলেন জুরিখে। ফিলিপ টয়েনবী তাঁহাকে 'নিঃসঙ্গ চিত্রনাগরিক'-আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু নিঃসঙ্গ হইলেও তাঁহার মনের ব্যাপ্তি ছিল সার্বভৌম। তাই পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে তিনি সমান আদর পাইয়াছেন।

ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবেই মান প্রথম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহার চরম পরিচয়। তাঁহার সাহিত্যকৃতির একটি লক্ষণ এই যে তিনি একাধারে দীর্ঘ উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প (যেমন Death in Venice) আয়তনে ঠিক ছোটগল্প নহে। ইহাদের মধ্যে ছোটগল্পের আকস্মিকতা ও বড়গল্পের বিস্তৃতি আছে। 'মধুর আমি নারী' (ইংরেজি নাম The Black Swan) এই শ্রেণীর গল্প। ইহার কাহিনী একাধারে শাশ্বত ও অভিনব। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে রমণীর দৈহিক জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে ; নারীর বিশিষ্ট শক্তির এই সময়ে তিরোধান। এই সংকটকালে দৈহিক বিপর্যয় মনের উপরেও রেখাপাত করে এবং নানা রমণীতে নানান রকমের আলোড়নের সৃষ্টি করে ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকেরা ইহার অনুধাবন করেন। কিন্তু সাহিত্যিকেরা ইহাকে বিষয়বস্তু করিয়াছেন এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই হিসাবে এই কাহিনী মানের কল্পনার দুঃসাহসিক অভিযানের পরিচয় দেয়। পঞ্চাশ বৎসরের নায়িকার মনে যে যৌবনোদ্গম হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে মনের সজীবতা ও দেহের জরাজীর্ণতার অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে তাহার অপূর্ব চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। ইহার মধ্যে আদিরস, অদ্ভুত রসের সঙ্গে বীভৎস রসও আভাসিত হইয়াছে। আধুনিক পরিভাষায় বলা যাইতে পারে ইহা একাধারে রোমান্টিক ও বাস্তবপন্থী। যে অসঙ্গতি কমেডির মূল সুর তাহা ইহার মধ্যে সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে অথচ কোথাও ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্য নষ্ট হয় নাই এবং ইহার পরিণতি বিষাদময়। কাহিনীর অভিনবত্বে, চরিত্রচিত্রণের নিবিড়তায় এই গল্প মানের পরিণত প্রতিভার সুষ্ঠু পরিচয় দেয়।

'মধুর আমি নারী' অনুবাদের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদক রসগ্রাহী 'সহৃদয়' ; তাঁহার ভাষা ঝরঝরে। তাই কোথাও অস্পষ্টতা ও আড়ষ্টতা নাই। সব সময়েই মনে হয় আমরা যেন একখানা মূল গ্রন্থ পড়িতেছি। এই জাতীয় অনুবাদ অভিনন্দনীয়।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা ২৬। পাঁচ টাকা।

ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ। প্রথম খণ্ড (মুসলীম যুগ)। ডা. বিমল রায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯। ছয় টাকা।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সঙ্গীতের আসরে। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ। কলিকাতা ১২। সাড়ে সাত টাকা।

বাংলাদেশে সংগীতালোচনার ধারা শতবর্ষ অতিক্রম করেছে কিন্তু বয়সের তুলনায় এই বিভাগটি নিতান্ত নাবালক। তার অন্যতম কারণ সম্ভবত সচেতন প্রচেষ্টার সংকীর্ণতা এবং প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আলোচনার অভাব। কথাটা আর একটু বিস্তারিত করা যাক। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় যেসব সংগীত-নায়ক (রাধামোহন সেন, কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি)

সংগীতের তত্ত্বালোচনা, ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ, সাংগীতিক কোষগ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদি নানাপ্রকার মৌল কাজে হাত দিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সংগীতমনস্ক ব্যক্তিগণ সেই গভীরতার সুরকে ধ'রে রাখতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ, বিংশ শতাব্দীতে ক্রিয়াত্মক সংগীতের অতিপ্রাধান্য এবং আমাদের মজ্জাগত ইতিহাস-উদাসীন আত্মসুখ। সেইজন্যই বিংশ শতাব্দীতে সংগীতের উপাদান (মূলত কথা ও সুর প্রসঙ্গে) ও সংগীতশিল্পীর মানসপ্রবণতা বিষয়ে যত আলোচনা হয়েছে আমাদের সাংগীতিক ইতিহাস ততই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ ও হেমেন্দ্রলাল রায়— প্রধানতঃ এই চারজন গীতরসিক বিংশতাব্দীর প্রথম চার দশকের বিভিন্ন সময়ে ঐসব প্রসঙ্গে চিন্তিত ছিলেন। তাঁদের পাশে নিঃসঙ্গভাবে শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল তাঁর রচনাবলীতে (দ্রষ্টব্য: 'প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা' ও 'স্মৃতির অতলে') ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ও শিল্পীর জীবনকাহিনীকে উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরে তিনি মগ্ন হলেন ভারতীয় রাগরাগিণীর স্বরের গঠনরীতির বিশ্লেষণে। ফলত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাভাষায় লেখা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, শিল্পীদের ঘরানার বিবরণ, সংগীতের বিভিন্ন কালপর্বের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কিংবা কোষগ্রন্থের সটীক অনুবাদ ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়ে গেল অনারব্ধ।

যুদ্ধোত্তরকালে, দেশ স্বাধীন হবার পরে, ঐসব প্রসঙ্গে নানা খণ্ডালোচনা ও বিক্ষিপ্ত উদ্‌যোগ লক্ষ্য করা গেল। কারণ ইতিমধ্যে সংগীতকে স্নাতকশ্রেণীপর্যন্ত পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হ'ল এবং বাংলাদেশে সংগীত-শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যাধিক্য ঘটল। তা ছাড়া সংগীত সম্পর্কে স্বতন্ত্র পাঠক্রম ও ডিগ্রিব্যবস্থার প্রবর্তনে (আই. মিউজ, বি. মিউজ) ইতিহাসনিষ্ঠ সংগীতালোচনা ও শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেল। ফলে, সংগীত সম্পর্কে গ্রন্থরচনার প্রয়াস চলল পাঠ্যসূচীকে সামনে রেখে। আর, সংগীত-শিক্ষায়তনগুলি প্রধানত রবীন্দ্রসংগীতভিত্তিক এবং গৌণত মার্গসংগীত-আশ্রয়ী বলেই অচিরে প্রকাশিত হ'ল বিশেষ পাঠ্যসূচীঘেঁষা রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা (দ্রষ্টব্য: দক্ষিণী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা') ও হিন্দুস্থানী সংগীত সম্পর্কে নামমাত্র ইতিহাস। ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত প্রেরণায় রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছিলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং যুদ্ধোত্তরকালে স্বকীয় প্রবর্তনায় ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগানগুলিকে পঞ্জীভুক্ত করলেন। কিন্তু অন্য কেউ দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় এগিয়ে এলেন না। অথচ সং ও অন্যনিরপেক্ষ প্রেরণায় সংগীতের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এবং প্রধানত এই বিবেকের দায়ে গত দশ-পনেরো বছরে বাংলা ভাষায় যেসব সংগীতালোচনার গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেগুলি আমাদের গৌরবস্থল। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'সংগীত ও সংস্কৃতি', শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাংলার গীতকার' ও 'সংগীত সমীক্ষা', শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুপুর ঘরানা', শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী প্রণীত Encyclopaedia 'ভারতীয় সংগীত কোষ' প্রভৃতি। তবু আমরা সংগীত আলোচনার ক্ষেত্রে এখনও সাবালকত্ব অর্জন করতে পারি নি। কেননা ভারতীয় সংগীত-ইতিহাসের সর্বাত্মক উদ্‌ঘাটন এখনও সম্পূর্ণ ঘটে নি। কিংবদন্তী আর কল্পনার অনালোক থেকে ভারতীয় গীতশিল্পীদের সাধনার সত্য ইতিহাসকে তথ্যের আলোয় এখনও বিচার করা হয় নি। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন রূপ ও রীতি সম্পর্কে ধারাবদ্ধ আলোচনা আজও অচরিতার্থ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংগীত সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা ও বিকৃতিঘটিত অসুবিধার কথাও বিবেচ্য।

এই জাতীয় অসুবিধা ঘটে নি পাশ্চাত্যসংগীতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। কেননা মধ্যযুগের চার্চকে আশ্রয় ক'রে পাশ্চাত্যসংগীত গড়ে উঠেছিল ব'লে বহু তথ্য দলিল ও শিল্পীদের তৈলচিত্র পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তা ছাড়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌যোগে সংগীতের অভিধান ও ইতিহাস রচনার বিধিবদ্ধ ও শ্রমলব্ধ প্রচেষ্টাও ও দেশের সংগীত-ইতিহাসকে উন্মোচিত করেছে। কোনো কোনো সংগীতসমিতিও (যেমন জর্মনীর 'য়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ্ সোসাইটি') এক এক জন শিল্পীর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের জন্য কয়েক দশকব্যাপী চেষ্টা চালাচ্ছেন। তা ছাড়া Curt Sachsএর মতো ইতিহাসকার, Hasketh Pearsonএর মতো জীবনীকার, অ্যালবার্ট সোয়াইৎজার, রোমাঁরোলাঁ, বার্নার্ড শ'র মতো মনীষী, Willi Apelএর মতো সংকলক, W. M. Audenএর মতো কবি সমালোচক এবং Susamme Langerএর মতো দার্শনিক পাশ্চাত্য সংগীতের আলোচনা ও সমীক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। পাশাপাশি আমাদের দেশে সংগীতালোচনার ক্ষেত্রে আমরা দিক্‌পাল লেখকদের মধ্যে তেমন কাউকেই পাই না।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ও শ্রীবিমল রায়ের প্রণীত গ্রন্থ দুখানি পাঠ করে আনন্দিত, কেননা মোগল-ভারতের সংগীতস্বরূপ ও সংগীত-নায়কদের সম্পর্কে এই বই দুটি তথ্যনিষ্ঠ, আন্তরিক ও স্বচ্ছ। দ্বিধাদুর্বল, কেননা উভয় লেখকের মতপার্থক্য সুবিপুল। যেমন, রাজ্যেশ্বরবাবুর মতে :

> যদিও আমীর খুসরওয়ের ভারতীয় সঙ্গীতে দান নিয়ে বহু কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে তথাপি আসল সত্য এই যে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না।...ভারতীয় সঙ্গীতকে নিষ্প্রভ করবার উদ্দেশ্যেই তিনি পারসীক সঙ্গীতের মিশ্রণ আনতে চেয়েছিলেন।' — পৃ ২

আর বিমলবাবুর মতে :

> 'অমীর খুসরো এমন একটি প্রতিভা যা ভারতের সনাতন পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিল, মুসলিম কৃষ্টিকে ভারতীয় কৃষ্টির অংশ ক'রে তুলতে সহায়ক হয়েছিল...।...তিনি পারস্যের শব্দ এবং ছন্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতেন, কিন্তু যখনই কোনো তর্ক উঠত তখনই তিনি বলতেন, "আমি ভারতীয়, এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সঙ্গীতকে আমি উপরে স্থান দিই"।' — পৃ ১৮ ও ২০

মোগল-ভারতের একজন প্রধান সংগীতনায়কের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এমন অসেতুসম্ভব মতবিরোধ সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু এ তো গেল মূল্যায়নপ্রসঙ্গে, তথ্যপ্রসঙ্গেও একই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। যেমন বিমলবাবুর মতে :

> 'ফকীরুল্লা "রাগদর্পণ" নামে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থখানিতে মানসিংহ তোমরের "মানকুতূহল" গ্রন্থের বহু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।' — পৃ ১৬৩

আর রাজ্যেশ্বরবাবুর মতে :

> 'রাগদর্পণ গ্রন্থটি গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমরের রচনা "মানকুতূহল" গ্রন্থের অনুবাদ'— পৃ ৩০।

এই দুটি উক্তি কি কোনপ্রকারেই একসূত্রে বাঁধা যায় ?

বস্তুত, আলোচ্য দুই লেখক মোগল-ভারতের সাংগীতিক ইতিহাস রচনায় দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। রাজ্যেশ্বরবাবু সে যুগের তিনটি প্রসিদ্ধ সংগীতগ্রন্থের সবিশ্লেষণ অনুবাদসূত্রে তৎকালীন সংগীত-চিন্তার মূল প্রবণতাটুকু আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। আর বিমলবাবু সে যুগের বিভিন্ন ও

বিশিষ্ট সংগীতনায়কদের জীবৎকাল নির্ণয়, জীবনপরিচিতি ও গীতবৈশিষ্ট্যের আলোচনা সূত্রে ইতিহাসের অন্তর্লীন স্বরূপটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই মতপার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের আন্তরিকতা ও বিশ্লেষণ সাধুবাদের যোগ্য। সেই সাধুবাদ আরো সপ্রশংস এই কারণে যে, দুজনেই দীর্ঘকাল সংগীত সম্পর্কে লিখছেন এবং তাঁদের সাম্প্রতিক এই দুই গ্রন্থ রচনা একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনাধৃত। 'আইন-ই-আকবরী' 'রাগদর্পণ' ও 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ্‌' গ্রন্থত্রয়ই মোগলযুগের ভারতীয় সংগীতের বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন। এই তিনটি আকরগ্রন্থের সানুবাদ সম্পাদনার স্বাভাবিক অধিকার রাজ্যেশ্বরবাবুর আছে কেননা তিনি ফার্সী ভাষায় অধীতী এবং ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সেই জন্যই তাঁর এই সার্থক গ্রন্থরচনার মাধ্যমে আমরা ভারতীয় সংগীতের সুদীর্ঘ একটি কালপর্বের (খৃষ্টাব্দ ১০৩০-১৫৫৬) বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাই এবং অধিকন্তু পাই 'সমগ্র মুসলিম যুগে মুসলমানগণ ভারতীয় সঙ্গীতকে কী ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সে সম্বন্ধে একটি সুসম্বদ্ধ ধারণা।' আরো পাই রাজ্যেশ্বরবাবুর সরস লেখনীতে ফকীরুল্লার নাটকীয় জীবন-কাহিনী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য। তবে তিনি মূল গ্রন্থগুলির মতামতকে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অভ্রান্ত মনে করেছেন বলে মনে হয়। বিচার করলে দেখা যায় মোগলযুগের সংগীতনায়কদের অনেক মন্তব্য অসূয়াপ্রসূত, সাধারণীকৃত ও ভ্রান্ত। রাজ্যেশ্বরবাবু সেগুলি সম্পর্কে নিখুঁত যত্নশীল হ'লে আমরা পুরোপুরি খুশি হতাম।

এই সযত্ন পরিশ্রমটুকু করেছেন শ্রীবিমল রায়। তাঁর গ্রন্থটিতে তিনি 'খাঁ সাহেব মেহেদী হুসেন খাঁর মুখ থেকে শোনা নানা সঙ্গীত বিষয়ক কাহিনী ও ঘরানা-সঙ্গীতজ্ঞদের কীর্তিকথা'কে তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। তিনি মনে রেখেছেন যে, 'আমাদের কাজ হবে সেইসব স্রষ্টাদের জানবার চেষ্টা করা যাঁরা বিভিন্ন পরিস্থিতি অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুভূতির সহায়তায় আমাদের সঙ্গীতকে নানা বিচিত্রতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।' প্রয়াস হিসাবে এ কাজ অভিনব কিন্তু কঠিন। তবু প্রশংসনীয় ধীশক্তি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে শ্রীরায় আলোকপাত করতে পেরেছেন তানসেন-হরিদাসস্বামী সমস্যা, বৈজু বাওরা সমস্যা, মীরাবাঈয়ের সংশয়িত জীবৎকাল এবং এমনকি চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে। এই কাজে তিনি যেমন পুঁথিপত্র ও লোকোক্তির সাহায্য নিয়েছেন তেমনই ব্যবহার করেছেন অনেকগুলি গান ও গানের ভাষা। গানের ভাষা বিচার ক'রে সেই সূত্রে ঐতিহাসিক সত্যনির্ধারণে তিনি নানা কৌতূহলজনক বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন ৮৯ পৃষ্ঠায় সুরদাসের অন্ধত্ব সম্পর্কে তাঁর চমৎকার সিদ্ধান্ত। অবশ্য এই রীতিতে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। এই দ্বিধাহীনতাই তাঁর রচনার প্রধান গুণ ও দোষ। দোষ, কেননা বিনা সংশয়ে তিনি এমনসব মতামত প্রকাশ করেছেন যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে ও ছাত্রদের পক্ষে অপকারী হ'তে পারে। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

'আমাদের বিশ্বাস, একজন প্রাচীন চণ্ডীদাস ছিলেন যাঁর গ্রন্থ আজ হারিয়ে গিয়েছে এবং তাঁর গ্রন্থকে অনুসরণ করেই গ্রাম্যরীতিতে বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলানাট্য রচনা করেছিলেন।'

শ্রীবিমল রায় সুলেখক। তাঁর সংগীতজ্ঞানও স্বচ্ছ। তবে সংগীত সংক্রান্ত শব্দগুলির উচ্চারণানুগ বানান লিখে তিনি কিছু চমক দিয়েছেন (যেমন : খ্যাল খ্যালী। গোয়ালিয়রকে কোথাও লিখেছেন 'গ্বালিয়র', কোথাও 'গ্বলিয়র'। আকবরকে লিখেছেন 'অকবর'। আমীরকে 'অমীর'।) আর ৪০ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে 'নাট্যকাব্য' আখ্যা দেওয়া, মনে হয়, খুবই দুঃসাহসিক।

শেষ বিচারে, মনে হয় শ্রীমিত্র ও শ্রীরায়ের গ্রন্থদুটি পরস্পরের অনুপূরক। কেননা দুজনেই স্বতন্ত্র বীক্ষণকোণ থেকে ভারতীয় সংগীত-ইতিহাসের এক গৌরবময় অংশকে আমাদের কাছে উন্মীলিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে উপাদানগত ও পদ্ধতিগত বৈপরীত্যে পাঠকের মনকে সন্দিগ্ধ কিন্তু সাবধানী ক'রে তোলে এবং সেই জন্য এই দুইটি গ্রন্থপাঠের পরিণামে সতর্ক পাঠক এমন এক সারাংসার আবিষ্কার করেন যা গভীরতা সঞ্চারী। বাংলা সংগীতালোচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থ দুটি পরবর্তী গবেষক ও সংগীত-রসিকদের কাছে বিশেষ প্রামাণিক হয়ে উঠবে।

'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস' একটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাদেশিক সরকারের সংগীত-শিক্ষক গঠনের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' সমন্বিত এই গ্রন্থখানি 'উদ্দেশ্য ও কলেবরের সীমাবদ্ধতার বিবেচনায়' সংগতভাবেই sketchy ও সরলভঙ্গিম। গ্রন্থের লেখকদ্বয় সংগীতক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত, কাজেই তাঁদের রচনায় মিশেছে তথ্যদর্শিতার সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুভূতিটুকু। বস্তুত, আমাদের দেশে পাঠ্য বই রচনার যে 'সৌখিন মজদুরি' ও অর্থলোলুপতা দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এই গ্রন্থখানি তার থেকে স্বস্তিকর ব্যতিক্রম। লেখকদ্বয় সচেতনভাবে 'তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য সহজপাঠ্য' ভঙ্গিতে ভারতীয় সংগীত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক ও শাস্ত্রীয়যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে অস্বস্তিকর যেটুকু তা হ'ল আধুনিক সংগীতসাধকদের নির্বাচনে।

'সঙ্গীতের আসরে' গ্রন্থটি anecdote জাতীয় রচনা। ভারতীয়, বিশেষত: বাঙালী সংগীতশিল্পীদের সংগীতজীবনের বিচিত্র, উত্তেজক, মধুর, বেদনাদায়ক ও কৌতুকাশ্রিত নানা ঘটনার সরস বিবৃতি এ গ্রন্থে লিখেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য কোন ঘটনাই তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্ট নয়। 'অনেক দিন ধরে অনেকের কাছ থেকে' বিবরণগুলি সংগ্রহ ক'রে 'সন, তারিখ ও ইতিহাসের অন্যান্য মাল-মসলা· ·ব্যবহার করে' লেখক রচনাগুলি উপস্থাপিত করেছেন। এক দিক থেকে এই গ্রন্থ যেমন নতুন স্বাদের আনন্দ দেয় তেমনই লেখকের বিবৃতি রচনায় অতিকৃত প্রয়াস ও স্বত-আনন্দের উচ্ছ্বাসটুকু সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে না। যেন খানিকটা possesed রচনা। ভাষাও সেই পরিমাণে স্বতোচ্ছ্বাস ও পুনরুক্তিদুষ্ট। অনেক ঘটনা বর্ণনায় লেখক মূল বিষয়ের চেয়ে শাখাপ্রশাখার দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। যেমন 'কালে খাঁ বনাম ইমদাদ খাঁ'র রেষারেষির বর্ণনার সূচনাতে গীতরসিক তারাপ্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে অতি বিস্তারিত পরিচয় প্রদানের প্রয়াস। কোন-কোন ঘটনায় (যেমন 'গান্ধীজির অপূর্ব অভিজ্ঞতা' বা 'মোগলাই কীর্তন') সংগীত নিতান্তই গৌণ তবু লেখক খুব সম্ভবত বৈচিত্র্যসৃষ্টির অত্যুৎসাহে এসব ঘটনা লিখেছেন। লেখকের বোঝা উচিত যে, গান্ধীজির সংগীতমনস্কতা বা গান সম্পর্কে দেশবন্ধুর বিস্তৃত মন্তব্য ('এ যে মোগলাই কেত্তন') anecdote হিসেবে খুব লঘু ধরণের। এ কথা লিখতে হ'ল এই জন্যে যে, ইতিপূর্বে দিলীপবাবু 'বিষ্ণুপুর ঘরাণা' গ্রন্থে যথেষ্ট ইতিহাসচেতনা ও বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে সেই বোধের অভাব আছে। অথচ লেখক ভূমিকায় লিখেছেন : 'এসবও সাঙ্গীতিক ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপকরণ'। লেখক সত্যিই কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুভট্ট', 'সুরের আসরে দুর্ঘটনা' বা 'সেকালের সেতার ডুয়েট'-জাতীয় বিবৃতিতে। এসব বিবরণ যেমন রোমাঞ্চকর তেমনই জ্ঞানগর্ভ। কালে খাঁ সংক্রান্ত কিছু

কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও তথ্য (শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে উল্লিখিত) লেখক অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। এ সবই গ্রন্থটির গুণ।

বস্তুত, 'সঙ্গীতের আসরে' জাতীয় গ্রন্থের আদর সর্বথা কাম্য। এর অন্তর্গত প্রায় সব ঘটনাই আমাদের শ্রদ্ধেয় স্মৃতি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর ও তৎপূর্বের কলকাতায় সংগীতচেতন গুণগ্রাহী ও ধনী connoisseur-দের উন্নত চিত্তবৃত্তি ও শিল্পপোষক মনোভাবের (বর্তমানে যা নিতান্ত দুর্লভ) নিখুঁত আলেখ্য এ গ্রন্থে সশ্রদ্ধভাবে পরিস্ফুট। শুধু সেই বিচারেও লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রাসঙ্গিকভাবে নানা দুষ্প্রাপ্য চিত্র সহযোগ গ্রন্থটিকে প্রামাণিক ক'রে তুলেছে। দেশের সর্বস্তরে এই গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি।

সুধীর চক্রবর্তী

সংশোধন : বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২

পৃ ১১৪ পত্রসংখ্যা ৮ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্থলে যতীন্দ্রনাথ বসু

পৃ ১৭৩ ছত্র ১১ কৃষ্ণকমল গোস্বামী স্থলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

তুমি এ-পার ও-পার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে ?
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখি যে সব চেয়ে ॥
ভাঙিলে হাট দলে দলে সবাই যবে ঘরে চলে
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে ॥
দেখি সন্ধ্যাবেলা ও পার-পানে তরণী যাও বেয়ে।
দেখে মন যে আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে ॥
কালো জলের কলকলে আঁখি আমার ছলছলে,
ও পার হতে সোনার আভা পরান ফেলে ছেয়ে।
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই ওগো খেয়ার নেয়ে—
কী যে তোমার চোখে লেখা আছে দেখি যে সব চেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

সা সন্‌া II সা সা -জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -া । [ম]পমা পা -া[ম] I
তু মি০ এ পা র্ ও পা র্ ক র ০ কে০ গো ০

I মা জ্ঞা -রসা । সা সরা -মজ্ঞরজ্ঞা I রা সা -া । -া গা মা I
ও গো ০০ খে য়া০ ০০০র্ নে য়ে ০ ০ আ মি

I মপা পা -া । পা পা -মা I পণা ণা -া । ণধা [র্স]ণা -ধপা I
ঘ০ রে র্ দ্বা রে ০ ব০ সে ০ ব০ সে ০০

I পা পা -দা । [দ]পা মা -পা I গা -া -মা । গমা -পদা -[ম]পা I
দে খি ০ যে স ব চে ০ ০ য়ে০ ০০ ০

I মা জ্ঞা -রসা । সা সরা -মজ্ঞরজ্ঞা I রা সা -া । -া -া -া I
ও গো ০০ খে য়া০ ০০০র্ নে য়ে ০ ০ ০ ০

[পধপা -মপা]
I { পা পা -মা । মজ্ঞা জ্ঞা -মা I পা না -া । না র্সা -া I
ভা ঙি ০ লে০ হা ট্ দ লে ০ দ লে ০

[-া]
I না র্সা -র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I না র্সা -নর্রা । র্সা ণা -ধা } I
স বা ই য বে ০ ঘ রে ০০ চ লে ০

I মা পা -া । পা পা -মা I পণা ণা -া । ণধা র্সণা -ধপা I
আ মি ০ ত খ ন্ ম০ নে ০ ভা০ বি ০০

I পা পা -দা । দপা মা -পমা I গা -া -মা । গমা -পদা -মপা I
আ মি ০ ও যা ০ই ধে ০ ০ রে০ ০০ ০

I মা জ্ঞা -রসা । সা সরা -মজ্ঞরজ্ঞা I রা সা -া । -া সা সা I
ও গো ০০ খে য়া০ ০০০র্ নে য়ে ০ ০ দে খি

I ন্‌া -া ন্‌া । প্‌া ন্‌া -া I সা সা -া । সা সা -রা I
স ন্ ধা বে লা ০ ও পা র্ পা নে ০

I ন্‌া ন্‌া -া । প্‌া ন্‌া -া I ন্‌া সা -া । -া মগা মা I
ত র ০ ণী বা ও বে য়ে ০ ০ দে০ খে

I মা -পা পা । পা পা -মা I পণা ণা -া । ণধা র্সণা -ধপা I
ম ন্ যে আ মা র্ কে০ ম ন্ ক০ রে ০০

I পা পা -দা । [দ]পা মা -পা I গা -া -মা । গমা -পদা -[ম]পা I
ও ঠে ॰ যে গা ন্‌ গে ॰ ॰ য়ে॰ ॰॰ ॰

I মা জ্ঞা -রসা । সা সরা -মজ্ঞরজ্ঞা I রা সা -া । -া -া -া I
ও গো ॰॰ খে য়া॰ ॰॰॰র্‌ নে য়ে ॰ ॰ ॰ ॰

I { পা পা -া । [প]মা [ম]জ্ঞা -মা I পা না -া । না র্সা -া I
কা লো ॰ জ লে র্‌ ক ল ॰ ক লে ॰

I না র্সা -র্জ্ঞা[২] । র্ঋা[২] র্সা -া I না র্সনা -র্রা । র্সা ণা -া } I
আঁ খি ॰ আ মা র্‌ ছ ল॰ ॰ ছ লে ॰

I ণর্সা ণা -া । ধা ণা -া I ণর্সা ণা -দা । দা পা -া I
ও॰ পা র্‌ হ তে ॰ সো॰ না র্‌ আ ভা ॰

I পা পা -া । পা পা -মা I পা -া -ধা । ধা -ণা -া I
প রা ন্‌ ফে লে ॰ ছে ॰ ॰ রে ॰ ॰

I -া -া -া । -া ধা ণা I ধর্সা ণা -া । ধা পা -া I
॰ ॰ ॰ ॰ দে খি তো॰ মা র্‌ মু খে ॰

I মা জ্ঞা -া । রা সা -রা I জ্ঞা জ্ঞরা -মজ্ঞা । রা রা -জ্ঞা I
ক থা ॰ টি না ই ও গো॰ ॰॰ খে য়া র্‌

I [স]রা সা -া । -া মগা মা I মপা পা -া । পা পা -মা I
নে য়ে ॰ ॰ কী॰ যে তো॰ মা র্‌ চো খে ॰

I পণা ণা -া । ণধা [র্স]ণা -ধপা I পা পা -দা । [দ]পা মা -পা I
লে॰ খা ॰ আ॰ ছে ॰॰ দে খি ॰ যে স ব

I গা -া -মা । মপা -া -া I { পা পা -পমা । মজ্ঞা জ্ঞা -মা I
চে ০ ০ য়ে০ ০ ০ আ মা র্ মু০ খে ০

I পা না -া । না র্সা -া I না র্সা -র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I
ক্ষ ণ ০ ত রে ০ য দি ০ তো মা র্

I না র্সা -নর্রা । র্সা ণা -া } I মা পা -া । পা পা -মা I
আঁ খি ০০ প ড়ে ০ আ মি ০ ত খ ন্

I পণা ণা -া । ণধা র্সণা -ধপা I পা পা -দা । দপা মা -পা I
ম০ নে ০ ভা০ বি ০০ আ মি ০ ও যা ই্

I গা -া -মা । গমা -পদা -মপা I মা জ্ঞা -রসা । সা সরা -মজ্ঞরজ্ঞা I
যে ০ ০ য়ে০ ০০ ০ ও গো ০০ খে য়া০ ০০০র্

I রা সা -া । -া -া -া II II
নে য়ে ০ ০ ০ ০

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকার গত সংখ্যায় রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র ছন্দপ্রয়োগে কতটা কুশল ছিলেন দৃষ্টান্তসহ সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে; বর্তমান সংখ্যায় তার উত্তরার্ধ প্রকাশিত হল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরও অনেক কবির ছন্দপ্রয়োগের কথাও স্বভাবতই উল্লেখিত হয়েছে। ছন্দের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল এবং ছন্দের প্রতি যাঁদের তেমন মমতা নেই— উভয়েরই দৃষ্টি এই রচনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কেবল কবিতায় নয়, মানুষের জীবনেও ছন্দ চাই, তা হলেই নাকি জীবন সুন্দর হয়।

ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম-জীবনে রবীন্দ্রনাথ যখন উত্তরবঙ্গের নদীপরিবৃত এলাকায় অবস্থান করছেন তখন তিনি এ সম্বন্ধে যা লেখেন তা উদ্ধারযোগ্য— "এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে।· ·দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না— অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে।· ·তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে।" পতিসর থেকে লেখা এই চিঠির তারিখ ১৩ অগস্ট ১৮৯৩, ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে এটি সংকলিত আছে।

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব রবীন্দ্রজীবনে থাকা স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় একটি আলোচনা প্রকাশিত হল।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌এর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশ ক'রে তাঁকে নতুন করে স্মরণ করা হল।

স্বীকৃতি

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌'এর আলোকচিত্র ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্‌-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সম্প্রতি প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রাঙ্গদা : সচিত্র

চিত্রাঙ্গদা প্রথম-প্রকাশকালে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা যে চিত্রাবলী এই কাব্য-গ্রন্থখানিকে অলংকৃত করেছিল, সেই চিত্রগুলিসহ এই স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি ভিন্ন রঙে মুদ্রিত। মূল্য ২·৫০ টাকা

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর অনেকগুলি রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মূল্য ৭·০০ টাকা।

চিঠিপত্র। প্রথম খণ্ড

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। দীর্ঘদিন পরে পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ এই সংস্করণে নূতন সংযোজন। মূল্য ৩·০০ টাকা।

Tagore for You

ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের রচনা, অভিভাষণ, পত্রাবলী, কবিতা ও রূপক-কাহিনীর সংকলন। তথ্যমূলক কবিপরিচিতি সম্বলিত। সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। মূল্য ৪·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

রূপান্তর

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী —নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রাবলী সংবলিত। মূল্য ৭·০০ টাকা।

খাপছাড়া

'সহজ কথা'য় লেখা ১২৪টি কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত রঙিন ছবি ও রেখাচিত্রে ভূষিত। দীর্ঘকাল পরে মুদ্রিত পরিবর্ধিত সংস্করণ।

মূল্য ১২·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

পরিবার
পরিকল্পনার
অর্থ কি?

IISCO

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়   বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৪

অলক চক্রবর্তী—**প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য** ২'০০
আশা বন্দ্যোপাধ্যায়—**লীলা-সহচরী** ৩'০০
অশোক গুহ—**সংগ্রামী হিন্দুস্থান** ২'৭৫
অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ—**শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী** ২'০০
অপূর্বমণি দত্ত—**মুকুন্দভট্টের পুঁথি** ৩'০০
" **মহাকালের অভিশাপ** ২'০০
ইন্দিরা দেবী—**বাংলার সাধক বাউল** ৪'০০
ঋষি দাস—**রত্নদ্বীপ** ২'৮০, **বার্ণাড শ** ১'৫০
সেক্সপীয়র ১'২৫, **মিলটন** ১'২৫, **টলস্টয়** ১'২৫, **গোর্কী** ১'৫০, **মাইকেল মধুসূদন** ১'২৫
নারায়ণচন্দ্র চন্দ—**ভারতের প্রতিবেশী** ৫'০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—**(গোর্কির) মা** ৫'০০
ফণিভূষণ বিশ্বাস—**বিভীষিকার অন্তরালে** ৩'৫০
বীরেন দাস—**আকাশজয়ের গল্প** ২'৫০
বিমল দত্ত—**বিদেশী গল্পগুচ্ছ** ২'৭৫
লে মিজারেবল ২'৭৫, **মোপাসাঁর গল্প** ৩'৭৫
ভূতনাথ ভৌমিক—**স্বামী বিবেকানন্দ** ৩'০০
মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত—**পরমারাধ্যা শ্রীমা** ২'৭৫, **মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ** ৬'০০, **রূপ হতে অরূপে** ২'৫০, **মুক্ত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতা** ৬'০০
ডঃ মনোরঞ্জন জানা—**রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস** (সাহিত্য ও সমাজ) ৮'০০
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২'৫০
মোহিতলাল মজুমদার—**কাব্য-মঞ্জুষা** (পূর্ণাঙ্গ সটীক সংস্করণ) ১০'০০
যোগেশ বাগল—**মুক্তির-সন্ধানে ভারত** ১০'০০
রামনাথ বিশ্বাস—**মাউ মাউ-এর দেশে** ১'৭৫
আজকের আমেরিকা ৩'৫০
ডঃ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য—**পশ্চিমের পাঁচালী** ৪'০০
ডঃ হরিসাধন গোস্বামী—**যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা** ৫'০০
নারায়ণ সান্যাল—**বাস্তু-বিজ্ঞান** (Building Construction in Bengali) ১০'০০
" A Hand Book of Estimating 12'00

ভারতী বুক স্টল

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

৫ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

এ সংখ্যায় লিখছেন :
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শীতাংশু মৈত্র, অজিতকুমার ঘোষ, প্রতিমা দেবী প্রমুখ অনেকে এবং রবীন্দ্রনাথ লিখিত অপ্রকাশিত কবিতাপত্র।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—চার টাকা (হাতে বা সাধারণ ডাকে)
সাত টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)

পরিবেশক : **পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিঃ**
১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

সদ্য প্রকাশিত

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫'০০

The House of the Tagores—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২'০০। **Studies in Aesthetics** ১০'০০, **Tagore on Literature and Aesthetics** ৮'৫০ প্রবাসজীবন চৌধুরী। **A Critique of the Theories of Viparyaya**—ননীলাল সেন ১৫'০০। **Studies in Artistic Creativity**—মানস রায়চৌধুরী ১৫'০০। **চৈতন্যোদয়** ২'৫০, **জ্ঞানদর্পণ** ৩'০০—হরিশ্চন্দ্র সান্যাল। **রবীন্দ্র-সুভাষিত**—বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ ১২'০০। **রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু** ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬'০০।

প্রকাশ প্রতীক্ষায়

Indian Classical Dances—বালকৃষ্ণ মেনন। **সংগীতচন্দ্রিকা**—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। **গান্ধী-মানস**—রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন ও নির্মলকুমার বসু।

পরিবেশক : **জিজ্ঞাসা** ৩৩ কলেজ রো কলিঃ ৯ ও ১৩৩এ রাসবিহারী এ্যাভেনিউ কলিকাতা ২৯

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

IISCO

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

স্মৃতি

শিল্পী রামকিঙ্কর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

চিঠিপত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভ্রাতঃ

চিঠি পড়িয়া দেখিয়ো। তোমরা কোনোমতেই ব্যবস্থা করিতে পারিবেনা অথচ কাগজ রাখিতেই হইবে এ গ্রহ কেন? কত লোকের কাছ হইতেই যে নালিশ আসে তাহার ঠিকানা নাই।

আজও "সাহিত্য" বইখানা বাহির কেন হইলনা শৈলেশকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে খবর দিয়ো।

ডাক্তার মীরাকে দেখিয়া গেছে মোটের উপর ভালই আছে তবে কাল হইতে একটু জ্বরের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে কয়দিন মাহিনা না পাও বোলপুরে আসিয়া কাটাইয়া যাও। টাকা পাইলেই কলিকাতায় দৌড় দিয়ো। ইতি ১৯শে ভাদ্র ১৩১৪

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'River View'
Almora
Sept. 1, '07

Srijut Rabindranath Tagore
Editor, Bangadarsan
Dear Sir,

I am a new subscriber of the paper of which you are the distinguished editor. I have to trouble you with a complaint. I hope you will kindly take necessary steps. I have to trouble you because I don't know the name of the manager neither is it anywhere written in the paper.

When I first became a subscriber this year, I wrote to you to kindly ask the manager to send me the first number per V.P. post. I received the first number in time, but for the second number I had to write to the manager. After that I have not received any issue. Some days ago I wrote a postcard addressed to the manager but I have not heard anything in reply neither have I got the third & fourth issues which I should have received by this time. Will you kindly see that the আষাঢ় and শ্রাবণ issues are sent to me now and the other issues in due course, that this letter may be my last letter of complaints? This is simply due to mismanagement, I am sure I hope you will kindly excuse me for the trouble I am compelled to give you. I am, yours faithfully

Akhilnath Sanyal
Prof. Ramsay College,
"River View"
Almora

P.S. I am sorry I do not know my Subscriber No. but I hope there will be no difficulty in finding my name out as I hope I am the only subscriber from this place. I am a new subscriber.

A. Sanyal.

ওঁ

ভ্রাত:

"গুমো"র কোনো আশা আছে কি? সত্য করে বোলো— কারণ সুরেন আমাকে প্রায়ই তাগাদা করেন। সেখানে যদি বাংলা ভাড়া পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে তিনি গিয়ে কিছুদিন থেকে নিজেই চেষ্টা দেখতে পারেন। সেখানে আমরা চাষের জমি চাই নে— বাসের জমি চাই। চাষের জমি চার টাকা খাজনা দিয়ে নেওয়া আমার মত লোকেরও বুদ্ধিতে সঙ্গত ঠেকে না। যদি গুমোতে জমির অভাব ঘটে তবে গিরীন্দ্রবাবু আর কোনো ভাল জায়গায় আমাদের কি একটুখানি বাসযোগ্য জমিও জোগাড় করে দিতে পারবেন না? ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
BARABAZAR
14 Oc. 07

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাত:

কলিকাতায় শমী আসতে চায় না। বোলপুরেও তার একলা ঠেকচে। এই কারণে, মনে করচি তাকে দুই তিন দিনের মধ্যে মুঙ্গের পাঠিয়ে দেব। অসুবিধা হবেনা ত? জগদানন্দ তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আস্‌বেন। ভেবেছিলুম সুবোধের সঙ্গে তাকে দিল্লী পাঠাব কিন্তু দিল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব শুনে পিছতে হল। শমী এত অল্প জায়গা জোড়ে এবং এত নিরুপদ্রব যে তার আগমনে তোমাদের মুঙ্গের সহরের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নেই। মীরা সেই রকমই আছে। এক একবার ভাবছি তাকে নিয়ে শিলাইদহে বোটে বেড়াতে যাব— কিছুই স্থির হয়নি। আপাতত আগামী কল্য বোলপুরে গিয়ে শমীকে রওনা করে দেবার ব্যবস্থা করব। গুমো এবং সরাইয়ার কথা স্মরণে রেখো। চাষ এবং বাস দুই জমাতে পারলে ভাল তবে কিনা সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত:। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
BOLPUR
18 Oc. 07

ভ্রাত:

বিজয়ার নমস্কার যুগলে গ্রহণ করিবে ও ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ দিবে।

শমীকে লইয়া স্থানাভাববশত: তোমাদের কোনো অসুবিধা হইবেনা ত? যদি হয় ত তাহাকে

অসঙ্কোচে এখানে পাঠাইবে অথবা তোমার সঙ্গে মানপুরেও লইয়া যাইতে পার।

নির্জ্জনতায় শান্তিনিকেতনের শান্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাতঃ

বহরমপুরের গোলমাল শেষ করিয়া আসিলাম। কথা, কথা, কথা। এ বয়সে আর ত ভাল লাগে না। তবে মহারাজ মণীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়া সুখী হইয়াছি। এতদিন পরে এমন একজন ধনী দেখিতে পাইলাম যিনি ধনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। ইনি যেমন অন্তরের সহিত বিনয়ী তেমনি দেশের সদনুষ্ঠানে ইঁহার উৎসাহ একান্ত অকৃত্রিম।

ছোটনাগপুরের দিকে জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছেনা। কারণ সেদিন একজনের কাছে শুনিলাম "গোমো"র জমি আর বড় বাকি নাই। অগত্যা ময়ুরভঞ্জে জমির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। সেখানে জমি আছে কিন্তু স্বাস্থ্যকর হইবেনা। কি করা যাইবে— এত খরচ করিয়া কৃষি শিখাইয়া শেষকালে জমি অভাবে সমস্ত ব্যর্থ করা ত যায় না। সুরেন জমি দেখিতে ও দরখাস্ত করিতে ময়ূরভঞ্জে যাইবেন। ছোটনাগপুরে কিরূপ বুঝিতেছ?

মীরার শরীর ভালই আছে। আমি বহরমপুরের অনিয়মে প্রথমে অর্শ পরে সর্দ্দিতে আক্রান্ত। শীঘ্র বোলপুরে পলায়নের চেষ্টায় আছি।

তোমরা যুগলরূপে আমার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করিবে এবং ছেলেদের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি ২২শে কার্ত্তিক ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

ভ্রাতঃ

দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে তোমাদের যে মন্তব্য সঙ্গত বোধ হয় তাহা দিবে সেই সঙ্গে আমিও একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিতে ইচ্ছা করি এইজন্য শৈলেশকে উক্ত প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখিলাম। প্রবন্ধের কোন অংশ বর্জ্জন বা শোধন করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না— প্রবন্ধের দায়িত্ব তোমার নহে।

আজকাল আমরা বোটের উপর থাকিয়া চরে রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া বেশ ভালই আছি। যদি তোমার পক্ষে অসাধ্য না হইত তবে তোমাকে একবার এখানে সশরীরে হাজির করা যাইত— কিন্তু আলাদিনের প্রদীপ তোমার বা আমার হাতে নাই।

এবার বঙ্গদর্শনের জন্য একটি ছোট্ট লেখা পাঠাইয়াছি। প্রবাসীর জন্য কন্‌গ্রেস ভাঙার উপরে আমার একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য জারি করিয়াছি।

আমি এবার ১১ই মাঘে কলিকাতায় যাইব কিনা এখনো সম্পূর্ণ মন স্থির করি নাই। যদি যাই তবে আবার এখানে ফিরিতে হইবে— কারণ অন্তত মাঘের শেষ পর্য্যন্ত আমাকে এখানে কাটাইতে হইবে— অনেককাল পরে পদ্মার সহিত আমার পুনর্ম্মিলনের দীর্ঘ অবকাশ ঘটিয়াছে, যতদিন পারি এইখানে কাটাইয়া যাইব। ফাল্গুনে বোলপুরে হাজির হইব।

এখানে জমির খবর লইয়া দেখিলাম কোথাও একত্র সংলগ্ন পঞ্চাশ বিঘা জমি পাওয়াও অসম্ভব। এসব জায়গায় জমি পড়িয়া থাকেনা। ১৫।২০ বিঘা জমি লইয়া রথী সন্তোষের কোনো কাজই হইবেনা। অতএব এখানকার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। মুঙ্গেরে সুরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতার কাছে ময়ুরভঞ্জের জমির যে বিবরণ পাইয়াছিলাম তাহা আশাজনক নহে— তিনি নিজে সেখানকার জমি ছাড়িয়া দিয়া বেহারে কোথায় জমি লইয়াছেন। তুমি আর একবার জমির জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিয়ো— বাংলার এ অঞ্চলে কোথাও জমি পাইবনা। ওখানেও যদি না পাওয়া যায় তবে ছেলেদের পক্ষে স্বাধীন কৃষিব্যবসায় করা একেবারে অসম্ভব হইবে। তোমরা আমার সাদর নমস্কার গ্রহণ করিবে। ইতি ১৯শে পৌষ ১৩১৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

ভ্রাত:

সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে— বোধ করি জয়পুরে অথবা দিল্লিতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে। সুতরাং আমি এখানে অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। এ সময়ে এখানে প্রধান কর্ম্মচারী কেহ না থাকিলে এ বৎসরের আদায় তহশিল একেবারে নষ্ট হইবে। অনিশ্চিতভাবে কাজ ফেলিয়া রাখা চলেনা। সুবোধের বয়স অল্প, নিষ্ঠাও নাই— কিসের জোরে হঠাৎ এত বড় শোক সম্বরণ করিবে?

গুমোর যে জমির কথা লিখিয়াছ সেখানকার বিঘার পরিমাণ কি? যদি standard বিঘা হয় তবে ৩ টাকা জমা বহন করা অসাধ্য। এ জমি আবাদী অথবা নূতন ভাঙিয়া চষিয়া তৈরি করিতে হইবে তাহাও জানা আবশ্যক! যদি হাজার বিঘা জমি লওয়া হয় তবে তিনটাকা জমায় মাসে আড়াইশো টাকা খাজনাই লাগিবে, এত খাজনা বহন করিয়া অন্যান্য খরচ বাদে লাভ করা সহজ হইবেনা বলিয়া মনে হয়। যদি ৫০০ বিঘাও লওয়া হয় তবু ১২৫ টাকা— সামান্য কথা নহে। কারণ মাসে ২০০।২৫০ টাকা যদি কোনোমতে লাভ হয় তবে সেই যথেষ্ট— তাও দীর্ঘকাল পরে হওয়া সম্ভব— ইতিমধ্যে যদি খাজনা দিতেই সব নিকাশ হইয়া যায় তবে কেবল দেনাই বাড়িতে থাকিবে। এক ত বিঘা প্রতি ৩০ টাকা পণ দিলে ১০০০ বিঘায় ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হয়— তার ৬ পার্সেন্ট সুদ ধরলেও মাসে একশো টাকার বেশি— ৩০০।৩৫০ টাকা মাসে দেওয়া সহজ ব্যাপার ত হবে না। আমাদের এখানে জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা— প্রায় ৩।৪ ফসল হয়— বিঘা ও দেড় বিঘার কাছাকাছি— এখানে বিঘাপ্রতি দেড় টাকা সতেরো আনা খাজনা দিতে

হয়। এর চেয়ে ভাল জমি সেখানে হওয়া অসম্ভব— অথচ সেখানে অত প্রচণ্ড দাম ও জমা হলে কি করে কাজ চল্‌বে? ঐ জমির rights কি তাও জানা চাই। এ বোধ হয় মৌরসী নয়।

চাষের জমি যা হয় হবে। গুমোয় বাসের জমি অন্তত বিঘা দশ পনেরো একটু রমণীয় জায়গায় পাওয়া যায় কিনা খবর নিয়ো। সেই সঙ্গে চাষের জমি ১০০০ বিঘা না হোক ২০০।৩০০ বিঘার চেষ্টা দেখা যাক— একটু উর্ব্বরা দেখে জমি বেছে নেওয়া চাই। তুমি নিজে ধাঁ করে গিয়ে একবার দেখে এলে হয় না? অমনি স্থরেনও যেতে পারে। আমি ত ফাল্গুনের পূর্ব্বে এখান থেকে নড়চিনে। কেবল ১১ই মাঘের কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুই তিন দিনের মত কলকাতায় যাব।

এখানে মেয়েরা বেশ ভাল আছে। আমিও নানা কাজে ব্যাপৃত। শরীর মনও বেশ ভাল।··

তোমরা আমার নমস্কার গ্রহণ কোরো ও ছেলেদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২রা মাঘ ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাতঃ

কলিকাতায় ফিরিয়াছি। আগামী কাল বোলপুরে যাইব। দিন দশেক সেখানে থাকিয়া বিদ্যালয়ের ছুটি দিয়া চলিয়া আসিব। সেখানে গুরুতর জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

গুমোর জমি আমাকে কি উপায়ে দেখানো হইতে পারে? সেখানে কি কোথাও আশ্রয় লইবার কোনো উপায় আছে? যাহাই হউক্ যদি সেখানে জমি পাওয়া যায় তবে কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। জমির সম্বন্ধে আমি ক্রমশই হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। ছেলেরা ফিরিয়া আসিলে কোথায় যে কাজ ফাঁদিবে তাহা ত জানিনা। বাংলাদেশে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় জমি পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই বুঝিয়াছি। আমাদের নিজের জমিদারীতে কোনো আশা নাই। অন্যত্র ততোধিক। যদি জমি না পাওয়া যায় তবে রথীকে আমাদের জমিদারীতে প্রজাদের উন্নতি সাধনের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিব।

বঙ্গদর্শনের নাগপাশে আমাকে আর জড়াইবার চেষ্টা করিয়োনা। কলম ছুঁইতে আর ভালই লাগেনা। কিছুকাল সকল কাজেই ইস্তাফা দিয়া বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম— কিন্তু কাজ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি একমুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ পাই নাই— অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছি। তোমাকে চিঠি লিখিতেছি পার্শ্বে প্রবোধ বসিয়া বকিতেছে। তাহাকে তোমার নবকুমারীর জন্মলাভের সংবাদ দিয়াছি— সে এই শুভ ঘটনায় মিষ্টান্ন প্রত্যাশা করিতেছে। ইতি ২৮ শে চৈত্র ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
BOLPUR
15 SE. 08

ভ্রাতঃ

ভোলাকে এবার ছুটির সময় আমাদের সঙ্গে শিলাইদহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। বৌঠাকুরানীর অভিমত কি? ছুটির সময় তিনি যদি ভোলাকে কাছে না পাইলে অভাব বোধ করেন তবে সে কথা ভোলাকে বুঝাইয়া লিখিয়ো— নতুবা আমাদের সঙ্গে গেলে হয়ত তাহার উপকার হইতে পারে। তোমাদের খবর অনেকদিন পাই নাই। ডুমকা কেমন লাগিতেছে? কাজ-কর্ম্মের অবস্থা কিরূপ? ছুটির পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে শারদোৎসব হইবে তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছি। ইতি ৩১শে ভাদ্র ১৩১৫

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শৈলেশ। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার: শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হলে তার কার্যভার এঁর উপর পড়ে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র 'নিবেদনে' লিখেছিলেন— "এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।" ইতিপূর্বে শৈলেশচন্দ্র কলকাতায় পুস্তক প্রকাশের কাজ শুরু করেছিলেন।

মীরা। কবির কনিষ্ঠা কন্যা

সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর: কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র

শমী। কবির কনিষ্ঠ পুত্র: আলোচ্য পত্রে শমীকে মুঙ্গেরে পাঠাবার প্রস্তাব চলেছে, কয়েক সপ্তাহ পরে এইখানেই শমীর মৃত্যু হয়।

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায়: শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক

সুবোধ। সুবোধচন্দ্র মজুমদার: আশ্রমের অধ্যাপক

মহারাজ মণীন্দ্র। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বহরমপুরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে' রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। বহরমপুরে এই অধিবেশন হয় ১৭-১৮ কার্তিক ১৩১৪

দ্বিজেন্দ্রবাবু। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রথী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষ। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার: শ্রীশচন্দ্রের পুত্র: শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্রবর্গের অন্যতম।

ভোলা। সরোজচন্দ্র মজুমদার: সন্তোষচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা

ভগিনী নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো-একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতে অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়— তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালী মতোই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে।

বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক দিক দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি

তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন— মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, এক দিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর-এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই; প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না— ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও আমরা গর্ব করিতেছি।

তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সে দিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে— অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন এ কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন— তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবল ভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ

করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এই জন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নিচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনো দিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনো দিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সে দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এ দেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই— তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না— কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু— তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন

হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এ দেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল;— তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত— এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপ্‌ল্‌"কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই— তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোনো-একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে— কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয় আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা-কিছু ভালো, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু নিত্য

পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী ; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এই জন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানা প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষি যেমন নিরর্থক নহে— তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে— তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা— তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই-সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই-সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা এক দিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর-এক দিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না— অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন ; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার 'পীপ্‌ল'দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা-কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই-সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই— এই জন্যই তিনি এই-সকল বিদেশীয় দিঙ্‌নাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যে-সকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন ; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা

ভগিনী নিবেদিতা

১৮৬৭-১৯১১

শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে— তাহা মানুষের মধ্যে দর্শন-শাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এই জন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমতো বুঝিতেই পারি না, এই জন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোট ছোট রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড় বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোট ছোট কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না— তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা শৈথিল্য অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব— যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল— তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন "ভাবৈকরস" হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে-সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল; এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়— যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটিরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত— এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরম-সুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা-কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।[১] তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

১ তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মহত্ত্বের উপলব্ধি আর-এক মহৎ-হৃদয়ের অনুভবসাপেক্ষ। সে অনুভব অন্য সবার হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারাও আপন মহিমারই নিশ্চিত প্রমাণ। মনুষ্যত্বের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিমাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য— যা শ্রেষ্ঠতম, তাকে চিনতে পারা, তার দ্বারা নিজে আলোকিত হওয়া, সে-আলোকে নিখিল মানবপ্রাণকে উদ্ভাসিত করা।

শ্রদ্ধার এই শক্তি উপনিষদের নচিকেতার মতো আপন আত্মবিশ্বাসের অটল নির্ভরভূমিতে দাঁড়িয়ে পরম-জিজ্ঞাসার আলোকে সত্যকে যাচাই করে নেয়। তখনই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিচিত্র পন্থায় এই সত্যানুসন্ধানের দ্বারা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সে ইতিহাসের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— দুটি প্রান্ত, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ড— আঠারো শতকের শেষার্ধে মিলিত হয়েছিল।

সে মিলনের প্রথম পর্বে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের পটভূমিকায় এক সুপ্রাচীন অভিজাত ঐতিহ্যের সম্মুখীন বিস্ময়াহত বিদেশীর সভ্যতাগর্ব অচিন্তনীয়। অবাধ শোষণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তখন একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ছিলাম আমরাই প্রথম, তাই অন্ধ অনুকরণের আবর্তে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিতসমাজ প্রধানতঃ ঋণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো ব্যতিক্রম সে যুগে ছিল। তবু অনুকরণের যুগ পেরিয়ে আত্মস্থ স্বীকরণের যুগ দেখা দিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। জাতি ধর্ম সাহিত্য সমাজ— সর্বত্রব্যাপ্ত যে স্বদেশপ্রাণতা এ যুগের মূলপ্রেরণা, তারই প্রতীকরূপে দেখা দিলেন এক দিকে রবীন্দ্রনাথ, আর-এক দিকে স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের মাত্র চার বৎসর পরে, ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৭, ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আয়ার্ল্যাণ্ডের নোব্‌ল পরিবারে। তাৎপর্যের দিক থেকে পৃথক হলেও একই ইংল্যাণ্ডের অধীনতাসূত্রে কাছের আয়ার্ল্যাণ্ড ও দূরের ভারতবর্ষের কোথাও একটু মিল ছিল। বিশ্বসংস্কৃতির আপাত বিপরীত যে দুটি প্রান্তের সমন্বয় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সাধনায় প্রতিভাত, উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে তা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ— ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভারত-সংস্কৃতির যে বক্তব্য ইংল্যাণ্ড তথা য়ুরোপ-আমেরিকার মননশীলসমাজে তুলে ধরেছিলেন, নিবেদিতার মনস্বিতায় তার এক মিলিত ফলশ্রুতি ভারতের যথার্থস্বরূপ ও উপলব্ধির বাণী নিয়ে বিশ্বসভায় উপস্থাপিত। অবশ্য নিবেদিতার কাছে এই ভারতমন্ত্রের উদ্গাতা তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দই প্রধানতম ও একতম। তবু নবীন ব্রাহ্মসমাজ ও প্রাচীন হিন্দুসমাজ মিলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে পটভূমি সৃষ্টি করেছিল, নিবেদিতার জীবনে ও মননে তার মূল্য অপরিসীম।

ভারত-ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে মানবচিন্তার বিপ্লব বা আমূল সংস্কারপ্রয়াস নানা ধর্মান্দোলনের

মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিবেকানন্দের ভাষায়—'ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।' —বর্তমান ভারত

ইতিহাসের এই শোভাযাত্রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম আজ অবশ্য সংযোজনীয়। ভারতের জাতীয় বিপ্লব প্রথমে ধর্মের নামে আত্মপ্রকাশ করে— বিবেকানন্দের এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি নিবেদিতার ভারত-দর্শনের প্রধান সূত্র।

উত্তরকালে স্বামীজির সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণের সময় নিবেদিতা বিবেকানন্দমানসে রামমোহন রায়ের প্রভাব সম্বন্ধে শুনেছিলেন— "...we heard a long talk on Ram Mohun Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out."[১] আচার্য রামমোহনের চিন্তাধারার তিনটি মূলসূত্র— বেদান্তস্বীকৃতি, স্বদেশপ্রেমপ্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানে সমান ভালোবাসা বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথম যৌবনে তরুণ নরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মসাধকবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের 'যোগীর চক্ষু' মহর্ষির দৃষ্টিতে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি বিধিবদ্ধ সভ্য ছিলেন। তবু ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের শিক্ষাগুরু হেস্টিসাহেবের উল্লেখিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী সমাধিমান শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহসান্নিধ্য লাভে তাঁর মানসপরিবর্তন ঘটতে থাকে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ; বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব; পুরাকালের ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান— 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে বিবেকানন্দ-হৃদয়ে ঈশ্বরের নিশ্চিত অভিজ্ঞান তুলে ধরল। ভারতসংস্কৃতির সমন্বয়চেতনার আধুনিকতম প্রবক্তারূপেই বিশ্বসভায় তাঁর আত্মপ্রকাশ।

নিবেদিতার ভারতাত্মার অনুধ্যান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও মননালোকে। স্বভাবতঃই ভারতের চিরন্তন গ্রহণশক্তির প্রমাণ তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের পারস্পরিক প্রভাবে, মুসলমান রাজশক্তির ছত্রতলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারত-চেতনায় এবং বিশেষ করে সম্পূর্ণ বিদেশী ইংরেজ আমলে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পথ ও মতের পরমলক্ষ্যগত ঐক্যসাধনায় অনুভব করেছেন—"...the personality that the nineteenth century has revealed as the turning point of the national development is that of Ramakrishna Paramahamsa,[২] whose name stands as

---

১ *Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda*: Nivedita: Ch. II.

২ এইখানে নিবেদিতার নিজস্ব পাদটীকা—Ramakrishna Paramahamsa lived in a temple-garden outside Calcutta from 1853 to 1886. His teachings have already become a great intellectual force.

another word for the synthesis of all possible ideas and all possible shades of thought. In this great life, Hinduism finds the philosophy of Sankaracharya clothed upon with flesh, and is made finally aware of the entire sufficiency of any single creed or conception to lead the soul to God as its true goal. Henceforth, it is not true that each form of life or worship is tolerated or understood by the Hindu mind, each form is justified, welcomed, set up for its passionate loving, for evermore···At last, then, Indian thought stands revealed in its entirety— no sect, but a synthesis ; no church but a university of spiritual culture— as an idea of individual freedom, amongst the most complete that world knows."৩

'জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল ; এই নামটি যাবতীয় সম্ভাব্য আদর্শ ও সমস্ত ধরণের চিন্তাধারার সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দুধর্ম এই মহাজীবনে শাঙ্করদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে, আর সেইসঙ্গে, যে কোনো একটি আদর্শ বা পন্থাই যে আত্মার ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এর পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয় সমন্বয় ; বিশেষ কোনো উপাসনামন্দির নয়, বরং অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয় ; বিশ্ব-ইতিহাসে পূর্ণতম ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশরূপে ভারতীয় মননধারা অবশেষে আপন সমগ্রতায় প্রকাশিত হল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বিশ্বজনীনতা নিবেদিতার দৃষ্টিতে আধুনিক পৃথিবীর দ্বন্দ্বজটিল পরিবেশে মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যসন্ধানের পরমসহায়করূপে প্রতিভাত হয়েছে। বিবেকানন্দের চিকাগো-বক্তৃতা এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যই জগতের প্রতি ভারতের বাণী—'একম্ সৎ' ; সত্য এক। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম -প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদিতার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— It must never be forgotten that it was the Swami Vivekananda who, while proclaiming the sovereignty of the Advaita Philosophy as including that experience in which all is one without a second, also added to Hinduism the doctrine that Dvaita, Vishistadvaita, and Advaita are but three phases or stages in a single development, of which the last name constitutes the goal. This is part and parcel of the still great and more simple doctrine that the many and the one are the same Reality, perceived by the mind at different times and in different attitudes or as Shri Ramkrishna expressedt he same thing, "God is both with form and without form. And

৩ *The Web of Indian Life* : The Synthesis of Indian Thought অধ্যায়।

He is that which includes both form and formlessness." (এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না যে, এক অদ্বয়সত্তার প্রবক্তা অদ্বৈতদর্শনের চূড়ান্ত অধিকার ঘোষণা করেও স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মে এই উপলব্ধিটুকু যোগ করে দিয়েছেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একটি ক্রমবিকাশেরই তিনটি বিভিন্ন স্তর মাত্র— এদের মধ্যে শেষোক্ত অদ্বৈতই চরম লক্ষ্যস্থল। পূর্বোক্ত কথাগুলি আসলে— বহু এবং এক যে একই সত্তা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ একই সত্য—এই মহত্তর ও সরলতর ধর্মচেতনারই অঙ্গস্বরূপ। অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, "ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। তাঁর মধ্যে সাকার ও নিরাকার দুইই রয়েছে।")

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের সোপানপরম্পরায় ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতি সাধারণতম মানুষ থেকে উচ্চতম প্রজ্ঞার অধিকারী সর্বশ্রেণীর মানব-ভাবনাকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার মাধ্যমে আশ্রয় দিয়েছে। ধর্ম বা দর্শন এখন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর করতলগত না থেকে জীবনের সমগ্র প্রকাশকেই অবলম্বন করেছে। যে বেদান্তচর্চা শুধু সাধকসমাজেরই চিন্তনীয় বিষয় ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণায় বিবেকানন্দ সে বেদান্তকে মুচি, মেথর, জেলে, চাষী, ছাত্র, অধ্যাপক, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান— সকল পথ ও মতের মানুষের আত্মোপলব্ধির সহায়ক করে তুলেছেন।

নিবেদিতার মতে এইখানে বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়তীর্থ হয়ে উঠেছেন। বহু ও এক যদি একই পরমসত্য হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র উপাসনাই নয়, সব ধরণের কর্মপদ্ধতি, সমস্ত রকমের সংগ্রাম, যাবতীয় সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। "To him there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spirituality." (তাঁর [বিবেকানন্দের] কাছে মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায়, পৌরুষে ও বিশ্বাসে, সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো পার্থক্য নেই।)

গুরুর এ আদর্শ তাঁর মানসকন্যার মননে ও জীবনে পরিপূর্ণ রূপায়িত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতার জীবনেও জ্ঞান ও ভক্তি তাঁর বিপুল কর্মযোগের প্রেরণা ও পরিপূরক।

বিবেকানন্দের রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুর আর-একটি বাণী বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন—"Art, science, and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita." পরম সত্যের উপাসিকা তাঁর অনুপ্রাণনায় কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাধক, দেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী—সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে কি সেই সত্যই প্রমাণ করে যান নি?

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদের পর আত্মপরিচয় রূপে তিনি লিখতেন Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা)।[৪] সন্দেহ নেই,

৪ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন। অপর পক্ষে ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। তাই বাহ্যতঃ এই বিচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল। তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনায় যেমন সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহায়তা সদাজাগ্রত ছিল, তেমনি বিবেকানন্দ-জীবন ও রচনাবলী সম্পাদনায় সঙ্ঘের মায়াবতী কেন্দ্রে থেকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময় তাঁর জীবনে এ বিচ্ছেদ একান্ত বহিরঙ্গ।

এই পরিচয়ই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। সে পরিচয়ের এক দিকে পাঁচ হাজার বৎসরের ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত উপলব্ধি, আর-এক দিকে বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গের ত্যাগসুন্দর আদর্শ। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— ভারতীয় সন্ন্যাসের এ আদর্শকে ব্রহ্মচারিণী (Sister কথাটির মূল তাৎপর্য তাই) নিবেদিতা তাঁর গুরু ও পরমগুরু বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের পন্থানুসরণে সম্পূর্ণ 'জগদ্ধিতায়' — জগৎকল্যাণের সাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আপন মুক্তির জন্য ব্যাকুল না হয়ে বিশাল বটের মতো বিশ্বমানবকে ছায়াদানের ব্রতে বিবেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। 'দয়া' নয়, 'সেবা'। বিবেকানন্দ সেই 'সেবা'কেই বলেছেন 'পূজা'। আর এই মহাপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ তিনি ভারত ও সমগ্র জগতের কাছে তাঁর 'নিবেদিতা'কে উৎসর্গ করেছিলেন। বেলুড় মঠে (তখন মঠ বৃন্দাবন বাবুর বাগানবাড়িতে) মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লের 'নিবেদিতা'-রূপান্তরের মুহূর্তে বিবেকানন্দ তাঁর হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধের আদর্শটি চিরপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন— "যাও সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো— বুদ্ধত্বলাভের আগে যিনি পাঁচ শো বার অন্যের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন!" নিবেদিতার কাছে সেই দিনের সকালটি 'জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় প্রভাত'।[৫] এক জনমে তাঁর 'জন্ম-জন্মান্তর' ঘটে গেল।

ভারতীয় গুরুবাদের দর্শন পূর্ব পূর্ব মহামানবদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিচ ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার নানা অবক্ষয়ের মতো গুরুবাদেরও ব্যবসায়িক বিকার নানা কারণে ঘটেছে, তবু জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের যে মূল্য, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সে মূল্য আরও বহুগুণ বেশি। অন্ততঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার গুরুপরম্পরা ভারতীয় গুরুবাদের মহনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে আশ্বস্ত করে। আপন গুরুর কাছে নিবেদিতা যে ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছিলেন, তার শরীরীসত্তা সমগ্র ভারতবর্ষ। নিবেদিতার ধ্যানদৃষ্টি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বত্র আপন অভীষ্টের অনুসন্ধান করে ফিরেছে এবং তাঁর সেই অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা ও ভক্তি নিবেদিতা-সাহিত্যের মূল অবলম্বন।

ভারতবর্ষকে ভালোবাসার যে আনন্দ তিনি বিবেকানন্দমানসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে ভালোবাসা জাতীয় গৌরব ও বেদনাবোধের অংশীদার হলেও আসলে তা বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গিত ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার বাণী। বৈদিক যুগের উষাকাল থেকে যে অমৃত ভারতবর্ষ আপন হৃদয়ে ও মনীষায় অনুভব করেছে, বিশ্ববাসীকে তার অংশভাগী করার জন্য ভারতের ব্যাকুলতা বেদ উপনিষদ, এবং বুদ্ধ শংকর রামানুজ নানক চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকবৃন্দের মাধ্যমে বারংবার উচ্চারিত। ভারতবর্ষের এই নিজস্ব বাণী বর্তমান মানবসভ্যতার সঞ্জীবনীমন্ত্রস্বরূপ। বিশ্বসভ্যতার ধাত্রী এই ভারতবর্ষকে উপলব্ধির প্রয়োজন পাশ্চাত্যের প্রশ্নমুখর বর্তমানের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি।

প্রতীচ্যের পক্ষ থেকে নিবেদিতার অসাধারণ মনীষা সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে এসেছিল বলেই ভারতবর্ষও নিজেকে অনেক পরিমাণে চিনতে শিখেছে। আমাদের আজকের ভারত-অনুধ্যান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরই আত্মনিবেদনে অনেকখানি অনুপ্রাণিত।

বিদেশিনী নোবলের পক্ষে ভারতোপলব্ধির সাধনায় এই অসাধারণ সিদ্ধি তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বের পরিচায়ক হলেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারাই এ বিষয়ে তাঁর পথ নির্দেশ করেছে। প্রসঙ্গত একটি

৫ ২৫শে মার্চ, ১৮৯৮

বিশেষ দিনের বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আলাপচারি স্মরণীয়। জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও চলেছেন। যাবার আগে স্বামীজি নিবেদিতাকে একটি মৃত্যুদৃশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, পূর্বদিন এই মৃত্যুঘটনায় নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ওই ঘটনার পটভূমিকায় নিবেদিতার মনে এক নিগূঢ় সত্যের উদ্ভাসন ঘটেছিল— "religions are only languages, and we must speak to a man in his own language."[৬] (ধর্মসম্প্রদায়গুলি শুধু বিভিন্ন ভাষা মাত্র, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আমাদের তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।) কথাটি শোনা মাত্র বিবেকানন্দের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন, "হ্যাঁ। আর শ্রীরামকৃষ্ণই শুধু সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একমাত্র তাঁরই এ কথা বলার সাহস ছিল যে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।"[৭]

নিবেদিতার চিন্তা ও বিবেকানন্দের সমর্থন প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র উপদেশ নয়, প্রধানতঃ ধর্মজীবন যাপনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন সমন্বয়ধর্মের আদর্শ তাঁর মানসকন্যার অন্তরে সঞ্চার করে চলেছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর হিমালয়-ভ্রমণ ও য়ুরোপ-যাত্রার স্মৃতি এ দিক থেকে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর শিক্ষয়িত্রীজীবনের সাধনায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতিও কত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন সে কথাও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ। সুতরাং ভারতের প্রাণ-স্পন্দনস্বরূপ ধর্মচেতনার প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধান ও স্বীকরণের সাধনার সূত্রপাত হল। "I set myself therefore to enter into Kali-worship, as one would set oneself to learn a new language, or take birth deliberately, perhaps in a new race."[৮] ('লোকে যেমন করে নতুন কোনো ভাষা শেখে, অথবা হয়তো স্বেচ্ছায় নতুন কোনো জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ঠিক তেমনি ভাবে আমি এই কালী-উপাসনার গভীরে প্রবেশ করতে চাইলাম।')

মানবসভ্যতার এই নূতন অথচ চিরপুরাতন ভাষাটি আয়ত্ত করতে প্রতিদিনের অভ্যাসে ও ধারণায় অতীত জীবনধারার কত শত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন, তবু বিরামহীন সংগ্রামে প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যবাণী প্রচারের এই ব্রত তিনি আমরণ উদ্‌যাপন করেছেন। এর ফলে তাঁর সাহিত্যকৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিচারের একটি সার্থক নিদর্শনে পরিণত। সেই সঙ্গে ভারতীয় চিন্তা ও চর্যার ব্যাখ্যায় তাঁর নিজস্ব দানও স্মরণীয়। কারণ, গুরুর কাছে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ভাষাটি আবিষ্কারের রহস্য তাঁর অধিগত ছিল। মানবমনের সেই চাবিকাঠিটি ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্যে নূতন আলোকপাতে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় ধ্যানধারণার শিব ও শক্তি -কল্পনা সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব ব্যাখ্যা স্মরণীয়—As the Purush, or Soul, He is Consort and Spouse of Maya, Nature, the fleeting diversity of sense. It is in this relation that we find Him beneath the feet of Kali, His recumbent posture signifies inertness, the Soul untouched and indifferent to the external. Kali has been executing a wild dance of carnage···. Suddenly She has stepped unwittingly on the body of her Husband. Her foot

৬, ৭ *The Master as I saw Him*: The Swami and Mother Worship অধ্যায়।

৮ তদেব

is on his breast. He has looked up awakened by that touch, and they are gazing into each other's eyes.

…Her mass of black hair flows behind her like the wind, or like time, "the drift and passage of things." But to the great third eye even time is one, and that one, God. She is blue almost to blackness, like a mighty shadow. Deep into the heart of that Most Terrible, He looks unshrinking, and in the ecstasy of recognition. He calls Her Mother. So shall ever be the union of the soul with God.[৯]

('পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মত্ত ছিলেন।…সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন।

…মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণ কেশরাশি ঝড়ের মতো পিছন দিকে উড়ে চলেছে, অথবা 'সমস্ত বস্তুপ্রবাহ বহনকারী' সময়ের মতো ছুটে চলেছে। কিন্তু পরম ত্রিনয়নের দৃষ্টিতে কালও এক অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণের কাছাকাছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহা ভয়ঙ্করীর হৃদয়-গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত আনন্দচেতনায় তিনি তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।')

নীলকণ্ঠের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত কালীর এই ধ্যানমূর্তি নিবেদিতামানসে মানবজীবনের চিরন্তন বেদনাসত্যের প্রতীকে পরিণত—"After all, has anyone of us found God in any other form than in this—the Vision of Siva? Have not the great intuitions of our life all come to us in moments when the cup was bitterest? Has it not always been with sobs of desolation that we have seen the Absolute triumphant in Love?"[১০] ('শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোনো উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি— তারা কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয় নি? সর্বরিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী-মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করি নি?')

কালীপ্রতীকের এই ব্যাখ্যায় সহজেই বিবেকানন্দের The Cup, 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং Kali, the Mother কবিতা তিনটি মনে পড়ে। বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতার শেষ ক'টি চরণ—

Who dares misery love,
And hug the form of Death,—

৯ *Kali the Mother*: The Vision of Siva.

১০ তদেব

Dance in destruction's dance
To him the Mother comes.[১১]

(সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।)[১২]

তবু নীলকণ্ঠ শিবের দিব্যদর্শন সমুদ্ভূত কালীকল্পনার ব্যাখ্যাটি নিবেদিতার একান্ত নিজস্ব। স্বামীজির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেই একদিন নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন, "Perhaps, Swamiji, Kali is the Vision of Shiva! Is She?" ('স্বামীজি, কালী সম্ভবতঃ শিবের দিব্যদর্শন! তাই কি?')। মুহূর্তের জন্য বিবেকানন্দ নিবেদিতার দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, "Well! Well! Express it in your own way, Express it in your own way." ('বেশ, বেশ, তোমার নিজের মতো করে প্রকাশ করো, তোমার নিজের মতো করে প্রকাশ করো।')[১৩] পরমসত্যের সাধনায় প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বিবেকানন্দ স্বীকার করতেন। নিবেদিতাকে এই স্বাধীন শিক্ষার দ্বারাই তিনি সবচেয়ে বেশি রূপান্তরিত করেছেন।

জগৎ ও জীবনের রহস্য-অনুসন্ধানে মানুষ বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন প্রতীক সৃষ্টি করেছে। পুরাতন লোকসংস্কৃতি, ব্রত-আচার-পার্বণ থেকে সেই প্রতীকরহস্যগুলি উপলব্ধি করতে না পারলে কোনো জাতির অন্তরঙ্গ ইতিহাস অনুধাবন করা যায় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ভারতের সেই প্রাণলোকের পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর *Kali the Mother*, *The Web of Indian Life*, *Footfalls of Indian History*, *Studies from an Eastern Home* এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে। ভারতবর্ষের নিজস্ব বাণী তাঁর কাছে ভারতের নানা প্রতীকচেতনার মাধ্যমে ধরা দিয়েছে। *Kali the Mother* গ্রন্থে এই প্রতীক-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তাঁর আর্ষ দৃষ্টি স্মরণীয়—"Our daily life creates our symbol of God. No two ever cover quite the same conception…yet we know how the tongue of each people expresses some one group of ideas with especial clearness, and ignores others altogether. Never do we find an identical strength and weakness repeated and always if we go deep enough, we can discover in the circumstances and habits of a country, a cause for its specific difference of thought or of expression."[১৪] ('দৈনন্দিন জীবন আমাদের ঈশ্বরের প্রতীক সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রতীকের নিহিতার্থ কখনো এক নয়।…তবু আমরা জানি, প্রত্যেকটি মানুষের ভাষাই কেমন করে বিশেষ এক ধরণের ভাবধারাকে প্রকাশ করে, অথচ অন্য জাতীয় ভাবধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। একই ধরণের সবলতা বা দুর্বলতা কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না। আর আমরা যদি আরো গভীরে সন্ধান করি, তাহলে বিশেষ কোনো ভাবনা বা প্রতীকের পটভূমিতে দেশবিদেশের পরিবেশ বা জীবনযাত্রার ধারাগুলি আবিষ্কার করতে পারি।')

১১ *Poems*: Swami Vivekananda. ১২ মৃত্যুরূপা মাতা— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-অনূদিত।
১৩ *The Master As I Saw Him*: The Swami and Mother Worship.
১৪ *Kali the Mother*: প্রথম প্রবন্ধ Concerning Symbols.

কিন্তু এই 'দেশ-দেখা-চোখ' আমাদের আপন দেশেই বিরল, কোনো বিদেশী ধর্মপ্রচারকের কাছে তো প্রত্যাশার অতীত। ভারত-পরিক্রমার সময়ে নিবেদিতা ভারতের নিজস্ব পুরাণ ও প্রতীকগুলির অর্থ উপলব্ধির আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছেন। স্বভাবতঃই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত একটু দ্রুত, প্রবল প্রীতির আগ্রহে অযোগ্যকেও যোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট। কিন্তু যে শ্রদ্ধার আলো চোখে না থাকলে কোনো ইতিহাস-দর্শনই সত্য হয় না, নিবেদিতার দৃষ্টিতে সেই আলো সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি অখণ্ড ভাবমূর্তি তাঁর রচনাবলীতে ফুটে উঠেছে।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতে যীশুখৃষ্টের আদর্শ আপনা থেকেই প্রচারিত হয়েছে, বিদেশী মিশনরিদের সে সম্বন্ধে ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে খৃষ্টধর্মপ্রচার যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এ জাতীয় প্রচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিমুখতাই স্বাভাবিক। বিদেশী মিশনরিদের উদ্দেশে ধর্মপ্রচারের যে আদর্শ তিনি উপস্থাপিত করেছেন, সে আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁরই জীবন। *Lambs Among Wolves* পুস্তিকাটিতে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—"Let them love the country as if they had been born in it, with no other difference than the added nobility that a yearning desire to serve and save might give. Let them become loving interpreters of her thought and custom, revealers of her own ideals to herself even while they make them understood by others. When a man has the insight to find and to follow the hidden lines of race-intention for himself, others are bound to become his disciples, for they recognise in his teachings their own aspirations."

('এমন ভাবে তাঁরা [মিশনরিরা] এ দেশকে ভালোবাসতে শিখুন, যেন এ দেশই তাঁদের জন্মভূমি ; আর কোনো পার্থক্য নয়, শুধুমাত্র সেবা ও ত্রাণের জন্য এক বিপুল আগ্রহের মহিমা তাঁদের থাকুক। এ দেশের চিন্তা ও চর্যাকে তাঁরা গভীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করুন, বাইরের পৃথিবীর কাছে সে ব্যাখ্যা যেন এই দেশবাসীর কাছেও তাদের আত্মপরিচয় উজ্জ্বলতর করে তোলে। কেউ যদি একটি জাতির অন্তরতম অভীপ্সার বাণী উপলব্ধি ও অনুসরণ করতে পারেন, তাহলে সে জাতির আর সবাই আপন আদর্শের মহত্তম প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়ে তাঁর অনুগামী হতে বাধ্য।')

সংক্ষেপে এই হল ভগিনী নিবেদিতার জীবনবেদ।

বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা জাতীয় আত্মাভিমান যখন ধর্মপ্রচারের ছদ্মবেশে দেখা দেয় তখন নিবেদিতার ওই আদর্শ অসম্ভব ও অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ কোনো মতবাদের দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা নয়, মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করাই যাঁদের সাধনা, তাঁরাই নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা উপলব্ধি করবেন।

জাতীয় সত্তার সঙ্গে এই একাত্মতার সাধনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তরসত্য তাঁর কাছে কতখানি ধরা দিয়েছিল তার অসংখ্য উদাহরণের একটি মাত্র প্রথমে পাঠকসমাজের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে। বৌদ্ধযুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগে ভারতবর্ষে শিব মুখ্য দেবতাদের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন—"In

tracing out the evolution of the Shiva-image, we are compelled to assume its origin in the Stupa. And similarly, in the gradual concretising of the Vedic Rudra into the modern Mahadeva, the impress made by Buddha on the national imagination is extraordinarily evident."[১৫] ('আমার ধারণা শিব-প্রতীকের বিবর্তন অনুসরণ করলে [বৌদ্ধ] স্তূপ থেকে এর উৎপত্তির ধারণা অবশ্য স্বীকার্য। ঠিক তেমনি বৈদিক রুদ্রের আধুনিক মহাদেবে ক্রমরূপান্তরে জাতীয় ধ্যানধারণায় বুদ্ধের প্রভাব অবশ্য লক্ষণীয়।')

শিব ও বুদ্ধ— উনিশ শতকের নবজাগরণে ভারতবাসীর এই দুই অন্তরতম দেবতার নবপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা— তিনজনেরই ধ্যান ও কল্পনায় নানাভাবে ঘুরে ফিরে শিব ও বুদ্ধ প্রসঙ্গ এসেছে। ভারতাত্মার অন্তরতম উপলব্ধির সন্ধানী এই ত্রয়ী তীর্থপথিকের রচনাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এঁদের দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব সম্মেলনে। এঁদের কাছে ভারতবর্ষ শুধু স্বদেশ বা ভৌগোলিক সীমামাত্র নয়, নিখিল বিশ্বের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির তীর্থভূমি।

ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণের দান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। ভারত-সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়লাভে উন্মুখ ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতেও আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জাতীয় জীবনে মনুষ্যমহিমার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, পুরাণ ও ইতিহাসের সমন্বিত প্রতীক, মহাভারত-নাট্যের সূত্রধার, ভারতীয় প্রজ্ঞার সংহত রূপায়ণ ভগবদ্গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের মহিমোজ্জ্বল প্রকাশ— If we dip into its history we shall think it a strange medley. So many parts were never surely thrust upon a single figure! But through it all we note the predominant Indian characteristics— absolute detachment from personal ends, a certain subtle and humorous insight into human nature.[১৬] শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস যদি আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহলে এক বিচিত্রতম মিশ্রণ দেখতে পাব। এত অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আর কোনোকালে একটিমাত্র ব্যক্তিত্বে আরোপিত হয় নি। কিন্তু এ-সব বৈচিত্র্যের অন্তরালে ভারতীয় চেতনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য— ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অনাসক্তির আদর্শ এবং মানবচরিত্রের মর্মস্থলে প্রবেশের এক সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছে।

গীতা ও বাইবেল— শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট— মানব-অন্তরে পরমের অন্বেষণে তীর্থযাত্রায় এক অনন্তকরুণার সিন্ধুতীরে এসে দাঁড়িয়েছেন— The voice that speaks on the field of Kurukshetra is the same voice that reverberates through an English Childhood from the shores of the Sea of Galilee. We read the gracious words, "Putting aside all doctrines, come there to me alone for shelter— I will liberate thee from all sins, do not then grieve. Fixing thy heart on Me, thou shalt by My grace, cross over all difficulties," and we drop the book, lost in a dream of one who cried to the weary and heavy laden, "Come unto Me."[১৭]

---

১৫ *Footfalls of Indian History* : **Buddhism and Hinduism**

১৬, ১৭ *The Web of Indian Life* : **The Gospel of the Blessed one.**

যে শরণাগতি সকল দেশের ভগবৎ-সাধনার গোড়ার কথা, নিবেদিতা-হৃদয়ে তা বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টীয় সাধনাদর্শকে পরম ঐক্যে মিলিত করেছে। আসলে যীশুর আদর্শ ভারতীয় ভক্তিযোগের খুব কাছাকাছি বলেই নিবেদিতার পক্ষে ভারতীয় ভক্তিচেতনার উপলব্ধি এত সহজ হয়ে উঠেছে। বিজয়ী জাতির সহজাত অহংকার তাঁর মন থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়ে তাঁর মধ্যে যে চিরন্তন মানুষটি জেগে উঠেছিল, ধর্ম সমাজ সম্প্রদায় ও জাতির বেড়া উত্তীর্ণ হয়ে তা সত্যের অমৃতরূপকে নিমেষে উপলব্ধি করেছে।

বাঙালী ঘরের সরস্বতীপূজা দেখে নিবেদিতার মনে হয়— Man has had many dreams of Divine Wisdom, but surely few so touching as this Saraswati in Bengal.[১৮] ('দিব্যজ্ঞানের কত-না রূপমূর্তি মানুষের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তবু বাংলাদেশের সরস্বতীর মতো হৃদয়স্পর্শী কল্পনা একান্ত বিরল।')

দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা স্মরণ করে তিনি ভাবেন— There was a wonderful fitness in the fact that in the fulness of time it was on the full-moon of Phalgun, the day of the Holi festival, that Chaitanya, apostle of rapture, lover of the poor and lowly, the national saint and the preacher of democracy, was born here in Bengal.[১৯]

('পরমানন্দের মূর্তবিগ্রহ, সাম্যের প্রচারক, পতিত ও দরিদ্রের প্রেমিক, জাতীয় মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য যে দোলযাত্রার ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন— এ ঘটনার মধ্যে এক অপূর্ব নাটকীয় অনিবার্যতা নিহিত।')

রামায়ণ-মহাভারতে চিরস্পন্দমান ভারতহৃদয় তাঁর অনুভবে— What philosophy by itself could never have done for the humble, what the laws of Manu have done only in some measures for the few, that the epics have done through unnumbered ages and are doing still for all classes alike. They are the perpetual Hinduisers, far they are the ideal embodiments of that form of life, that conception of conduct, of which laws and theories can give but the briefest abstract, yet towards which the hope and effort of every Hindu child must be directed.[২০]

('দর্শন যা কখনো সাধারণ মানুষের জন্য করতে পারত না, মনুর অনুশাসন যা মুষ্টিমেয়ের জন্য সম্ভব করে তুলেছিল, অনন্তকাল ধরে এবং আজ অবধি এই মহাকাব্যটি সর্বশ্রেণীর মানবের জন্য তাই সাধন করে চলেছে। হিন্দুর ধ্যানধারণার তারা চিরন্তন প্রকাশ। ভারতীয় জীবনাদর্শ ও আচার-আচরণের যে

---

১৮ *Studies from an Eastern Home :* The Saraswati Puja.

১৯ তদেব : Dol-Jatra.

২০ *The Web of Indian Life :* The Indian Sagas.

আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে সূত্রাকারে প্রকাশিত, এ দুই মহাকাব্যে তারই পরিপূর্ণ বাণীমূর্তি। প্রতিটি হিন্দু সন্তানের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার এরা নিয়ামক।')

ছাত্রদের কাছে ভারতীয়তাবোধের প্রথম পাঠরূপে রামায়ণ-মহাভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তিনি একান্ত আবশ্যক মনে করতেন। শুধুমাত্র অতীত গৌরবের জন্যই নয়, সেবা ও সাধনার দ্বারা নবযুগের মহত্তর কীর্তিসৌধস্থাপনের স্বপ্নও তিনি তরুণপ্রাণে সঞ্চার করতেন। *Studies from An Eastern Home* গ্রন্থের ভূমিকায় স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও তাঁর গুণগ্রাহীবন্ধু শ্রীর‍্যাটক্লিফ এক তরুণসভায় রামায়ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার বক্তৃতাংশ উল্লেখ করেছেন—'The Ramayana is not something that come once for all from a society that is dead and gone; it is something springing ever from the living heart of a people. Our word to the young Indian today is: Make your own Ramayana, not in written stories, but in service and achievement for the motherland.'

('রামায়ণ শুধুমাত্র এক বিগত মৃত সভ্যতার অতীত কাহিনী মাত্র নয়। এক জীবন্ত জাতির প্রতিদিনের জীবন থেকে এই রামায়ণ উৎসারিত হয়ে চলেছে। আজকের তরুণ ভারতের কাছে আমাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র লিখিত কাহিনীতে নয়, সেবা ও সাধনায় নিজেদের রামায়ণ তোমরা নিজেরা সৃষ্টি করে তোলো।')

কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্র শিল্প বা সাহিত্য নয়, নিবেদিতার কাছে ভারতের মহিমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এ দেশের দরিদ্র নিরক্ষর সরল অথচ গভীরতম জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত নরনারী। সন্দেহ নেই, সাধারণের মধ্যে এই অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করার প্রেরণামন্ত্রও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী থেকেই সঞ্চারিত। তবু, মানুষকে গড়ে তোলা ও মানবমনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার সাধনায় তিনি যে তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষয়িত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষকে তিনি জীবনের সর্বস্তর থেকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করতে পারতেন—এ তাঁর সহজাত প্রতিভা। উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে এসে সে প্রতিভা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসুর স্মৃতিচারণে লক্ষণীয়, নিবেদিতা তাঁর আলাপ-আলোচনায় কখনো 'Indian Women' বা 'Indian need' বলতেন না, বলতেন, 'Our Women' বা 'Our need'[২১] জগদীশচন্দ্রের আগ্রহে লিখিত[২২] রবীন্দ্রনাথের 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধটিতেও কবি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন, "তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।"

শ্রদ্ধার দূরত্বে নয়, আত্মার আত্মীয়তায় নিবেদিতার মহত্ত্বের পরিমাপ। বৈষ্ণব কবিরা হয়তো একেই বলবেন 'রাগাত্মিকা ভক্তি'— জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তা।

শিক্ষা— বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন নিবেদিতার এ দেশে আসার প্রধান উপলক্ষ্য। কিন্তু এ দেশের যুগযুগান্তরের ভাবধারায় গঠিত নিরক্ষর অথচ গভীরতর অর্থে মহত্তম চিন্তার অধিকারিণী এমন এক

২১ *Studies from An Eastern Home*: শ্রীর‍্যাটক্লিফের ভূমিকা 'In memoriam' থেকে।

২২ 'নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্যে জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন— আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম' [পত্রাবলী: রবীন্দ্রনাথ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত: শারদীয় দেশ পত্রিকা ১৩৭৩]

নারীসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, যাঁদের কাছে তিনিই শিক্ষার্থিনী হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃরূপা গোপালের মা, সাধিকা যোগীন মা (প্রধানতঃ এঁরই মুখে পুরাণ-কাহিনী শুনে নিবেদিতার *Cradle Tales of Hinduism*-এর অমর কাহিনীগুচ্ছের সৃষ্টি) প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীদের জীবনে, আচরণে, কথোপকথনে তিনি ভারতীয় নারীসমাজের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেন, তার দ্বারা ভারতীয় আদর্শে শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলার মূলভিত্তিটি সুদৃঢ় হয়েছিল।[২৩] প্রাচ্যের আত্মবিলোপ ও পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য— জননী ও সহধর্মিণী— এ দুটিভাবেরই উপযোগিতা উপলব্ধির পটভূমিতে তিনি আধুনিক ভারতীয় নারীর জাগরণ কল্পনা করেছেন— When the women see themselves in their true place, as related to the soil on which they live, as related to the past out of which they have sprung ; when they become aware of the needs of their own people, on the actual colossal scale of those needs ; when the mother-heart has once awakened in them to beat for land and people, instead of family, village and homestead alone, and when the mind is set to explore facts in the service of that heart— then and then alone shall the future of Indian womanhood dawn upon the race in its actual greatness ; then shall a worthy education be realised ; and then shall the true national ideal stand revealed[২৪]

('ভারতীয় নারী যখন তাদের নিজস্ব স্থানটি অধিকার করবে— যে দেশে তাদের জন্ম, যে অতীত থেকে তাদের আবির্ভাব, যে বিপুল জাতীয় জীবনের কর্তব্য তাদের সম্মুখীন— সে-সব কিছু সম্বন্ধে যখন তারা সচেতন হয়ে উঠবে, শুধুমাত্র আপন আপন বাড়িঘর, গ্রাম ও পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন সমস্ত দেশ ও জনসাধারণের জন্য তাদের মাতৃহৃদয় স্পন্দিত হবে, আর সে হৃদয়ের অনুভব কর্মে পরিণত করার মানসিকতা তাদের মধ্যে দেখা দেবে— একমাত্র তখনই ভারতীয় নারীর মহিমময় ভবিষ্যৎ এ জাতির জীবনে প্রতিভাত হবে, এক মহান শিক্ষাদর্শের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ ঘটবে, যথার্থ জাতীয় জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ তখনই প্রত্যক্ষগোচর হবে।')

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, নিবেদিতাপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন সারদাদেবী। নিবেদিতার ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় সারদাদেবীর স্থান শ্রীরামকৃষ্ণের সমতুল্য। পবিত্রতা ও প্রশান্তির মূর্তবিগ্রহ সারদাদেবী তাঁর কাছে—'To me it has always appeared that she is Sri Ramkrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood.'[২৫] বাস্তবিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বাভাবিক সংস্কারে বিকশিতা সারদাদেবী যে উদার অসাম্প্রদায়িকতায় তাঁর এই বিদেশিনী কন্যাকে সব ছুঁৎমার্গের উর্ধ্বে আপনবক্ষে টেনে নিয়েছিলেন, নিবেদিতার ভারতবর্ষ-উপলব্ধিতে তা সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল। গুরুর কাছে তিনি ভারতের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর যেসব কাহিনী

২৩, ২৫ *The Master As I Saw Him* : **The Holy Women** পরিচ্ছেদ।

২৪ *The Web of Indian Life* : **The Oriental Woman** প্রবন্ধ।

শুনেছিলেন, সারদাদেবীর মধ্যে ভারতীয় নারীর সেই মাধুর্য নম্রতা ও মহত্তম আদর্শে জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ রূপমূর্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু অতীত ভারতবর্ষ নয়, ভবিষ্যৎ ভারতের নারী-জীবনের প্রেরণারূপেও এই মহীয়সী নারীর জীবন ও সাধনা তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের এই অন্তঃপুরবাসিনীদের সান্নিধ্যে এসেই নিবেদিতা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছেন— The Indian home thinks of itself as perpetually chanting the beautiful psalm of custom. To it, every little act and detail of household method and personal habit is something inexpressibly precious and sacred, an eternal treasure of the nation, handed down from the past, to be kept unflawed, and passed on to the future.[২৬]

ভারতীয় জীবনধারার এই সামগ্রিক ছন্দটি অনুধাবন করাই নিবেদিতার ভারত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বিদেশী ও স্বদেশী এমন অনেক সমালোচককে আমরা জানি যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে যান বলেই অসহিষ্ণু ব্যস্ততায় নেতিবাদী সিদ্ধান্তে এসে পৌছান। *The Web of Indian Life* গ্রন্থের ভূমিকায় সে কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'Those who have no ear for music, hear sounds but not the song'.[২৭] অনেক কাল কোনো দেশবিশেষে বাস করলেই সে দেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অধিকার জন্মায় না। সে দেশের প্রাণছন্দটি অনুভব করার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই সংগৃহীত তথ্যস্তূপের অন্তরালে নিহিতার্থের সন্ধান দিতে পারেন। 'গানের কান যাদের তৈরি হয় নি, তারা আওয়াজ শোনে, গানটি শুনতে পায় না।'

ভারততীর্থের সন্ধানী মধুকরদের সঙ্গে সহজেই নিবেদিতার প্রাণের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, ওকাকুরা, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, আনন্দকুমার স্বামী, হ্যাভেল, র‍্যাটক্লিফ, দীনেশচন্দ্র, নন্দলাল, অসিত হালদার— চিরন্তন ভারতের অন্বেষণে দেশ ও দেশান্তরের আরো অসংখ্য যাত্রীদল নিবেদিতার চিত্তপ্রাঙ্গণে মিলিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই মনীষীসমাবেশের দিক থেকে দেখলেও নিবেদিতার প্রেরণাশক্তি অপরিমেয় বিস্ময় ও গৌরবের বস্তু।

উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ধর্ম জাতীয়তা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে বাঙালী ও ভারতবাসীর চিত্তলোকে অক্ষয় প্রভাব বিস্তার করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু উনিশ শতকের মহান পুরুষদেরই অন্যতম নন, তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের শাখাপ্রশাখায় হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যবধানের রেখাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠলেও মহর্ষির নিজস্ব ধ্যানের জগৎটিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। তা ছাড়া স্বদেশী-সংস্কৃতির

২৬ *The Master As I Saw Him* : The Holy Women অধ্যায়।

২৭ *The Web of Indian Life* : The Sister Nivedita : Introduction : Rabindranath Tagore. বইটির প্রথম প্রকাশ মে ১৯০৪। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তারিখ ২১শে অক্টোবর ১৯১৭। বইটির চতুর্থ মুদ্রণ হয় অক্টোবর ১৯১৪ এবং পুনরায় মুদ্রণ জুলাই ১৯১৮। সুতরাং এই পঞ্চম মুদ্রণের আগে ভূমিকাটি লিখিত।

যে সাধনা ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে যাত্রা শুরু করেছিল, নিবেদিতার সঙ্গে তার প্রাণের মিল সহজেই ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সরলাদেবী— ঠাকুর-পরিবারের এই তিনজনের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলাদেবী বিবেকানন্দের কাছে প্রতীচ্য জগতে ভারতের বাণী প্রচারের জন্য বিশেষভাবে যোগ্যরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্য পাশ্চাত্যের নিবেদিতা ও পাশ্চাত্যের জন্য ভারতের সরলাদেবীকে উপস্থাপিত করার পরিকল্পনাও তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের সে-আহ্বানে নানা কারণে সরলাদেবী সাড়া দিতে পারেন নি। অবশ্য বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর জীবনে যে কী গভীর পরিবর্তন এনেছিল সে কথা 'জীবনের ঝরাপাতা'[২৮] গ্রন্থে পরম আন্তরিকতায় বিধৃত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর একদিন মহর্ষির আহ্বানে নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের অপরূপ আতিথ্যের স্মৃতি নিবেদিতার মনে জাগরূক ছিল। মহর্ষির সঙ্গে সেদিন তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় (১৮৯৮) থেকেই এ দুই মনীষী পরস্পরের মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের আকৃতি কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।[৩০] অন্যান্য মিশনারি সম্প্রদায়ের মতো তাঁকেও প্রথমে সাধারণ প্রচারকারিণী মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু, প্রথম দর্শনেই এমন কোনো বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা দিয়ে থাকবে যে জন্য নিজের মেয়ের শিক্ষার ভার তিনি নিবেদিতার হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইরে থেকে কোনো শিক্ষা চাপিয়ে দিতে রাজী হন নি। জাতিগত ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৩১] কন্যার ক্ষেত্রে এ অনুরোধ পালিত না হলেও নিবেদিতার শিক্ষাদর্শের কিছু প্রভাব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রের ক্ষেত্রে হয়তো কার্যকরী হয়েছিল। ১৯০৪ সালে কলকাতা থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা তাঁর চিঠিতে লক্ষণীয়— 'বুধগয়ায় আমার যাওয়া ঘটে কিনা সন্দেহস্থল। পিতার শরীর অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যাই হোক ছেলেদের নিয়ে তোমরা যেয়ো। সিস্টার নিবেদিতার ও জগদীশের সংসর্গে ও আলাপ আলোচনায় তাদের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করচি। নিবেদিতা ওদের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি ওদের ইতিহাসশিক্ষার ভার নিয়েছেন— সেইজন্যে এই উপলক্ষ্যে তিনি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে চান। বুধগয়ায় বসে তিনি ওদের ইতিহাসচর্চার ভূমিকা স্থাপন করে দিতে পারেন।'[৩২]

নিবেদিতার নানা পরিকল্পনার মধ্যে Boys' Home একটি— এই ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা ছ মাস আবাসিক শিক্ষালাভ করবে, আর ছ মাস দেশভ্রমণের দ্বারা শিক্ষালাভ করবে। প্রথম ছ মাসের পরিকল্পনা তখনি কাজে পরিণত হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ১৯০৩এর এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে 'বিবেকানন্দ হোমে'র যে ছাত্রদল কেদারনাথের

---

২৮ একুশ অধ্যায় : 'সম্পাদকীয় জীবন— স্বামী বিবেকানন্দ' : পৃ ১৬০-১৬২ : জীবনের ঝরাপাতা।

২৯ নিবেদিতার পত্র— ১৫।২।৯৯ : ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

৩০ *Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda:* Pravrajika Atmaprana পৃ ২৩৮।

৩১ পরিচয় : রবীন্দ্রনাথ : 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধ। ৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।

উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করে রথীন্দ্রনাথ সেই ছাত্রদলে ছিলেন।[৩৩] "When father heard from Sister Nivedita that one of the monks from Belur Math— Sadananda Swami was going to lead one such group to the shrine of Kedarnath in the Western Himalayas, he made up his mind to send me along with them. Father thought that this sort of a hiking trip would be a good priliminary training for the life of hardship he intended me to take up, as a pupil of Brahmacharya Asrama at Santiniketan."[৩৪]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৫] কিন্তু বাগবাজারে তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র কিছু করা নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার যে প্রবল ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, সেদিক থেকে হয়তো তাঁর স্বাধীন কর্মক্ষেত্র নির্বাচনই শ্রেয়তর হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে ও বিশ শতকের গোড়ায় ধীরে ধীরে যে স্বদেশী মনোভাবের সূচনা দেখা দিয়েছিল, রথীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে ভাবধারার আন্দোলনে পরিণতির কারণ হিসাবে প্রধানতম দুটি ব্যক্তিত্ব— ভগিনী নিবেদিতা ও কাউণ্ট ওকাকুরা। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে নিবেদিতার দান সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— "She had the zeal of a convert and was more of an Indian than any native-born. Inspired by the patriotic feelings of her guru the Irish blood in her did not let her remain passive. Her dynamic personality drove her to become a torchbearer of the cause of India's freedom and her rehabilitation in spiritual and cultural status."[৩৬]

সমসাময়িক যুগের শিক্ষা, জাতীয়তা, বিজ্ঞানসাধনা, স্বদেশী শিল্প, স্বাধীনতা-আন্দোলন— এমনি নানা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের সমপ্রাণতা ছিল। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষ্যে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটলেও পরস্পরের সান্নিধ্যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি দিন ছিলেন শিলাইদহে ও বুদ্ধগয়ায়। ১৮৯৯এর ১৬ই জুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রীতির যে নিদর্শন মেলে, তখন অবধি তাঁদের স্বল্পকালীন পরিচয়ের কথা মনে থাকলে তা নিবেদিতার অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।[৩৭] জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব নিবেদিতার কাছে রবীন্দ্রসান্নিধ্য আরো আগ্রহের বিষয় করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই ত্রয়ীব্যক্তিত্বের সমাহার চিরস্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় নিবেদিতার অমিত উৎসাহের কারণও বর্তমান পৃথিবীতে ভারতবর্ষের নিজস্ব মহিমার আত্মপ্রকাশ।[৩৮] বসুবিজ্ঞানমন্দিরের সম্মুখভাগে কল্যাণদীপ হস্তে যে নারীমূর্তি প্রজ্ঞালোক বিকীর্ণ করছেন, তিনি নিবেদিতারই কল্পরূপ।

৩৩, ৩৪ প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার পূর্বোল্লেখিত নিবেদিতাজীবনী পৃ ১৬০ এবং শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *On the Edges of Time* পৃ ৪৪ এবং 'হিমালয়ভ্রমণ' পরিচ্ছেদ— পিতৃস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

৩৬ *On the Edges of Time* পৃ ৬৮-৬৯।

৩৫ ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা পৃ ২৭৪।

৩৭, ৩৮ চিঠিপত্র : রবীন্দ্রনাথ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ১৪৫-১৫৩ [রবীন্দ্রনাথকে লিখিত নিবেদিতার পত্র]

কবির চেতনায় নিবেদিতার পুণ্যপ্রভাব দেখা দিয়েছে আর-এক ভাবে। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি। নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" স্বদেশীযুগের কবিতা ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের ভারত-তন্ময়তা ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের জননীমূর্তির উদ্দেশে অন্তরের আকুলতানিবেদনের অন্যতম প্রেরণা ভগিনী নিবেদিতা।

সাধারণতঃ 'কালী-প্রতীকে'র প্রতি রবীন্দ্রমানসে বিশেষ কোনো আকর্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু স্বদেশীযুগের পরিমণ্ডলে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানটির চিত্রকল্পে যখন দেখি—

> ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
> দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।· ·
> তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
> তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!

তখন নিবেদিতার কালী-অনুধ্যানের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। ভারতবাসীর চিত্তলোকে দেশজননীর কালিকামূর্তিতে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁরই নিজস্ব।

অবশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নিবেদিতার প্রেরণা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে। সমগ্র যুগচেতনার প্রকাশরূপে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি মহাকাব্যোপম। আর সে উপন্যাসের নায়ক সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে জাত আইরিশ রক্তের সন্তান 'গোরা'। সমগ্র জীবন ও চেতনা দিয়ে 'হিন্দু' হতে চেয়েও শেষ অবধি তার জন্মসূত্রে সে হিন্দুসমাজের বহিভূত হল। কিন্তু আনন্দময়ীরূপে ভারতবর্ষ তাকে আপন বুকে টেনে নিলেন।

বিবেকানন্দ-শিষ্য নিবেদিতা যে ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরে—এমনকি তাঁর গুরুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসিতা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতেন না— সে বেদনাদায়ক সত্য আমাদের চরম লজ্জার কথা। তবু, কোনো ক্ষোভ, কোনো অভিমান এই ভারতপ্রাণার হৃদয়কে মুহূর্তের জন্য বিমুখ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো হিন্দু-সমাজের তদানীন্তন এই সংকীর্ণতা স্মরণ করেই নিবেদিতাকে গল্পটি বীজাকারে শোনাবার সময় গোরার সঙ্গে সুচরিতার মিলন ঘটতে দেন নি। প্রসঙ্গতঃ পিয়ার্সনকে লেখা গোরা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়— 'You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of *Gora.* She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in *Gora* as it stands now—but I introduced

it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind'.[৩৯]

সংরক্ষণশীলতা যেমন নিবেদিতাকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় নি, তেমনি আর-এক দিক থেকে সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে চিরন্তন ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছে।

নিবেদিতাচরিত্রে যে যোদ্ধভাব— 'বলবান আক্রমণের বাধা' এবং অপরের মনকে পরাভূত করার উৎসাহ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, তা গোরা-চরিত্রের অন্যতম মূল উপাদানে পরিণত। হিন্দুঐতিহ্যের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে গোরার অনন্যসাধারণ যুক্তিশাণিত সংলাপও নিবেদিতার আলাপচারির ভঙ্গিমায় প্রভাবিত। ব্রাহ্মসমাজ যে ভারতীয় ঐতিহ্যেরই আধুনিক রূপ— তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমগ্র হিন্দুসমাজ ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়— আদি ব্রাহ্মসমাজের এই দূরদৃষ্টি নিবেদিতার গোরা-চরিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের অখণ্ড জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ গোরার অজস্র উক্তির মধ্য থেকে একটিমাত্র উপস্থাপিত করি— "আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষত যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে, তারা যে ভাবে কথা কয় আমার কথা সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউ-বা বোঝে কেউ-বা বোঝে না— তা নাই হল— আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক; তারা আমার সকলেই আপন; তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।"

গোরার প্রবল কণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে, টেবিলে, সমস্ত আসবাবপত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল। (২০শ অধ্যায়, গোরা)

এই বক্তব্য ও বক্তার প্রবল ব্যক্তিত্ব— দুইই নিবেদিতা-চরিত্র-সম্ভব। ভারতবর্ষের অন্তরতম পরিচয়-লাভে পরমাসিদ্ধির কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন *The Web of Indian Life*-এর ভূমিকায়— "She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy. She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of

৩৯ Visva-Bharati Quarterly, August-October 1943 পিয়ার্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৯২২)। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ডে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের এক বা একাধিক গল্প নিবেদিতা অনুবাদ করেছিলেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের অনুবাদটি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরো গল্পের অনুবাদ তিনি করেছিলেন মনে করার কারণ আছে।

its superior aloofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves." ।

জাতিহিসাবে আমাদের দোষ-ত্রুটি কোথায়, তা নিবেদিতার অজানা ছিল না। কিন্তু সে দোষ-ত্রুটির বিবরণ জাতির সামগ্রিক পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠত না। "And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connexion with its past and is marching towards its fulfilment." ।

প্রেমের এই অন্তর্দৃষ্টিবলেই ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জীবনধারা সম্বন্ধে মৌলসত্যের (vital truths) বাণী উচ্চারণ করতে পেরেছেন। এ অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ধীরে ধীরে খুলে গেছে। ভারতবর্ষে আসার প্রথম দিকে তিনি প্রধানতঃ সেবিকা। পাশ্চাত্যের সংস্কার, এমনকি ব্রিটিশ পতাকার প্রতি অন্ধ আনুগত্য পর্যন্ত তাঁর মনে বহুদিন সক্রিয় ছিল। তার পর বিবেকানন্দের প্রেরণায় সেই জাতীয়তাবাদের অবলম্বন হয়ে উঠল ভারতবর্ষ। আসলে, ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেই তিনি স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে এলেন।

গোরা-চরিত্রের একটি মূলসূত্র তার জন্মরহস্য। কেউ কেউ এ রহস্যকে উপন্যাসটির প্রধান দুর্বলতা মনে করেছেন। কিন্তু এ রহস্য জীবনসত্যেরই রূপকমাত্র। সত্য যে বিশেষ দেশ কাল ও সমাজের দ্বারা বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত হতে পারে না, তারই নিশ্চিত প্রমাণ নিবেদিতা এবং নিবেদিতাপ্রণোদিত গোরা-চরিত্র।

গোরার ভারত-অনুসন্ধান আমাদের জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমানবিকতার স্তর-পরম্পরা। জাতি ও বিশ্বের এই সংযোগসূত্রটি আমরা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ইতিহাসের দরবারে জাতির যে নিজস্বের পরিচয়পত্রটি সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, সেই জাতীয়তাবোধের প্রেরণাই ভারতীয় শিক্ষাধারায় নিবেদিতা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

Hints on National Education in India গ্রন্থের Paper on Education IV অধ্যায়ে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য— "Education in India to-day has to be not only national but Nation-making···The centre of gravity must lie for them outside the family, we must demand from them sacrifices for India, bhakti for India, learning for India. The ideal for its own sake. India for India. This must be as the breath of life to them." ।

এই একান্ত জাতীয়তাবাদী আদর্শের যুগপ্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি জানতেন, "In the last and final court, it may be said, humanity is one and the distinction between native and foreign purely artificial."[৪০] চূড়ান্ত বিচারে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মানবতা এক ; আর দেশী ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্যবোধ একান্ত কৃত্রিম।

নিবেদিতার মতো আর ক'টি জীবনে এ মহান সত্য প্রমাণিত হয়েছে !

---

৪০ 'The Place of Foreign Culture in a true Education' : *Hints on National Education in India,*

নিবেদিতা চরিত্রের দুটি দিগন্ত— এক দিকে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম, আর-এক দিকে তাঁর পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সে আত্মনিবেদনের একটি প্রকাশে তিনি 'লোকমাতা'— ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতা। তাঁর জাতীয়তাবোধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ— সর্বধর্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেই এক অসাম্প্রদায়িক ভারতচেতনায় সার্থক। আর-এক দিকে গুরুর প্রতি নিষ্ঠায়, সত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির অতল গভীরতায় তিনি ধ্যানমগ্না তপস্বিনী। বুদ্ধ ও যীশু, মেরী ও কালী, শিব শক্তি, ব্রহ্ম ঈশ্বর— দেশে দেশে কালে কালে মানবপ্রাণে পরমপ্রকাশের সব প্রতীকগুলি তাঁর অন্তরে এসে মিলিত হয়েছে।

বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতার সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ 'ফুজি' নামে গরিব জাপানী জেলেটির মুখে প্রতি সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমতলে যে আবৃত্তি শুনতেন—

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতমচন্দিমায়।
নমো নমো নন্তগুণণ্ণবায়, নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

পরবর্তীকালে 'নটীর পূজা'য় সে শ্লোকটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শুধু কি ফুজির ওই আবৃত্তি? তারই পাশাপাশি নিবেদিতার বুদ্ধ ও ভারতের প্রতি আত্মনিবেদনও কি তাঁর অন্তরের রসলোকে শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের গানে পরিণত হয় নি!— 'বন্দনা মোর ভংগীতে আজ সংগীতে বিরাজে'। শ্রীমতীর ওই অনন্যশরণ সাধনার বাস্তব প্রতিরূপ তিনি তো নিবেদিতার জীবনেই দেখেছিলেন।

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মানসঐক্যের আর-একটি সূত্র তাঁদের কবিচেতনায়। দূরতম অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত রোমান্টিক কবিচৈতন্য দুজনেরই মনোধর্ম। নিবেদিতার গদ্যরচনায় কাব্যস্পন্দন তো ক্ষণে ক্ষণেই চোখে পড়ে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ কবিতাও তিনি বেশ কিছু লিখে গেছেন। ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ—তাঁর কবিতার প্রধানতম বিষয়। *Footfalls of Indian History*-গ্রন্থের সূচনায় তাঁর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কবিতাটির অংশবিশেষ প্রথমে উদ্ধৃত করি—

We hear them, O Mother!
Thy footfalls,
Soft, soft, through the ages
Touching earth here and there,
And the lotuses left on Thy footprints
Are cities historic,
Ancient scriptures and poems and temples,
Noble strivings, stern struggles for Right.

৪ঠা জুলাই, ১৯০২— তারিখটি নিবেদিতা কোনো দিন ভোলেন নি— তাঁর গুরু ও ইষ্ট বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের তারিখ।[৪১] বিবেকানন্দ-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি লিখেছিলেন ৪ঠা জুলাই

৪১ একটু আকস্মিক যোগাযোগ মনে হলেও এ কথা স্মরণীয় যে, ৪ঠা জুলাই তারিখেই (১৮৯৮) হিমালয়-পরিভ্রমণের সময় বিবেকানন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসটির উদ্দেশে তাঁর বিখ্যাত To the fourth of July কবিতাটি লেখেন।

তারিখে পাঁচ বৎসর পরে। বান্ধবী ম্যাকলাউডের কাছে তাঁর প্রাণের অভিব্যক্তি 'To me he was all love.'। মৃত্যু সেই প্রেমেরই আর-এক মূর্তি।

"Then can I not watch and pray beside him while he sleeps, or wait to join him in that self-same silence?"[৪২]

> "And of that Knowledge, the Knowledge of the Beloved,
> presence and absence are but two differnt modes."[৪৩]

কম্পমান হোমশিখার মতো তাঁর প্রেমস্তোত্র—

> "Love all transcendent,
> Tenderness unspeakable,
> Purity most awful,
> Freedom absolute,
> Light that lightest everyman,
> Sweetest of the sweet, and
> Most Terrible of the terrible,
> To thee our salutation,
> Thee we salute. Thee we salute,
> Thee we salute."[৪৪]

যে অন্তরতম আকুলতা ওই মৃত্যুমুহূর্তটিকে ঘিরে অনুক্ষণ গুঞ্জরিত হত, তারই কিছু অনুরণন তিনি রেখে গেছেন *An Indian Study of Love and Death*-এর কবিতাগুচ্ছে। উৎসর্গপত্রে তাঁর না-বলা বাণীর বেদনা স্বল্পতম ভাষায় সংহৃত— Because of Sorrow— আর নীচে লেখা নামের আদ্যাক্ষর N.

কবি ও শিল্পীর দৃষ্টিতে নিবেদিতা সতী ও উমায় রূপান্তরিত। তাঁর সাধনা প্রেম আত্মত্যাগ— ভারতীয় মানসের মহত্তম কবিকল্পনার কথাই বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে।

"শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে, তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল।"— বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল।·· সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর।"— 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের এই বর্ণনারই ভাষান্তর তাঁর অনন্য ছবি 'উমা'।

৪২, ৪৩, ৪৪ *An Indian Study of Love and Death* (১৯০৫)

নিবেদিতার প্রয়াণ-উপলক্ষ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শ্রদ্ধানিবেদনের অর্ঘ্য সাজিয়েছেন—

তপস্যার পুণ্যতেজে করেছিলে অসাধ্য সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণদীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।
এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈলমূলে ;— শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী। —নিবেদিতা : কুহু ও কেকা

সতী ও উমার মতো নিবেদিতার মানসপটভূমিতেও হিমালয় সমাহিত ধ্যানের প্রতীক। ভারতের সেই যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সাধনারই আর-এক রূপায়ণ ভারতীয় শিল্পকলায়। হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ-আনন্দ-কুমারস্বামী-নন্দলালের সমবেত প্রতিভায় পুনরুজ্জীবিত ভারতশিল্পের পীঠভূমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। আর এ শিল্পের প্রাণময়ী প্রেরণাশক্তি ভগিনী নিবেদিতা। সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও এক অর্থে এই ভারতশিল্প-আন্দোলন আমাদের জাতীয় সত্তার জাগরণে অনেক বেশি সহায়ক হয়েছিল। তার কারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবলোকে নিবেদিতা ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতশিল্পের নিজস্ব ভঙ্গিমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো নিজেই অপূর্ব মূর্তি গড়তে পারতেন, ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় ভারতীয় চিত্তে পৌরাণিক রূপকল্পের নবপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে বিভিন্ন ধর্মমন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব সমন্বয়ে ফুটে উঠেছে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের মানসচিত্র। রামকৃষ্ণ মিশনের সর্পবেষ্টিত প্রতীকচিহ্নটি বিবেকানন্দের শিল্পসৃষ্টির অভ্রান্ত সাক্ষ্য— "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি— কর্মের, কমলগুলি— ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি— যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়— চিত্রের ইহাই অর্থ।" —স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

ভারতশিল্পের অধ্যাত্মবাণীর প্রেরণা ভগিনী নিবেদিতায় হৃদয়ে আর-একটি প্রতীকের সৃষ্টি করেছিল— বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গিতপ্রাণ দধীচিমুনির অস্থিনির্মিত বজ্র। এ বজ্রপ্রতীক তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রতীকচিহ্নরূপে ব্যবহৃত, তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকার কেন্দ্রস্বরূপ।

গ্রীক ও পাশ্চাত্যশিল্পকলার অনুকরণচিন্তা থেকে ভারতীয় শিল্পী-মানসকে মুক্ত করে তিনি যে ভারতীয়তার আদর্শ শিল্পীদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের পরে সে আদর্শের মহত্তম প্রকাশ নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে। শুধুমাত্র ইতিহাস পুরাণে নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত সংগ্রামে সর্বস্তরের প্রকাশে ভারতশিল্পের নিজস্ব সিদ্ধির পরিচায়ক নন্দলালের বিচিত্র শিল্পসাধনা।

ভারতশিল্পের যাত্রারম্ভ থেকে এই শিল্পাদর্শে এদেশের ও বিদেশের শিল্পজিজ্ঞাসুদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন। মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত তাঁর এই জাতীয় শিল্পব্যাখ্যার আংশিক উদাহরণ নন্দলালের 'সতী'-চিত্র-পরিচায়িকা থেকে উদ্ধৃত—

"Had the painter of this picture been a European, we should unquestionably have had the subject presented to us as a fine-looking woman, drawn to her full height, and facing the spectators in a mingling of beauty and triumph. Nothing can be more significant of the distinctive character of Indian feeling, however, that the way in which Mr. Nanda Lall Bose has here set himself to approach the idea. We see before us a woman, beautiful indeed, and adorned like a bride, with her whole mind set on the moment of triumph, yet without the slightest consciousness of her own glory. The form is pure sattva, without one particle of rajas, as the Indian thinker might express it. The spirelike flames leap up. She kneels throned on a summit of fire. Yet there is no fear. No farewell song is mingled with her praying. Her eyes see nothing— neither the flames beneath, nor the loved one she is leaving— nothing at all, save the sacred form of him who she is about to rejoin. Her mind is quiet, flooded with peace. The moment is one of union. She knows nothing of separation."[৪৫]

এ শুধু চিত্র-পরিচয় নয়, ভারতাত্মার অন্তরময় অনুভব। আর-এক অর্থে এ তাঁরই আত্মপরিচয়। যে জীবনসাধনায় তিনি এ প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন, তা মৃত্যুর অন্ধকার বিদীর্ণ করে অমৃতের শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। গুরুর কাছে তো তিনি শুনেছিলেন, "সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা।·· মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অন্যের জন্য উৎসর্গ করতে হবে।"

দেহাবসানের কিছুদিন আগে দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকে নিবেদিতা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র একটি প্রস্তরমূর্তি চেয়ে এনেছিলেন। এ মূর্তি যার কাছে থাকবে, তার অকল্যাণের সম্ভাবনা— এই সংস্কারবশে দীনেশচন্দ্র মূর্তিটি প্রথমে দিতে চান নি।

নিবেদিতা ঐতিহাসিকের মুখে এই অন্ধসংস্কারের কাহিনী শুনতে চান নি। তিন মাস পরে তাঁর অকালপ্রয়াণে[৪৬] কেউ কেউ অন্ধসংস্কারেরই জয় হয়েছে ভেবে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার অনন্ত আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ শেষবাণী— 'The frail boat is sinking, but I shall yet see the sunrise'—যখন তাঁর জীবন থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন ভারত-ইতিহাসের এই প্রজ্ঞাপারমিতার দিব্যকণ্ঠ আমাদের আশ্বস্ত করে। এমন মৃত্যু আছে যা জীবনের সর্বোত্তম প্রকাশ।

---

৪৫ *Civic and National Ideal:* Nivedita

৪৬ ১৩ই অক্টোবর ১৯১১

কাব্যের স্বরূপ

প্রবাসজীবন চৌধুরী

একটি বিশেষ প্রকারের আনন্দদান করাই কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম। এই সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, এই আনন্দদান যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে এবং যে মানসব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় তারাও কাব্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে বা লক্ষণ-বিচারে বিবেচিত হয়। আনন্দদানই কাব্যের সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয়। কারণ, আনন্দলাভ আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। কোনো মনুষ্যনির্মিত বস্তুর উদ্দেশ্য কি তাও আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য। যেহেতু কাব্যের এই আনন্দসৃষ্টিকারিতা সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে, সেহেতু এই গুণটির দ্বারাই আমাদের কাছে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপিত। অবশ্য কাব্যের এই প্রাথমিক সংজ্ঞাটি—যা এখন বীজ-আকারে আছে, ক্রমে ক্রমে তা মূল শাখা-প্রশাখা-পল্লবে প্রসারিত হবে। কারণ এই সংজ্ঞাটির সংজ্ঞা—আবার তার সংজ্ঞা—এইভাবে অনেক তত্ত্বের সারিতে টান পড়বে যেই আমরা কাব্যকে বিশদরূপে জানতে অগ্রসর হব। বিশেষ ধরণের আনন্দদান যা কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম বলা হল তারও স্বরূপ এবং লক্ষণ -নির্ণয় করতে হবে এবং সেগুলির গুণধর্মও বিচার করতে হবে। তা না হলে যদি বলা হয় যে, কাব্য তাই যা একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় এবং সেই বিশেষ ধরণের আনন্দ সেই বস্তু যা কাব্য হতেই পাওয়া যায় তা হলে স্পষ্টই দেখা যায় শব্দের আবর্তেই শুধু ঘোরা হয়, বাস্তবিক কোনো জ্ঞান হয় না। কাব্যের যা বৈশিষ্ট্য তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এই ব্যাখ্যার বা সংজ্ঞা-নিরূপণ ব্যাপারের শেষ ধারণাগুলি আমাদের সাধারণ জ্ঞান-সাপেক্ষ ও সার্বিক হতে হবে। তা না হলে আমাদের কাব্য-মীমাংসায় পৌছনো সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথা॥ প্রথমেই কাব্যের আনন্দকে সাধারণ আনন্দ হতে পৃথক বলে জানতে হবে। নয়তো কাব্যের সঙ্গে সাধারণ আমোদ-প্রমোদ বা ক্রিয়া-কলাপের কোনো প্রভেদ থাকে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ[১] এবং কোলরিজ[২] কাব্যের আনন্দ দিয়েই তার লক্ষণ বিচার করেছেন। কিন্তু তাঁরা কাব্যের আনন্দকে অন্যান্য আনন্দ হতে পৃথক করে দেখেন নি বা দেখান নি এবং সেইজন্যই দুই রকমের সমালোচনার হাতও এড়াতে পারেন নি। প্রথমতঃ, যেমন টলস্টয়ের মতে কাব্যের কাজ যদি আনন্দদানই হয় তবে তাকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে কোনো গৌরবের বস্তু বলে মনে হবে না। তা ছাড়া কাব্য এমন কি করে, যার জন্য সে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে? ব্যসন হতেও তো আমরা আনন্দলাভ করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, দুঃখমূলক নাটক বা ট্র্যাজেডি যে ধরণের আনন্দ আমাদের দেয় তাকে তো সাধারণ অর্থে

১ "The end of poetry is to produce excitement in co-existence with an overbalance of pleasure." —Wordsworth : *Preface to Lyrical Ballads,* 1800.

২ "It is that species of composition which is opposed to science by proposing for itself its immediate object pleasure, not truth." Coleridge : *On Poesy or Art,* (1818) in Biographia Literaria (Oxford. 1907)। তেমনই Dryden বলেন : "Delight is the chief aim." *Essay on Dramatic Poesy* (1668)। আরও অনেকে, যেমন Horace ও Philip Sidney বলেন : শিক্ষা ও আনন্দ-দান উভয়ই কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানেও কাব্যের আনন্দঘন অংশটুকুর বৈশিষ্ট্য বলা হল না — অধিকন্তু মনে রাখতে হবে যে কাব্যনীতি শিক্ষার বাহন নয়।

আনন্দ বলা যায় না। কেননা তা হলে বলতে হয় যে আমরা যখন নায়কের দুঃখে অশ্রুবিগলিত হই তখন আমরা মিথ্যাচার করি; আসলে আমরা আমোদই পাই এবং পরের দুঃখে আমোদ পাওয়াটা আমাদের স্বভাব। কিংবা বলতে হয়, যে-ট্র্যাজেডি হতে কোনো আনন্দই পাওয়া যায় না তা কাব্য নয়। অতঃপর এই বিপর্যয় নিবারণ করবার জন্যই অ্যারিস্টটল[৩] বললেন যে, ট্র্যাজেডির একটি বিশেষ আনন্দ (proper pleasure) আছে। যদিও অ্যারিস্টটল এই বিশেষ আনন্দটির ব্যাখ্যা করেন নি। কান্টও এক বিশেষ ধরণের আনন্দ দ্বারা শিল্পের লক্ষণ-নির্দেশ করেছেন— সে আনন্দ ইন্দ্রিয়জনিত সুখ, জ্ঞানভিত্তিক বা নীতিমূলক আনন্দ হতে বিলক্ষণ। সুতরাং কাব্যের আনন্দের প্রকৃতি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লংগাইনাস[৪] এক মহান তুরীয়ানন্দরূপে দেখেছেন এবং অভিনবগুপ্ত[৫] এ আনন্দকে 'অলৌকিক-চমৎকার' বলেছেন, আর মম্মট[৬] এ আনন্দকে বলেছেন 'সদ্যপরানির্বৃত্তিঃ'। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যসম্ভোগ যে মানস-ক্ষেত্রে সম্ভব হয় তা সাধারণ নয় বলেই ভারতীয় আলংকারিকগণ মনে করেন। চিত্তের এই উচ্চস্তরে সাধারণ স্বার্থ-বুদ্ধি এবং কামনা-বাসনা লোপ পায় ও কবি বা কাব্যরসিক কাব্যবর্ণিত ভাবাদি দ্বারা অভিভূত না হয়ে তাদের সম্যক্ উপলব্ধি করেন এবং ঐ সঙ্গে আপনার নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্য-স্বরূপকেও উপলব্ধি করেন। তার এই আত্মোপলব্ধির সঙ্গে জড়িত হয় একটি অলৌকিক আনন্দ— যাকে 'পরাব্রহ্মাস্বাদ সচিব'[৭] বা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরা'[৮] বলা হয়েছে— কারণ এই মুক্ত স্বভাব আত্মা ভাবাদি দ্বারা চালিত না হয়ে তাদের কেবল মনন করে তৃপ্ত হয়। অতঃপর আমরা দেখি যে কাব্যের স্বরূপকে ভারতীয় কাব্য-দর্শনে 'রস' সংজ্ঞা-দ্বারা বোঝানো হয়েছে[৯] এবং এই রসকে নিজের সম্বিতের আস্বাদ বলা হয়েছে— যে সম্বিতের উপর কাব্যে বর্ণিত ও চিত্তে জাগরিত ভাবগুলি চিত্রিত হয়ে থাকে[১০]। আনন্দঘন আত্মার আস্বাদ বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক হবারই কথা এবং কাব্যের ভাবাদি সেই বিশিষ্ট অলৌকিক আনন্দকে 'চিত্রতাকরণ' করে মাত্র, অর্থাৎ তার বৈচিত্র্য সম্পাদন করে[১১]।

তৃতীয় কথা ॥ এই আনন্দ-দ্বারা কাব্যকে মানুষের অন্যান্য অনেক রচনাকার্য হতে পৃথক করা সম্ভব; যথা, তার কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান হতে। কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আনন্দই রচনার প্রত্যক্ষ ও প্রধান লক্ষ্য নয়— বরং মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধিই সেই লক্ষ্য। কিন্তু কাব্যকে অন্যান্য ললিতকলা হতে কোন্ লক্ষণ দ্বারা পৃথক করা যায়? সেসব ক্ষেত্রেও অলৌকিক আনন্দ-প্রদানই প্রত্যক্ষ ও প্রধান

---

৩ Bywater-এর অনুবাদ *Aristotle on the Art of Poetry* (1920) pp. 52, 79, 95।

৪ *Longinus on the Sublime* অনুবাদক Saintsbury। তাঁর *Loci Critici* দ্রষ্টব্য।

৫ ধ্বন্যালোকলোচন ৩/৩৩ : অভিনবগুপ্ত-রচিত। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের ভাষ্য।

৬ কাব্যপ্রকাশ ৪।২৭-২৮

৭ ধ্বন্যালোকলোচন ২।৪

৮ সাহিত্য-দর্পণ : বিশ্বনাথ-রচিত ৩।৩৫

৯ ভরত : নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪
অভিনবগুপ্ত : ধ্বন্যালোকলোচন ১।৪, ২।৩
সাহিত্য-দর্পণ ১।৩ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"

১০ নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৫। সাহিত্য-দর্পণ ৩।৩৫

১১ অভিনব-ভারতী ৬।৩৫ (অভিনবগুপ্ত রচিত ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য)।

উদ্দেশ্য। এখানে বলা যায় যে, কাব্যের মাধ্যম বা আধার ভাষা— অন্যান্য ললিতকলার তা নয়। সংগীতে ভাষার প্রয়োগ হয়, কিন্তু তার নিজস্ব ও প্রধান মাধ্যম ধ্বনি ও তার স্বর তাল লয় ইত্যাদি। চিত্র ও নৃত্যকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম। এইসব বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে এইসকল শিল্পকলা মানবহৃদয়ের নানা ভাব প্রকাশ করে এবং সেগুলিকে রসিক-চিত্তে এমন ভাবে সংক্রামিত করে যে তাদের এইসব ভাবের রসানুভূতি হয়, যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং অনুরূপ আনন্দেরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু কাব্যকে সাহিত্যকলার অপর কয়েকটি শাখা হতে কোন্ লক্ষণ দ্বারা প্রভেদ করা যায়? তারাও তো ভাষার মাধ্যমেই অলৌকিক আনন্দ-প্রদান করে। এখানে কি ছন্দমিল-আদির সাহায্যে কাব্যকে নাটক উপন্যাস গল্প ও রম্যরচনা হতে পৃথক করব? কিন্তু, যেমন শেলী বলেছেন[১২]— এইরকম ভেদ মনে করা অযৌক্তিক ও স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক। কারণ কাব্য তো গদ্যেও লেখা হয়ে থাকে এবং কাব্যমাত্রকেই যে ছন্দমিলের আশ্রয় নিতে হবে এমন কথা আজকের কবিরা তো মানবেনই না। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এমন-একটি রচনাকে কাব্য বলব যার ভাবসম্পদ খুব ঘন এবং সেইজন্য সেটি আবেগপ্রধান। এইজন্য কাব্যের ভাষা পদ্য হতে চায়, কারণ তা ভাব-প্রকাশের তাগিদে সংগীতের সাহায্য নিতে চায়। শব্দের কেবল অর্থ-জ্ঞাপনের কাজটিতে কবি সন্তুষ্ট নন, তিনি শব্দের ধ্বনিরও সাহায্য নেন তাঁর ভাব-প্রকাশের কাজে। তাই বিষয়-অনুসারে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টি ক'রে শব্দ-চয়নে শব্দের ধ্বনির দিকে কান রাখেন। কেবল অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের— 'ভোরের প্রথম আলো, জলের ওপারে' বা 'তরুণী রজনীগন্ধা, উন্নমিতা, একান্ত কৌতুকী'— এমন কোনো গভীর ভাবাবেগ জাগায় না। কিন্তু এই পংক্তি দুটি পাঠ বা শ্রবণ করলে চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে এক অব্যক্ত সুষমায়। এইজন্য কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব।

চতুর্থ কথা ॥ কাব্যের এই বিশিষ্ট আনন্দরসটি দিয়েই কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে হবে— সৌন্দর্য দিয়ে নয়। সৌন্দর্য সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা চাই। সুন্দর বলতে অনেক কথাই আমাদের চিন্তায় উপস্থিত হয়। কাব্য সুন্দরকে প্রকাশ করে এ কথা বললে সাধারণতঃ মনে হবে কাব্যে রমণীয় বস্তুরই প্রতিফলন হয় এবং তা মনোহরণ করে— যেমন মনোহরণ করে কোনো অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা বা রূপবতী নারী। কিন্তু মনোহারিতা বা রমণীয়তাই কাব্যের লক্ষণ হতে পারে না, কারণ কাব্যে মানবহৃদয়ের নানান ভাবের রূপায়ণ হয় এবং ভয়ংকর ও বীভৎস রসেরও কাব্য হয়। সুতরাং কাব্যকে যদি সৌন্দর্যের ধারণা দিয়ে পরিচয় দিতে হয় তা হলে সৌন্দর্যের সাধারণ ধারণাটিকে একটু বদলে নিতে হবে। যথার্থ সৌন্দর্যবোধ তখনই ঘটে যখন আমরা যে-কোনো ভাবকে— তা আপাতরমণীয় হোক বা না-হোক— নিবিড় অনুভূতি-দ্বারা উপলব্ধি করি এবং তার গভীর সত্যটিকে জানি। এই জানার সঙ্গেসঙ্গেই আপন আনন্দস্বরূপ চৈতন্যকেও জানতে পারি। কারণ, এই প্রকারে কোনো ভাবকে জানার সময়ে চৈতন্যপুরুষ নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব ধারণ করে— অর্থাৎ তখন সে তার সাধারণ জীবজগতের নানান বিক্ষেপ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেই সচেতন হয়। এই আত্মোপলব্ধি যখন হয় তখনই হয় রসানুভূতি, এবং একেই যদি সৌন্দর্যানুভূতি বলা যায় তা হলে সেই অর্থে কাব্য সৌন্দর্যকে প্রকাশ বা রূপায়ণ করে।

১২ "The distinction between poets and prose writers is a vulgar error." *Defence of Poetry*, 1821

রবীন্দ্রনাথও সৌন্দর্যের প্রচলিত অর্থে কাব্যের আনন্দকে গ্রহণ করেন নি বরং এইরূপ এক পরিবর্তিত অর্থে সৌন্দর্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল।[১৩] যেহেতু সৌন্দর্যের এই উন্নত সংজ্ঞা চলিত নয় সেজন্য সাধারণতঃ এই ধারণাটি কাব্যের সংজ্ঞা-নিরূপণে ব্যবহৃত হয় না। ভারতীয় কাব্য-দার্শনিকগণও তা করেন নি। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও বড়ো একটা করেন নি।

আনন্দের সংজ্ঞাটির বেলায় এরকম সংকটের সম্মুখীন হতে হয় না; কারণ আনন্দের যে স্তরভেদ আছে তা সকলের বিদিত এবং কাব্যানুশীলনের আনন্দ যে জাগতিক ক্রিয়াকর্মের লৌকিক আনন্দ হতে ভিন্ন তা প্রায় সকল কাব্যামোদীই অনুভব করেন।

পঞ্চম কথা ॥ এই বিশিষ্ট এবং অলৌকিক আনন্দটি যেমন সাধারণ লৌকিক আনন্দ থেকে পৃথক বস্তু, তেমনই আবার তা জ্ঞানের আনন্দ (যা বিজ্ঞান ও দর্শন অনুশীলনে লাভ হয়) হতেও ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু এ কথাও সত্য যে কোনো কাব্যে বিশুদ্ধ কাব্যিক আনন্দের সঙ্গে এই দুই প্রকার আনন্দও অল্পবিস্তর মিশ্রিত থাকে। তবুও কাব্যের কাব্যত্ব তার এই বিশিষ্ট আনন্দদানের শক্তিসামর্থ্যেই। আবার এও দেখা যায় যে, কাব্যকে লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নামানো হয় এবং এর দ্বারা জনশিক্ষা বা অন্যান্য উপকারিতার কথাও বলা হয়। আজকাল ললিত ও ফলিত কলার পরিপাটি পৃথকীকরণকে অনেকেই সুনজরে দেখেন না, যেমন দেখেন নি আনাতোল ফ্রাঁস ও জন ডিউই। কারণ ফলিত কলা বা কারুশিল্পের মধ্যেও নিরাসক্ত মনের অবকাশ থাকে, শুধু প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদ ও তৃপ্তি নয় এবং সকল ললিতকলা চারু-শিল্পেরও কিছু কিছু উপযোগিতা থাকে। অন্ততঃ তা থাকা স্বাভাবিক ও উচিতও বটে। কবি বা শিল্পী মানুষকে কেবল বিশুদ্ধ মননের বিষয়বস্তু উপহার দেন না, ঐ সঙ্গে তাকে কিছু বলেন বা শিক্ষা দেন। কাব্যের বা ললিতকলার মধ্যে কিছু নিহিত বাণী থাকে, সে বাণী এ নয় যে শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যই মানুষের একমাত্র কাম্য (যা কবি কীট্স বলেছিলেন) বরং এমন-কিছু যা মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন-যুদ্ধে বাস্তবিক সাহায্য করে। অবশ্য এই বাণীটি সরাসরিভাবে কাব্যকলায় পাওয়া যায় না, আভাসে-ইঙ্গিতেই হয় তার প্রকাশ এবং রসবোধের অন্তর্গত হয়েই সে মানুষের কাছে আসে। এ কথা স্বীকার করেও বলা যায় কাব্যের কাব্যত্ব তার বিশুদ্ধ রস-পরিবেশনে এবং যেখানে এইরূপ ব্যবহারিক কিংবা বুদ্ধিমূলক কিংবা নীতি-ধর্মানুপ্রাণিত মূল্যবোধ কাব্যের কাব্যিক মূল্যবোধকে অপ্রধান করে দেয়, সেখানে কাব্য আর কাব্য থাকে না। কাব্যের মধ্যে ব্যবহারিক মনোভাবের এবং জ্ঞান নীতি ও ধর্মের প্রেরণার দৃষ্টান্ত যেমন অজস্র তেমনই আবার এই ভাবগুলির আধিক্যে কাব্যের রসভঙ্গ এবং অধঃপতনের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

ষষ্ঠ কথা ॥ কাব্যের স্বরূপনির্ণয়ে অনেকে কাব্যের শব্দপ্রয়োগ-কৌশলকে আশ্রয় করেছেন। ধ্বনিবাদীরা—যেমন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন[১৪] মনে করেন যে শব্দ এমন রূপে কাব্যে প্রয়োগ করা হয় যে তাদের বাচ্যার্থের মধ্য দিয়ে এবং তাকে ছাড়িয়ে একটি ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশিত হয়, যা কাব্যের প্রধান অর্থ হয়ে চিত্তকে একটি চমৎকারিতার আস্বাদ দেয়। শরীরের লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব দ্বারাই প্রকাশিত হয়েও তা শরীরকে অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র ভাববস্তু রূপে প্রতিভাত হয়—কাব্যের ধ্বনিকে সেই

---

১৩ দ্রষ্টব্য সাহিত্যের পথে।

১৪ ধ্বন্যালোক ১।১।৫

ভাবেই বুঝতে হবে। এখন এই চমৎকারিত্বের মূলে আছে শব্দের এইরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি, বিশুদ্ধ ধ্বনিবাদ তাই বলে। কিন্তু আনন্দবর্ধন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ধ্বনিত অর্থ তিন প্রকার— বস্তুমাত্র, অলংকার এবং রসাদি, এবং এদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ— কাব্যের পরমার্থ[১৫]। এখন কাব্যের এই ভালোমন্দের বিচার যদি কেবল ধ্বনির ভালোমন্দের বিচারে না হয়ে অন্য-কিছুর সাহায্যে হয় তা হলেই ধ্বনিকে আর 'কাব্যের আত্মা' বলা যায় না। সুতরাং ধ্বনিকার তাঁর 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরীতি' সূত্রের যথার্থ মূল্য দেন নি। বাস্তবিক বিচারেও দেখা যায় যে যদিও ভাবকে রসে উন্নীত করতে হলে— অর্থাৎ কাব্যানন্দের উপযোগীরূপে প্রকাশ করতে হলে—শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তাদের ব্যঞ্জনার্থেরই বেশি সাহায্য নিতে হয় তবুও এই রসই সেই কাব্যানন্দের স্বরূপ; শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যাপারটি নয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপার একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় বটে তবে তা কাব্যানন্দের সমগোত্রীয় হয় না এবং এই আনন্দ অনেক রচনায় থাকলেও তা যথার্থ কাব্য বলে বিবেচিত হয় না বরং কেবল শব্দপ্রয়োগের কৌশল হিসাবেই প্রশংসা লাভ করে থাকে। যেখানে কোনো ভাবের প্রকাশ মুখ্য নয়— বরং কোনো বক্তব্য বিষয়, সংবাদ বা আদেশ প্রদানই মুখ্য— সেখানে রচনা কাব্যপদবাচ্য নয়। উদাহরণতঃ একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায় যার বাচ্যার্থ হল: 'হে তপস্বি! তুমি এখন নির্ভয়ে যেখানে সেখানে যাইতে পারো; এখানে যে কুকুরটি ছিল তাহাকে গোদাবরীতটবাসী সিংহ বধ করিয়াছে!' এর ব্যঙ্গ্যার্থ হল: 'হে তপস্বি! তোমার এখন যেখানে সেখানে যাওয়া মানে সিংহের কবলে পড়া।' শ্লোকটি কাব্যস্তরে উঠতে পারে না, তবে একটি কৌশলী বক্রোক্তিরূপে আমাদের আমোদ দেয়। কাব্য আমোদ বা কলাকৌশলের ব্যাপার নয়, বরং গভীর অনুভূতি ও রসোপলব্ধির বস্তু— যার দ্বারা রসিক-চিত্ত ভাবের সত্য-রূপটিকে এবং সেই সঙ্গে আপন চৈতন্য-স্বরূপকে আস্বাদ করে। গভীর রসসৃষ্টি সম্ভব হয় শব্দের ধ্বনির মাধ্যমেই। কারণ কোনো ভাবকে পরিস্ফুট করতে হলে শুধু তার উল্লেখে কোনো কাজ হয় না, তাকে তার অন্তর্গত সঞ্চারীভাব ও উপযুক্ত বিভাব এবং অনুভাব সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে এবং এখানে শব্দার্থ দ্বারা কেবল সেই-সকল বস্তু ও ভাবগুলিরই প্রকাশ সম্ভব— যারা কাব্যের সেই মুখ্য বা স্থায়ী ভাবটিকে জাগরিত করে এবং প্রাণপূর্ণ করে তোলে। যথা, শৃঙ্গার রসের বেলায় শব্দার্থ দ্বারা কোনো নায়ক বা নায়িকার সাধ-বাসনা আশা-নিরাশা হর্ষ-বিষাদ আকাঙ্ক্ষা-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবগুলিকে প্রকাশ করা যায়— কিছু এগুলির নাম নিয়ে আর কিছু স্থান কাল ও নায়ক-নায়িকার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের হাব-ভাব হাস্য-লাস্য ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে— যা ঐ ভাব-গুলিরই দ্যোতক। সুতরাং শব্দের ধ্বনি রসসৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাই বলে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বললে ভুল হয়, কারণ রসই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি তার কায়ামাত্র। ধ্বনি যদি রসসৃষ্টির উপায় না হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলে সে রচনা কাব্য হয় না— কুশল রচনার নিদর্শন হিসাবেই গণ্য হয়।

ধ্বনিবাদীদের মতো রীতিবাদীরা রীতিকে, আলংকারিকেরা কাব্যালংকারকে ও বক্রোক্তিবাদীরা বক্রোক্তিকে বা কাব্য-বিন্যাসের কৌশলকে কাব্যের আত্মা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এখানেও এ কথা বলেই এঁদের মতবাদ খণ্ডন করা যায় যে, এঁদের নিরূপিত লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি-দোষে 'দুষ্ট'; কারণ কোনো রচনারীতি অলংকার বা বক্রোক্তি অভাবেও উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে এবং ওগুলি কাব্যের

---

১৫ ধ্বন্যালোক ১।৪-৫

অপরিহার্য উপাদান নয়। রসই কাব্যের আত্মা এবং সেই রসে ঔচিত্য-অনুসারে কবি কাব্যে উপযুক্ত রীতি, বক্রোক্তি ও অলংকারের প্রয়োগ করেন। এগুলি সেই রসেরই সুষ্ঠু প্রকাশের উপায়। রসই নিজেকে কাব্যে প্রস্ফুটিত করার জন্য এই-সকল উপায় সৃজন করে এবং এদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। রসের তাগিদে কাব্যের অন্তরাত্মা হতে না এলে এরা সব বহিরঙ্গ-হিসাবে কাব্যশরীরে ভারস্বরূপ লেগে থাকে— কাব্যের অন্তর্গত হয়ে সুন্দরী নারীর শোভন সজ্জা ও ভূষণের মতো তার রূপলাবণ্যকে প্রকাশ করে না। সুতরাং দেখা যায় যে কাব্যকর্মে এই-সকল ব্যাপারকে কাব্যাত্মা রসের অধীন ও উপায়-হিসাবেই দেখা উচিত— স্বতন্ত্র ভাবে নয়।

সংশোধন : বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৩

পৃ ২৩৮ শেষ অনুচ্ছেদের চতুর্থ ছত্র : 'পূর্ববর্তী স্বরের স্থানটি' স্থলে 'পূর্ববর্তী স্বরের পরবর্তী স্থানটি'।

নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৬৬ - ১৯৩৮

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, ইনি সেই সব 'জায়েণ্ট'দের একজন যাঁরা জাতি গঠন করেন। এটা অত্যুক্তি নয়। জাতীয়-জীবনের একটি ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। কোষগ্রন্থ পূর্বেও ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে কোষগ্রন্থ সংকলন করে জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। গান্ধীজি অবশ্য হিন্দী বিশ্বকোষ দেখে তাঁর মন্তব্য করেছিলেন। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনে অনেক বিশেষজ্ঞের সহায়তা পেয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু বাংলা বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ মূলতঃ তাঁর একক সাধনার ফল। কিশোর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রেরণাকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন বিকাশ লাভ করেছে। আর সেই জীবনের ইতিহাসও বিচিত্র।

বাংলা ১২৭৩ সালের (ইং ১৮৬৬) ২৩শে আষাঢ় শুক্রবার ছাতুবাবুর ভবন সংলগ্ন তারিণীদেবীর ৭৫নং বীডন স্ট্রীট ভবনে নগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কর্তা-মা তারিণীদেবী কোটিপতি রামদুলাল সরকারের তৃতীয়া কন্যা; এঁর স্বামী কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র। এঁদের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি। অনেক খুঁজে কালীকৃষ্ণ মেয়ের বিয়ে দিলেন তারিণীচরণ বসুর সঙ্গে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তারিণীচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ক্ষেত্রমণির তিন কন্যা এবং নীলমাধব ও নীলরতন দুই পুত্র। নগেন্দ্রনাথের পিতা নীলরতন কৈলাসচন্দ্র ঘোষের কন্যা পবিত্রকুমারীকে বিয়ে করেন। সিনিয়র স্কলার কৈলাসচন্দ্রের বিদ্বান হিসাবে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি ছিল। নীলরতনের নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ—এই দুই পুত্র এবং এক কন্যা। পবিত্রকুমারীর বয়স যখন মাত্র এগারো বছর আট মাস তখন নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। যেদিন তাঁর জন্ম সেদিনই পিতামহী হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং সবাইকে বলেছিলেন যে, এই পুত্রসন্তানই বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। অন্নপ্রাশনের উৎসবে ব্যয় হয়েছিল ষোলো হাজার টাকা।

নগেন্দ্রনাথের জন্মের পর কয়েক বছর পর্যন্ত পরিবারে অর্থের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু ছিল না সুখ ও শান্তি। খুব অল্প বয়সে মার মৃত্যু হয়। বাবা ও জ্যেঠামশাই মদ ধরেছিলেন প্রথমযৌবনে। স্ত্রীর শোকে পিতা উন্মাদ। পিতামহী ক্ষেত্রমণির পক্ষে বিপুল সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। কর্মচারীদের প্রবঞ্চনায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। বসতবাড়ি পর্যন্ত নিলামে উঠল। আদালতের পেয়াদা এসে তাঁদের বের করে বাড়ি দখল করবে এমন খবর যখন পাওয়া গেল তখন পিতামহী সবাইকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে উঠলেন। কিছুদিন বাগবাজার অঞ্চলে থাকবার পর ছাতুবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন নরম্যাল স্কুলে। সেখান থেকে এসে ভর্তি হলেন ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে। অষ্টম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়লেন। তার পর একদিন হঠাৎ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কাশী পালিয়ে যাবার মতলব আঁটলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলিকাতায় এক বন্ধুর

নগেন্দ্রনাথ বসু

১৮৬৬-১৯৩৮

বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন দুদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাশী যাওয়া না হওয়ায় বাড়ি ফিরে আসতে হল।

মামাবাড়ি ছিল বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া। মামা তাঁকে নিজের বাড়ি এনে ভর্তি করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনে। এখানে তৃতীয় শ্রেণীতে (ক্লাস এইটে) পড়বার সময় পারিবারিক জীবনে দেখা দিল চরম বিপর্যয়। পিতা উন্মাদ; একমাত্র বোন স্বামী হারিয়ে শিশুকন্যা নিয়ে এসে উঠেছে পিতৃগৃহে; বৃদ্ধা পিতামহী এতদিন দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকতেন, নিজের হাতে কোনো কাজ করবার দরকার হয় নি কখনো। আজ তিনি সকলকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। মামাবাড়ির অবস্থা সচ্ছল; নগেন্দ্রনাথ সেখানে সুখেই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর একদিন মনে হল, পরিবারের সবাই এত দুঃখে আছে, হয়তো দুবেলা নিয়মিত ভাত জোটে না এমন অবস্থা, অথচ তিনি সেই দুঃখের পরিবেশ থেকে দূরে নিশ্চিন্ত মসৃণ জীবন যাপন করছেন। এই আত্মপরতার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি ঠাকুমার কাছে ফিরে এলেন সকলের সঙ্গে দুঃখের ভাগ নেবেন বলে।

সকলের সঙ্গে জীবন জড়াতে গিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার বদলে শুরু হল ব্যক্তিগত রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে পড়া। আর চলল সাহিত্যচর্চা। যখন চৌদ্দ বছরের কিশোর তখনই তিনি গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন তাঁদের ভাড়াটিয়া কবি নন্দলাল সরকারকে। নন্দলাল 'কনোজের যুদ্ধ' নামক কাব্যের লেখক। কবিতা রচনার পাঠ এঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সাহিত্য-চর্চায় আর-এক জন সঙ্গী ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তোফী। ব্যোমকেশের মধ্যস্থতায় এক ধনীপুত্রের আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেল একটি মাসিক পত্রিকা বের করবার। সম্পাদক নন্দলাল সরকার, পত্রিকার নাম 'তপস্বিনী'। এ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ 'অক্ষিচাঁদ' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন।

ছাতুবাবুর বাড়ির সামনেই ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। দোতলার বারান্দা থেকে অভিনয় কিছু কিছু দেখা যেত। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কারণেই নাটক ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। 'কর্ণবীর' নামে ম্যাকবেথের অনুবাদ করলেন তিনি; খানিকটা ছাপা হল 'তপস্বিনী' পত্রিকায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ণবীরে'র পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয় এবং কিছুকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'তপস্বিনী' বেশি দিন চলে নি। এর পরে 'ভারত' নামে আর-একটি পত্রিকা শুরু হল। এই পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথের হ্যামলেটের অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। দর্জিপাড়ার থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য তিনি পার্শ্বনাথ, শংকরাচার্য, লাউসেন, হরিরাজ প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। নন্দলাল সরকারের চেষ্টায় 'কর্ণবীর' (ম্যাকবেথ) নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে। কয়েক হাজার টাকার টিকিটও বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু পরিচালক জীবনকৃষ্ণ সেন টাকা আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে চাতুরী করে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্তির পরই একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেওয়ায় অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। দর্জিপাড়ার ক্লাব মহাসমারোহে 'পার্শ্বনাথ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। কিন্তু কলিকাতার জৈনসম্প্রদায় আপত্তি করায় এর অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

'হরিরাজ' হ্যামলেট ও 'রাজতরঙ্গিণী'র কাহিনীর সংমিশ্রণে রচিত। নগেন্দ্রনাথের এক মঞ্চাভিজ্ঞ বন্ধু নিজের অভিরুচি অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির আমূল পরিবর্তন করে স্টার থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য অমৃতলাল বসুকে দেখতে দেন। অমৃতলালের পছন্দ হয় নি। তখন নগেন্দ্রনাথের বন্ধু নিজেই উদ্যোগী

হয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয় জনপ্রিয় হওয়ায় নাটকটি ছাপানো হয়। মূল পাণ্ডুলিপির এত বেশি অদল-বদল করা হয়েছিল যে নগেন্দ্রনাথ নামপত্রে নিজের বা অন্য কারো নাম দেন নি। প্রখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাটকে প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন। নাটকের জনপ্রিয়তা হয়েছিল তাঁর জন্যই। 'হরিরাজে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর অমরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন নামপত্রে লেখক হিসাবে নিজের নাম ছাপিয়ে। প্রকৃত লেখক নগেন্দ্রনাথ বসুর নাম একটি সংস্করণেও ছাপা হয় নি।

নাটক রচনা করে শখ মিটতে পারে, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায় হয় না। তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। মাতামহের চেষ্টায় রেলি ব্রাদার্সের গুদামে নগেন্দ্রনাথ চাকরি পেলেন। টিঁকে থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। কিন্তু মাত্র ছয় দিন কাজ করবার পর তাঁর এ কাজ ভালো লাগল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে জুটিয়ে নিলেন এক ছাত্র। বেতন বারো টাকা। সাত টাকা দিতেন ঠাকুমাকে; আর পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে নিজে সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করলেন।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে নগেন্দ্রনাথ এক বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে উদ্যোগী হলেন। কোষগ্রন্থের নাম 'শব্দেন্দু মহাকোষ'। এর পরিকল্পনাটি নগেন্দ্রনাথ নিজে এই ভাবে বিবৃত করেছেন: "শব্দেন্দু মহাকোষের তিনটি স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে ইংরেজি আদ্য বর্ণমালা অনুসারে ইংরেজি শব্দ, তাহার ইংরেজি ও বাংলা অর্থ, প্রধান প্রধান ইংরেজি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ এবং যে যে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক শব্দের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; দ্বিতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সকল প্রধান শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় বিবরণ; এবং তৃতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বাংলা, সংস্কৃত ও যে সকল বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, প্রমাণ, প্রয়োগ এবং পর্যায় শব্দ বিস্তৃত ভাবে সংকলিত হইয়াছে।"

এই প্রচেষ্টায় নগেন্দ্রনাথের অংশীদার ছিলেন গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র বসু। সংকলনের সকল দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথের; ছাপা কাগজ বাঁধাই ইত্যাদির ব্যয় সুরেশচন্দ্রের। সংকলনের কাজ খুবই কঠিন। কঠোর পরিশ্রম করে প্রথম এক শত পৃষ্ঠা একা সংকলন করলেন। নানা বই দেখবার জন্য প্রায়ই তাঁকে মেটকাফ হলে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করতে হত। কিন্তু এত পরিশ্রম বেশি দিন সইল না। শিরঃপীড়ায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তবু কাজ না করে উপায় নেই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোষগ্রন্থের এক-একটি খণ্ড পর পর ছাপা হচ্ছে। সংকলন বন্ধ হলে প্রেস বসে থাকবে, গ্রাহকরা অধৈর্য হয়ে উঠবে। সুতরাং বেদনায় যখন অস্থির তখনও মাথায় বরফ চাপিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় একা কাজ করা যখন একান্তই অসম্ভব হয়ে উঠল তখন দুজন সহকারী নিযুক্ত করা হল।

এমনি করে 'শব্দেন্দু মহাকোষে'র চার শো পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে গেল। তখন গ্রাহকসংখ্যা প্রায় দু হাজার। কোষগ্রন্থ সুসম্পন্ন হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু এই সময় 'শব্দেন্দু মহাকোষে'র মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সুরেশবাবু ছাপা বন্ধ করে দেন। নগেন্দ্রনাথের এত বড় দায়িত্ব একা বহন করবার মতো সাধ্য ছিল না। তাঁর এত আশা এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে নগেন্দ্রনাথের পরিচয় হল। আনন্দকৃষ্ণ আরবী ফারসী লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজিতেও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি তাঁর কাছ থেকেই ইংরেজি শিখেছিলেন। ভাষা শেখার দিকে নগেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল বরাবরই। জর্মন ফরাসী ও ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করেছেন তখন। আনন্দকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হলেন।

রাধাকান্ত দেব বঙ্গলিপিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' ছাপিয়েছিলেন। দেশের সর্বত্র এই বিরাট কোষগ্রন্থের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু লিপির বাধা এর ব্যাপক প্রচলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। নাগরী লিপিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের জন্য অনুরোধ আসতে লাগল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। রাধাকান্ত তখন পরলোক গমন করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের কেউ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারলেন না। বরদাপ্রসন্ন বসু ও হরিচরণ বসু 'শব্দকল্পদ্রুমে'র স্বত্ব ক্রয় করে নাগরীলিপিতে প্রকাশের আয়োজন করলেন।

সে সময় নগেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। উপার্জন অত্যাবশ্যক। আনন্দকৃষ্ণের সুপারিশে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র নতুন প্রকাশকরা তাঁকে কাজে নিযুক্ত করলেন। বেতন পঁচিশ টাকা। পূর্ব সংস্করণে যেসব শব্দ বাদ গেছে সেগুলি সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে সংকলন করা হল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। বৈদিক দার্শনিক জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনেক সংস্কৃত শব্দ পূর্ব সংস্করণে নেই। অপ্রকাশিত পুঁথি পড়ে সেগুলি সংকলন করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুঁথি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে বহু পুঁথি ছিল। সেগুলি দেখবার অবাধ অধিকার পেলেন নগেন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেন গ্রন্থাগারের মুদ্রিত বই পড়বার। প্রথম থেকে ঐ পর্যন্ত যত বাংলা বই ছাপা হয়েছিল তার একটি করে কপি গ্রন্থাগারে ছিল। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পটভূমিকার সঙ্গে পরিচিত হবার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন ঐ গ্রন্থাগারে।

কোষগ্রন্থ সংকলনের কাজ নগেন্দ্রনাথ আগেও করেছেন। সুতরাং চাকরি নতুন হলেও কাজটা নতুন নয়। আর এটা তাঁর মনের মতো কাজ। তা ছাড়া এ কাজে আর-একটা সুবিধা পেলেন। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র প্রকাশকদের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। হরিচরণ বসুর আগ্রহে এই ছাপাখানায় তাঁর নাটক 'ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য' ছাপা হয় ১২৯৫ সালে। নাটকটির বেশ ভালো সমালোচনা হল। একদিন দুপুরে তিনি ছাপাখানায় বেঞ্চের উপরে শুয়ে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় নাট্যকার অমৃতলাল বসু সেখানে কোনো কাজে এসে উপস্থিত হলেন। হরিচরণবাবু নগেন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত নাটকটির এক কপি তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি দেখেছেন ?

অমৃতলাল ভূমিকাটি পড়লেন। নাটকের আখ্যানবস্তু কোন্ কোন্ হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ভূমিকায় তার বিবরণ ছিল। নাট্যকারের পাণ্ডিত্য দেখে অমৃতলাল মন্তব্য করলেন যে, লেখক নাটক লিখে শুধু সময় নষ্ট করবে; অথচ যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা করলে তার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

অমৃতলাল জানতেন না নাট্যকার সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর উপদেশ মন্ত্রের মতো কাজ করল। নগেন্দ্রনাথ তখনই পুরাতত্ত্বচর্চার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এর পর থেকে নিয়মিতভাবে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়েছেন দিনের পর দিন।

কিছুকাল পরে এক অলৌকিক ঘটনায় নগেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা এক নতুন সার্থক পথ খুঁজে পেল। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র শব্দ সংগ্রহের জন্য পুঁথির খোঁজে তিনি একবার এসেছেন বহরমপুরে। পুঁথির সন্ধান করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'শব্দকল্পদ্রুমে'র জন্য গ্রাহকও সংগ্রহ করতেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত রামদাস সেনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার দেখতে গিয়ে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ করায় তাঁরা বললেন, এই গ্রন্থ খুবই মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী 'বিশ্বকোষ'। দুঃখের বিষয় একটি খণ্ড বেরিয়েই 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের এতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আপনি 'বিশ্বকোষ' বের করবার চেষ্টা করুন না কেন ?

নগেন্দ্রনাথ হকচকিয়ে গেলেন : আমি করব ? আমার সম্বল আর যোগ্যতা কই ?

রাত্রিতে তিনবার স্বপ্ন দেখলেন। জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে জগজ্জননী আবির্ভূতা হয়ে আদেশ করলেন, কলকাতা যাও, বিশ্বকোষ বের করো।

— কিন্তু মা, আমি কি পারব ?

মা আবার আদেশ করলেন, পারবে, আমি তোমার সহায়।

বহরমপুরে কয়েক দিন থাকবার কথা ছিল। কিন্তু স্বপ্নাদেশ লাভ করে সবকিছু বদলে গেল। সংকল্প স্থির হয়েছে। 'বিশ্বকোষ' নতুন করে বের করবার চেষ্টা করবেন। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। পরদিনই কলিকাতা যেতে হবে।

কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুজ 'কঙ্কাবতী'র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মিলিতভাবে 'বিশ্বকোষ' সংকলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইংরেজিতেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দক্ষ অফিসার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১২৯১ সালে উপক্রমণিকা সহ ২২ সংখ্যায় (fascicule) 'বিশ্বকোষে'র প্রথম খণ্ড বের হয়। এই খণ্ডে শুধু 'অ' বর্ণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। নামপত্রে রঙ্গলাল এবং ত্রৈলোক্যনাথ দুজনেরই নাম ছিল। 'বিশ্বকোষে'র ছাপার কাজ যাতে সুষ্ঠুরূপে হতে পারে সে জন্য রঙ্গলাল চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে একটি ছাপাখানা করেছিলেন।

সংকলনের প্রধান দায়িত্ব ছিল রঙ্গলালের উপর, বৈষয়িক দিকটা পরিচালনা করতেন ত্রৈলোক্যনাথ। 'বিশ্বকোষে'র কাজ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর ত্রৈলোক্যনাথকে সরকারী কাজে ইংলণ্ড যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতি 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে যাবার একটি অন্যতম কারণ। যেসব গ্রাহক অগ্রিম চাঁদা দিয়েছিলেন, 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হওয়ায় তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে ত্রৈলোক্যনাথ টাকাকড়ি নিয়ে বিলেত পালিয়ে গেছেন।

রঙ্গলাল একা 'আ' বর্ণের 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত সংকলন করে ছেপেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ('আ') ১ হতে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গ্রাহকদের দেওয়া হয়েছে। ৮১ থেকে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হলেও নানা কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত এসে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল ১২৯৩ সালে।

এর কিছুকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ দেশে ফিরে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

এক দিন উনিশ বছরের এক তরুণ তাঁর আপিসে এসে উপস্থিত। 'বিশ্বকোষ' নতুন করে বের করবে, অনুমতি চায়। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমে কান দিলেন না তার কথায়। এমন অনভিজ্ঞ তরুণের কাজ নয় বিশ্বকোষ সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। একে একে বললেন 'শব্দেন্দু মহাকোষ' সংকলনের কথা; জানালেন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র নতুন সংস্করণের সংকলনের দায়িত্ব অনেকটা তাঁর উপরে। ধীরে ধীরে ত্রৈলোক্যনাথ নগেন্দ্রনাথের কর্মক্ষমতায় আস্থাবান হলেন। সাফল্যের পথে যত অন্তরায় তার ব্যাখ্যা করে বললেন, বেশ, তুমি যদি সত্যি পার তবে আমার স্বত্ব তোমাকে লিখে দিচ্ছি।

রঙ্গলালও তাঁর স্বত্ব লিখে দিলেন নগেন্দ্রনাথকে।

'বিশ্বকোষে'র মালিকানা তো পেলেন, কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? স্থির হল, সংকলনের সকল দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথের একার; ছাপার দায়িত্ব গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর। কিছুদিন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র কাজও নগেন্দ্রনাথকে করতে হয়েছে 'বিশ্বকোষ' সংকলনের সঙ্গে। পঁচিশ টাকার চাকরিটি গেলে সংসার অচল হবে।

'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনা আরম্ভ। ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রীঃ) তিনি এই কাজ শুরু করেন। গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির উপরেই 'বিশ্বকোষে'র ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। মাত্র শ-খানেক গ্রাহক ছিল। কিন্তু নতুন গ্রাহক করতে গেলে এ পর্যন্ত যতদূর ছাপা হয়েছে তা দেওয়া চাই। পুরনো ফর্মাগুলি রাহুতা গ্রামে পড়ে আছে। দাম প্রায় তিন হাজার টাকা। নতুন করে ছাপতে গেলে অনেক বেশি টাকা লাগবে। নগেন্দ্রনাথের অনুরোধে ত্রৈলোক্যনাথ সমস্ত ফর্মা হাজার টাকায় দিতে রাজী হলেন। অনেক কষ্টে নগদ পাঁচ শ টাকা দিতে পারলেন; এক বছরে শোধ করবার প্রতিশ্রুতিতে হ্যাণ্ডনোট দিলেন বাকি টাকাটার জন্য।

বছর পার হয়ে গেল। বিশ্বকোষ থেকে পাঁচ শ টাকা পাওয়া গেল না ঋণ শোধ করবার জন্য। নিরুপায় হয়ে ঠাকুমার সর্বশেষ অলংকারখানি বন্ধক দিয়ে পাঁচ শ টাকা দিলেন ত্রৈলোক্যনাথকে। আর পাঁচ শ টাকা গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেনবাবুকে দিয়ে নগেন্দ্রনাথ 'বিশ্বকোষে'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী হলেন।

স্বত্বাধিকারী, কিন্তু কোনো আর্থিক লাভ নেই। তবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষকেই করলেন তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ বছরের একাগ্র সাধনায় এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। একক প্রচেষ্টায় এমন ব্যাপক সংকলনের কাজ এর পূর্বে ভারতে হয় নি।

নগেন্দ্রনাথের জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিশ্বকোষের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বকোষের জন্য প্রবন্ধ রচনার তাগিদেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। যে সব প্রসঙ্গের উপর সন্তোষজনক বইপত্র পাওয়া যায় নি তাদের সম্বন্ধে লেখার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এইসব প্রবন্ধের জন্যই তাঁর বহুমুখী গভীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কঠোর জ্ঞানসাধনার প্রতিদান তিনি পেয়েছিলেন নানাভাবে। এর মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা অন্যতম।

দেশবাসী নগেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের যোগ্য মর্যাদা দিতে বিলম্ব করে নি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চন্দ্রবর্মার বিজয়লিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পান। তার পর

থেকে সভ্য হিসাবে সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাগরী লিপির উৎপত্তির উপর তাঁর একটি মৌলিক রচনা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন (১৩০২)। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথকে টেক্সটবুক কমিটির সভ্য নির্বাচিত করা হয়। ঐ বছরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির ফিললজিক্যাল কমিটিরও সভ্য মনোনীত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে প্রথমাবধি নগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরিষদের সেই প্রথম দিকের অনিশ্চিত জীবনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরিষদ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বকোষের অনেক প্রবন্ধের খসড়া এখানে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা পুথি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করে প্রকাশ করবার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। এই-সব সম্পাদিত-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন পরিষদ, ছাপা হয়েছে তাঁরই বিশ্বকোষ প্রেসে।

পরিষদ পত্রিকা ছাড়া নগেন্দ্রনাথ কিছুদিন কায়স্থ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নগেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়া তিনি 'সিদ্ধান্তবারিধি' 'তত্ত্বচিন্তামণি' ও 'শব্দরত্নাকর' উপাধিও লাভ করেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল বলেই কয়েক বছরের জন্য তিনি এ কাজ গ্রহণ করেছিলেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বহু পুরাকীর্তির সচিত্র বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন একটি ইংরেজি গ্রন্থে।

১২৯৪-৯৫ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনার ফলে মোট ২২ খণ্ডে এবং ১৭,০০০ পৃষ্ঠায় বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। সংকলনের কাজ অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথ এবং রঙ্গলাল কিছুকাল আগে থেকেই আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম খণ্ড রাহুতার বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে ১২৯৩ সালে প্রকাশিত হয়; সর্বশেষ খণ্ড কলিকাতার বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৮ সালে। প্রথম খণ্ডের কোনো কোনো কপিতে প্রকাশের তারিখ আছে ১৩০৯। এটা পুনর্মুদ্রণের তারিখ। রাহুতায় ছাপা কপি শেষ হয়ে যাবার পর নগেন্দ্রনাথ ঐ বছর নতুন করে ছেপেছিলেন।

বিশ্বকোষে কি পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণের নামপত্রে বলা হয়েছে: "যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হাকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।"

বাংলা ভাষায় কোষগ্রন্থ রচনার ইতিহাস শুরু হয়েছে ফেলিক্স কেরির 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯) দিয়ে। তার পর থেকে নানা ধরণের কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বকোষের মতো এরূপ বিরাট, নির্ভরযোগ্য এবং সফল উদ্যম এর পূর্বে হয় নি। তবে, আধুনিক কোষগ্রন্থের আদর্শের সঙ্গে পার্থক্যটাও সহজেই চোখে পড়ে। কোষগ্রন্থ ও অভিধানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে বিশ্বকোষের

সংকলকরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। তাই বিশ্বকোষকে তাঁরা বলেছেন "অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান"। অভিধানে যে-সব সাধারণ শব্দের অর্থ পাওয়া যায় তাদের ব্যাখ্যাও বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শব্দার্থের দিক থেকে বিশ্বকোষ যে সমৃদ্ধ তার উল্লেখ করে নগেন্দ্রনাথ বলেছেন: "শব্দ-কল্পদ্রুম অথবা বাচস্পত্য অভিধানে অধিকাংশ বৈদিক শব্দই নাই; বিশ্বকোষে সেই-সকল বৈদিক শব্দ প্রমাণ প্রয়োগ, ভাষ্য টীকা সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

শব্দার্থ সংকলনকে প্রাধান্য দেবার ফলে অনাবশ্যকরূপে বিশ্বকোষের আকার বড় হয়েছে অথচ অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব হয় নি। অবশ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম দিকেও অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হত।

যদিও নাম বিশ্বকোষ, তথাপি ভারতীয়-বিদ্যার উপরেই এই গ্রন্থে জোর দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বলেছেন: "ব্রিটানিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকোষ সমূহে ভারতবাসীর অবশ্যজ্ঞাতব্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভারতবাসীর সেইসব অভাব পূরণের দিকে লক্ষ রাখিয়াই বিশ্বকোষ সংকলিত হইয়াছে।"

আকর-গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বকোষের মূল্য এই কারণেই। ভারতীয়-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পপরিচিত তথ্যগুলি সংকলন করে একটি সংহত ও ধারাবাহিক রূপ দেবার কৃতিত্ব বিশ্বকোষের। শুধু সংকলন নয়; পূর্বে যেসব প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হয় নি সেসব প্রসঙ্গের উপর লেখার জন্য নগেন্দ্রনাথকে মৌলিক গবেষণা করতে হয়েছে। বিশ্বকোষের অনেক প্রবন্ধে এখন কিছু কিছু তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ে। তা ছাড়া প্রথম মধ্য ও শেষ দিকের রচনাগুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে সে কথা নগেন্দ্রনাথই বলেছেন। কোষগ্রন্থের প্রসঙ্গ নির্বাচনে যে অব্‌জেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন কোথাও কোথাও তারও একটু অভাব দেখা যায়। সম্পাদক যেসব বিষয় সম্পর্কে বিশেষরূপে আগ্রহশীল সেইসব বিষয়ের প্রসঙ্গগুলির বিস্তার কিছু বেশি।

বিশ্বকোষ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবার সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতসমাজ অনুরোধ করেন হিন্দী সংস্করণ সংকলনের জন্য। বাংলা সংস্করণ শেষ করে হিন্দী সংস্করণের কথা ভেবেই নগেন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিশ্বকোষ কেবল বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর; যাহাতে এই বিশ্বকোষ সমগ্র ভারত-বাসীর অধিগম্য হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্বৎসমাজ আমার সহায় হইবেন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।"

হিন্দী সংস্করণের কাজ বাংলা বিশ্বকোষ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হবার কয়েক বছর পরে শুরু হয়েছিল। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ এই দুরূহ কাজে হাত দেন।

হিন্দী বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। পঁচিশ খণ্ডে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। হিন্দীভাষী পণ্ডিতদের কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথ সংকলনের কাজে সহায়তা পেয়েছিলেন। মোটামুটি ৭৬৮ পৃষ্ঠার পঁচিশটি বাঁধানো খণ্ডের মূল্য ছিল ৩১৭ টাকা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রকাশক বলেছেন: "হিন্দী বিশ্বকোষ হিন্দীকা ব্রিটেনিকা হৈ, চিত্র আর মানচিত্রো সে সুশোভিত হোতা হৈ। ইসকা তুলনা করনে বালা বড়া গ্রন্থ ভারতীয় কিসী ভী ভাষা মে নহী হৈ। হিন্দী সংসার মে য়হী এক ঐসা মহাকোষ হৈ জো হিন্দী ভাষাকো সজীব আর রাষ্ট্রীয়তাকে গুণো সে পরিশোভিত কর সকতা হৈ।"

হিন্দী সংস্করণকে বাংলা বিশ্বকোষের অনুবাদ মনে করলে ভুল করা হবে। বাংলা সংস্করণের ভুলত্রুটি সংশোধন করা ছাড়া মৌলিক রচনাও যোগ করা হয়েছে।

হিন্দী বিশ্বকোষের কয়েক খণ্ড দেখে মহাত্মা গান্ধী সম্পাদকের পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে এসে গান্ধীজি নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কোনো খবর না দিয়েই গান্ধীজি ১৮ই পৌষ (১৩৩৫) রাত্রি আটটায় বিশ্বকোষ লেনে নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। নগেন্দ্রনাথ তখন হাঁপানী হৃদ্‌রোগ ও নেফ্রাইটিসে ভুগছিলেন। তথাপি তাঁর মনের জোর ও সুদৃঢ় আশাবাদ গান্ধীজির হৃদয় স্পর্শ করেছিল। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনের উদ্যোগে নগেন্দ্রনাথের পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হবার আশঙ্কা। কিন্তু তার জন্য নগেন্দ্রনাথের ভাবনা নেই। গান্ধীজিকে তিনি বললেন, এই কাজই আমার সাধনা, এর মধ্য দিয়েই আমি ভগবানের সেবা করি। কর্মই আমার জীবন। গান্ধীজি লিখেছেন, "I was thankful for this pilgrimage, which I should never have missed. As I was talking to him I could not but recall Doctor Murray's labours on his great work···nations are made of such giants"।

গান্ধীজির বিশ্বকোষ লেনে এই 'তীর্থযাত্রা'র বিবরণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি সংখ্যার "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" বেরিয়েছিল।

১৯শে পৌষ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে কাশীতে তাঁর থাকবার এবং কাজের সুবিধা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সুযোগ গ্রহণ করা নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১৩৩৮ সালে আশ্বিন মাসে হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়। ১৩৪০ সালের বৈশাখ থেকে আরম্ভ হল বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে। এ কাজে নগেন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন ছিলেন পুত্র বিশ্বনাথ। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। পুত্র-শোকাতুর নগেন্দ্রনাথ অপটু দেহ সত্ত্বেও চার খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৪৫ সালের ২৪শে আশ্বিন নগেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যে সম্পূর্ণ হতে পারে নি এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সম্পূর্ণ হলে নগেন্দ্রনাথের আজীবন অভিজ্ঞতার ফল এর মধ্যে পাওয়া যেত। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড তুলনা করলেই পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রসঙ্গ নির্বাচন, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও বিন্যাস, মুদ্রণপারিপাট্য ইত্যাদি বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ প্রভূত উন্নতি বিধান করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, বাংলা দেশের প্রায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত এঁদের নামের তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যাবে বিশ্বকোষ বাঙালী মনীষার এক মিলিত প্রচেষ্টার ফল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত।

নগেন্দ্রনাথের আর-একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'। বিশ্বকোষের মতো এর

ব্যাপক ব্যবহার না হলেও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল এই গ্রন্থ। ১৩০৩ সালে নড়াইল-হাটবাড়িয়া জমিদার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের উৎসাহে নগেন্দ্রনাথ এই কাজে ব্রতী হন। বহু কুলগ্রন্থ ইতিহাস শিলালিপি তাম্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য জাতির কুলবিবরণ তেরো খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন নগেন্দ্রনাথ। তিনি কায়স্থের কুলগৌরব সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নতি ও সংহতির জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন; কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।

বাংলা ভাষায় সুপ্রাচীন ও অপ্রাচীন যত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে তা থেকে শব্দ সংকলন করে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা অভিধান রচনা করবার আশা ছিল নগেন্দ্রনাথের। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৫০০ বাংলা, ৫০০ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি এবং সংস্কৃত ও বাংলায় মিশ্রিত প্রায় ৫০০ কুলগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এ কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

এই সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল। এর বাইরেও দু-একটি বই থাকা সম্ভব।

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানানুসন্ধান কত বিচিত্র পথে অভিযান করেছিল। অথচ তিনি স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্তও উঠতে পারেন নি। শুধু নিজের চেষ্টায় জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং দেশবাসীকে তা বিতরণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী হিন্দী ও সংস্কৃতে তো পারদর্শী ছিলেনই, তা ছাড়া কয়েকটি বিদেশী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। আত্মশিক্ষার এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে না।

নগেন্দ্রনাথ বসুর রচনাপঞ্জী

বাংলা

১ ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য। ১২৯৫।
বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শংকরাচার্যের জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক।

২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ইংরেজী নাম: The Castes and Sects of Bengal)। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। ইতিহাস, কুলগ্রন্থ, শিলালিপি ও তাম্রশাসনের সাহায্যে লিখিত বিভিন্ন সমাজের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত, পরিচয়, স্থাননির্ণয়, বংশাবলী। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য— এই কয়টি জাতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪ খণ্ড বা ৬ অংশে বিভক্ত। এ ছাড়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের প্রামাণিক কুলগ্রন্থ মহাবংশও 'জাতীয় ইতিহাসে'র একটি খণ্ড। কায়স্থদের বিবরণ ৫ খণ্ড বা ৬ অংশে সম্পূর্ণ। বৈশ্যকাণ্ডের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়। ইং ১৯০১।
প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কায়স্থ জাতির বিবরণ। পরে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪ যশোর ইতিহাস-শাখার সভাপতি…সম্বোধন; ১৯১৬।

অনুবাদ

কর্ণবীর, ১২৯২। ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ।

ইংরেজি

1 The Archaeological Survey of Mayurbhanja ; Vol. I. 1911
2 The Modern Buddhism and its Followers in Orissa, 1911
3 A Short History of the Indian Kayasthas. Written for the All India Kayastha Conference, Lahore ; 1915
4 The Social History of Kamrupa, 3v. 1922-33.

হিন্দী

১ ভারতীয় লিপিতত্ত্ব, ১৯১৪।

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাংলা

১ বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ; ২ খণ্ড ; ১৮৯৯।
২ পীতাম্বর দাস—রসমঞ্জরী, ১৩০৬।
৩ নরহরি চক্রবর্তী—ব্রজপরিক্রমা, ১৩১২।
৪ কবি জয়ানন্দ—শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল, ১৩১২।
৫ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—কাশী-পরিক্রমা, ১৩১৩।
৬ রামাই পণ্ডিত—শূন্যপুরাণ, ১৩১৪।
৭ নরহরি চক্রবর্তী—নবদ্বীপ পরিক্রমা (প্রথমাংশ), ১৩১৬।
৮ বিজয়রাম সেন—তীর্থমঙ্গল, ১৩২২।
৯ যদুনাথ সর্বাধিকারী—তীর্থ-ভ্রমণ (ভ্রমণের রোজনামচা), ১৩২২।
১০ বর্ধমানের ইতিকথা—প্রাচীন ও আধুনিক। অন্যান্য লেখক: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; রাখালরাজ রায় ; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী। ১৯১৫

সংস্কৃত ও বিভিন্ন ভাষা

১ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণম্ ; মূল সংস্কৃত, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত। ১-২৩ ভাগ, ১২৯৮-১৩০৯। অসমাপ্ত।
২ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব—সংগীতরাগকল্পদ্রুম। হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী সংগীতজ্ঞগণের সাহায্যে সম্পাদিত। ৩ খণ্ড, ১৯১৬

বিশ্বকোষ-বাংলা ও হিন্দী

১ বাংলা প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে বাইশ খণ্ড পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনা ; ১২৯৮-১৩১৮।

২ বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১-৪ খণ্ড, ১৩৪২-১৩৪৫। অসমাপ্ত।

৩ হিন্দী বিশ্বকোষ ; ২৫ খণ্ড, ১৩২০-১৩৩৮।

'হরিরাজ' নামক একটি নাটকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপি এক বন্ধু এত বদল করেছিলেন যে নগেন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণে নিজের নাম দেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল যশস্বী অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে। 'নারীরত্ন', অভিনব সামাজিক উপন্যাস বা বঙ্গ-সমাজের আধুনিক চিত্র (১৩২৪) নগেন্দ্রনাথের রচনা বলে কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু প্রমাণ নেই। তাঁর সমসাময়িক আর একজন নগেন্দ্রনাথ বসুও লিখতেন, 'অদৃশ সহায়' তাঁর লেখা। 'নারীরত্ন' এই দ্বিতীয় নগেন্দ্রনাথের লেখাও হতে পারে।

সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সবচেয়ে যা অসুবিধাকর তা হল, কবি-শিল্পী হিসাবে যতখানি কীর্তিমান, মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে এক তিলও কম উল্লেখযোগ্য নন। আর মানুষ-হিসেবেও তাঁকে সাধারণ মানুষপদবাচ্য ভাবা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দুঃখ-হতাশা-অপূর্ণতায় দীর্ণ যে সাধারণ মানুষটি শুধুমাত্র গোপন স্বপ্নসঞ্চয়বশত শিল্পের গোষ্ঠে গিয়ে গোত্রবদ্ধ হয়ে পড়েন, সবাই জানেন, সেই ধরণের শিল্পকর্মার পাশে রবীন্দ্রনাথের নাম আমাদের মনে আসে না। আসলে, যতই তিনি তাঁর অনন্য কবি-পরিচয়ের জন্য উতলা হয়ে উঠুন-না কেন, তাঁর সম্বন্ধে ধারণা আমাদের আসে উল্টো ক্রম ধরে। আমরা আগে তাঁকে মানি অসাধারণ এক পুরুষ বলে, পরিশেষে সেই অসাধারণ পুরুষের অন্যতম কৃত্যের মতো তাঁর শিল্পরচনাকে সংলগ্ন করে দিই।

আমাদের এই ধারণা সদ্যোজাতও নয়। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী তাঁর আমলে লিখেছিলেন, "আমি যখন কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হই পরিচিত তখনই তাঁকে একজন লোকোত্তর পুরুষ বলে চিনতে পারি।" তার পর উত্তরোত্তর এই বিশ্বাসে আমরা বদ্ধমূল হয়েছি। সমাজতাত্ত্বিক বলতে পারেন, এতে আমাদের জাতীয়-জীবনে কতখানি আশা বা আস্তিকতা ফিরেছে, কিন্তু শিল্পতাত্ত্বিক ও শিল্পার্থপ্রার্থীর কাছে এটি একটি নতুন সমস্যার মতো দাঁড়িয়ে। সেই কবে থেকে আজও পর্যন্ত যে কোনো রবীন্দ্র-রচনা মানেই জনৈক লোকোত্তর বিশ্বমানবের ব্যক্তিপরিচয় লিখে দেওয়া, 'রবীন্দ্ররচনাপরিচয়' যার শিরোনাম সেই লেখাও মূলত রবীন্দ্রজীবনপরিচয়ের বেশি নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রজীবনী এখনো আমাদের কাছে দৈব-অধিকার তত্ত্বের অস্খলিত প্রকটন, আর রবীন্দ্ররচনা সেই দৈবপ্রতিভা-সৃজিত অকম্প্র বাণীবন্ধ— আর্যোক্তির মতো অনপনেয়— কেবলমাত্র নির্বিকল্প স্তবেই যার যোগ্য পরিচয় লেখা চলে। শতবর্ষ পূর্ণ করে আরো এই যে ক-বছর পেরিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, যখন সত্যি সত্যিই পুরোনো অবস্থা পুরোনো বিশ্বাস পুরোনো প্রত্যয়ের পৃথিবী কোথাও আর টিঁকে নেই, তখনো নিজের সম্বন্ধে আমাদের সামান্যই বিচলিত করতে পেরে, মনে হয়, অচল কারেন্সি নোটের মতো আমাদের তিনি সেই পুরোনো বিচার-বিবেচনাতেও যেন দাঁড় করিয়ে রাখতে চান; এই যে একগুচ্ছ নতুন-প্রকাশিত রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থাবলী আমাদের হাতে এসেছে যার প্রায় সবগুলিরই প্রণেতা সুপরিচিত বিচক্ষণ আলোচয়িতারা, যার মধ্যে এক-আধখানি নতুন গবেষণাও রয়েছে, আর যার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ক্লান্তিহীনভাবে সুলিখিত, সেই লেখারও সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক কৌতূহল গিয়ে দাঁড়ায় ঐখানে। নিজেদের বৈষয়িকভাবে সচ্ছলতর মেনে ওঠার আগেই এইসব বিবরণ থেকে আমাদের জানবার আগ্রহ হয়, বিষয়ে বা বিবেচনায় এখানে পূর্বানুবৃত্তি কতদূর? বা, মুহূর্তবর্তিতা কতখানি?

তার সবচেয়ে অনিবারণীয় হেতু আমরা গোড়াতেই বলেছি: বিষয় হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ অসুবিধাকর। বোধহয় সেই কারণে এই সবগুলি বইয়ের প্রস্তাবনাতে গিয়েই একটু ঠেকে যেতে হয়। যেমন, প্রথম বইখানির গোড়াতেই মিলছে: 'এই অসাধারণ মানুষের— নূতন দেবতার— মধ্যে কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম হলেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' যেমন, কাজী আবদুল ওদুদ উপক্রমেই বলে নিয়েছেন ; 'মহৎ ও বিরাট রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসু হয়েছি পরম বিনয়ে ও শ্রদ্ধায়।' রবীন্দ্রদর্শনের বিশ্লেষক লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন কাব্যসায়রে বার বার অবগাহন ক'রে মনের গভীরে যে প্রশান্তি নামে, যে অনাবিল আনন্দ ধারায় সমগ্র মানবীয় সত্তা পরিস্নাত হয়, তার তুলনা মানুষের অভিজ্ঞতায় বড় একটা মেলে না।' পৃ ৮৪। আর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের আলোচয়িতা জানিয়েছেন : 'যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বের অর্থকে বিস্তৃততর করেছেন, সমস্ত চিন্তাপ্রমাদ কুসংস্কার ও ভুলমাত্রার আরোপ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশগুলিকে সৌষম্যে মিলিত করেছেন তা একটা অলোকিক কীর্তির মতোই আশ্চর্য।' পৃ ৮। অথবা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যাঁর আলোচ্য, তাঁরও সূত্রপাত : 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর অসাধারণ বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়-বিমূঢ় করে।'

আমরা সমস্ত বইয়ের মধ্যে থেকেই এরকম সশ্রদ্ধ দৃষ্টান্ত তুলতে পারি। মনে রাখা দরকার, এতে বইয়ের পরিচয় বলা হয় না, বইয়ের ভালো বা মন্দ বোঝানোও হয় না। তা সত্ত্বেও, এই কথায় যদি ভুল-বোঝার ফাঁক তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এই সুযোগেই বলে নেওয়া ভালো, শ্রদ্ধা-বস্তুটিকে আমরা কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করি না, অনাধুনিকও বিবেচনা করি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধতম পাঠক বোধ করি স্বীকার করবেন, তাঁর সাফল্যের মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত ঐ বস্তুটি যে পরিমাণে ও যে ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আমরা ঈষৎ ক্লান্ত হয়েছি। শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধায় তাঁর কীর্তিও হয়তো অনেকখানিই ঢাকা পড়ে আছে, এমন চিন্তা অন্তত প্রতিক্রিয়াতেও আসে। অবশ্য যে বইগুলির কথা আমরা বলতে বসেছি তার সবগুলির আভ্যন্তরীণ প্রেরণা এভাবে আভাসিত করতে যাওয়াও বিপজ্জনক। কিন্তু প্রায় সবগুলি বইয়েরই শেষ পংক্তিতে পৌছোবার আগেই আরো কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। একটু শিথিল বিচারে দেখা যায়, এইসব বইই হয় সেই জীবনীর উপকরণে লেখা শিল্পালোচনা, সবগুলিতেই জীবন-নেপথ্যের বা রচনান্তরালের দার্শনিক-ধর্মীয় প্রণোদনা নির্ণয় করা— যেমন আমরা অনেকদিন ধরে জেনে আসছি ; প্রায় কোনো জায়গাতেই তাঁর রচনা ভাষার সমস্যা বা প্রকরণের সমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত নয়— যেন তাঁর লেখা একমাত্র বিষয়গৌরবেই মহীয়ান ; আর সেই সমস্ত বক্তব্যই এত superlatively বিবৃত যে তার ভিতরকার তথ্যাংশকেও যেন সে ছাপিয়ে থাকে।

ভাষার সমস্যা বা প্রকরণের সমস্যা বলতে আমরা চূড়ান্ত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার কথা বলছি না— যা কোনোরকম বিষয়বস্তুকেই আমল দিতে চায় না, যা সব ধারার বিষয়বস্তুকেই বলে রচনার থেকে আলাদা ও সমান্তরাল— পাশাপাশি কিন্তু এক নয়, কখনো এক হবারও নয়। নিছক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার কথাও বলছি না— যা শুধু শব্দসহযোগের আত্মীয়সম্বন্ধের ফলাফল কষতে যত্নবান। এর থেকে অনেক প্রত্যক্ষ জিজ্ঞাসা আমরা জানতে চাই : তাঁর লেখা কী ভাবে কী উপায়ে তৈরি, তাঁর লেখার উৎকর্ষ ঠিক কোন্ জায়গাতে, বাঙলা শব্দের কী পরিমাণ অর্থপ্রসার অর্থসঙ্কোচ তিনি ঘটিয়ে গেছেন, পূর্বকালের কোন্ কোন্ কাব্যকৌশল আর কাব্যবিষয়কে তিনি সমকালে বহমান রাখতে চেয়েছেন, কোন্ কোন্ রচনাগত সুবিধা-অসুবিধা রেখে গেছেন তিনি উত্তরসূরির জন্য— আমাদের এখনকার সমালোচকদের কাছ থেকে এইগুলিই যেন বেশি করে আমাদের চাইবার আছে। এমনকি বিষয়কে—বিষয়গত আলোচনাকেও— হেলা করবার মতো সচ্ছলতা বোধহয় আমাদের নেই। এতদিন গেল আজও পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথের একটি পুরো ভেরিওরাম সংস্করণ আমাদের হাতে নেই, এতদিনেও প্রধান রবীন্দ্রপংক্তিগুলির সব বৈষয়িক নির্দেশ আমরা একত্র করে উঠতে পারিনি, যে সব জায়গায় তাঁর লেখা মুহূর্ত ও শাশ্বতের দ্বন্দ্বে বিচলিত, সেই দ্বন্দ্বের ফাট থেকে রশ্মিরেখার মতো যে চরিত্র উদ্ভিন্ন হয়ে আসে, অসংখ্য অপরূপ নয়নাভিরাম স্টুডিও-ফোটো-র নির্বন্ধ এড়িয়ে সেই রবীন্দ্রজীবনপরিচয় বোধহয় এখনো আমাদের লেখার সময় হয় নি।

এই সমস্তই আমরা প্রত্যাশা করতে চাই, এমনকি যাচ্ঞা করতে চাই। তার বদলে যা পাওয়া যায় তা আমাদের বারংবার মনে হয় সমালোচকের স্বার্থসাধনপ্রযত্ন, অনেক জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথকে ঐ ভাবের ভাষ্যে অনূদিত হয়ে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি লাগে।

কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও বলে নিতে হয়, এই অস্বস্তি শুধু আমাদের কাছেই সত্য যারা গৃহীত সত্যের নিপুণতর কিংবা নিপুণতম বর্ণনাতেও অবিশ্বাসী, যারা সবসময়ে কেবল প্রসঙ্গাতীতের প্রত্যাশী আর অনুপস্থিতের প্রার্থী, যারা নতুন লেখা রবীন্দ্রপরিচয় পুস্তকে রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র এই মুহূর্তেরও বিশ্রব্ধ বন্ধুর মতো প্রমাণিত চাই। আরো স্পষ্ট করে বলে নেওয়া দরকার, এই অভাববর্ণনা আলোচ্য বইগুলির সঙ্গে একেবারেই নিঃসম্পর্ক। এ শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অভাববোধ, আলোচনার আগেই একে লিখে রাখা গেল। কিন্তু আবেগার্ত মন্তব্য লেখার চাইতে যা উপস্থিত তারই মধ্যে সরাসরি বইগুলির মধ্যে একে একে মনোযোগ স্থাপন করা ভালো।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের বইটি থেকে এর আগে আমরা একটি বাক্য উদ্ধার করেছি, ঐ কথাটিতে যত আছে এই বইয়ের নামে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে তার চেয়ে কম প্রথাশ্রয় নেই। অন্ত্য-উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের দেশে জীবনী ও কবি-জীবনী লেখা হচ্ছিল, তখন জনৈক কবি-জীবনী-রচয়িতাকে এই কথা বলতে দেখা গিয়েছিল :

> যে সকল অনুকূল এবং প্রতিকূল ঘটনায় মধুসূদনের জীবন সংগঠিত হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে তাঁর প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিসমূহ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া, আমি তাঁহার জীবনের বিকাশ, পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।[১]

আর এখানে লেখক তাঁর যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন :

> তাঁর মানসিকতা ও চারিত্র্য সংসারের ও সমাজের পরিবেশে আর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের রঙে-বেরঙে ও আকর্ষণে-বিকর্ষণে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারই এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।—

—তাতে এই বইখানির পৃথগত্ব বা নতুনত্ব যেটুকু সূচিত হয়, তা শুধু ঐ 'বিশ্লেষণ' শব্দটিতে। এবং 'বিশ্লেষণ' বস্তুটি, সকলেই জানেন, এই মুহূর্তেরও সংযোজন বটে।

অবশ্য বিষয় হিসেবেও চরিত্র দু-টি আলাদা রকমের আলোচনাপদ্ধতির দাবি করে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব যতখানি রোমাঞ্চকর, ততখানিই স্বভাবানুমোদিত ও সরল 'বর্ণন'ই তার পক্ষে যথেষ্ট। তার তুলনায় 'রবীন্দ্র' শব্দটি অপরিসীম জটিল, তা আমাদের জন্যে ব্যক্তি-পরিচয়ের থেকে সহস্রগুণ বেশি অর্থ

১ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংস্করণ ১৮৯৩

বহন করে আনে। 'রবীন্দ্র'-নামধেয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তির বহুযত্নে সংরচিত সেই অভীষ্টদানকারী চরিত্র, যথোচিত বিশ্লেষণ ব্যতীত যা হৃদয়ঙ্গত হওয়া সহজ নয়।

তা যে সত্যিই সহজ নয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধকরি বুঝেছিলেন— পঞ্চাশোর্ধ্বে পৌঁছেই, সদ্যোবিকশিত রবীন্দ্রের বিকাশের পিছনকার প্রণোদনাগুলি তিনি রেখে-ঢেকে রূপকথার ভাষায় এবং অভিমান প্রকাশ না করে যতদূর বলা যায় নিজেই জীবনস্মৃতির পাতায় গুছিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা বিশেষ করে 'জীবনস্মৃতি'রই নাম করলাম তার কারণ কেবল এ নয় যে 'জীবনস্মৃতি'ই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ঘটনা-তথ্য-নির্ভর সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক আত্মজীবনী, তার আরো কারণ শ্রীসুকুমার সেনের এই বই, বুঝতে দেরি হয় না, আসলে তথ্যমাত্রসার সেই 'জীবনস্মৃতি'র মর্মপ্রকাশী ভাষ্য ; একান্ন বছরের চোখ দিয়ে পঁচিশ বছরের যে রবীন্দ্রবিকাশ তত্রত্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, উপযুক্ত পার্‌সপেক্‌টিভে এনে অর্থাৎ শতাধিক বছরের ব্যাপ্ত বিবেচনার সামনে তাকে হাজির করে, এই বই তার অন্তর্জগতের সেই কার্যকারণগুলিকে বিশদতর করে তুলেছে।

আলোচনাক্রমেও এখানে মোটামুটিভাবে জীবনস্মৃতিরই ধারাবাহিকতা অনুস্যূত হয়েছে, দেখা যায়। শুরু হয়েছে সেই একই জায়গায়— একেবারে গোড়া থেকে—যেমন 'জীবনস্মৃতি'র সূচনা : বৃহৎ পরিবারে মাতৃসদন থেকে ভৃত্যমহলে নির্বাসিত শিশুর দিনযাত্রা থেকে। কিন্তু যেহেতু এবারে আরম্ভেরও আগে থেকে পরিণাম-মুহূর্ত আমাদের জানা, যেহেতু এবারে প্রত্যেকটি ঘটনা শুধু এক-একটি আগে-জানা চরিত্ররেখাকে বিশ্লেষণ করে দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাই 'সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে'— এই আভাসের অতিরিক্ত পরিচয় দেওয়ার তাগিদেই তাকে 'কড়ি ও কোমল'এর রবীন্দ্রনির্দেশিত বিকাশ-মুহূর্তকে অন্তত তিনবার অতিক্রম করতে হয়েছে।[১] প্রথমবার তাঁর সঙ্গে গঙ্গার অন্ত্য পর্যায়ের সম্পর্ক বোঝাতে, যে গঙ্গা তাঁর রচনায় সরাসরি উঠে আসেনি, এসেছে পরোক্ষ চিত্রকল্পের বাস পরে। আর পদ্মা-ভূমির সূত্র তুলে নিতে, অন্তত আন্দী বোষ্টমী নাম্নী চরিত্রটির জন্য, যাকে না দেখলে 'মনে হয়, আমরা চতুরঙ্গ পেতুম না'। পৃ ৫১। উল্লেখযোগ্য, যে পদ্মাবাসকে তাঁর মানবলীলাকুতূহলী গল্প-উপন্যাসের উৎস বলে মেনে নেওয়া প্রথা, সেই উৎস শ্রীসুকুমার সেন নির্ধারণ করেছেন গঙ্গাভ্রমণে : 'যে দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন সে দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছিল গঙ্গাভ্রমণে, আর সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল পদ্মাবাসে।' পৃ ৪৬

দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় বার অতিক্রম করতে হয়েছে মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের বিলাতযাত্রা ও তার অনিবার্য পূর্বাপর বর্ণনা করার জন্য। দ্বিতীয় বারের বিলাত তাঁকে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ, আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন-আদি বিষয়ে অবহিত করেছিল, আর দিয়েছিল সঙ্কোচমুক্ত সমালোচনা-দৃষ্টি। দ্বিতীয় বার বিলাত থেকে ফিরে পেলেন পদ্মাভূমির নবসঙ্গরসায়ন, তারপর শুরু হলো জাতীয় আন্দোলনের পৌত্তলিকতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিক-পর্ব। সেখানে 'নবীনের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনদীপ্তি ফিরে পেলেন, তাঁর মনের ব্যাটারি যেন নতুন চার্জ গ্রহণ করলে।' পৃ ৯২

১ কড়ি ও কোমল, জীবনস্মৃতি

আর তৃতীয় বার বিলাতযাত্রার ফলে প্রথমত 'জগৎসভায় কবিমনীষীর গ্যালারিতে তিনি ভারতবর্ষের আসনখানি চিহ্নিত করে রেখে এলেন' পৃ ৯৪। আর দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর পরিণাম-সিদ্ধান্ত, যা কিনা, লেখকের মতে, আত্মহিতে ও জগৎহিতে আধুনিকতম চিন্তা, তা প্রকাশিত হলো। রবীন্দ্রচরিত্রে সাহিত্যিকের পাশাপাশি যে অ-সাহিত্যিক কর্মী-উপাদান রয়েছে, 'জীবনস্মৃতি'তে তার জন্য অপূর্ণ দু-টি আভাসক মিলেছিল— 'স্বাদেশিকতা' আর 'জাহাজের খোল'। এই বই পড়ার পর সেখানকার অপূর্ণতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া আর সর্বত্রই মোটামুটিভাবে 'জীবনস্মৃতি'রই ধারানুক্রম।

সমস্ত আলোচনাটি বিবৃত হয়েছে পরিজন ও পরিবেশ— এই দুই পর্যায়ে। শৈশবপরিজনদের মধ্যে এসেছেন তাঁর আত্মীয়, শিক্ষক ও পরিচিত পণ্ডিতবর্গ, পরিশেষ-ভাষণে কয়েকজন তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক পরিজনের কথাও আছে। পরিবেশও তেমনি প্রকৃতি-পরিবেশ ও সাহিত্য-পরিবেশ— এই দু-ভাগে ভাগ করা। প্রকৃতি-পরিবেশে গঙ্গা, গঙ্গাবিহীন বাঙলাদেশ ও পদ্মাভূমির প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে। সাহিত্য-পরিবেশে ক্রমান্বয়ে এসেছেন ভারতী-পদ্মবনের আসল বীণাপাণি থেকে শুরু করে তাঁর বিরোধীপক্ষেরা পর্যন্ত, এবং সারা বাঙলাদেশের সস্নেহ প্রশ্রয় থেকে শুরু করে অনুকম্পাহীন নিন্দাবাদ অবধি।

শ্রীসুকুমার সেনের এই বইয়ে নিঃসঙ্গ লাজুক অন্তর্মুখিন এক প্রতিভার আলেখ্য ফুটে উঠেছে, যিনি লোকদায়িত্বকে অস্বীকার করেন নি, আর জগৎ-কবিসভায় ভারতের আসন যিনি সম্মানিত করে এসেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাবয়ব আলেখ্যের চাইতে এখানে বড় স্থান অধিকার করেছে ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি, সূত্রাকারে ও নিয়মবদ্ধভাবে সেগুলি এই বইয়ে স্থাপিত হয়েছে। আর সেই কারণেই এই বই রবীন্দ্র-জীবনী নয়, রবীন্দ্রবিকাশের বিশ্লেষণ।

আমরা গোড়ায় লেখা 'প্রথাশ্রয়' কথাটিকেও ভালো বা মন্দর মতো চূড়ান্ত বিশেষণ বলে বোঝাতে চাই নি, তারও কারণ এই বইয়ের অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণপদ্ধতি। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁদেরও রবীন্দ্রবোধকে আরো শাণিত করে তুলতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়েছে। আর তাঁর আলোচনার গদ্য, যে গদ্যভাষার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুরক্ত, এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও তা ভয়ানক প্রাণবন্তভাবে উপস্থিত।

কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' পূর্ণাবয়ব রবীন্দ্রজীবনী, এখানে শুধু জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলি ও রবীন্দ্র-ভাবনায় তার অবদান, কবির জীবন ও রচনা দু-য়ের পাশাপাশি পরিচয় লিখে কবির অন্তর্জগতের পরিচয় লেখার প্রয়াস আছে— এই খণ্ড কবির চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। লেখক রবীন্দ্রবিকাশে 'প্রভাব' শব্দটি বর্জন করতে চেয়েছেন 'স্বভাবদত্ত প্রতিভা'র বিনিময়ে, কিন্তু স্বভাব-এর প্রেরণা যেসব তথ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন, চিনতে বাধা হয় না, তা পূর্ব-আলোচিত বইয়ের 'প্রকৃতি-পরিবেশ' ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু এই বইয়ের বক্তব্য কেবলমাত্র ধারাবাহিকতা ভাবলে ভুল হবে। এই বইয়ের আলোচনাবিন্দু প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য দুটি সূত্র থেকে উৎসারিত। প্রথম : লেখক এর আগে— বেশ কিছুদিন আগে, 'কবিগুরু

গ্যেটে' নাম দিয়ে দুখণ্ডে সমাপ্ত এক গ্যোতে-জীবনী লিখেছিলেন। সেখানে, ১৩৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, তাঁর মন্তব্য এইরকম :

> বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন গ্যেটের জীবনের সমৃদ্ধি আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে যোগ তা এত গভীর যে তাকে আত্মিক যোগ বলা যেতে পারে।

এই বইয়েরও শুরুতেই তিনি বলে নিয়েছেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেও তুল্য চেষ্টা [আগের জীবনী খানিরই মতো] আমরা করবো।' ঐ তুল্যতা, দেখা যায়, এখানে শুধু জীবনীরচনা-পদ্ধতির তুল্যতা হয়ে দাঁড়ায় নি, দুই কবির চরিত্রগত তুলনারও পরিসর করে দিয়েছে। একটু নজর দিলেই আরো চোখে পড়ে— 'রবীন্দ্রপ্রতিভা যথার্থত তুলনীয় মহাকবি গ্যেটের প্রতিভার সঙ্গেই'— ২৮৮ পৃষ্ঠার এই প্রতিপাদ্যেই যেন সমস্ত আলোচনাটি আলগ্ন। প্রথমবার বিলাত যাবার পূর্বাহ্ণে আমেদাবাদে গ্যোতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে 'নৈবেদ্য' সমাপ্তি পর্যন্ত সারা বইয়ে অন্যূন একত্রিশবার গ্যোতেকে হাজির করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মর্ম বোঝাতে, এবং তা শুধু কবিত্ব ও মনীষার ব্যাপক ও যুগ্ম-দায়িত্বের হেতুনির্ণয়ের কারণে নয়। তিনি ইতস্তত শেলি-কীট্‌স্-টেনিসন-ব্রাউনিঙ্-হাফিজ-ওমর খৈয়াম ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে, কিন্তু আগাগোড়া রবীন্দ্রকৃত্যের পাশে এই একটি বিশ্ববিশ্রুত সমান্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে টেনে রেখে মনে হয় তাঁর আলোচ্য কবির জন্য আরো উজ্জ্বলতর এক পরিণাম নির্ণয় করে দিতে চেয়েছেন।

এবারে এই আলোচনার দ্বিতীয় বক্তব্যবিন্দুর কথা বলা যেতে পারে। এটি মূলত দৃষ্টিভঙ্গির কথা। লেখক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা একাধারে মহৎ ও মনোহর। মহত্ত্ব ভাবনার, মনোহারিত্ব প্রকাশের। রবীন্দ্রনাথ মহৎ প্রতিভাসম্পন্ন কবি, এবং মহৎ সাহিত্যের রচয়িতা। প্রকাশের মনোহারিত্ব পড়ে শিল্পনৈপুণ্যের কোঠায়। এবং আরো স্পষ্টত : 'আমাদের প্রধান বিষয় কবির মানস, কবির জীবন ও জগৎ-চেতনার পরিচয়, কবির শিল্পনৈপুণ্য তার আনুষঙ্গিক— তার বেশি নয়।' পৃ ১১০

ভূমিকাতেও, আমরা দেখেছি, লেখক এই কথাটিই প্রস্তাবিত করেছিলেন : 'আশা করি [কবির রচনার] সেই মনোহারিত্বের মায়া এতখানি হবে না যে তাতে আবৃত হবে কবির ব্যক্তিত্ব বা অন্তর্জীবন— যাতে কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়।' এবং অতঃপর আরো লিখেছেন : 'দেহমনের স্বাস্থ্যেরই সত্যকার মূল্য, প্রসাধনের মূল্য সে তুলনায় অনেক কম। শিল্পনৈপুণ্যকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে গিয়ে আমাদের রবীন্দ্রোত্তর অনেক কবি বিড়ম্বিতই হয়েছেন বেশি, সেই ব্যাপারটিও মনে রাখবার মতো।' পৃ ১১০

কিন্তু আমরা এই সুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনায় এতখানি উদ্ধৃতি লিখতাম না, একে ওই বইয়ের দ্বিতীয় বক্তব্যবিন্দু বলেও প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত হতাম না, যদি না এর ভিতরে আরো উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লুকানো থাকতো। আমরা আগেই এই দ্বিতীয় সূত্রটি নিষ্পাদিত করে নিতে চাই।

আমরা দেখেছি লেখকের প্রবল প্রস্তাবনা, তিনি বিষয়গৌরবেই রবীন্দ্ররচনার মূল্য নির্ধারণ করতে চান, প্রকাশসামর্থ্যে নয়। তথাপি দেখা গেছে, কবির প্রথম দিককার রচনা ও পরবর্তী কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে তিনি তাঁর কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন রচনাশক্তির ঊনত্ববশত, অবিকশিত মহত্ত্বের কারণে নয়। অন্তত তিনটি আত্মখণ্ডনকারী স্বীকৃতি বইয়ের তিন বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে দিতে পারি :

> ১. সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরই সত্যকার মর্যাদা, ইতিহাসের মর্যাদা সে তুলনায় অনেক কম,…

সাহিত্যে মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে প্রকাশ…সেই প্রকাশ যেখানে হয় নি, অর্থাৎ প্রকাশে যেখানে চমৎকারিত্ব দেখা দেয়নি, তার ঐতিহাসিক মূল্যের মায়া আমরা কাটাতে চেষ্টাই করবো। পৃ ২৮

২. রস-সাহিত্যে কোনো রচনার মর্যাদা লাভ হয় চিন্তার গুণে যতটা তার চাইতে বেশি রূপসৃষ্টির গুণে। পৃ ৭০

৩. শুধু ভাব নিয়ে কবিতা নয়, তার রূপটিও তার এক অতি বড় সম্পদ। পৃ ১৩৫

এই উদ্ধৃতির সংখ্যা একটু সন্ধান করলে হয়তো আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু তার আর দরকার আছে বলে মনে হয় না। আমরা লেখকের চিত্তের শুধু দ্বিধাই দেখাতে চাই, দ্বৈত নির্ণয় করতে চাই না। বোধ করি এই দ্বিধাবশতই লেখক অনেকবার পরিহার্য ঐ প্রকরণেরই প্রসঙ্গ হাতে তুলে নিয়েছেন মানদণ্ড হিসাবে, এবং তারও চেয়ে বেশি পুনরাবৃত্তিসহ রবীন্দ্রজীবনে মনীষার অধিনায়কতার কথা স্মরণ করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়েছেন : 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা শিল্পীর রূপকর্ম মুখ্যত নয়, মুখ্যত তাঁর আত্মকথা।' পৃ ১৫৫

বোঝা যায় এই বইয়ে রবীন্দ্ররচনা মুখ্যত কেন রবীন্দ্র-আত্ম-রহস্য প্রকটনে নিয়োজিত হয়েছে। তাঁর আদর্শস্বরূপ গ্যোতে তাঁর নিজের সঙ্গে তাঁর কর্ম ও রচনার সম্পর্ক বোঝাতে ১৮২৪ সালের ১৬ ও ২৬ ডিসেম্বর তারিখে এসেনবেথ ও রেইনহার্টকে যে কেন্দ্রাভিগ পরিধি ও কেন্দ্রনিবদ্ধ কৃত্যের কথা লিখেছিলেন, হয়তো সেই সূত্রের নির্দেশও তাঁর স্মরণে থেকে থাকবে। আর যেহেতু এখানে কেন্দ্রের স্বরূপ পূর্বনির্ধারিত, তাই কালানুক্রমিক যে জীবনবিকাশ এই বইয়ে তিনি অনুসরণ করে এগিয়েছেন, আর একদিক থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে তা মহত্ত্বের উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস ; এবং পূর্ব-উদ্ধৃত 'ঐতিহাসিক মূল্যের মায়া' সত্যিই তিনি কাটাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের উপাদানগুলি সযত্নে তিনি বিচার করেছেন, এবং সেই কারণে যে প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার কথা ভেবেছেন, তাদের অন্যতম— যদি প্রধানতম না হয়— কৃতিত্ব তারা স্মরণীয়। কিন্তু স্মরণীয়-কবিতার যে সংজ্ঞা তিনি তাঁর বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন তাঁর দিকে চেয়েই তা আমরা মানতে পারি নি, যেহেতু স্মরণীয়তার মধ্যে প্রাধান্য যে ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতারই, এ কথার প্রতিবাদ তাঁর লেখার কোনোখানে নেই।

উদাহরণত, তাঁর একটি-দুটি নিষ্পাদন দেখানো যেতে পারে। তিনি প্রথম যুগের তিনখানি কাব্যকে অবিস্মরণীয় আখ্যাত করেছেন, তার কারণ এরা 'বহন করেছে তাঁর অনন্যসাধারণ চিত্তের বিকাশের এক মহামূল্য পরিচয়'। 'মানসী'-কাব্যকে যে পরিণত বিবেচনা করেছেন তার কারণ 'মানসী' থেকে কবির 'মনীষীত্বে'র স্পষ্ট পরিচয় মিলেছে। 'সোনার তরী'র মূল্য : সমকালীন বাঙালিচিত্তের মায়াবাদ-প্রবণতাকে সে বহুজায়গায় খণ্ডন করেছে। আর 'নৈবেদ্যে' যে শুধু 'স্বাধীনতার মহাগীতা' রচিত হয়েছে, কিংবা তার আদর্শ যে শুধু চরিতার্থ হয়েছে পরবর্তী গান্ধী সাধনায়—তা-ই নয়, 'এক ওজস্বল আত্মা অমর সৃষ্টিমহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে।'

অল্প কথায় বলা যায়, এই বইয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্যই রচনার পরিচয় লিখেছেন, আর অপরদিকে প্রতিটি উপস্থাপিত রচনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আহরণ করে এনেছেন জীবনীগত উৎস। 'দুই দিন' কবিতার জন্য ইংলণ্ডের স্কট পরিবারের স্মৃতি, 'বিজয়িনী' ও 'উর্বশী' কবিতার জন্য লণ্ডনের লাইসীয়ম নাট্যশালার নগ্নিকাচিত্র— এইরকম উল্লেখযোগ্য দু-টি সন্ধানাহৃত

উদাহরণ। রচনা ও জীবনকে যুগপৎ আলোকিত করার জন্য তিনি ছিন্নপত্রাবলী ও অন্যান্য পত্রের সহযোগ সঙ্কলন করে দিয়েছেন। সর্বত্রও তিনি প্রভূত তথ্য আকর্ষণ করেছেন, এবং তাঁর এই বই পড়লে রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্ররচনার অনেকখানি স্বাদও যে পাওয়া যায় তাতে কোনো ভুল নেই।

লেখকের গ্যোতে-ব্যবহার বিষয়ে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। গ্যোতে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তিনি পুস্তক লিখেছেন, এবং গ্যোতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ। কিন্তু গ্যোতের সঙ্গে তিনি যে তুলনা সজ্জিত করেছেন তা প্রায় সব জায়গাতেই খুব বাইরেকার সাদৃশ্য। কোনো অন্তরঙ্গ সমান্তর দেখানোর শ্রম যেন তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি ইতস্তত যে বহুল পরিমাণ রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির সাক্ষ্য তুলেছেন তাও অবশ্য অ-ব্যবহৃত, প্রায় কোনোখানেই তার অন্তরভিপ্রায় তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেন নি। রবীন্দ্রনাথের একটি মৃত্যুশোক ও পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ তিনি বিশদ করে যেখানে লিখেছেন তার পাশে গ্যোতের 'বাসনা ও প্রমত্ততা' (Selige Sehnsucht) নামক বহু-উদ্ধৃত কবিতার শেষ অনুচ্ছেদ থেকে 'মরো আর বেঁচে ওঠো' এই উপলব্ধিটি আমাদের মনে ভেসে উঠেছিল এবং এই উপলব্ধির বিশদতর সম্পর্ক তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার প্রত্যাশাও আমাদের ছিল। তিনি উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের আত্মসংরচনপ্রবণতার সঙ্গে গ্যোতের স্বভাবানুগমিতার যে লক্ষ্যণীয় বৈসাদৃশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যোতে সম্পর্কে তা-ই আমাদের প্রথমে ও পরিশেষে মনে আসে। এ বিষয়েও লেখক উল্লেখমাত্র করেন নি। এবং দুই লেখকের সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জরুরি যেসব জিজ্ঞাসা ছিল তার কোনোটিকেই লেখক জরুরি বিবেচনা না করার ফলে লেখক তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রস্তাবনা-বিষয়ে অন্তত আমাদের বঞ্চিত করেছেন, এ কথা আমরা মনে না করে পারি নি।

একটি ঘটনানির্ভর অপরটি রচনানির্ভর জীবনান্তরালসন্ধানের মোটামুটি পরিচয় লেখা গেল। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের বই ঠিক অতখানি অন্তর্জীবনী নয়, বরং তাঁর বইকে সহজভাবে 'রবীন্দ্রপরিচয়' বলে পরিচয় দিলেই যথার্থ হবে। রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও কবিত্বকে লেখক দুটি পৃথক পর্যায়ে আলাদা করে আলোচনা করেছেন, তাতে বিষয়ের জটিলতা যথাসম্ভব বাদ দেওয়া গেছে, এবং আলোচনা বা অনুধাবনের পক্ষে বিষয়টি স্বচ্ছন্দতরও হয়েছে। শেষকালে যে মন্তব্য করেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্য··· রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যজগতে প্রবেশের চাবিকাঠি', তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে তৃতীয় একটি দিশারী পর্যায় হিসাবে নির্ভর করা গেছে, যার সাহায্যে যুগপৎ বিচিত্রের দূত ও আত্মপ্রকাশী কবিকে রবীন্দ্রনাথের স্বনির্দেশিতমতো বুঝে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনকে চেনাবার জন্য লেখক 'আত্মপরিচয়' বইখানিরও অপরিহার্যতা বিস্তারিত ভাবে নির্ণয় করেছেন।

এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্য এর পরিশিষ্ট। 'রবীন্দ্র-বিরোধ : রবীন্দ্র-বরণ'— এই নামাঙ্কিত রচনায় তিনি রবীন্দ্ররচনার সামাজিক মূল্য ধারাবাহিক কালানুক্রমে দেখিয়েছেন, এবং এই অংশটি বিশেষভাবে সুলিখিত। অন্যত্রও রবীন্দ্রালোচনার প্রত্যাশিত উপায়েই তিনি তাঁর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন যত্নসহকারে, লেখায় জায়গায়-জায়গায় একটু বেশি উচ্ছ্বাসপরায়ণ হয়ে পড়লেও সব জায়গাতেই নিরলসভাবে তথ্যগ্রাহী তাঁর লেখা। আধুনিকতম রবীন্দ্রালোচনার তথ্যগুলিও তিনি সমান নির্ভরতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

দু-একজায়গায় অবশ্য তাঁর রচনা একটু অসতর্ক। রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' বইটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, এই বইয়ের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা' নামকরণ করলে বোধহয় আরো সঙ্গত হত।' পৃ ৬৬। কিন্তু তা বোধহয় সঙ্গত হত না তার কারণ 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা'র প্রণেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোনো রবীন্দ্রবিদ্‌-এরই দাবি নিশ্চয় সমধিক। তিনি লিখেছেন: 'ধর্মদেশনার ক্ষেত্রেও যে তিনি মৌলিক চিন্তার অধিকারী এ খবর অনেকে রাখেন না।' কিন্তু তার পরেই তিনি নিজেই সেই মৌলিক চিন্তার বিরুদ্ধাচরণের যে দীর্ঘ সামাজিক ইতিবৃত্ত আহরণ করে দেখিয়েছেন (পৃ ৩৮-৪৬) তাতে দেখা গেছে ঐ খবর শুধু যে অনেকেরই জানা তা নয়, অনেকেরই অপছন্দও বটে। ১৬১ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বভারতী' এই নামটির প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানির রবীন্দ্রজীবনী -বই থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন: 'শ্রীকৃপালানির (?) এ ব্যাখ্যার সঙ্গে বেদের 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌' বাণীটির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।' শ্রীযুক্ত কৃপালানিও কিন্তু তাঁর বইয়ের ঠিক ঐ জায়গাতেই লিখেছিলেন: "The poet selected for its motto an ancient Sanskrit verse: Yatra visvam bhavati eka nidam—which means, 'where the whole world meets in one nest'!"[১]

এ-রকম অসাবধান রচনার পরিমাণ অল্প নয়, বলতে গেলে নিছক পৃষ্ঠা জুড়বে। কিন্তু বিশেষ করে আর-একটি জায়গার কথা অন্তত বলতে চাই যেখানে লিখেছেন: 'সৌভাগ্যক্রমে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যে পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কেটেছিল সে পরিবেশ ছিল সঙ্কীর্ণ ধর্মসংস্কারমুক্ত। হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার-বিচার-বিমুক্ত মহর্ষি পরিবারে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি ছিল বালকদের পক্ষে নিত্যকর্ম।' ঠাকুর পরিবারের সমস্ত বালকদের পক্ষে ওটি নিত্যকর্ম ছিল কিনা স্পষ্ট করে জানি না, কিন্তু ঠাকুর পরিবার প্রকৃতার্থে—লেখক যেভাবে বলতে চেয়েছেন সেইরকম একেবারে সঙ্কীর্ণ ধর্মসংস্কারমুক্ত বা প্রাচীন আচার-বিচার-বিমুক্ত ছিল, এ কথা মানবার ঈষৎ তথ্যগত বাধা রয়েছে। লেখক সম্ভবত জানেন, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'এর লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে 'রক্ষণশীল প্রকৃতি' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। পৃ ২৫০। রাজনারায়ণ বসুও জানিয়েছেন, সোমেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন-যজ্ঞে তিনি শূদ্রবৎ পরিত্যাজ্য হয়েছেন ['আমি জানিতাম না যে শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না। জানিলে, আমি তথায় বসিতাম না।'—আত্মচরিত, পৃ ১৯৯]। এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন: 'আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।' এই কথাগুলি মনে থাকলে লেখকের ঐ উক্তি ঠিক সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যায় না।

পারস্যরাজ রেজা শাহ পাহলেভীর সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ পারস্য-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের অন্যতম আয়োজক ও সঙ্গী ছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ' মূলত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়েরই ব্যক্তিগত ভ্রমণসমাচার, তার মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে—এইমাত্র। বরং

---

১ টেগোর: এ বায়োগ্রাফি, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃ ২৬৭

এই বইয়ের ভূমিকা-অংশে যাত্রা-পূর্বের কয়েকটি খুঁটিনাটি নেপথ্যসংবাদ দেওয়া আছে, সারা বইয়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তার চাইতে উল্লেখযোগ্য বা কৌতূহলকর অংশ আর নেই বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত পারস্য-ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার আহ্বানও এখানে নেই। লেখক রবীন্দ্রনাথের এক সপ্তাহ পূর্বেই যাত্রা করেছিলেন এবং অসুস্থতাহেতু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পরেও কিছুকাল ঐখানে দ্রষ্টব্য দেখে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি দ্রষ্টব্যের জন্য গাইড-বুক-এর তথ্য এবং পরিশেষে ইরাণ ও ইরাকের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লেখক সঙ্কলন করে দিয়েছেন। অথচ বিভিন্ন-স্থানের চলিত ও সাধুভাষার পীড়াকর সঙ্কর—যা কিনা আরেকবার চোখ বোলালেই হয়তো বাদ দেওয়া যেত, তার পরিশোধনে কোনো আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু অত্যন্ত সুমুদ্রিত ও বহুচিত্রশোভিত এই বই ভ্রমণকাহিনী-পিপাসুদের নিঃসন্দেহে আকর্ষণ করবে।

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দীর অন্বীক্ষণে কবি-মনীষী গৃহীত হয়েছেন কবি-দার্শনিক হিসাবে। লেখকের প্রাথমিক যুক্তি: 'কবিরা দার্শনিক নন, এ কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রমানস যে দার্শনিক-সত্তম্ এ তত্ত্ব অবিসংবাদিত সত্য। কাব্যে, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি পরম দার্শনিকতায় তন্ময়। ভুরি ভুরি (?) তত্ত্বকথা উদ্গীত হয়েছে তাঁর অজস্র রচনায়।' পৃ ১৫৯। পুনরায় বলেছেন, 'তাঁর দর্শন দর্শনশাস্ত্রীদের অনুমোদিত কোন বিশেষ পারাবতনীড়ে অবরুদ্ধ নয়।' এবং সিদ্ধান্ত করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নানান দার্শনিক ভাবধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।'

জীবন-দর্শন, শিক্ষা-দর্শন, শিল্প-দর্শন—এইসব পর্যায়ে আলাদা করে লেখক রবীন্দ্রনাথের দর্শন-চিন্তার আলোচনা করেছেন। কবির মানবতাবাদ, যা কিনা তাঁর জীবন-দর্শনের অন্যতম সূত্র, আর যার প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নেই, তা নিয়েও আলাদা করে আলোচনা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে জীবন-দর্শন, সে সম্বন্ধে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা', আর সেই বিশ্ববোধ থেকেই সঞ্জাত হয়েছে তাঁর বিশেষ অহংবোধ, 'আগে ভালোবেসেছেন পৃথিবীকে, জীবনকে ভালোবেসেছেন তার পরে' পৃ ৩৮; সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবপ্রীতি আর তাঁর অপরাজেয় আশাবাদ,—এবং জীবনদর্শনের এই সামান্য লক্ষণগুলিকে স্পর্শ করে আছে সেই নিত্য ও সনাতন উপনিষদ: 'রবীন্দ্রনাথ সেই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন।'

যেহেতু রচনা বা শিল্পের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি আত্মপ্রকাশ করেছেন, এই বইয়ের অধিকাংশ পৃষ্ঠাই বোধ করি সেই কারণে শিল্প-দর্শনের আলোচনায় উৎসর্গিত। রবীন্দ্র-শিল্প-দর্শনের একটি তত্ত্বগত পরিচ্ছেদ ছাড়াও বলাকা মহুয়া বনবাণী পূরবী সোনারতরী ও ডাকঘর—এই বইগুলির থেকে লেখক সবিস্তারে রবীন্দ্র-শিল্পনীতির সূত্র আহরণ করেছেন। এই বইয়ের আলোচনাগুলি সেই কারণেই কবিতার বইয়ের প্রথামাফিক আলোচনা নয়, একমাত্র দার্শনিক বা নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উত্তরেই তারা উৎসাহী। যেমন: বলাকা গতিবাদের কাব্য, আর সেই গতিবাদ বের্গসঁ-র চেয়ে উপনিষদে অধিক নির্ভরশীল। প্রয়োজনবাদ ও শিল্পবোধ—নন্দনতত্ত্বের এই দুরূহতা-কণ্টকিত সমস্যার উত্তর হলো 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ। 'বনবাণী'তে প্রকৃতি-দত্ত বৈরাগ্য সঞ্চারিত হয়েছে শিল্পীচিত্তে, যে বৈরাগ্য ছাড়া শিল্প হয় না (পৃ ১৪৮), এবং ঐ প্রকৃতি আবার কবির প্রাণতত্ত্বের মূলাধার। 'পূরবী'তে নন্দনতত্ত্বের সেই

অপ্রায়োজনিক লীলাভূমি। এবং 'সোনার তরী'তে কর্ম-কর্মী তত্ত্ব, মানসীতত্ত্ব, জীবন-মৃত্যু তত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ তত্ত্ব। আর 'ডাকঘর'? 'ডাকঘর' এখানে আলোচিত হবার অধিকার পেয়েছে— অখণ্ড জীবনবিশ্বাস ও সাময়িক অনুভব— এই দুয়ের নন্দনতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বটিকে প্রশ্রয়িত করে।

লেখক এই বইয়ের যে সব জায়গায় সাধারণভাবে রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ করেছেন, সেই অংশগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে সরল, কোনো দিক থেকেই মনোযোগ দাবি করতে পারে না। যেখানে তাঁর আলোচনা শিল্পদর্শনাশ্রয়ী, সেখানে বরং তিনি নতুন ভাবে রবীন্দ্ররহস্যের উপরে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। যথা, রবীন্দ্রচিত্তে তিনি কবি ও দার্শনিকের বিরোধ দেখিয়েছেন, বলেছেন: 'দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বকথা আমাদের শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী বার্তা আমাদের পরিবেশন করেছেন। তাই আমরা সাম্প্রতকালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং দার্শনিকের সমন্বয়তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারলাম না।' পৃ ৫৫। তার প্রথম কারণ যা দিয়েছেন:

> শিল্প হল আত্ম-অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। সেখানে ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা অবান্তর, অতিরিক্ত। কাজে কাজেই কবি এবং দার্শনিকের মতবিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেলে

ইত্যাদি— তা অবশ্য আমরা তেমন বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। তার কারণ, আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করার অর্থ, আমরা যতদূর বুঝি, আত্ম-অনুভূতির সদৃশ তুল্যমূল্য একটি মূর্তি নির্মাণ: শব্দ, শিলা, রেখা বা সুর যে কোনো মাধ্যমেই হোক; অর্থাৎ রূপায়িত বা রূপার্পিত আত্ম-অনুভূতি, এবং তার অর্থ কোনোক্রমেই আত্ম-বিচ্যুতি নয়। 'আত্ম' এখানে, বলা বাহুল্য, আত্মবোধ বা মৌল জীবনদর্শনের প্রতিশব্দ।

আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করার ভাবটিকে আরো স্পষ্টার্থক করে তোলবার জন্য আরেকবার লেখক বলেছেন: 'শিল্পে কবির অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিকরণ ঘটে।' এখানেও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি থেকে কবির অনুভূতিটিকে বের করে এনে নৈর্ব্যক্তিকৃত (depersonalized) বা সাধারণ্যে স্থাপনের যে প্রসঙ্গ আছে তার মধ্যে ব্যক্তি-বৈপরীত্য নেই, বড় জোর সারা দুনিয়ার রসিকসমাজের জন্য সাদর আবাহন লেখা আছে।

এর পরের সাক্ষ্য লেখক মেনেছেন: রবীন্দ্রমানসের বহুবিচিত্র প্রকাশ'এর সূত্রটিকে, কিন্তু রবীন্দ্রমানসে বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে পরস্পর-বিরোধের সমস্ত সম্ভাবনা তিনি যে নিজেই আদৌ নিহত করেছেন, তার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই লিখেছি, বরং পুনরুদ্ধৃত করছি: 'রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা।'

রচনা ও জীবনদর্শনের বিরোধ প্রমাণ করবার জন্য লেখক এর পরেও ঐ বৈচিত্র্যের হেতুটিকেই পুনরায় আরো আন্তরিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন এই বলে: 'কবি যে জীবনদর্শনে বিশ্বাসী, তার ধ্যান, তার ধারণা যে মূল আশ্রয়ী সেখান থেকেই আবশ্যিক ভাবে যে তার কাব্যের পত্রপুষ্পসমারোহে দিক আকীর্ণ হবে এমন কথাটা ন্যায়শাস্ত্রগ্রাহ্য নয়। যদি কবির জীবনবেদ থেকেই তার সৃষ্টির উৎসার ঘটত তবে সৃষ্টিবৈচিত্র্য থাকত না রবীন্দ্রনাথ, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, শেক্‌স্‌পীয়র এবং কালিদাসের অসংখ্য বর্ণবহুল সৃষ্টিতে।' পৃ ১৬৯।

লেখকের এই উক্তিকেও আপতিকভাবে ন্যায়শাস্ত্রগ্রাহ্য বলে মনে হওয়া কঠিন, যদিও এই উক্তির মধ্যে একখণ্ড নন্দনতাত্ত্বিক বিতর্কের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। কথাটি যদি হয় শুধুই বিচিত্রতা বা বহুলতা তাহলে

তার কেন্দ্রেকপ্রেরণার সত্য খণ্ডিত হয় না। আর কবি যদি তাঁর লেখায় তাঁর বিশ্বাসবিরোধী প্রবণতা বা আদর্শবিরোধী চরিত্রও আঁকেন তাহলেও কবির জীবনবেদ থেকেই যে সেই সৃষ্টিরও উৎসার ঘটে নি সে কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। আসলে নিজের বিশ্বাসের বিপরীত চিত্র বা চরিত্র এঁকে কবিরা নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিই বোধ করি প্রমাণ করেন, কিংবা নিজের মূল চরিত্রকেই যাচাই করে নিতে চান। এ কথা— যিনি সবচাইতে বিচিত্র আর স্ব-বিরোধী প্রসঙ্গ লিখেছেন বলে জানি— সেই গ্যোতের লেখাতেও স্পষ্ট। গ্যোতের ভিলহেল্‌ম্‌ মাইসটার নক্ষত্রদীপিত দ্যুলোকে তাকিয়ে নিজেকে বুঝিয়েছিল, তারও ভিতরে একটি অনন্য বর্তিকা রয়েছে যেখানে তার বহুবিচিত্র সকল কর্মপুঞ্জের মূল উৎসাহ জ্বলে আছে। আর গ্যোতে নিজে তাঁর রচনাবলীর অন্তর্গত যোগসূত্র না খুঁজে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর রচনার পর্যালোচনা করার জন্য তাঁর রচনার একটি বিখ্যাত সমালোচনাকে নাকচ করতে চেয়েছিলেন সে কথা গ্যোতের জীবন যাঁরা জানের তাঁদের অজানা নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সূত্রে এতদূর যাবার দরকার আছে বলে মনে হয় না এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অজস্রতা ও বিচিত্রতার মধ্যে রবীন্দ্র-বিপরীত চরিত্র মোটেই সুলভ নয়। শেক্‌সপীয়র-ইত্যাদি বিষয়নির্ভর লেখকের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্য লেখক নিজেই উদ্ধৃত করেছেন, সেখানেও 'শিল্পে শিল্পীচরিত্র আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করে'— এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

সুধীরবাবু সম্ভবত প্রথিতযশা একদল শিল্পালোচকের প্রভাবে বিষয়নির্ভর শিল্পের মহিমায় বিশ্বাসী। সেই কারণে মনে হয় তিনি 'রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল প্রকাশ' (পৃ ৫৭) এ-কথা স্বীকার করেও, সেই প্রকাশকে আত্ম-প্রকাশের বিরোধী বা অতিরিক্ত লক্ষণ বলে বারংবার বোঝাতে চেয়েছেন, এবং রবীন্দ্র-নাথের বহুল বিচিত্র রচনাকে আত্ম-অতিরেকী বহু ও বিচিত্র বিষয়ের রচনা বলে বারংবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[১] আমাদের মনে আছে, কোলরিজ-এর মত ছিল, শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিগত পরিস্থিতি নিয়ে লেখা হয়ে ওঠে না, এবং বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া-য় তিনি শেক্‌সপীয়রের যে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তার কারণ দেখিয়েছিলেন শেক্‌সপীয়রের বিষয় নির্বাচন— যা লেখকের নিজস্ব প্রবণতা বা পরিস্থিতির থেকে বিচ্যুত আর দূরবর্তী। সুধীরবাবুর লেখায় এলিয়ট সাহেবের বহু-আলোচিত সেইসব মতামতগুলির প্রতিধ্বনিও অস্পষ্ট নয় : সেকরেড উড'এর ভূমিকায় তিনি যে বলেছিলেন, 'কবিতায় যে অনুভব আবেগ বা দর্শন প্রকাশ পায়, কবির মানসিকতার থেকে তা আলাদা ধরণের' ; রেমী দ্য গুর্মেঁার ধরণে তাঁর সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তি, 'কবিতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, ব্যক্তিত্ব থেকে অপসরণ' ; অথবা আলম্বন বিভাবের উপরে তাঁর সেই অখণ্ড বিশ্বাস যাকে আমরা objective correlative বলে জানি— এই ধারণাগুলি সুধীরবাবুর লেখায় ইতস্তত সঞ্চরণ করে ফিরেছে। অবশ্য এই সঙ্গে এও মনে রাখা যায়— এঁরা যে বিষয়নির্ভরতার কথা বলেছেন তা মূলত রোমান্টিক খেয়ালীপনার প্রতিক্রিয়ায় জাত, এই ব্যক্তিত্ব-অসম্পৃক্ত কবিতা প্রাচীন কবিতার নৈর্ব্যক্তিতকতাও নয়, এবং এলিয়ট সাহেব যাকে objective correlative বলেছেন তাও সর্বতোভাবেই ব্যক্তিমানসিকতার সঙ্গে সমান্তর-সূত্রে সম্পর্কবদ্ধ।

---

১ 'প্রকাশ' কথাটি লেখক ক্রোচে কলিঙউডের 'প্রকাশতত্ত্ব' থেকে গ্রহণ করেছেন। উভয়ত্রই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রকাশ বলতে নিছক অনুভব বা পাঠক-চিত্তে কোনো অভিপ্রেত আবেগের উদ্রেক বোঝায় না— কোনো বিষয়ের বর্ণনাও বোঝায় না— প্রকাশ হলো শিল্পীচিত্তের প্রকাশ (the work of art is the expression of the artist who created it.— আর. জি কলিঙউড)।

সুধীরবাবু অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয় চিত্রণের জন্য শুধুমাত্র এই ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি তত্ত্বের সহযোগিতা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ যে স্ব-বিরোধী ও বিচিত্র বিষয়ের রচনা লিখেছেন তা 'শিল্পীমানসের সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ'এর অসাধ্য সাধন (পৃ ৬৬)। এই সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ শব্দটি, চেনা যায়, মনস্তত্ত্বের পরিভাষা-কোষ থেকে নেওয়া, Einfühlung ঐ শব্দটি—যা বিশেষ করে শিল্পবেত্তারাই কাজে লাগিয়েছেন, ফ্রয়েড ওর অর্থ করেছেন: understanding of what is inherently foreign to our ego in other people, আর ঐ ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ বা বিশ্বপ্রীতির ধারণার সঙ্গেও বেশ মিলে যায় (পৃ ১৭৭ দ্রষ্টব্য)। অতএব সর্বানুরাগবশেই যে রবীন্দ্রনাথ আত্মবিরোধী ভাবনা ও মানুষকেও তাঁর লেখায় প্রশ্রয়িত করেছেন, এই সিদ্ধান্তে বাধা থাকে না।

এই সর্বানুরাগের পাশে 'সর্বসাধারণের জন্য রচনা'র দ্বিতীয় আরেক রবীন্দ্র-আকাঙ্ক্ষা লেখক উপস্থিত করেছেন, এবং তার জন্য উপস্থিত করেছেন 'সাধারণীকরণ' নামের আলঙ্কারিক শব্দটিকে। তার পরে বলেছেন: 'যদি শিল্পের উপজীব্য হয় মানুষের···মহত্তর চারিত্র্যধর্ম [যা কিনা রবীন্দ্রচরিত্রের সমার্থক] তাহলে তার সঙ্গে শিল্পের সাধারণীকরণ-তত্ত্বের সমন্বয় ঘটানো যায় না।' এই বাক্যের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য যাই হোক, এর ভেতরে লেখকের নির্দেশিত এই দ্যোতনা ঢাকা নেই যে যদি রবীন্দ্রনাথ সাধারণীকরণে আস্থা রেখে থাকেন তাহলে নিজের জীবনবেদ তাঁর রচনায় লেখেননি, অথবা এর উল্টো। আর লেখকের মতে, রচনায়— আর যাই হোক— রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবেদ প্রকাশ করতে চান নি।

তাঁর রচনা তাঁর জীবনবেদ থেকে উৎসারিত হোক বা না হোক, 'সাধারণীকরণ' শব্দটিকে লেখক কিন্তু সঠিক অর্থে গ্রহণ করেন নি। আনন্দ কুমারস্বামী 'সাধারণীকরণ'এর ভাবটিকে Einfühlung এর সমার্থক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন,[১] তার মধ্যে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকরণও সাধিত হয়, সহৃদয়ের তন্ময়ীভবনও সূচিত হয়। কিন্তু সুধীরবাবু যে লিখেছেন, 'সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশন করতে গেলে···মহাভাবকে (মহৎ ভাব ?) অনেকখানি সাধারণ করে ফেলতে হবে। এতে মহাভাবের হানি ঘটবে, তার মর্যাদার লাঘব হবে'—তাতে সাধারণীকরণের অর্থ দাঁড়ায় লেখাকে প্রাকৃতজন বা পৃথগ্‌জনের উপযোগী করে তোলা, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে শব্দটির কোনো সম্বন্ধই কল্পনা করা যায় না।

তা ছাড়া, সুধীরবাবু বোধ করি জানেন, কাব্য বা শিল্প— সাধারণের নয়— সর্বদাই সহৃদয়ের অপেক্ষায় থাকে, এবং সাধারণীকরণে যদি সাধারণ প্রাকৃত কারোকে সহৃদয়ের পদবী দেওয়াও হয়, তাহলেও সেই ব্যক্তিকে ভিতরে ভিতরে পরিশীলিত আর রসবেত্তা হয়ে উঠতে হয়। আর 'সাধারণীকরণ' ব্যাপারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধও নয়, সে পরবর্তী আর একটি পর্যায়ের সঙ্গে নদ্ধ, সে পরবর্তী আরেকটি পর্যায়ের সূচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই যার নাম 'বাসনা' সহৃদয়ের চিত্তে সে প্রসুপ্ত বাসনার উদ্বোধ ঘটায় পরক্ষণেই। এই পরের পর্যায়টির কথা মনে থাকলে মহাভাবকে সাধারণ করে ফেলার কোনো প্রশ্নই সম্ভবত ওঠে না।

যাই হোক, 'মহাকবির জীবনক্রান্তি এবং সৃষ্টিক্রান্তি দুই ভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী' এ কথা প্রমাণ করবার জন্য এর পরেও লেখক আস্ত একখানি নাটক— 'ডাকঘর'—তুলে নিয়েছেন। 'ডাকঘর', তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি' এবং 'ডাকঘর' 'কবির জীবন থেকে চ্যুত ও ভ্রষ্ট'। এখানে রবীন্দ্রোচিত আশাবাদ নেই,

১ দি ট্রান্‌স্‌ফর্‌মেশন অফ নেচার ইন আর্ট, ডোভার কাগজ-বাঁধাই সংস্করণ, পৃ ৫২ ও পৃ ১৯৭-৯৮

মৃত্যুতে পরিণাম, আর 'এই মৃত্যুর জয়গানে জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত হয়েছে'। এর কারণও আছে, দেখিয়েছেন : 'এটি অসুস্থ কবিমনের সৃষ্টি'। দুরারোগ্য অর্শ ব্যাধিতে কিছুদিন আগেই কবি ভুগছিলেন, আর 'অসুস্থ শিল্পীমন যে সৃষ্টি করলো হয়তো সুস্থ থাকলে তা সম্ভব হ'ত না।' পৃ ২০৭।

কিন্তু 'ডাকঘর'এর পরিণাম যে মৃত্যু এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই খণ্ডন করেছিলেন বলে মনে পড়ে। তিনি যা বলেছিলেন তা হলো : 'ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ করে যারা তারা অবিশ্বাসী।' তা বাদে, মৃত্যুর ঘটনা থাকলেই যে তাতে 'জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত' হয় তাও আমাদের মনে হয় না। 'ডাকঘর'কে অজিতকুমার চক্রবর্তী যে সুদূরপিয়াসী মানসিকতায় আপন্ন বলে চিহ্নিত করেছিলেন তা খারিজ করার মতোও কোনো কারণ ঘটেনি, এবং তা রবীন্দ্র-দর্শন অনুমোদিতও বটে। আর ব্যাধিগ্রস্ত লেখকের রচনা বলেই যদি একে জীবনবিরোধী বলে দেখানোর সুযোগ নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের বক্তব্য, অসুস্থতা থেকে নিরানন্দ রচনা জাত হয় এটি স্বাভাবিক লক্ষণ নয়, বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— জর্জরিত জীবনই সাধারণত আনন্দকর শিল্পে রূপায়িত হয়ে পড়ে।

এই বইয়ের অন্য উল্লেখযোগ্য অধ্যায় : 'রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প', কিন্তু রূপকল্প সম্পর্কেই লেখকের ধারণা যথেষ্ট স্বচ্ছ বলে এখানে আমাদের মনে হয় নি।

আমরা এই বইখানিকে অনেকখানি স্থান দিলাম, তার কারণ আর কিছু নয়, অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এতে প্রথাবিচ্যুত দু-একটি কথা শোনা গেছে। নন্দনতত্ত্বের জটিলতাগুলি প্রয়োগ করার মতো সচ্ছলতা তাঁর আছে কিনা এই সন্দেহ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে বাচালতা, কিন্তু তাঁর রচনারীতি আরেকটু পরিচ্ছন্ন হলে তাঁর এই বক্তব্যগুলিই আরো আবেদনবহ হতো, আমাদের মনে হয়েছে। আর তাঁর রবীন্দ্রনাথ-পাঠের আন্তরিকতা সম্বন্ধেও তিনি যে আমাদের কখনো কখনো ঈষৎ দ্বিধান্বিত করেছেন, এ কথা না বলে উপায় নেই।

শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকারের বইটি বিশেষ করে শিক্ষাদর্শন-বিষয়ক আলোচনা এবং ঐতিহাসিক আলোচনা, রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশ্ব-শিক্ষাচিন্তার পটভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই আখ্যাত হয়েছেন 'কবি-গুরুদেব' বলে। তারপর লেখক দেখিয়েছেন : 'শিক্ষাগুরু হতে গিয়ে তিনি তাঁর ঋষিকবির ভূমিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। এই দুই ভূমিকাই তাঁর মধ্যে এক হয়ে গেছে।'

রবীন্দ্রজীবনে শিক্ষাচিন্তার স্থান নির্ণয়ের জন্য লেখক আরো স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্য থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান যে তিনটি ক্ষেত্র : আত্মজীবন রূপায়ণ, সাহিত্য-সংগীত-শিল্পকলা, আর তৃতীয়ত শান্তিনিকেতন-সাধনার মধ্য দিয়ে লোকজীবনকে প্রভাবিত করা—তার উল্লেখ করেছেন, আর শেষকালে বলেছেন : 'তার মধ্যে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয়টিকেই। অপর দুই ক্ষেত্রে যা তাঁর প্রাপ্তি তা তিনি অসংকোচে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ঐ শিক্ষাভিসারের পথ প্রশস্ত করবার জন্য।' তার প্রমাণ 'তাঁর সাধারণ দর্শন ও তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মূলনীতির কোনো পার্থক্য নেই।' শান্তিনিকেতনকে তিনি নাম দিয়েছিলেন একটি প্রত্যক্ষ কবিতা, একটি নৌকা যা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহন করছে। তার আরো প্রমাণ, তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনাগুলি—বিচ্যুতভাবে নয়— একমাত্র রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের বৃহত্তর ভূমিকায় তার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় গুরু শিষ্যকে শেখান কেমন করে নিজেকে ও নিজের অন্তরপুরুষকে জানতে হয় এবং সেই জ্ঞানকে সহায় করে কেমন করে চিরন্তন স্বাধীনতা লাভ করা যায় আত্মসত্য নিয়ে পরীক্ষা করবার। ঐ আত্মসত্যের সন্ধান পাওয়া আর নিজেরই চিরন্তন ঐ প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে প্রবেশ করে তা-ই হয়ে ওঠার ব্যাপারটি, সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেরই অন্যতম অন্বিষ্ট। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের রচনাধারারও প্রধান অন্তরভিপ্রায়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অর্থ যে বিশ্বসত্য বা বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও তারই প্রভাবে ব্যক্তিসত্তার বৃদ্ধি ও বিকাশ, সেই 'বিশ্বসত্য' বা 'বিশ্বমানব' শব্দদুটির ভার বুঝতে গেলেও রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্ররচনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

লেখক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনকে তাঁর মৌল জীবনসাধনার থেকে উৎসারিত প্রবাহবিস্তার হিসাবে পরিচিত করেছেন। সেজন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু আয়োজন সমস্ত সুচারুরূপে ঘটিয়েছেন। একাধারে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে এবং শিক্ষাশাস্ত্র-সম্পর্কে বহুল অভিজ্ঞতার দরুণ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সূত্র ও উপাদানগুলি চেনবার জন্য সবসময়েই বিহিত ও অমোঘ উৎসের সামনে তিনি আমাদের পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থী যাঁরা তাঁরাও কৃতজ্ঞ হবেন—এমন নিয়মানুগ সূত্রবদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরিচ্ছন্ন তাঁর রচনা। পরিচ্ছেদ-অন্তের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি বিশেষভাবে উপকারী। কিন্তু শুধু তা-ই নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, যা শিক্ষাকে ব্রত ও ঈশ্বরকে ব্রতপতি বলে গ্রহণ করে, যা শিক্ষার্থীকে পূর্ণ মানবতায় প্রতিশ্রুত করে আর 'আনন্দময় লীলাভিসারে'র পথে নির্ধারিত করে— তার সাধনা, রবীন্দ্র-উত্তর সময়ে সাংস্কৃতিক কৃত্যতালিকায় তার অর্থসঙ্কোচ বর্ণনা করে (পৃ ১০৬-১০৮) লেখক প্রমাণ করেছেন তাঁর গভীরতর দায়িত্ব। এই গভীরতর দায়িত্বের প্রমাণ— তিনি যে রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার বিশ্ববিসারী পটভূমি টাঙিয়ে দিয়েছেন তারও মধ্যে স্পষ্ট: 'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বাসটিকে মুঞ্জরিত ক'রে তুলেছিলেন তা পৃথিবীব্যাপী পশ্চাৎপটেই ফলপ্রসব করেছে।' ঐ পটভূমির স্বার্থে দেশী ও বিদেশী শিক্ষা-চিন্তকেরা এখানে তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়েছেন। আর, বিশ্বশিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান — যা এমনভাবে আর কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না — নির্ণীত হয়েছে এই বইয়ে।

এই বইয়ের অধ্যায়গুলি যে-রকম পরিচ্ছেদে-পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, মাঝে মাঝে একই কথার পুনরুক্তি এসে অবশ্য সেইরকম ধারাবাহিকতার ধারণা গড়ে ওঠার বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর পরিভাষাগুলি খুব যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে একটু ক্লিষ্ট মনে হয়, যেমন প্রতিনিহিত, পোহন, উপযান, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই ত্রুটি অকিঞ্চিৎকর।

'আমাদের ভারতবর্ষে অতিবৃহৎ সাহিত্যপ্রতিভা দুটি জন্মেছে — কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।' পূর্ব-আলোচিত শ্রীসুকুমার সেনের বই থেকে এই মন্তব্যটি স্মরণ করা গেল। কেননা বিষ্ণুপদবাবুর প্রস্তাবনায় এই সূত্রটিই বিশদীকৃত, তিনি লিখেছেন: 'কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যই কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়।' এই উক্তি অবশ্য লেখক বলেছেন — শ্রী Sten Konowর রচনার প্রেরণা-জাত।

কিন্তু বিষ্ণুপদবাবুর নাম-প্রবন্ধটি অধিক প্রত্যাশাবশতই আমাদের কিঞ্চিৎ হতাশ করে, পরিচিততম

তথ্যগুলি সংক্ষেপে শুধু তাঁর প্রশংসনীয় রচনাভঙ্গি দিয়ে তিনি এখানে সঙ্কলন করে দিয়েছেন। তার বেশি নয়। অবশিষ্ট রচনার অধিকাংশগুলি বিশ্লিষ্টভাবে কালিদাস-বিষয়ে, বাকী চারটির বিষয় রবীন্দ্রনাথ। কালিদাস-সম্বন্ধীয় রচনাগুলির মধ্যে আমাদের সবচাইতে অধিকার করেছে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও কালিদাসের ব্যাখ্যা'। কালিদাস-আলোচক হিসাবে বাঙলা সমালোচনার এই শ্রুতকীর্তি মনীষীর ভূমিকা বিষ্ণুপদবাবুর বিশ্লেষণে অতি উজ্জ্বলভাবে নিষ্পাদিত হয়েছে, এবং আমাদের বিবেচনায় এই প্রবন্ধই এই বইয়ের সবচাইতে মূল্যবান রচনা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপকারী লেখা 'অভিসার কবিতার উৎস-সন্ধানে'। এর আগে তাঁর কৃত 'পরিশোধ' কবিতার উৎসের বিবরণ পড়ে[১] পুরাণানুগৃহীত রবীন্দ্ররচনাগুলির পর্যালোচনায় তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এই লেখা পড়ার পরে ঐ বিষয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত একটি বইয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হচ্ছি।

আমরা বিশেষ করে এই দুটি নিবন্ধের নাম করলাম। কিন্তু তাঁর অন্যান্য নিবন্ধগুলিতেও প্রভূত পাণ্ডিত্য ও নিপুণ বিশ্লেষণের সমপরিমাণ সাক্ষ্য আছে, যা বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্রের আলোচনা বোধকরি এর অপর পিঠ, তিনি রবীন্দ্রমানসে পাশ্চাত্য ভাবধারা-জাত উপাদানগুলি আমাদের দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র ভারতীয়তার সূত্রে বিচার্য বলে গ্রহণ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে সাহিত্য-আকাদমী-সঙ্কলনে প্রকাশিত শ্রীতারকনাথ সেনের বহু-আলোচিত রচনাটির বিরুদ্ধে শীতাংশুবাবুর প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখ চিত্তকে, তাঁর মতে, ভারতীয় বেদ-উপনিষদের মধ্যে বেঁধে রাখা অসঙ্গত। তা বাদে ইতিহাসগত যুক্তিতেও রবীন্দ্রনাথের জন্য পাশ্চাত্য পটভূমিকাটি অপরিহার্য, তার কারণ: 'পাশ্চত্যকে গ্রহণের ফলে তিনি যুগের মর্মকথাটিকে বাণীরূপ দিতে পেরেছেন, তিনি আধুনিক কালকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে যুগ-চেতনার শ্রেষ্ঠ ধারক হয়েছেন। পাশ্চত্যকে গ্রহণ না করলে তাঁকে মধুসূদনেরও আগের যুগে ফিরে যেতে হতো।' পৃ ৮

'পাশ্চাত্য'-কথাটিকে এখানে আরো বিশেষ করা হয়েছে পাশ্চাত্য রোমাণ্টিকতা বলে। লেখক দেখিয়েছেন, বাঙলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর খাত ধরে ঐ ইতিহাসপ্রবাহ এসে প্রবেশ করেছে রবীন্দ্রমানসে। তার সূচনা প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে— মধুসূদন-বিহারীলালের-মধ্যে, আর পরিণাম রবীন্দ্রনাথে। এবং পশ্চিমের রোমাণ্টিক যুগ ও তারই পরিণতি-পুষ্ট অনুবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের সাগ্রহ স্বীকরণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। পৃ ৭৬

নরনারীর সম্পর্ক ও নারীহৃদয়ধারণা, বিশ্বমানবতা ও মানবিকতাবাদ, ইহমুখিতা ও নিসর্গদৃষ্টি, দুঃখবোধ ও সৌন্দর্যবীক্ষার সূত্রে এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতীচ্যধর্ম নিষ্পাদিত হয়েছে। উর্বশী-কবিতাটিকে শীতাংশুবাবু বেছে নিয়েছেন কথামুখ হিসাবে। ঐ দীর্ঘ উপক্রম-আলোচনাটিতে— যেখানে বইয়ের মূল নির্ভরতা— বিশদভাবে দেখানো হয়েছে তার সমস্ত ঐতিহ্যগত পরিমণ্ডল সত্ত্বেও তার স্তরে-স্তরান্তরে প্রতীচ্য রোমাণ্টিক ভাবধারার গভীর অনুসরণ, শুধুমাত্র ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে ঐ ব্যক্তিত্বদীপ্ত নারী, তাঁর মতে, বেরিয়ে আসতে পারতো না। উর্বশীর মধ্যে শীতাংশুবাবু প্রাচ্য শক্তিবাদেরও ক্ষণিক উপস্থিতি স্মরণ করেছেন— শুধু বিপুলতরভাবে তাকে পাশ্চত্য রোমাণ্টিকতায় ফিরিয়ে আনবার মানসে।

---

১ কাব্য-কৌতুক'এর অন্তর্ভুক্ত।

উর্বশীর পরেই বোধকরি উপন্যাসের অগ্রাধিকার, তার কারণ এখানকার ইহচেতনা বা যৌনজীবন কোনোটাই ভারতীয় মতানুগত নয়। ভারতীয় ঐতিহ্য, তাঁর মতে, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রাধান্য হলো নারীর, যে নারী আবার একমাত্র প্রেমকে বাঁচাবার, প্রিয়া হয়ে বেঁচে থাকায় লালসার দীপ্যমান, যা কিনা প্রতীচ্যের রোমান্টিক দর্শনজাত। শীতাংশুবাবু প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্র-উপন্যাসে কই সেই সম্পূর্ণাঙ্গী প্রাচ্যা? শীতাংশুবাবু তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে খুঁজে পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই তাঁর বিশ্ববীক্ষার প্রতীচ্যময়তা সবচেয়ে পরিস্ফুট, কিন্তু অন্যত্রও শীতাংশুবাবু তাকে পরিস্ফুট করেছেন। যেমন তাঁর জীবনদেবতা-তত্ত্ব— যা মূলত ভারতীয়তারই প্রেরণা বলে বহুমানিত— শীতাংশুবাবু তার জন্য স্মরণ করেছেন য়ুং-এর কালেকটিভ আনকনশাস-এর ঋণ, আর তার জন্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে কবির আজন্ম উৎসাহ। এ ছাড়া তাঁর জীবনদর্শনের বৈরাগ্যবিমুখিতা ও মানবকেন্দ্রিকতা তো রয়েছেই, সেগুলি আমাদের অজানা নয়, শীতাংশুবাবুকে তার জন্য শুধু উদাহরণ বাড়াতে হয়েছে।

শীতাংশুবাবুর আলোচনা কোনোখানেই কল্পনাহীন সমান্তর-সন্ধান নয়, এবং সবজায়গাতেই প্রভূত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু তাঁর আলোচনায় সবচাইতে যা অস্বস্তিকর তা হলো পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের আনুগত্য, আর সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রথিতযশা কিছু বিলিতি সমালোচনার নিঃশর্ততর আনুগত্য। রোমান্টিকতার আলোচনায় ঐ বিদেশী সূত্র-সিদ্ধান্ত— এমনকি চেনা সেই পারিভাষিক শব্দবন্ধগুলি পর্যন্ত বারংবার ফিরে ফিরে এসে লেখকের সদভিপ্রায়কে পাঠকের কাছে একটু ব্যাহত করবে বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু তা বাদ দিলে, তাঁর লেখা প্রচুর জ্ঞাতব্যে ভরা, এবং রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের কাছে সেই জ্ঞাতব্যগুলি কোনোক্রমেই পরিহার্য নয়।

নেপাল মজুমদারের বইখানিতে রবীন্দ্রালোচনার ভিন্ন একটি পরিপ্রেক্ষিত গৃহীত হয়েছে, এক হিসেবে সেটি উপেক্ষিত পরিপ্রেক্ষিতও বটে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার পাশে যে কর্মীসত্তার সতত উপস্থিতি, আলাদা করে তার সমূহ পর্যালোচনা তেমন হয়নি, নেপালবাবু সেই দিনকৃত্যরত রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লিষ্টভাবে তাঁর আলোচনার বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন ভারতের এবং তৎকালীন বিশ্বের যাবতীয় জ্বলন্ত সমস্যাবলী তাঁকে যে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল, 'সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও সাধনা এবং তাঁহার রচনাবলীর পর্যালোচনা করাই হইতেছে এই গ্রন্থ প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য।' এবং আরো বিশেষভাবে, তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্য লেখক এখানে নির্ণয় করার প্রয়াস করেছেন; সেইমতো, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের ধারাটি ক্রমানুসারে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কর্মপ্রচেষ্টার পাশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকেও নেপালবাবু তাঁর প্রতিপাদ্যের মধ্যে তুলে নিয়েছেন, কার্যতও রবীন্দ্রনাথের কবিকৃত্যকে এই আলোচনায় অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সব সময়েই পাঠককে তিনি মনে করিয়ে রেখেছেন তাঁর পরিপ্রেক্ষিতটি আর প্রস্থানবিন্দুটি আলাদা। সেইসব রবীন্দ্ররচনার উল্লেখ করেছেন যারা রবীন্দ্রনাথের ঐ সামাজিক দিকটির জন্য প্রয়োজনীয়, এবং সেই রবীন্দ্ররচনাবলীকে শিল্প হিসাবে নয়, তাঁর

ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটির দ্বারাই সবখানি প্রমাণিত করেছেন। যেমন, 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'কে তিনি দেখিয়েছেন, মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩১১ ও পৃ ৩৭১)। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'য় লক্ষ্য করেছেন অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩০২ ও দ্বিতীয় খণ্ড : পৃ ১৯৫)। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তা তাঁর চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (দ্বিতীয় খণ্ড : পৃ ২৬৪ ও পৃ ২৬৭)। আবার 'নৈবেদ্য'র কবিতায় একদিকে তিনি দেখেছেন 'সাম্রাজ্যবাদী লালসা'কে বিনিপাত-জানানো পংক্তিসমুচ্চয়, অপরদিকে ঐ 'নৈবেদ্য'র যুগ থেকেই, লক্ষ্য করেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে,...তাহা হইতেছে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ'।'

যেখানে রচনাগুলি রাজনৈতিকভাবে অব্যক্তভাষী, সেখানেও খুব উপযোগী কতকগুলি প্রশ্ন লেখক রেখেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার ১৯০৮ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, বা সে সময়কার গান্ধীজি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না :

তবে কি প্রায়শ্চিত্ত-নাটক কবিমনে দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফল? (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩০৩) গীতাঞ্জলি-র পরে জীবনস্মৃতি, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে অচলায়তন-কেই 'কিছুটা আলোচনার আওতার মধ্যে আসে' বলে বিবেচনা করেছেন। তার কারণ, অচলায়তনে

> রবীন্দ্রনাথ কি [আমাদের জাতীয় আন্দোলনের] সশস্ত্র সমাজ-বিপ্লবকে সমর্থন করিলেন? (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩১৯)

'বর্ষশেষ' নামক বহুখ্যাত কবিতাটির সম্বন্ধে লিখেছেন

> কেহ কেহ ইহাতে শেলীর 'Ode to the West Wind'এর পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কবির বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থাটির কথা চিন্তা করেন নাই। (প্রথম খণ্ড : পৃ ১৩৬)

নেপালবাবুর এই মন্তব্যগুলির কোনো কোনোটি-অন্তত বিচ্ছিন্নভাবে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর, কিন্তু তাঁর কর্তব্য যে আলাদা আর কোনোখানেই শিল্পগ্রাহিতার অবসর যে তাঁর নেই— তাঁর লেখা সবজায়গাতেই এই আন্তরিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই কারণেই সমগ্র বইটির গতিপ্রবাহের মধ্যে এই মন্তব্যগুলি, মনে হয়, স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে গেছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মূল কবি-চরিত্রকেও তিনি দৃষ্টির বাইরে রাখতে চান নি। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি সামাজিক কার্যের পিছনে কবিপ্রবৃত্তি ও সমাজচেতনার যুগ্ম উপস্থিতি তিনি নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিরও ভূমিকা সন্ধান করেছেন যেখানে সমস্ত রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকা স্বীকৃত, সেইখানে— 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় :

> ইহাতে শুধু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যেরই ভূমিকা লেখা হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের রাজনীতির ভূমিকাও এই কবিতার মধ্যে লিখিত রহিয়া গিয়াছে। (প্রথম খণ্ড : পৃ ২৯)

আর তাঁর রাজনীতির মূল উৎস নির্ধারণ করেছেন কবি-অনুভূত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে। অচিরকালের মধ্যেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে পৃথক করে এনে গঠনমূলক সমাজসেবায় মনোনিয়োগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে লেখক তাঁর কবিচরিত্রের প্রভাব দেখিয়েছেন। আর অচিরকালমধ্যে

তিনি যে উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাকে আধ্যাত্মিক বিশ্বজাগতিকতাবাদ নামে অভিহিত করে লেখক সেই কবিঅভিপ্রায়েরই প্রাধান্য দেখিয়েছেন। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিছক দিনকৃত্যগুলির জন্যও আত্মা ও শাশ্বতের সমর্থন যাচ্ঞা করেছিলেন। লেখক যখন সামাজিক কর্মে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, রাজনীতিজ্ঞতার অভাব কিংবা রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, তখনো এই সত্যকেই তিনি মর্যাদা দিয়েছেন বলে মনে হয়!

নেপালবাবু তাঁর দু-খণ্ডের সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এসে পৌঁছিয়েছেন। এই সালটি দু-টি কারণে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তার উপর ড. শচীন সেনের বইটি এই সালে প্রকাশিত হয়, তাতে রাজনীতিচিন্তক হিসেবে তাঁর সর্ববাদিসম্মত পুঁথিগত প্রতিষ্ঠার পরিচয় সম্ভবত মেলে। আর দ্বিতীয়, এই সালেরই শেষে লাহোর কংগ্রেসে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র স্বদেশমনস্ক রবীন্দ্রনাথ নন, ঐ সময়ের ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকাটিও বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনবিকাশটিও যাতে ধারাবাহিকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। তাঁর সমাজাদর্শের সব দিকগুলি— তাঁর গণসংযোগ, কৃষি, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন, স্বদেশী সমাজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শ, তাঁর শিক্ষাপ্রকল্প আর্থনীতিক ভাবনা ও সমাজের নানাবিষয়ে তাঁর প্রগতিক চিন্তাধারা— বিশেষভাবে আর বিশদভাবে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিচিন্তকদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাঁর আলোচনা করে তাঁর চিন্তা ও মতগুলিকে লেখক যথাযোগ্য মর্যাদাতেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

লেখক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারতের সমস্যাকে বিশ্বের সহানুভূতিশীল চোখের সামনে উপস্থিত করার অনেকখানি কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথেরও। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ভোলার নয়। এবং তাঁর চিন্তার তাবৎ মৌলিকতাগুলি তিনি সযত্নে বেছে তুলেছেন।

এই একটি জায়গায় বিশেষ করে লেখকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তার কারণ সাধারণত ভারত-রাজনীতির আলোচনায় সরকারীভাবে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্থান নেই ; তাঁর দু-একটি কৃত্য— যেমন, তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ বা জাতীয় গীতিরচনা আমরা তাঁর গুণমুগ্ধেরা আপ্লুত কণ্ঠে বলে থাকি বটে, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও জাতীয় চিন্তায় তাঁর অজস্র মৌলিক অবদানের খবর আমরাও অধিকাংশজনেই হয় অল্পদিনেই ভুলেই গেছি, নতুবা তাঁর কবিতার দ্বারা আচ্ছাদিত করে ফেলেছি। সর্বভারতীয় আলোচনাতেও তার তেমন কোনো স্বীকৃতি চোখে পড়ে না বলে আমাদেরও সে কথা মনে রাখার গরজ নেই। নেপালবাবু তাঁর এই বইতে সেইসব রবীন্দ্রচিন্তার মূল্যবান দলিল আহরণ করে রাখলেন। তাঁর বই আরেকটু সুলিখিত বা প্রসাদগুণান্বিত হলে আমাদের ভালো লাগতো। তাঁর রচনায় যে পরিমাণ তথ্যসামগ্রী রয়েছে, সেই অনুপাতে গৃহস্থালী: নেই, কিন্তু এগুলি বাদ দিয়েও তাঁর এই আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান ; এবং সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও অবশ্যপাঠ্য রবীন্দ্রজীবনী বলে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক জীবনীর পাশেই এই বইয়েরও দাবি থাকবে বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের সকল শ্রেণীর পাঠককেই এই বইখানি পড়বার অনুরোধ করি।

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস তাঁর বইয়ের গোড়াতেই অত্যন্ত সময়োপযোগী এই প্রশ্ন তুলেছেন : 'রবীন্দ্র কবি প্রতিভা শতাংশের কত অংশে পরিবেশ নির্ভর?' বিশদ করে বলতে হলে : 'একটি আশ্চর্য কবিবাণীর পরিশীলনে প্রত্যক্ষের যাবতীয় রমণীয়তার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষের চকিত স্পর্শ একত্র তাঁর কাব্যে যেভাবে লাভ করা যায় তার কী পরিমাণ ঠাকুরবাড়ির সংসার এবং তৎকালীন বাঙলাদেশের রচনা?' ক্ষুদিরাম বাবু বরং পুরাতন বাঙলার কাব্যসংস্কারের পটভূমিকায় 'সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে জাতীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তী বলে গণ্য করতে' চেয়েছেন তাঁকে। কিন্তু তারপরে আরো প্রত্যাশিত এই সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছেন : 'প্রত্যক্ষ কবিবচনকেই কাব্য-কীর্তির মৌল সম্পদ বলে দেখা উচিত।'

তার কারণ, ক্ষুদিরামবাবু অসংশয়িতভাবে জানিয়েছেন, 'কাব্যগত রমণীয়তা স্বয়ম্প্রকাশ, বাহ্য পরিচয় ছাড়াই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে তার ইন্দ্রধনুর বর্ণবিস্তার।' সেই অনুসারে, তাঁর এই আলোচনায় কবিতা বিশ্লেষণের স্বার্থে তিনি বাইরের জীবনী পরিবেশ ঘটনা কিংবা আরোপিত বা বহুমানিত কোনো তত্ত্বের প্রভাব-প্রেরণা সন্ধান করেন নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছবি ও গানের সংশ্লেষ বলে তাঁর কবিতার যে-পরিচয় দিয়েছিলেন, চিত্রগীতময়ী সেই রবীন্দ্রবাণীর রূপপ্রকরণের উপর তিনি তাঁর আলোচনার মূল নির্ভর রেখেছেন, এবং 'মুখ্যত প্রকাশের বা কবিভাষার উপর নির্ভর করে কাব্যচমৎকারের স্বরূপ নির্ণয়ের' প্রয়াস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যধারার ধারাবাহিকতাকে তাই বলে তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। শুরু করেছেন 'কড়ি ও কোমল'এ, যেখান থেকে রবীন্দ্রনির্দেশিত সার্থকপদত্বের সূচনা। আর 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'জন্মদিন'এ পর্যন্ত তাঁর আলোচনাবিস্তার যে-পর্যায়-ক্রমে তিনি বিন্যস্ত করেছেন সেখানে একটি ক্রমবিকাশের সূত্রও যেন অলক্ষিতে কাজ করে যায়, যেটি প্রায় জীবনবিকাশের সহযোগী। অথচ আলোচনার পদ্ধতিতে বোঝা যায়, এখানে কবিতাগুলি কোথাও জীবনবিকাশের উদাহরণ হিসাবে গৃহীত হয় নি, এবং সমস্ত আলোচনা ভয়ানক ভাবে কবিতামাত্রনির্ভর। শুধু একবারমাত্র পদসার্থকতার প্রসঙ্গটিকে অগ্রাহ্য করে একটি গোটা কবিতাগ্রন্থ এই বইয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, সেটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং সেটি গৃহীত হয়েছে আরো মহত্তর কারণে, পূর্ব-উদ্ধৃত জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সেতুবন্ধনের অভিপ্রায়ে। তার কারণ তাঁর মতে, এখানে 'এমন একটি প্রাচীন রীতির রচনায় তিনি প্রভাবিত হচ্ছেন যা তাঁর কবিধর্মের সঙ্গে অর্থাৎ শব্দার্থ নির্মাণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ।'

'চিত্র-সংগীত' কথাটিকে ক্ষুদিরামবাবু শব্দার্থ-সাহিত্যের বা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র কথিত বক্রতা-র প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, শুধু তাই নয়, 'রূপের দিক থেকে কাব্য-বিবেচন' করতে গিয়ে তিনি সেই পুরাতন রূপদর্শী আলঙ্কারিদের বিস্মৃত পথরেখাটিকে যেন এই আলোচনায় পুনরায় উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। ক্ষুদিরামবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্রুত পণ্ডিত। এই আলোচনায় আলোচ্য-কবিতা ও পাঠক উভয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের সহায়তায় নিঃসন্দেহে লাভবান হয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও বলতে হয়, তাঁর আলোচনায় খুব স্পষ্ট দু-টি দিক ফুটে উঠেছে। তাঁর আলোচনা যেখানে ভালো সেখানে ঐ পুরাতন বিবেচনাপদ্ধতিতেও তিনি এই মুহূর্তের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করতে পেরেছেন, শব্দশরীরের অন্তঃস্থ যে কবিতা— তারও মাঝখানে পাঠককে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু অন্যত্র— আর বলা যায় অনেক স্থানেই— তাঁর আলোচনা শুধু ছন্দোবিশ্লেষণ-অলঙ্কারনির্ণয়-এবং অঙ্গীরস সন্ধান— আর একই ধরণের কয়েকটি বিশেষণ-প্রযুক্ত অল্প-কথার মন্তব্য, যা কিছুতেই কবিতাটির মধ্যে পাঠককে নিয়ে যেতে

পারে বলে আমাদের মনে হয় না। তাঁর কোনো কোনো অর্থনির্ণয়ের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারি নি, সেটি অবশ্য তেমন জরুরি প্রসঙ্গও নয়, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে তিনি যদি বিশ্লেষণের জন্য আরো অল্প কবিতা বেছে নিতেন— আর কোথাও কোথাও অন্তত পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্তের উপরে স্থান দিতেন ব্যক্তিগত বিবেককে, তাহলে আলোচ্য প্রত্যেকটি কবিতায় তাঁর পূর্ণ মনোযোগ পড়তো, এবং তাহলে তাঁর অভিপ্রায় আরও প্রস্ফুটতর হয়ে উঠতো তো বটেই, আমরাও তাঁর এই আলোচনাকে আরো মূল্যবান— আরো অপরিহার্য বিবেচনা করতে পারতাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এর আগের লেখা রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কবিতা-বিষয়ের সুদীর্ঘ বইদুটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন, এই তৃতীয় বইটিকে সহজেই তাঁরা ঐ আলোচনাপর্যায়ের পরবর্তী যোজনা হিসেবে মিলিয়ে নিতে পারবেন। এই বইখানিও সমান সুদীর্ঘ, একই রকম বিশদ ও বর্ণনাধর্মী, একই রবীন্দ্রবোধের ভিন্ন-নিদর্শন-আশ্রয়ী প্রকাশ। উপন্যাসের আলোচনা এখানে সংক্ষিপ্ততর, এবং বিশেষত্বহীন। প্রধানত উপন্যাসগুলির কাহিনীসংক্ষেপ কালানুক্রমে অধ্যায়ে অধ্যায়ে স্থাপিত হয়েছে; পটভূমিক বা অন্তরঙ্গ তাৎপর্য সন্ধান নেই এমন নয়, কিন্তু তুলনায় অনেক গৌণ আর অনুল্লেখ্য স্থান নিয়ে আছে।

লেখকের মতে উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ কৃতকার্য হতে পারেন নি। তার কারণ তিনি বলেছেন: 'যে-ধাতুতে রবীন্দ্রমানস গঠিত তাকে রোমান্টিক-মিস্টিক বলা যায়।' এবং 'ঔপন্যাসিকের যে দেশ ও কালের সাধারণ জীবনযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে সহজলভ্য ছিল না।' পৃ ৩২৮। এই সিদ্ধান্ত স্বয়ম্প্রকাশ, এর উপরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর এরই পিঠোপিঠি তাঁর অপর উক্তি: 'উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ সার্থকতা লাভ করেছেন' পৃ ৩৭। এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যে আলোচনা আছে তার চেয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি।

কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বহুদিন আগে লিখেছিলেন: 'ছোটগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।' এবং ছোটগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, তার জন্য 'ছোটগল্প' নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই প্রথম ব্যবহার। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু শুধু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেই অনন্যমনাভাবে নিবদ্ধ। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পরচনার পশ্চাদ্-ভূমি ও আবেষ্টন' বলে রবীন্দ্রজীবনের একটি অধ্যায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনীত হবার আগেকার বাঙলাসাহিত্যের যে প্রস্তুতি, সেই ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটটিকে জরুরি বিবেচনা করেন নি। তিনি আলোচনার যে পরিসর নিয়েছেন তারই জন্য ঐ আদি পর্বটি তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা ছিল।

উপেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিরও কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন। 'গল্পের ভাববস্তু ও রসবিশ্লেষণ'-অধ্যায়ের এটিই মুখ্য কৃত্য। যেখানে 'গল্পের ভাষা ও রচনারীতি' বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাষায় একাধিক বিশেষণের ও উপমারূপকাদির অব্যর্থ প্রয়োগ।' তদনুযায়ী ভাষার বিশেষণ ও উপমা-রূপকগুলি তিনি সন্ধান করে তুলে দিয়েছেন। তাঁর আলোচনার অন্যস্থানগুলিও প্রায় এই রকমই সরল, এবং এর চেয়ে

অধিক তাৎপর্যবহও নয়। তাঁর আলোচনার সবচেয়ে প্রধান গুণই অবশ্য তাঁর আলোচনার এই সরলতা। এবং এই জন্য তাঁর বক্তব্যগুলি তিনি শুধু প্রাঞ্জলই করেননি, তাদের স্মরণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য তাদের সূত্রাকারেও উপস্থিত করেছেন। পৃ ৪৯, পৃ ২২০, পৃ ৩০৬।

যে সমস্যাকে তিনি তাঁর আলোচনার কূটস্থানে রাখতে চেয়েছেন, সেটি বাস্তবের সমস্যা। ঐ বাস্তব-অনভিজ্ঞতার দরুণ তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে গ্রহণ করতে পারেন নি। আবার ছোটগল্পগুলিকে সার্থক সিদ্ধান্ত করার জন্য তাদের 'অবিসংবাদিতরূপে খাটি বাস্তবচিত্র' (পৃ ২৫) বলে প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। এই দিক চেয়েই বোধ করি তাঁকে লিখতে হয়েছে : 'তাঁর কাব্যসৃষ্টির ধারা ও ছোটগল্পের ধারা পৃথক।' পৃ ৩১। তার কারণ: 'ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবনিষ্ঠ কাহিনী-রচয়িতা চৌদ্দ-আনি, ভাব-সাধক কবি দু-আনি।' পৃ ১৯। এবং 'রবীন্দ্র-প্রতিভা মূলত গীতধর্মী হলেও গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের বেলাতে তাঁর গীতধর্ম মোটেই প্রাধান্য পায়নি।' পৃ ৩১

এই সিদ্ধান্তকে সবলতর করার জন্যই সম্ভবত এর পর উপেন্দ্রবাবু তাঁর প্রতিপক্ষদের উপস্থিত করেছেন ও খণ্ডন করেছেন। লিখেছেন :

> অনেকে তাঁর গল্পগুলিকে লিরিকধর্মী বলে একটা সহানুভূতিপূর্ণ তাচ্ছিল্যের উদাসীন মন্তব্য করেন। অর্থাৎ এ গল্পগুলি প্রকৃত গল্প নয়, তাঁর কবিতারই অপর রূপ। পৃ ২০

এবং তার জবাব দিয়েছেন

> কবি গল্পরচনার ক্ষেত্রে সেই জীবন্ত বাস্তববোধকেই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কবির প্রতিভা সেই বাস্তবের শুষ্ক কঙ্কালমধ্যে অপূর্ব জীবন-চেতনা ও অপরূপ লাবণ্য সঞ্চার করেছে। পৃ ২১

এই অসংশয়িত যুক্তি পড়ার পরেও আমাদের কিন্তু জানার ইচ্ছা হয়, এই অনির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ কারা? আর এই মন্তব্য কোন সময়ের? এক সময়ে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিরুদ্ধে এমন ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তা বোধহয় নিছক ইতিহাসের তথ্য। ছোটগল্পের আলোচনায় ঐ কবিতা ও বাস্তবের সমস্যা এখন আর আদৌ জরুরি বলে মনে হয় না, সম্ভবত এতদিনে তার নিরসন হয়েছে, আর অন্যান্য অজস্র অন্তরঙ্গ প্রশ্ন এসে বহুদিন হলো তাকে স্থানচ্যুত করে গেছে।

তা ছাড়া, উপেন্দ্রবাবু যেভাবে বাস্তববোধ ও কাব্যপ্রবণতাকে দুই মেরুশায়ী পার্থক্যে তফাত করেছেন কোনো কবির জীবনেই বাস্তব ও কবিতা সেইরকম সাংসারিক বিভাগে আলাদা নয়। আরো আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, 'লিরিক-ধর্মী' কথাটি কোন বিবেচনায় তাচ্ছিল্য এমনকি সহানুভূতিপূর্ণ তাচ্ছিল্যেরও কথা। আমাদের তো মনে হয়, এটি নিতান্ত প্রশস্তি— কি তার চেয়েও বড়, আন্তরিক গুণগ্রাহিতা। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি নিঃসন্দেহে লিরিকাল, যেহেতু আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতার গভীরতম ও উচ্চতম মুহূর্তগুলি লিরিকাল, এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিবিড়তম অংশগুলি লিরিকাল। সেই লিরিকাল আধ্যাত্মিক যে বাস্তব তা অলীকও নয়, তা পার্থিব বাস্তবের বিপরীতার্থকও নয়! তাঁর গল্পগুলিকে লিরিক-ধর্মী বললে রবীন্দ্রনাথ বেদনা বোধ করতেন বলে লেখক যে জানিয়েছেন, একটু অন্তর্দৃষ্টিতেই বোঝা যায় সেই বেদনার আসল কারণ অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের পাঠক ও সমালোচকেরা তখনো লিরিক বলতে বুঝতেন পদ্যাতিশয়ী বাক্যবন্ধ, এবং কবিতা-কথাটির মর্মোদ্ধার তখনো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বেদনা সম্ভবতঃ ছিল এইখানে।

পরিশেষে বলতে হয়, উপেন্দ্রবাবুর এই আলোচনা প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ। তিনি একটি বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণস্থচক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি যোগ করে গেছেন। অনেক জায়গায় রচনার সঙ্গে চিঠিপত্র-গুলি নিপুণভাবে সম্পর্কিত করেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তিনি বাহুল্য বর্জন করার কথা ভাবেন নি। আর রবীন্দ্ররচনাকে যেভাবে জারিত করে তিনি পরিবেশন করেছেন তাতে তাঁর আলোচনা অনুচিতভাবে স্বয়ম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছে বলেও আমাদের আপত্তি। তার কারণ এই আলোচনা পড়ার পর মূল রচনাগুলি পাঠকের কাছ থেকে এত দূর আর অদরকারী হয়ে পড়ার ভয় থাকে, যাকে কিছুতেই সমালোচনার সার্থকতা বলে বিবেচনা করা যায় না।

অধ্যাপক প্রণয়কুমার কুণ্ডুর বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস-করা গবেষণাগ্রন্থ, ইদানীংকালে যে-সব উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রালোচনা হয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এর স্থান থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে। প্রধান কারণ নিশ্চয়ই তাঁর আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের গীতি-ও-নৃত্যনাট্যগুলির সামাজিক আবেদন যতই বাড়ুক না কেন, সে সম্বন্ধে আলোচনার অত্যন্ত অভাব ছিল। আর অধ্যাপক প্রণয়-কুমারের আলোচনা নিছক কাব্যবস্তুর ব্যাখ্যাও নয়, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণই তার মুখ্য অংশ, এবং সেদিক থেকেও প্রণয়কুমার তাঁর অধিকার অসংশয়ে প্রমাণ করেছেন।

এই বইয়ের পর্যালোচনকেন্দ্রে অবশ্য একটি তত্ত্বের অধিষ্ঠান রয়েছে। লেখকের মতে, বিশিষ্ট এক ছন্দোবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা ও শিল্পপ্রকরণগুলি— তাঁর কাব্য-নাটক-সংগীত-ও-চিত্র— জন্মলাভ করেছে। ‘এগুলি বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্রপথে বিশেষ বিশেষ ছন্দকে আশ্রয় করে বিবর্তিত।’ কিন্তু এই আলাদা আলাদা প্রকরণপ্রয়াসগুলি অবিচ্ছিন্ন ছন্দোময়তায় গিয়ে পরিণতি পেয়েছে তাঁর নৃত্যনাট্যে— ‘যেখানে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির সামগ্রিক তাৎপর্য সহসা উদ্ভাসিত।’

‘কাব্য, গীত ও অভিনয়— তিনের এই যে সর্বাত্মক অভিসার’— এর সূচনা ছিল গীতিনাট্যের মধ্যেই। সেইজন্য তাঁর শিল্পচর্যার আদিতে গীতিনাট্য। কিন্তু ঐ ছন্দশ্চেতনা সেখানে সর্বাত্মক হয়ে ওঠে নি, প্রথম পা রেখেছে মাত্র। লেখক গীতিনাট্য ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ থেকে নৃত্যনাট্যের প্রাথমিক খসড়া ‘শিশুতীর্থ’ এবং ‘শিশুতীর্থ’-‘শাপমোচন’ থেকে নৃত্যনাট্য ‘শ্যামা’ পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট বিবর্তনের ধারা চিহ্নিত করে, এবং ধারাবাহিকভাবে সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে সেই বিবর্তনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে, পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার সার্থক সমন্বয় ও রূপায়ন দেখা গেল নৃত্যনাট্যের মধ্যে।··· নৃত্যনাট্যই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার সিদ্ধি।’ পৃ ৩২৫

গীতি ও নৃত্যনাট্য দুটিই অনিবার্যভাবে সুরারোপিত বলে রবীন্দ্রসংগীতপ্রসঙ্গও এই আলোচনার বেশ বড় একটি অংশ গ্রহণ করেছে। লেখকের মতে, রবীন্দ্রজীবনে সংগীতের ভূমিকা অবশ্য আরো বড়, আরো গম্ভীর। তিনি বলেছেন: ‘রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিই সংগীত চেতনায় আলোকিত।··· শিল্পী বা কবিজীবনের শুরু থেকেই সংগীতানুরাগই তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে’ পৃ ৩২৫। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি এখানে গীতি ও নৃত্যনাট্য-প্রত্যেকটির গায়কী বা গায়নপদ্ধতি এবং সুর সমাবেশের বিশিষ্টতাগুলি সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাটকে গানের ক্রমবিবর্ধিত ব্যবহারের প্রসঙ্গও বলেছেন। দেখিয়েছেন:

> গীতিনাট্যের পর নাট্যকাব্যে যেমন গান নেই, তেমনি সাংকেতিক নাটকে ধীরে ধীরে গানের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে নৃত্যনাট্যে তা অবশেষে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ নাটকের বক্তব্য গানের ভিতর ফুটে উঠেছে তো বটেই, তা ছাড়াও সংলাপের বক্তব্য পুনর্বার গানে রূপান্তরিত। পৃ ১৬৮

নৃত্যনাট্যের প্রসঙ্গে বিশেষ করে আলোচনা করেছেন যেগুলিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ছন্দছুট গদ্যগান বলে জানি। আর বলা যায়, পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাসও এখানে তিনি রেখান্বিত করেছেন, যার শুরু 'মায়ার খেলা'র যুগ থেকে। কারণ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানে রবীন্দ্ররচনা অনুপস্থিত, 'মায়ার খেলাতে'ই সুরস্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ। এইরকমভাবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যরীতির উপাদানগুলি ও ক্রমবিকাশের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে বিশদভাবে সঙ্কলন করে দিয়েছেন শান্তিনিকেতনের নৃত্যচর্চার ইতিহাস।

প্রণয়কুমারের এই আলোচনায় সবচাইতে চোখে পড়ে পরম্পরা-সম্পর্কে তাঁর সবসময়ের সচেতনতা, প্রয়োগগত আলোচনায় যে সচেতনতা প্রায়শই শিথিল হয়ে পড়তে দেখা যায়। গীতি ও নৃত্য -নাট্যের আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র-রবীন্দ্রনাথকেও তিনি কোনোখানে কুণ্ঠিত করেন নি। পরন্তু ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধে একদিকে বাঙলাদেশের উনিশ শতাব্দী থেকে বাঙলা নাটক-অভিনয় ও মঞ্চ-বিবর্তনের সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের গীতি ও নৃত্যনাট্যের পিছনে বিলিতি অপেরা ও ব্যালে-র প্রেরণাবিধায় সেই বিদেশী যোগসূত্রগুলিকেও সযত্নে সঙ্কলন করেছেন। খুব পরিচ্ছন্নভাবে তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁর আলোচনায় ব্যবহার করেছেন, তাতে ঐ প্রকরণ-বিষয়ে কতকগুলি অপরিহার্য ও অনালোকিত সূত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সব মিলিয়ে, বাঙলাদেশের নাট্যকলার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমাদের জ্ঞান আরো পূর্ণতা-প্রাপ্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। রবীন্দ্রজীবন সম্বন্ধেও একটি পূর্ণ ধারণা দেবার জন্যে তিনি সযত্ন থেকেছেন।

শম্ভু সাহা-কৃত অনবদ্য আলোকচিত্র-উদাহরণগুলির উল্লেখ না করলে এই বইয়ের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। ঐ আলোকচিত্রগুলি এই বইয়ের উৎকর্ষের অন্যতম উপকরণ।

আমাদের সর্বশেষ পুস্তক 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু'। এই গবেষণাগ্রন্থের লেখক শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সম্পর্কিত চিন্তার একটি ধারাবাহিক ও বিস্তারিত ইতিহাস সঙ্কলন করে তুলতে যত্নবান হয়েছেন। তিনি সব-জায়গাতেই সেই চিন্তার নেপথ্যে পার্থিব হেতুগুলি আর সেই মুহূর্তকার যা উপলব্ধি, এবং তার পাশে সনাতন দার্শনিক ঐতিহ্যের যতখানি প্রভাব, সযত্নে সন্ধান করেছেন, আপাতভাবে-পরস্পরবিরোধী অনুভবও মন্তব্যগুলির জন্য আহরণ করে এনেছেন সঙ্গতিসূত্র— তাঁর মৌল জীবনদর্শন থেকে, সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হয়ে কবির মৃত্যুচিন্তার একটি অখণ্ড ও সামগ্রিকরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

গ্রন্থ-পরিচয় অংশে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনালোচিতপূর্ব বলে এই বিষয়টিকে অভিনন্দিত করেছেন। লেখক নিজে অবশ্য বিশেষ করে এই বিষয়েই লেখা অন্তত চারটি নিবন্ধের উল্লেখ করেছেন (যার মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারের স্মরণীয় রচনাটিরও উল্লেখ আছে), এবং আরো

অন্তত ছ-জন রবীন্দ্রালোচকের নাম করেছেন যাঁরা তাঁদের আলোচনায় প্রসঙ্গত এই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তৎসত্ত্বেও এ কথা বলতে হয়, এই বিষয়ে এত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে কেউ করেন নি, এবং সেই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে শ্রীদেবনাথের প্রাপ্য।

পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ। শ্রীসুকুমার সেন। পৃ ১০৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩.০০ টাকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। প্রথম খণ্ড। কাজী আবদুল ওদুদ। পৃ ৫৫১। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭। ১২.০০ টাকা

রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্রসাহিত্য। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। পৃ ৩৭৬। কনটেমপোরারি পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯। ১০.০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১৩+২০৬। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা ৭। ৫.৭৫ পয়সা

রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ। ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী। পৃ ১০+২৩৬। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা ৯। ৮.০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা। শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। পৃ ১৪৫। মৈত্রী। প্রাপ্তিস্থান: জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯ ও কলিকাতা ২৯। ৬.০০ টাকা

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। পৃ ২০৭। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯ ও ২৯। ৬.০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য। শ্রীশীতাংশু মৈত্র। পৃ ৩২+১৬৮। বুকল্যাণ্ড, কলিকাতা ৬। ৬.০০ টাকা

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনেপাল মজুমদার। প্রথম খণ্ড, পৃ ১১+৪৫৩। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৫২৫। মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১২। যথাক্রমে ১০.০০ টাকা ও ১০.০০ টাকা

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী। শ্রীক্ষুদিরাম দাস। পৃ ৩২৪। গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা ৯। ১২.৫০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃ ঘ+৬১৩+১৫। এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১২। ১৮.০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য। শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু। পৃ ১৬+৪০০। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। ১২.৫০ পয়সা

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। পৃ ২২৮+১৪। রবীন্দ্রভারতী, কলিকাতা ৭। ৬.০০ টাকা

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ। বীণা মুখোপাধ্যায়। নাভানা, কলিকাতা ১৩। দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সঠিক সংখ্যা কত তা শেষ পর্যন্ত অজানা থাকবেই, তবে এটুকু সকলেই জেনেছেন যে অন্যান্য দিকে তাঁর সৃষ্টির যেমন বিপুল বিস্তার চিঠিপত্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর চিঠির সংকলন কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেই ছিন্নপত্র উচ্চস্তরের সাহিত্য বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। পরবর্তী চিঠিপত্রের খণ্ডগুলি সেই স্তরের সাহিত্য না হলেও নানা কারণে কবির সৃষ্টির ও জীবনের চর্চায় তাদের অপরিসীম মূল্য অনস্বীকার্য।

সংসারে অধিকাংশ লোকের চিঠিই ঘটনাকেন্দ্রিক। কখনো কখনো কবিত্বের ঢেউ জেগে উঠলে সাধারণ মানুষের চিঠিতে গাছপালা পাহাড় সমুদ্র প্রভৃতির আবেগচঞ্চল বর্ণনা দেখা দেয়। কিন্তু সারা জীবন ধরে চিঠি-বস্তুটাকে যাঁরা নিজের মনের বিচিত্রতা আস্বাদন করার উপায় বলে ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ শিল্পীদের অন্যতম। তাঁর অধিকাংশ চিঠিই যাঁকে লেখা তিনি উপলক্ষ্য মাত্র— লক্ষ্য নিজের সম্বিৎ চর্বণের আনন্দ—যাকে আলঙ্কারিকেরা রসসৃষ্টি প্রক্রিয়ার শেষ ফল বলে উল্লেখ করেছেন—'স্বসংবিদানন্দ চর্বণীয়ো ব্যাপারঃ'। প্রকৃতপক্ষে অনেক কবিতার জন্মপ্রেরণা বহুপত্রের জন্মের পিছনে সমান সক্রিয়।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে জীবনের শেষ বিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ এমন বহু চিঠি লিখেছেন যেগুলির মুদ্রিত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি ষোলো-আনা অবহিত ছিলেন। তাঁর জীবৎকালেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর চিঠি ছাপার জন্য ব্যাকুলতা ছিল। এই ঘটনা যে পত্রাবলীতে তাঁর অন্তরলোকের নিঃসংকোচ উদ্ঘাটনে বাধা জন্মায় নি এমন কথা জোর করে বলা শক্ত। এবং যেমন প্রথম-মহাযুদ্ধের পর থেকেই তাঁর কবিতা মননসমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি জীবনের শেষ অর্ধের চিঠিগুলির মধ্যে ব্যক্তি-হৃদয়ের উত্তাপের চেয়ে ভাবনাগত নিরাসক্তির নৈর্ব্যক্তিকতাই প্রবলতর। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত প্রভৃতিকে লেখা চিঠিগুলির সঙ্গে হেমন্তবালা দেবী, কাদম্বিনী দেবী প্রভৃতিকে লেখা চিঠিগুলির পার্থক্য উপরের মন্তব্য সমর্থন করবে।

বলা বাহুল্য এইসব বিচিত্রতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পত্ররচয়িতা। এতাবৎকাল অনেকেই কলেজ-পাঠ্যবস্তু হিসাবে ছিন্নপত্রের আলোচনা করেছেন, কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রপত্র-সাহিত্যের আলোচনার প্রথম গ্রন্থ যা চোখে পড়ল তা হল বীণা মুখোপাধ্যায়ের 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ'।

যে উদ্যম ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়ে লেখিকা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় সাজিয়েছেন তার প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হয় পরিকল্পনাজনিত দুর্বলতা ও শৈথিল্য বিষয়বস্তুর উপর লেখিকার সম্যক গৃহিণীপনার পরিচয় বহন করে না। অধ্যায়-বিভাগ প্রায় সর্বস্তরেই পরস্পর-অতিক্রমী। এ জাতীয় অধ্যায়-বিভাগ চিঠিপত্রের মতো পার্সোন্যাল রচনায় ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যক্তিগত চিঠিপত্র' এবং সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত আবেগপ্রবণ পত্রাবলী দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। একই চিঠি এই দুটি শ্রেণীতেই পড়তে পারে। 'স্বদেশ প্রেম' 'সমাজ সংস্কার' 'জীবনদর্শন'

এগুলির মোটামুটি বিভাগও যে সম্ভব নয় তা প্রায় একই মর্মার্থমূলক উদ্‌ধৃতির বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োগের ফলে স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের বিপুল সংখ্যাধিক্য চিঠিগুলির ঠিকমত শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষে প্রবল বাধা। কোনো কোনো চিঠি প্রবন্ধাকারে প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সেগুলো কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও তার মধ্যে চিঠির রস আদৌ নেই। রাজনীতি সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়েই এই জাতীয় চিঠির রচনা।

আলোচ্য গ্রন্থে এই জাতীয় চিঠির সঠিক মূল্য নির্ণয় করার চেষ্টা লেখিকা করেছেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিষয়বস্তুর আলোচনায় সীমিত হয়েছে, পত্ররচনার কলাকৌশলের দিক থেকে যথোচিত মূল্য আরোপ করা যায় নি। তবে 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রমপরিণতি' অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য, কারণ যেমন তাঁর সাহিত্যরচনার অন্যান্য শাখায় তেমনি তাঁর পত্ররচনাতেও তিনি যে নিজেকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করেছিলেন লেখিকা তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় একটি মন্তব্য লেখিকা করেছেন যেটি নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে— বিশেষ করে যখন দেখি লেখিকা নিজেই নিজের বক্তব্য সমর্থন করছেন না। তিনি বলছেন: "কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা ভাষায় পত্রসাহিত্য-রচনার সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে, কেননা ষোড়শ শতাব্দী থেকেই প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংরাজী না-পড়া লোকের লেখা পত্র-সাহিত্যের নিদর্শন মিলেছে।" লেখিকা পত্র আর পত্রসাহিত্যকে প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন কিন্তু একই পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই বলছেন, "সে সময়ে চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবেজে যে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল তাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। পরন্তু তখনকার দিনে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষাতেই চিঠিপত্র রচনা করতেন।" পৃ ১

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই চেষ্টার যা তাৎপর্য তার প্রতি পাঠকের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণে লেখিকা সক্ষম হয়েছেন। হাজার হাজার চিঠির মধ্য থেকে নানা মত নানা মেজাজের যে বিচিত্র মানুষটিকে ধরা যায় তার আভাস তিনি পাঠকদের ধরিয়ে দিয়েছেন। আর-একটু সংক্ষিপ্ত হলে আর-একটু পরিকল্পনাগত ভারসাম্য রক্ষিত হলে বক্তব্য অনেক বেশি স্পষ্ট হত।

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু

পিতৃস্মৃতি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। ষোলো টাকা।

পিতৃস্মৃতি আমাদের দেশের ঐতিহ্যের একটি বিশিষ্ট সংস্কার। এই লেখাগুলির জন্য প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে হয় রথীন্দ্রনাথকে, সহজ সরস মনোজ্ঞ ভাষায় নিজের আত্মজীবনীর সঙ্গে মিলিয়ে যিনি কবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্ভুতভাবে বহু তথ্য ও বিবরণ দিয়ে। বসুধারায় (১৩৬৬-৬৮) যখন রথীন্দ্রনাথের লেখাগুলি বের হচ্ছিল তখন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে অনেক সময়ই যেতাম, মুগ্ধ হয়ে পড়তাম ঐ লেখাগুলি, শুনতাম তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য। রথীবাবুকে জোর করে লেখাতে হচ্ছে এ ধরণের

মন্তব্যও মনে পড়ছে। আর ধন্যবাদ জানাতে হয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়কে, যিনি রথীবাবুকে, কবি ও তাঁদের পরিবারের অনেককে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, এবং তাঁদের ভাবধারার সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে পরিচিত। *On the Edges of Time* থেকে অংশগুলির শ্রীক্ষিতীশ রায়-কৃত অনুবাদ সাবলীল ও সুখপাঠ্য। লেনার্ড এলমহর্স্টের ভূমিকাটি স্বল্প কথায় লেখা হলেও বইটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। আমাদেরও দুঃখ রয়ে গেল যে মহাপ্রতিভাবান পিতার পুত্র তাঁর বিচিত্র ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার অবসর পেলেন না, এক কথায় তিনি 'হয়ে' উঠলেন না। পিতৃনামেষু মধ্যমই রইলেন, পিতার খ্যাতিতেই আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই তিনি বলে গেছেন— জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের। সেটা আত্মশ্লাঘা নয়, আত্মবিলুপ্তির চেষ্টাও নয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই তাঁর আত্ম-উন্মীলন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ— এমন বাড়ি যা ইতিহাসের বোঝা কাঁধে করে এগিয়েছে— যে বাড়ির শতাব্দী জুড়ে বাংলার মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ছিল অদ্ভুত প্রভাব, যার অবদান অসামান্য। 'বাড়ির মানুষের মধ্যে ছিল উদ্দীপনা, পরিবারে ছিল মাধুর্য, পরিবেশে ছিল দাক্ষিণ্য'। রবিকাকার সন্তান জন্মাবার আগে থেকেই 'পারিবারিক খাতায়' প্রশ্ন উঠল যে আসছে, সে পুত্র না কন্যা— সে গম্ভীর আরণ্যক ঋষি হবে, না, সারাক্ষণ দাঁত বের করে হাসবে। কিন্তু মায়ের কোলে রথীন্দ্রনাথ যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ পাই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে কবিপত্নীর 'প্রোফাইল স্টাডি' রথীন্দ্রনাথের মাতৃচিত্রে এত স্বল্প কথায় এমন ভাস্বর হয়ে ফুটেছে যে যার তুলনা নেই। কবিগৃহিণীর কথা ঠিক কাব্যে উপেক্ষিতা নয় বটে, অন্তরঙ্গ কয়েকখানি মুগ্ধ চিঠি আছে, ছোট বউকে বা ভাই ছুটিকে লেখা, 'স্মরণ'এর কয়েকটি অনবদ্য কবিতা আছে, আর আছে কতকগুলি কাহিনী যেমন নবীন চিত্তরঞ্জনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাঁক— কাকিমা, আমি এসেছি, লুচি মাংস কই ; কিম্বা শিলাইদহে পদ্মা ধলেশ্বরীর তীরে তাঁর ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কথা, যেখানে ঘৃত আসছে ভারে ভারে, চাকর দাসীরা ঘৃতশ্রাদ্ধ করছে, যেখানে জগদীশচন্দ্র আসছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল আসছেন, লোকেন পালিত আসছেন, নিবেদিতা আসছেন ; অমলা দেবীর কণ্ঠে গান হচ্ছে— কবি লিখছেন গল্পের পর গল্প— রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতিতে এই শিলাইদহ কাহিনীই চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু ধূধূ করা পদ্মার চরের গল্প নয়, মাটির গল্পও— যে মাটিতে আমরা জন্মেছি— যে শিক্ষালাভের জন্য তিনি যান আমেরিকায় যেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কৃষিবিদ্যার ছাত্র ছিলেন এবং এইখানেই আর্বানায় কবিও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছেন।

রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে আমরা শুধু কবিকেই পাই না, মাতৃবন্দনাই শুনি না, কস্‌মপলিটান ক্লাব বা খামখেয়ালী সভা বা বিচিত্রার বিবরণই পড়ি না, দেখি বড় জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্যরসিক চিত্র কয়েকটি— 'বলিবে নমো রবয়ে, বড় দাদা তব এ', মেজো জ্যাঠামশাই সত্যেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের পরিবেশ, যে আসরে আসতেন তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি, যেখানকার মধ্যমণি তারকনাথ পালিতকে হতভম্ব করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দদের সম্মানে এক ডিনারপার্টিতে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি অনেক সময়েই অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'কে মনে করিয়ে দেয়। নিবেদিতার সঙ্গে কবি ও জগদীশচন্দ্র বসুর বুদ্ধগয়া ভ্রমণের কথাও আমরা নতুন করে শুনি

রথীন্দ্রনাথের কাছে। অধ্যাপক যতুনাথ সরকার পূর্বেই আমাদের শুনিয়েছেন সে কথা। সবচেয়ে ভালো লাগে কবির বিলাতযাত্রার নানা খুঁটিনাটি খবর, গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া ও তার পুনঃপ্রাপ্তি।

সত্যিই ঠাকুরবাড়ির কথা একটা স্যাগা বিশেষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, প্রতিমা দেবী, রথীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে কত কথা লিখেছেন। শুধু জীবনস্মৃতি নয়, কত চিঠি, কত ডায়েরী, কত আত্মপরিচয়। দ্বারকানাথের পত্রাবলী, মহর্ষির পত্রাবলী (ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুরের সংগ্রহ), অনেক দলিল দস্তাবেজ কোবালা ট্রাস্টডীড ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য তো এক অপূর্ব সম্পদ, শুধু রবীন্দ্রনাথের অবচেতন ও অধিচেতন মনের খবরই দেয় না, ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে দেশের ও সমাজের চিন্তার ধারারও সমন্বয় করে দেয়। তিন শতাব্দী (অষ্টাদশ উনবিংশ ও বিংশ) ছুঁয়ে এর ইতিহাস, এর পুরোগামিনী যাত্রা, এর পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা— কিন্তু তবু সেই রথচক্রে মন্দ্রিত হয়েছে তিনটি নাম, বিশেষ করে প্রিন্স দ্বারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এই সেই বাড়ি যার কথা লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—

ভাতে যেথা সত্যহেম মাতে যেথা বীর
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি

আমরা পাই এখানে জাতীয়-ইতিহাসের তিনটি সূত্র—

১. প্রাচীন ভারতের ধ্যান ও মন, তপ ও তপস্যার আদর্শ
২. পশ্চিমের ধাক্কা-খাওয়া চেতনার সংশয়ে ও সন্দেহে সব-কিছু যাচাই করে নেবার প্রয়াস, সংকল্প ও সাধন
৩. ভবিষ্যতের স্বপ্নে-মশগুল এক সমন্বয় ও সিদ্ধির আভাস— এর সঙ্গে ছিল দেশাত্মবোধের একটা মধুর প্রকাশ, বিজ্ঞান টেক্‌নলজিকে স্বীকার ও সব মিলিয়ে জীবনের প্রতিটি পর্বে সত্যশিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

ঠাকুরবাড়ির ধ্যানমগ্ন অন্তর্জীবনের সঙ্গে গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রস মিশে এক অপরূপের সৃষ্টি করেছিল এবং তারই মধ্যে সেই সুরে মিলিয়ে যদি আমরা রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতিকে ধরতে পারি তবেই তার সূক্ষ্ম তারটিতে ঝংকার দিতে পারব।

বইটির সম্পাদন ও প্রসাধন সুন্দর, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে আজকের মূল্যবৃদ্ধির দিনেও দাম বেশ কিছু বেশি বলেই মনে হয়। দাম কিছুটা কম হলে রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তিদের ঘরের লাইব্রেরিতে বইটি স্থান পেত। এখন তাদের স্কুল কলেজ বা পাঠাগার থেকে বইটি সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ এই কারণে যে এ বইটি না পড়লে পিতাপুত্রের মিলিত একটি যুগ্ম-জীবনের কয়েকটি স্বর্ণোজ্জ্বল ও বর্ণোজ্জ্বল পৃষ্ঠা অজানা থেকে যাবে— যেখানে আত্মকথা ও পিতৃস্মৃতি এক হয়ে গেছে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুরবাড়ীর কথা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯। বারো টাকা।

দুই মনীষী। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। ছয় টাকা।

দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষায়, নানামুখী কর্মচেষ্টায় এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় এক তাৎপর্যময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বভাবতই এই ঠাকুরবাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাবার অধিকারী। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে ঠাকুর-বাড়ির দানের কথা সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে থাকেন। চিত্রবিদ্যাতে যে গৌরবময় স্থান আমরা অধিকার করেছি তাও এই ঠাকুরবাড়ির সূত্রেই। জাতীয়তার উদ্বোধনে ঠাকুরবাড়ির ঋণও স্বীকৃত।

ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস আসলে বাংলাদেশেরই ইতিহাস। ঠাকুরবাড়ি যে আমাদের কৌতূহলই উদ্রেক করে তা নয় তার 'রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বংশের কীর্তিমান মানুষের কত স্মৃতিবিজড়িত' কথা বাঙালীর গৌরবময় অগ্রগতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইতিহাস-রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বলা বাহুল্য এই বিশ্ববিদ্যালয় ঠাকুরবাড়ির সেই ঐতিহ্য-রক্ষায় আগ্রহী। ইতিমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজে কিছুটা অগ্রসরও হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে বলতে পারি ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ঠাকুরবাড়ির কর্মচেষ্টাকে বাংলাদেশে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করার দায়িত্বও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন কতগুলি তথ্য এবং উপাদান সংগ্রহ করেছেন যার দ্বারা কিছু নূতন সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে; কিছু সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে এবং পূর্বের অনেক অনুমান এখন প্রমাণরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'য় এই সকল তথ্য ব্যবহার করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

লেখক দ্বারকানাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সবিস্তারে বলে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অন্যান্যদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপরবর্তী ঠাকুর-পরিবারের অন্যান্য বিষয় শেষের অধ্যায় দুটিতে বলা হয়েছে। দ্বারকানাথের চিন্তাধারায় আধুনিকতার দিকটি এখন সকলেই স্বীকার করেছেন। শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে দ্বারকানাথের প্রসঙ্গ সবিস্তারে বলেছেন। যে ব্যবসায়ে দ্বারকানাথ এতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা যে কত প্রতিকূল ঘটনাকে অতিক্রম করে সম্ভব হয়েছিল শ্রীযুক্ত ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে সে কথা বিশদ করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গ তো উল্লেখ করেছেনই উপরন্তু দ্বারকানাথের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের দায়িত্বের বিবরণ দিয়েছেন। নানা দিক দিয়ে দ্বারকানাথও অসামান্য পুরুষ ছিলেন। এই অসামান্যতার কথা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। দ্বারকানাথের পুত্রদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের জীবনকথা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে পিতার বৈশিষ্ট্য যেমন এক দিক থেকে উপেক্ষণীয় নয় তেমনি রামমোহনের শাসনও গুরুতর। সে সময়ে যে ধর্মজিজ্ঞাসা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে জেগেছিল তা কি করে নানা আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল সেইটি লক্ষ্য করবার বিষয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যে সংকট দেখা দিয়েছিল সে সংকট উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর। এক দিকে খ্রীস্টান পাদ্রিদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, অন্য দিকে প্রাচীন শাস্ত্রপন্থীদের রক্ষণশীলতা— উভয়ই দেবেন্দ্রনাথের কাছে পরিত্যাজ্য ছিল। বেদের বহু দেবতাস্তুতি

দেবেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিতে পারে নি। উপনিষদের অদ্বৈতবাদও নয়। অথচ বেদান্তকে তিনি অস্বীকারও করেন নি। উপনিষদেই যে দ্বৈতবাদের ইঙ্গিত আছে তাকেই অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মনীষার দ্বারা ধর্মমতে অভিনবত্ব দান করলেন। তিনি উপনিষদ থেকে সেই সকল বচন সংগ্রহ করলেন যেগুলি তাঁর মনীষা ও অনুভূতির সমর্থন পেয়েছিল। তিনি সেই সংকলনগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন ব্রাহ্মী উপনিষদ। এভাবে দেখতে পাই দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করে তার ব্যাখ্যাতে নূতনত্ব দান করলেন। এ ধর্ম মননেরও বটে আবার উপলব্ধির বস্তু তো নিশ্চয়ই। প্রকৃতপক্ষে ইয়ংবেঙ্গল যে সরণী আশ্রয় করেছিল তাও যেমন যথার্থ নয় তেমনি ধর্মসভা যে মতে বিশ্বাসী ছিল তাও অযথার্থ— দেবেন্দ্রনাথের কাছে ধর্মের ক্ষেত্রে এই ছিল প্রবল যুক্তি। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় যে পথ গৃহীত হয়েছিল তা মধ্যবর্তী পথ যাকে ভারতপন্থা বলতে পারি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বেদ-বেদান্তের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দেবেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার যে সহজ সরল ভাষায় বিচার করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দুই মনীষী'তে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গেও অনুরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে। বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করেছিলেন অথচ জীবকে তিনি অস্বীকার করেন নি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রবাণী ও বিবেকবাণীর মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্যের ধারাটি অনুধাবন করেছেন। আসলে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তায় ধর্মজিজ্ঞাসার যে পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথে তার একরকম পরিণামরমণীয়তা দেখি। কিন্তু সমস্যার আরও কতগুলি দিক ছিল যা পরমহংস-দেবের সাধনায় লভ্য। পরমহংসদেব 'মতুয়া বুদ্ধি' পরিত্যাগ করে 'যে যৈছে ভজে তারে আমি ভজিতৈছে' —এই বুদ্ধিকেই সমর্থন জানিয়েছেন। বিবেকানন্দের সাধনায় ছিল সহিষ্ণুতা, সর্ববিধ মত স্বীকার করার ঔদার্য, পরধর্মের স্বীকৃতি এবং অগণিত মানবের দুঃখদারিদ্র্যকে যে ধর্ম ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখে তাই। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন 'দুই মনীষী' গ্রন্থে। 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'য় রবীন্দ্রনাথের জীবনভাষ্য অধিকাংশ স্থান নিয়েছে। পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের ক্রমবিকাশের কথা আমরা অন্যত্র পেয়েছি। 'রবীন্দ্রজীবনী'র মত এনসাইক্লোপিডিয়া এ প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে। স্বল্প পরিসরে হিরণ্ময়বাবু রবীন্দ্রনাথের যে জীবনকথা নিবেদন করেছেন তাতে তাঁর কাব্যালোচনা কিংবা গ্রন্থবিচার নেই। মুখ্যত যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন বিকশিত হয়েছিল তাই লেখকের আলোচ্য বস্তু। বলা বাহুল্য 'ঠাকুরবাড়ির কথা'য় রবীন্দ্রজীবনের আলোচনা অন্যতম বিষয়। অল্প কথায় হলেও এ জীবনকথা লেখকের আন্তরিকতার সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠা যুক্ত হয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

'দুই মনীষী'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-আলোচনা স্থান পেয়েছে। লেখক কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকচিত্তের কাছে গভীর আবেদন নিয়ে আসে। দুই মনীষী—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের কথা আগে বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা কোন্ সরণী ধরে ঈশ্বরভাবনায় রূপান্তরিত হল এবং এই দুই ভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার স্থান কোথায় তা নির্দেশ করতে চেয়েছেন লেখক। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রকৃতি-ভাবনা ও ঈশ্বর-ভাবনার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় হল প্রেমের অধ্যায়। 'এই দুই অধ্যায়ের মাঝখানে কিছুকালের জন্য ব্যবধান সৃষ্টি করে একটি ছোট অধ্যায় কবির কাব্যজীবনে রচিত হয়েছিল।

সে অধ্যায়টিকে প্রেমের অধ্যায় বলা চলে'। এই অধ্যায়টির সূত্রপাত মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাপ্তি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে। এর গোড়ায় মিলনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অন্তে 'হঠাৎ মৃত্যুর আঘাতের মর্মস্পর্শিতা'। অবশ্য এই প্রেমের প্রস্তুতিপর্বও আছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যের বিচারে এরকম ভাবনা ইতিপূর্বে অনুল্লিখিত। লেখক বলেছেন প্রেমের অধ্যায়টি প্রকৃতি ও ঈশ্বর চিন্তার মাঝখানের পর্দা। উদাহরণযোগে তিনি তাঁর বক্তব্য বিশদ করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে ('ওহে অন্তরতম') লেখক জীবনদেবতা-তত্ত্ব পর্যালোচনা করেছেন। 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'য় দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি ঔপনিষদিক তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পুনরায় সে তথ্য পরিবেশন করে লেখক রিলিজন অব ম্যান, শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রবচন উদ্ধৃত করে জীবনদেবতা-রহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর হয়েছেন। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ কবির দার্শনিকমন স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথের কবিমন তা স্বীকার করতে পারে নি। অন্তরের উপলব্ধিতে জানি পরমসত্তা ব্যক্তিরূপে আমাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সেই ব্যক্তিরূপী পরমসত্তাই জীবনদেবতা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাউলের, বৈষ্ণবের সাধনা। লেখক জীবনদেবতার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তায়ও সম্ভাবিত এরকম মনে করেন। বলা বাহুল্য জীবনদেবতা ভাবনা সম্বন্ধে কোনো সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বোধকরি সম্ভবও নয়। যা উপলব্ধির তাকে ব্যাখ্যার দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। কবির ব্যাখ্যাও এই কারণে সকলের দ্বারা গৃহীত হয় নি। লেখকের বক্তব্যও সকলে গ্রহণ করবেন এমন আশা করা যায় না। তবে লেখকের বক্তব্যে সারালো যুক্তি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিরণ্ময়বাবুর আলোচনা দৃষ্টে অন্তত এই কথাই বার বার মনে হয় জীবনদেবতা-রহস্য আমাদের চিত্তে কত বিচিত্র ভাবনাকে জাগ্রত করে।

রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপকতা এবং সর্বাতিশয়িতা লক্ষ্য করে হিরণ্ময়বাবু পরের প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো ঐশ্বর্য এনে দিয়েছে যেমন সত্য কথা তেমনি কোনো কোনো দিকে বিপর্যয়ের সূচনাও করেছে। লক্ষ্মীর সাধনায় নিমগ্ন জাতি সরস্বতীর কথা বিস্মৃত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন। হিরণ্ময়বাবু রবীন্দ্রনাথের সমাজ-জিজ্ঞাসার মৌলিক রূপটি প্রকাশ করেছেন তাঁর আলোচনাতে। রবীন্দ্রনাথের কর্মচেষ্টার আর-এক দিক শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের কর্মোদ্যমের যে চিত্র আমরা এই গ্রন্থে পাই তাতে লেখকের সহানুভূতি ও দরদের পরিচয় সুস্পষ্ট।

'ঠাকুরবাড়ীর কথা' ও 'দুই মনীষী' গ্রন্থ দুটি উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাস। সমাজের অগ্রগতির মূল্যবান দলিল এই দুই গ্রন্থ। লেখক জ্ঞাত তথ্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং এ জাতীয় গ্রন্থরচনায় যে ইতিহাসনিষ্ঠার প্রয়োজন তাও লেখকের রচনায় লভ্য। বাংলাতে প্রথমোক্ত গ্রন্থের অভাব ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি— আচার-ব্যবহার, রুচি-সৌজন্য, জীবনাদর্শ, সঙ্গীত সাহিত্য ও শিল্পকলা— নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা, বঙ্গদেশকে সমুজ্জ্বল এবং ভারতবর্ষের দিগন্তকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।" 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'র সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ('দুই মনীষী') অনুসরণ করলে বাংলার রেনেসাঁসের একটি উজ্জ্বল চিত্র পাই। এই পথেই এই দুই গ্রন্থের সাফল্য।

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

স্বরলিপি

আজি দক্ষিণপবনে
দোলা লাগিল বনে বনে ॥
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃদ্‌স্পন্দনে ॥
মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়
উৎসব-আমন্ত্রণে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

দা২ না II { র্সা -া । সর্গা র্গা I র্গা -র্ঋা । র্গর্ঋা -র্সনা I (নর্সা -সনা । দা২ না) } I
আ জি দ ০ ক্ষি ণ প ০ ব ০০ নে ০ আ জি

I নর্সা -া । র্সা র্সা I নর্সা -না । না -ধা I ধা -পা । পা -মা I মা -া । মগা -পা I
নে ০ দো লা লা ০ গি ০ ল ০ ব ০ নে ০ ব০ ০

I মা -া । মা মা I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -র্ঋা । র্সা -না I র্সা -র্সনা । দা২ না II
নে ০ দো লা লা ০ ০ ০ ০ ০ গি ০ ল ০ "আ জি"

-া -া I -া -া । -া -া II { র্সা -র্গা । র্গা র্গা I র্গা -া । -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ দি ক্ ল ল না ০ ০ র্

I র্গর্পা -র্মর্পা । র্গা -া I র্গর্পা -র্মর্পা । র্গা র্গা I র্গর্পা -র্মর্পা । র্গা র্গা I
নৃ০ ০ ত্য ০ চ০ ন্ চ ল ম০ ন্ জী র

I র্গা -র্ঋা । র্ঋা -র্সা I র্সা -র্গা । র্গা র্গা I র্গর্ঋা র্ঋা । র্ঋর্সা র্সা I
ধ্ব ০ নি ০ অ ন ত রে ও ঠে র০ ন

I র্সঋ্া -া^র্স । র্সা -া I -া -া । -া -া } I র্সা র্সর্গা । র্গা র্গা
র্ ॰ ॰ নি • ॰ • ॰ • বি র্ • হ বি

I -ঋ্া ঋ্া । ^র্সঋ্া -র্সা I ^র্সঋ্া -র্সা । র্সা -ণা I ণা -দা । দা -পা
হ্ ব ল • হৃ দ্ স্প ন্ দ • নে •

I -পা -মা । মা মা I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -ঋ্া । সা -না
• • দো লা লা • ॰ ॰ • ॰ গি •

I র্সা -^র্সনা । দা^২ না I র্সা -র্গা । র্গা -ঋ্া I ঋ্া -র্সা । র্সা -ণা
ল • দো লা লা • গি • ল • ব •

I ণা -দা । দা -পা I পা -মা । মা মা I গা -মা । -ধা -না
নে ॰ ব • নে ॰ দো লা লা ॰ ॰ •

I -র্সা -ঋ্া । র্সা -না I র্সা -^র্সনা । দা^২ না II
• • গি ॰ ল • "আ জি"

-া -া I -া -া । -া -^র্সনা II ^পধা ধা । না র্সা I র্সা -ঋ্া । -া -র্সনা
॰ ॰ ॰ • ॰ ॰ মা ধ বী ল তা ॰ ॰ ॰ ॰

I -া -া । -া -া I { না র্সা । র্সঋ্া র্সা I না -া । র্সা ^র্সঋর্সা
॰ ॰ ॰ য়্ ভা ষা হা ॰ রা ব্যা • কু ল ॰

I না -া । -া -া I -মা -া । -গা -া I মা ধা । না র্সা]
তা • ॰ • • • ॰ • মা ধ বী ল

I র্সা -ঋ্া । -া -র্সনা I -র্সা -া । -া -া I (র্সর্গা -া । র্গা র্গঋ্া]
তা ॰ • • ॰ ॰ ॰ • য়্ প • ল্ ল বে •

I র্ঋর্পা -া । র্গা র্গা I র্গর্ঋা র্ঋর্পা । র্গা র্গা I র্গর্ঋা র্ঋর্গা । র্গর্ঋা -া I
প ০ ল্ ল বে প্র ল ০ পি ত ক ০ ল ০ র ০

I র্সা -া । -া -র্সনা I নধা ধা । না র্সা I র্সা -র্ঋা । -া -র্সনা I
বে ০ ০ ০ মা ধ বী ল তা ০ ০ ০ ০

I -র্সা -া । -া -া)} I { র্সা র্সর্গা । র্গা -া I র্গা -া । র্গা -র্ঋা I
০ ০ ০ র্ প্র জা ০ প ০ তি র্ পা ০

I র্ঋর্পা -া । -া -র্ঋর্পর্ঋা I -র্গা -া । -া -া I র্ঋা র্ঋর্পা । র্গা র্গা I
খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দি কে ০ দি কে

I র্গর্ঋা র্গা । র্গর্ঋা র্ঋা I র্সা -া । -া -া I -া -া । -া -া } I
লি পি নি ০ য়ে যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

I র্সর্গা -া । র্ঋা র্সা I না -া । র্সা -র্ঋা I র্সা -ণা । ণা -দা I
উ ৎ স ব আ ০ ম ন্ ত্র ০ ণে ০

I -দা -পা । পমা মা I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -র্ঋা । র্সা -না I
০ ০ দো ০ লা লা ০ ০ ০ ০ ০ গি ০

I র্সা -র্সনা । দা২ না I র্সা -র্গা । র্গা -র্ঋা I র্ঋা -র্সা । র্সা -ণা I
ল ০ দো লা লা ০ গি ০ ল ০ ব ০

I ণা -দা । দা -পা I পা -মা । মা মা I গা -মা । -ধা -না I
নে ০ ব ০ নে ০ দো লা লা ০ ০ ০

I -র্সা -র্ঋা । র্সা -না I র্সা -র্সনা । দা২ না II II
০ ০ গি ০ ল ০ "আ জি"

সম্পাদকের নিবেদন

আত্মবিসর্জনের আত্মসমর্পণের ও আত্মনিবেদনের এমন দৃষ্টান্ত বড়-একটা দেখা যায় না।— একজন বিদেশিনী হয়েও ভগিনী নিবেদিতা ভারত-আত্মার কাছে যেভাবে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদন করেছিলেন, অনেক ভারতবাসীর পক্ষেও সম্ভবত অতটা সম্ভব নয়। ভারতের প্রতি মমতাবশত অথবা ভারতবাণীর দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অনেক বিদেশী এ দেশে এসেছেন, ভারতবর্ষকে ভালোও হয়তো তাঁরা বেসেছেন। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা কিছুটা সচেতন ছিলেন বলেই হয়তো তাঁরা নিজেদের একটু পৃথক্‌ভাবে রেখেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেবল ভারতবর্ষকেই ভালোবাসেন নি, তিনি ভারতবাসীকেও পরম-আত্মীয় বলে জ্ঞান করেছেন। এ দেশে এসে তিনি দেশের ও দশের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর স্নেহ মাতৃস্নেহেরই তুল্য ছিল। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন লোকমাতা। এ দেশের মাটির সঙ্গে মহত্ত্ব মিশ্রিত আছে বলেই বিদেশীকে এ দেশ আপন করে নিতে পারে— অনেক সময় আমরা এ রকম ভেবে থাকি। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, এ দেশের মাটিতে আত্মনিবেদন ক'রে এই দেশের সঙ্গে নিজেকে যিনি এক ক'রে নিতে পেরেছেন তিনিও মহৎ।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে আমরা নূতন করে তাঁর প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। এই সংখ্যায় মুদ্রিত নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সংখ্যা প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়; অষ্টাদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এটি সংকলিত আছে।

একক চেষ্টায় কত বৃহৎ কাজ করা সম্ভব তার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ বসু। ইনি একাই যেন একটি ইন্সটিটিউশন ছিলেন। কোষ-গ্রন্থ রচনা করা বড় কাজ ও কঠিন কাজ, এবং হয়তো একার কাজ নয়। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ একক চেষ্টায় অনুরূপ করে প্রমাণ করেছেন যে, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা থাকলে কোনো কাজই কারো পক্ষে অসাধ্য নয়। তাঁরও জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁকে স্মরণ করলাম।

স্বীকৃতি

ভগিনী নিবেদিতার চিত্র কলিকাতাস্থ অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নগেন্দ্রনাথ বসুর চিত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক
৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৫. সম্পাদক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১ মার্চ ১৯৬৭ স্বাঃ সুশীল রায়